অধ্যাত্ম রামায়ণ

মূল সংস্কৃত থেকে শ্লোকানুযায়ী বঙ্গানুবাদ

(মহামুনি শ্রীব্যাসদেব রচিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত)

অনুবাদ

শ্রীরামদাস

(স্বামী ধীরেশানন্দ)
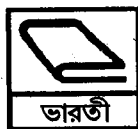
ভারতী বুক স্টল

৬বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯
✆ ২২৪১-৮০৮৯

Adhyanta Ramayana, a Bengali translation from original Sanskrit (written by Sri Bayasdeve) by sri Ramadasa (Swami Dhiresananda). *Published by* Ashoke Kr. Barik, Bharati Book Stall, 6B Ramanath Mazumder Street, Kolkata – 700 009. Rs. 150·00

প্রকাশক ঃ

শ্রীঅশোককুমার বারিক
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ ঃ মার্চ, ২০১১

মুদ্রণ ঃ

প্রদীপকুমার বারিক
রামকৃষ্ণ প্রিন্টার্স
৬বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ ১৫০.০০

প্রাক্-কথন

'অধ্যাত্ম রামায়ণ' গ্রন্থটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি প্রিয়। উহা শ্রবণ করিবার জন্য তিনি প্রায়ই বিভিন্ন স্থানেও গমন করিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থের নানা বিষয় উল্লেখ করতঃ ভক্তগণকে আনন্দ পরিবেশন করিতেন। ঐ গ্রন্থোক্ত জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের কথা তিনি একাধিকবার সকলকে বলিয়াছেন।

ঐ গ্রন্থটি বারংবার পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাই। প্রথম জীবনেই উহার একটি বাংলা তর্জমা করিবার বাসনা ছিল, কারণ তখনও উহার কোন বঙ্গানুবাদ দৃষ্টিগোচর হয় নাই! জীবন সায়াহ্নে তাই ঐ কার্যে ব্রতী হই। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির মান্দ্যতা উহার প্রতিবন্ধক ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীরাম-প্রেমী মহারাজ উহা লিখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে অনুবাদ কার্য আরম্ভ হয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আশিস তাঁহার উপর বর্ষিত হউক — ইহাই প্রার্থনা করি।

এই গ্রন্থটি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উত্তরখণ্ডের অন্তর্গত। সুতরাং সর্ব পুরাণ কর্তা মহামুনি শ্রীব্যাসদেবই এই গ্রন্থের রচয়িতা — ইহাই বিদ্বান্‌গণ বলিয়া থাকেন। শ্রীরাম চরিত বর্ণন প্রসঙ্গে ইহাতে ভক্তি, জ্ঞান, উপাসনা, নীতি ও সদাচার বিষয়ক নানা উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়। তত্ত্ব বিচারের প্রাধান্যই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। গ্রন্থের নামও ইহাই ঘোষণা করিয়া থাকে। গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস তাঁহার অমর কীর্তি 'শ্রীরাম চরিত মানস' গ্রন্থ রচনাকালে এই গ্রন্থেরই বিশেষ সাহায্য লইয়াছেন, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

এই গ্রন্থের বহু হিন্দী অনুবাদ আছে। কিন্তু উহা প্রায়শঃ অনেক স্থলে ভাবানুবাদ। মূল গ্রন্থের অক্ষরশঃ অনুবাদ নহে। এই বিষয়ে 'গীতা প্রেস' হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত প্রবর শ্রীমুনিলালের হিন্দী অনুবাদই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হওয়ায় আমরা ঐ অনুবাদই অনুসরণ করিয়াছি। শ্লোক সংখ্যাও তদ্রূপই করা হইয়াছে। শ্রীমুনিলালের প্রতি আমরা এ বিষয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞতা সানন্দে স্বীকার করিতেছি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার কল্যাণ করুন, ইহাই প্রার্থনা করি। সংস্কৃত শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করা অতি কঠিন কার্য। অনেক অনুবাদকই এজন্য অনেকস্থলে শ্লোকসমূহের ভাবটুকু বজায় রাখিয়া নিজের সাহিত্যিক ভাষায় সর্ববিষয় বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে মূল সহ মিলাইয়া পড়িতে গেলে অসুবিধা হয়।

বর্তমান অনুবাদে মূলের কোন শব্দ বাদ না যায় এরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহাতে ভাষার শুদ্ধতা, মাধুর্য, পূর্বাপর সাবলীলতা ও তাহার সামঞ্জস্য বোধ হয় কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

মূলসহ পাঠ করিবার পক্ষে এই অনুবাদ কাহারও কিঞ্চিৎ সহায়ক হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই গ্রন্থ বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাও সংকলন পূর্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

অনুবাদে কোন ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হইলে পাঠকগণ উহা ক্ষমাদৃষ্টি পূর্বক শোধন করিয়া লইবেন, এই প্রার্থনা। কারণ ঃ—

"ধাবতঃ স্খলনং ক্বাপি ভবেদেব প্রমাদতঃ।
হসন্তি দুর্জনাস্তত্র সমাদধতি সাধবঃ।"

ইতি নিঃস্বানামস্বামী
শ্রীরামদাস

পাণ্ডুলিপি উৎসর্গ—
শ্রীরাম নবমী।

হরিদ্বার ঃ ২৮শে চৈত্র-১৩৯৮
১১ই এপ্রিল-১৯৯২

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে রামায়ণ গ্রন্থ নানা ভাষায় লেখা হয়েছে। 'বাল্মীকি রামায়ণ', তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস', 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' সকলের নিকট পরিচিত হলেও অনেক বিখ্যাত সাহিত্য, কাব্য রামায়ণের কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। তবে রামায়ণের তাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনা গ্রন্থের মধ্যে 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' এবং 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' বিখ্যাত। যোগবাশিষ্ঠে রামের জীবন-কাহিনী অংশ খুবই কম। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে রামচরিতের সম্পূর্ণ কাহিনী পাওয়া যায়—তৎসহ ধর্ম ও নীতিকথা, দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা ও বিচার প্রভৃতি অতি সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ভাবে উল্লিখিত রয়েছে। অথচ শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কাহিনী ও নানা গল্পের মধ্যে যুক্ত আছে বলে এই সব ধর্মীয় আধ্যাত্মিক স্তবস্তুতি, বিচার, তত্ত্ব বিরক্তিকর বা নিরস মনে হয় না—বরং আকৃষ্ট করে তোলে।

স্বামী ধীরেশানন্দ মহারাজ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ও প্রবীণ সন্ন্যাসী। বেদান্তের ওপর তাঁর কয়েকখানি বই প্রকাশিত আছে এবং ধর্মপিপাসুদের কাছে সেগুলো অপরিহার্য। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তাঁর অনেক ধারাবহিক রচনা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের মূলানুসারে বঙ্গানুবাদ অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এক বিশেষ অবদান। একশ বছর আগে প্রকাশিত এই রামায়ণের একটি বাংলা অনুবাদ পাওয়া গেলেও তা ভাবানুবাদ মাত্র। বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্ম রামায়ণ আগ্রহ সহকারে শুনতেন, ভক্তদের কাছে মাঝে মাঝে এর বিষয়ে উল্লেখ করতেন—এগুলো পূজনীয় মহারাজকে এই অনুবাদ কার্যে প্রেরণা যোগায়। এই অনুবাদ কার্যে শ্রীরামের ধ্যান, স্মরণ, মননের ফলে তাঁকে অনুবাদক হিসাবে 'শ্রীরামদাস' পরিচিতি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলেও আমাদের অনুরোধে নিজের নামটি সঙ্গে যুক্ত রাখতে সম্মত হয়েছেন বলে আমরা আনন্দিত। বইটি আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ হলেও সহজ, সরল এবং মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা যুক্ত।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সোমানন্দ মহারাজের কাছে পূজনীয় মহারাজ ও তাঁর বইটি সম্বন্ধে জানতে পারি। যদিও ধর্মীয় বইয়ের চাহিদা স্বাভাবিক ভাবেই কম থাকে, তবু এই প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীর কথা শুনে এবং রামায়ণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মনে একটি আবেদন স্থান পায় বলে এই অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রকাশে আগ্রহী হয়েছি। আশা করি স্বামী ধীরেশানন্দজীর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই রামায়ণও অধ্যাত্ম পিপাসুদের আনন্দ দেবে এবং জীবন-দর্শনে দিশারী হয়ে থাকবে।

আগস্ট, ১৯৯৪

প্রকাশক

শ্রীরামরহস্যম্

('শ্রীরামপূর্বতাপনীয়োপনিষৎ')

চিন্ময়েহস্মিন্ মহাবিষ্ণৌ জাতে দশরথে হরৌ।
রঘোঃ কুলেহখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ ॥১॥
স রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রকটীকৃতঃ।
রাক্ষসা যেন মরণং যান্তি স্বোদ্রেকতোহথবা ॥২॥
রাম নাম ভুবি খ্যাতমভিরামেণ বা পুনঃ
রাক্ষসান্ মর্ত্যরূপেণ রাহুর্মনসিজং যথা ॥৩॥
প্রভাহীনাং স্তথা কৃত্বা রাজ্যার্হাণাং মহীভৃতাম্
ধর্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ ॥৪॥
যথা ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং স্বস্য পূজনাৎ।
তথা রাত্যস্য রামাখ্যা ভুবি স্যাদথ তত্ত্বতঃ ॥৫॥
রমন্তে যোগিনোহনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥৬॥
চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥৭॥

অনুবাদ ঃ- দশরথের ঔরসে রঘুর বংশে এই চিন্ময় মহাবিষ্ণু হরি জাত হইলে (তাঁহার রাম এই নাম হয়) ; যিনি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিয়া নিখিল বস্তু দান করেন এবং শোভমান হন, যাঁহার দ্বারা রাক্ষসগণ মরণ প্রাপ্ত হয়, সেই হরিই জ্ঞানিগণের দ্বারা জগতে রাম বলিয়া প্রকটিত হইয়াছেন ; অথবা স্বীয় উৎকর্ষ হেতুই (রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন)। ॥১-২॥

অথবা আনন্দবর্ধন-হেতু রামনাম পৃথিবীতে খ্যাত হইয়াছে ; রাহু যদ্রূপ চন্দ্রকে প্রভাহীন করে, তদ্রূপ মানুষরূপে রাক্ষসদিগকে প্রভাহীন করেন এবং সুযোগ্য রাজারা যাহাতে স্বীয় চরিত্র শ্রবণ করিয়া ধর্মপথ, নাম কীর্তন করিয়া জ্ঞানপথ, ধ্যান দ্বারা বৈরাগ্য ও পূজা দ্বারা ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারেন, তত্তদ্রূপে ফলবিধান করেন — এই কারণেও পৃথিবীতে ইঁহার নাম রাম হইয়াছে। ॥৩-৫॥

অনন্ত ও নিত্যানন্দ জ্ঞানমূর্তিতে যোগিগণ তৃপ্তিলাভ করেন, এই হেতুও পরব্রহ্ম এই দশরথ-পুত্রই রামপদের দ্বারা অভিহিত হন। ॥৫॥

উপাসকদিগের প্রয়োজন-নির্বাহের জন্য চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল ও অশরীরী ব্রহ্মের মায়িক রূপ হয়। ॥৭॥

'স্তবকুসুমাঞ্জলি' —স্বামী গম্ভীরানন্দ
(৭ম সংস্করণ—পৃষ্ঠা ঃ ১২৯)

রাম-নাম রহস্য (মন্ত্ররাজ)

'রামরহস্য - উপনিষৎ' ॥৫৬॥ পৃষ্ঠা - ৩৩৬ - (১০৮ উপনিষৎ)

'শ্রীরামে'তি পদং চোক্ত্বা
'জয় রাম' ততঃপরম্।
'জয়দ্বয়ং' বদেৎ প্রাজ্ঞো
'রামে'তি মনুরাজকঃ।।

অর্থাৎ ঃ-

"শ্রীরাম জয়রাম জয় জয় রাম।"

ইহা মন্ত্ররাজ।

সমর্পণ - পত্রিকা

গাঙ্গ্যং বারি গৃহীত্বা তু গঙ্গা-পূজাং করোম্যহম্।
ত্বদীয়ং বস্তু হে রাম তুভ্যমেব সমর্পয়ে।।

কোশলেশ!

মিত্র কে বা শত্রু সে বা না করি গণন।
উদ্ধারিতে সর্বজীবে তব আগমন।।
একবার শ্রীচরণে লইয়া শরণ।
'**আমি তব**' এ কথাটি বলে যেই জন।।
তাহাকে '**অভয়**' তুমি দিবে বলেছিলে।
এহেন ব্রত তোমার সুকণ্ঠে* ঘোষিলে।।
কৃপার মূরতি তুমি কৃপার সাগর।
তবপদে দাস্যভক্তি যাচি নিরন্তর।।
ভুবনমোহিনী মায়া দূর কর মোর।
পদযুগে এ মিনতি 'কোশল কিশোর'।।
বামনের যথা চাঁদ ধরিতে প্রয়াস।
কৌশল্যেয়-কেলি তথা কহে 'রামদাস'।।

ইতি শ্রীরামচন্দ্র-চরণ-চঞ্চরীক
— রামদাস

---

* সুগ্রীবের প্রতি। যুদ্ধকাণ্ড—৩/১২

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বাল কাণ্ড

তাড়কা বধ

অধ্যাত্ম রামায়ণ

বাল কাণ্ড

প্রথম সর্গ

রাম - হৃদয়

যে চিন্ময় অবিনাশী প্রভু পৃথিবীর ভার অপনয়ন করিবার জন্য দেবগণের প্রার্থনায় এই পৃথিবীতলে সূর্য বংশে মায়ামনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যিনি সমগ্র রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়া জগতীতলে সর্বপাপ বিনাশিনী অবিচল কীর্তি স্থাপন করতঃ পুনঃ স্বীয় আদ্য শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়াছিলেন সেই জানকীনাথের ভজনা করি। ॥১॥

বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়াদির একমাত্র কারণ, মায়ার আশ্রয় হইয়াও যিনি মায়াতীত, অচিন্তনীয় স্বরূপ, আনন্দঘন, উপাধি জনিত সর্বমালিন্য বর্জিত এবং স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ, সেই সর্বতত্ত্ববিদ্ শ্রীসীতাপতিকে আমি প্রণাম করি। ॥২॥

যাঁহারা এই সর্বপুরাণ সম্মত 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' অনন্যচিত্তে নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন, বা নিত্য শ্রবণ করিয়া থাকেন তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করেন। ॥৩॥

যদি কেহ সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি বাঞ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' নিত্য পাঠ করিবেন। যে মনুষ্য এই গ্রন্থ নিত্য শ্রবণ করিয়া থাকেন তিনি সহস্র-অযুত-কোটি গোদানের ফল লাভ করেন। ॥৪॥

শ্রীমহাদেবরূপ পর্বত হইতে নির্গত ও রামরূপ সমুদ্রে মিলিত এই অধ্যাত্ম রামায়ণরূপ গঙ্গাপ্রবাহ লোকত্রয়কে পবিত্র করিয়া থাকে। ॥৫॥

কোন সময়ে কৈলাস-পর্বত-শিখরে শত সূর্যতুল্য প্রকাশমান নির্মল মন্দিরে রত্নসিংহাসনোপরি ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া উপবিষ্ট, সিদ্ধগণ সেবিত, সর্বভয় রহিত, সর্বপাপাপহারী, সর্বানন্দের উৎসস্বরূপ, দেবাদিদেব, ভগবান ত্রিনয়ন সদাশিবকে তাঁহার বামাঙ্কে উপবিষ্টা গিরিরাজ কুমারী শ্রীপার্বতী ভক্তি বিনম্রচিত্তে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ॥৬॥

শ্রীপার্বতীজী বলিলেন—"হে দেব! হে জগদাশ্রয়! আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্বজীবের অন্তঃকরণের সাক্ষী এবং পরমেশ্বর। আপনার নিকট আমি শ্রীপুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্রের স্বরূপতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, কারণ আপনিও সেই সনাতন তত্ত্বস্বরূপ। ॥৭॥

মহান উদার-স্বভাব মহাপুরুষগণ অত্যন্ত গোপনীয় এবং সর্বসাধারণে অপ্রকাশ্য বিষয়ও কৃপাপরবশ হইয়া আপন ভক্তজনের নিকট প্রকট করিয়া থাকেন। হে দেব! আমিও আপনার অনন্যা ভক্ত, আপনি আমার পরম প্রিয়। অতএব আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় আপনি বর্ণন করুন। ॥৮॥

যে জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্য সংশয়-সমুদ্র পার হইয়া যায়, ভক্তি ও বৈরাগ্য পরিপূর্ণ প্রকাশময় বিজ্ঞান সহিত সেই আত্মজ্ঞান সংক্ষেপ-শব্দে বর্ণন করুন, যাহাতে স্ত্রী-শরীর লাভ করিয়াও আমি তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ॥৯॥

হে কমল নয়ন! পরম গোপনীয় আর এক রহস্যও আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উহা আপনি সর্বাগ্রে বর্ণন করুন। ইহা প্রসিদ্ধ যে, সর্বজগতের মূল শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশুদ্ধা ভক্তিই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার সুদৃঢ় নৌকা স্বরূপ। ॥১০॥

সংসার হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ উপায়। উহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন সাধন নাই, তথাপি আপনি আপনার জ্ঞানগর্ভ বচনদ্বারা আমার হৃদয়স্থ সংশয়-গ্রন্থি ছেদন করুন। ॥১১॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, সকলের আদিকারণ ও প্রাকৃতিক ত্রিগুণাতীত, —প্রমাদরহিত সিদ্ধপুরুষগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন এবং দিবানিশি তাঁহার ভজন করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন। ॥১২॥

কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে পরম ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াও শ্রীরামচন্দ্র আপনার মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া আত্ম-স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এইজন্য তিনি বশিষ্ঠাদি অন্য গুরুর উপদেশ সহায়ে পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ॥১৩॥

অতএব আমার জিজ্ঞাস্য এই যে যদি তিনি স্বস্বরূপ বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন তবে সেই পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র সীতাহরণ জনিত অজ্ঞজন-সুলভ বিলাপ কেন করিলেন? আর যদি বলা হয় তিনি আত্মজ্ঞান বিহীন ছিলেন, তবে তিনি সকল জীবগণ সমতুল্য হওয়াতে সেব্য হইতে পারেন না (অতএব সকলে তাঁহার ভজন চিন্তন কেন করিবে?)। এই বিষয়ে আপনার কি সমাধান অর্থাৎ এই শংকার কি উত্তর তাহা আপনি এইরূপে বর্ণন করুন, যাহাতে আমার সংশয় নিবৃত্ত হয়।" ॥১৪-১৫॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন —"হে দেবি! তোমার হৃদয়ে রামতত্ত্ব জিজ্ঞাসা সমুদয় হওয়াতে তুমি ধন্যা, তুমি পরমাত্মার পরম ভক্ত। ইহার পূর্বে পরমগূঢ় রামতত্ত্ব-রহস্য বর্ণন করিবার জন্য অপর কেহই আমার নিকট এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। ॥১৬॥

আজ ভক্তিপূর্বক আমাকে তুমি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, এইজন্য শ্রীরঘুনাথজীর চরণ-কমল-যুগল প্রণাম করতঃ আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ইহা নিঃসন্দেহ যে শ্রীরামচন্দ্র মায়াতীত, অনাদি, পরমাত্মা, আনন্দ-স্বরূপ, অদ্বিতীয় এবং পুরুষোত্তম। ॥১৭॥

তিনি নিজের মায়া দ্বারা সর্বজগত সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র আকাশের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান, এবং অন্তর্যামিরূপে নিগূঢ় তিনিই সর্বান্তঃকরণে স্থিত হইয়া স্বকীয় মায়াশক্তি সহায়ে এই সৃষ্ট বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছেন। ॥১৮॥

চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহখণ্ডের গতিশীলতার ন্যায় যাঁহার সান্নিধ্য বশতঃ এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সদা আপন নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেই পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে আত্মবিষয়ক অবিদ্যা-তমসাচ্ছন্ন বিমূঢ় ব্যক্তিগণ জানিতে সমর্থ নহে। ॥১৯॥

সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ মায়াতীত বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাতেও স্বীয় অজ্ঞান আরোপ করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাঁহাকে নিজতুল্য অজ্ঞানী মনে করিয়া থাকে)। সর্বদা স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত ও নানা কর্মে বিব্রত থাকিয়া সেই পামর জীবসমূহ সংসারচক্রেই নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে। ॥২০॥

ভ্রান্তিবশতঃ বিস্মৃত সুবর্ণনির্মিত হার কণ্ঠস্থিত থাকিলেও যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা জানে না, তদ্রূপ তাহারা স্বহৃদয়স্থ পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকেও অজ্ঞানবশতঃ অবগত নহে। বস্তুতঃ সূর্যে যে প্রকার অন্ধকার থাকিতে পারে না সেইরূপ মায়াতীত বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন, জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রেও অবিদ্যার অবস্থান হইতে পারে না। ॥২১॥

চক্রাকারে ঘুরিতে থাকিলে চক্ষুর ঘূর্ণন বশতঃ গৃহাদি সর্বপদার্থ যেরূপ ঘূর্ণায়মান বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেইপ্রকার স্বীয় আত্মা ও কর্তারূপে দেহ ইন্দ্রিয়াদিকৃত কর্মসমূহ পরমাত্মাতে বৃথা আরোপ করতঃ অজ্ঞজন মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। ॥২২॥

সূর্য নিত্য ও অপরিবর্তনীয় প্রকাশস্বরূপ বলিয়া তাহাতে রাত্রি ও দিনে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ উহা সর্বদা এক প্রকাশরূপেই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ শুদ্ধচৈতন্যঘন শ্রীরামচন্দ্রেও জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়ের স্থিতি অসম্ভব। ॥২৩॥

অতএব পরমানন্দস্বরূপ, বিজ্ঞানঘন, জ্ঞান ও অজ্ঞানেরও সাক্ষী, কমলনয়ন, রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রে লেশমাত্রও অজ্ঞান অবস্থান করিতে পারে না। কারণ তিনি মায়াধীশ, মায়ার অধিষ্ঠান, মায়ার আশ্রয় বলিয়া ঐ মায়া তাঁহাকে মোহিত করিতে পারে না। ॥২৪॥

হে পার্বতি! এ বিষয়ে তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় ও পরম দুর্লভ মোক্ষসাধন, সীতা রাম ও হনুমানজীর সংবাদ শুনাইতেছি। ॥২৫॥

পূর্বে রামাবতার কালে রণনিপুণ শ্রীরামচন্দ্রজী দেবগণের কণ্টক-স্বরূপ মহাশত্রু রাবণকে পুত্র, সেনা ও বাহন সহিত যুদ্ধে হনন করতঃ, সীতা, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ এবং হনুমান আদি বানরগণ পরিবৃত হইয়া অযোধ্যানগরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ॥২৬-২৭॥

তথায় তিনি রাজ্যাভিষেকের পর বশিষ্ঠ আদি মহাত্মাগণ কর্তৃক পরিবৃত ও কোটি সূর্যসম প্রকাশমান হইয়া সিংহাসনে বিরাজিত হইয়াছিলেন। ॥২৮॥

সেইকালে সর্বসেবাকার্য সমাপনকারী, ভোগেচ্ছারহিত, মহাবুদ্ধিমান, জ্ঞানাভিলাষী, শ্রীহনুমানকে যুক্তকরে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রজী সীতাকে বলিলেন —'হে সীতে! এই হনুমান আমাদের উভয়ের প্রতি সদা ভক্তিমান, নিষ্পাপ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুযোগ্যপাত্র। অতএব তুমি ইহাকে কিছু তত্ত্বোপদেশ প্রদান কর।' ॥২৯-৩০॥

তখন লোকবিমোহিনী সীতা শ্রীরামচন্দ্রের কথায় সম্মত হইয়া শরণাগত হনুমানকে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপবিষয়ক তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ॥৩১॥

সীতা বলিলেন —"বৎস হনুমান! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মরূপে জানিও। তিনি সর্ব উপাধিরহিত, সত্তামাত্র, মন ও ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, আনন্দস্বরূপ, নির্মল, শান্ত, নির্বিকার, নিরঞ্জন, সর্বব্যাপক, স্বয়ং প্রকাশ ও পাপবিহীন পরমাত্মা। ॥৩২-৩৩॥

আর আমাকে সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়কারিণী মূল প্রকৃতি বলিয়া জানিও। সেই শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যমাত্র দ্বারাই আমি-ই সাবধানচিত্তে এই বিশ্বরচনা করিয়া থাকি। ॥৩৪॥

তথাপি তাঁহার সান্নিধ্যমাত্র দ্বারা আমা কর্তৃক সৃষ্ট বিশ্বরচনা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ লোকে তাঁহাতে আরোপ করিয়া থাকে। অতএব অযোধ্যানগরে অতি পবিত্র রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম। ॥৩৫॥

পুনঃ বিশ্বামিত্রজীকে সহায়তা দান, তাঁহার যজ্ঞ রক্ষণ, অহল্যার শাপমুক্তি, শ্রীমহাদেবের ধনুক ভঙ্গ— ॥৩৬॥

তৎপর আমার পাণিগ্রহণ, তৎপশ্চাৎ ভৃগুপুত্র পরশুরামজীর গর্বখণ্ডন—তৎপর আমার সহিত অযোধ্যাপুরীতে দ্বাদশবর্ষতক বাস—তৎপর দণ্ডকারণ্যে বিরাধ বধ, মায়ামৃগরূপী মারীচ বধ, মায়িক সীতা হরণ, ॥৩৭-৩৮॥

তৎপর জটায়ু ও কবন্ধের মোক্ষপ্রাপ্তি, শবরী কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পূজন ও সুগ্রীব সহ মিত্রতা, তৎপর বালী বধ, সীতান্বেষণ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন, লঙ্কাপুরী অবরোধ। ॥৩৯-৪০॥

তৎপশ্চাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্রাদিসহ দুরাত্মা রাবণবধ, বিভীষণকে রাজ্যদান, পুষ্পকরথে আমাকে লইয়া অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও তৎপশ্চাৎ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক—ইত্যাদি সমস্ত কর্ম আমা কর্তৃক আচরিত হইলেও অজ্ঞলোক এই সকলই নির্বিকার সর্বাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের উপর আরোপ করিয়া থাকে। ॥৪১-৪২॥

বস্তুতঃ পারমার্থিক দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্র গমন, অবস্থান, শোক, ইচ্ছা,ত্যাগ অথবা অন্য কোন কর্মই করেন না। তিনি আনন্দস্বরূপ, অচল ও পরিণামবিহীন হইলেও কেবল মায়া-গুণের অনুগত হইয়াই অর্থাৎ মায়া আশ্রয় করিয়াই পূর্বোক্ত বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।" ॥৪৩॥

তদনন্তর সম্মুখে দণ্ডায়মান পবনসুত হনুমানকে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বলিলেন —"হে বৎস! আমি তোমাকে আত্মা, অনাত্মা ও পরমাত্মবিষয়ক তত্ত্ব বর্ণন করিতেছি—উহা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ॥৪৪॥

জলাশয়ে আকাশের ত্রিবিধ ভেদ স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়—প্রথমতঃ সর্বলোক ব্যাপ্ত মহাকাশ, দ্বিতীয়তঃ জলাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ জলাশয়ে পরিমিত আকাশ এবং তৃতীয়তঃ জলে প্রতিবিম্বিত প্রতিবিম্ব-আকাশ। ॥৪৫॥

তদ্রূপ চৈতন্যও তিনপ্রকার হইয়া থাকে—প্রথমতঃ বুদ্ধি-অবচ্ছিন্ন চেতন, দ্বিতীয়তঃ সর্বত্র পরিপূর্ণ চেতন ও তৃতীয়তঃ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চেতন। ইহাকে 'আভাস-চেতন' বলে। ॥৪৬॥

ইহাদের মধ্যে একমাত্র আভাস-চেতন সহিত বুদ্ধিতেই কর্তৃত্বাদি বিদ্যমান। কিন্তু অজ্ঞানী লোক ভ্রান্তিবশতঃ নিরবচ্ছিন্ন নির্বিকার সাক্ষীচৈতন্যে কর্তৃত্ব ও জীবত্ব আরোপ করিয়া থাকে অর্থাৎ সাক্ষী কূটস্থ চৈতন্যকেই কর্তা ভোক্তা জীবরূপ মনে করিয়া থাকে। ॥৪৭॥

আভাস-চৈতন্য মিথ্যা। বুদ্ধি অবিদ্যার কার্য। শুদ্ধসাক্ষী চৈতন্য বস্তুতঃ অবিচ্ছিন্ন, উহাতে বিচ্ছিন্নতা অবিদ্যাবশতঃ কল্পিত হইয়া থাকে। ॥৪৮॥

অবিচ্ছিন্ন সাক্ষীর পূর্ণব্রহ্ম সহিত একত্ব, তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে—(অর্থাৎ আভাসরূপ জীবের উপাধি অংশ বাধিত বা মিথ্যারূপে পরিত্যক্ত হইয়া কূটস্থ সাক্ষী সহ ব্রহ্মের একত্ব সাধিত হয়)। ॥৪৯॥

মহাবাক্য প্রভাবে এইরূপ একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সর্বকার্য সহিত অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায় — ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ॥৫০॥

আমার ভক্ত এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমার স্বরূপ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু এই ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করতঃ যাহারা শাস্ত্ররূপ মহাগর্তে পতিত হইয়া মোহগ্রস্ত হয়, তাহাদের শত জন্মেও জ্ঞান বা মোক্ষ কিছুই লাভ হয় না। ॥৫১॥

হে নিষ্পাপ হনুমান! এই পরম রহস্য আত্মস্বরূপই রামের (অর্থাৎ আমার) হৃদয়। ইহা স্বয়ং আমিই তোমাকে বলিলাম। ইন্দ্রলোকাদি রাজ্য অপেক্ষা অধিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেও এই তত্ত্ব মদ্ভক্তি-বিহীন শঠ (ধূর্ত) ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না।" ॥৫২॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন — "হে দেবি! আমি তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয়, হৃদয়ানন্দকারী, পরম পবিত্র এবং পাপনাশক 'শ্রীরাম-হৃদয়' বলিলাম। ॥৫৩॥

সর্ববেদান্তের সার সংগ্রহস্বরূপ এই তত্ত্ব সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং-ই কথন করিয়াছেন। যে কেহ ইহা ভক্তিপূর্বক সদা পাঠ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্ত হইয়া থাকেন। ॥৫৪॥

বহুজন্ম সঞ্চিত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ (ইহার পাঠমাত্র দ্বারাই) বিনষ্ট হইয়া থাকে। কারণ ইহা শ্রীরামচন্দ্রেরই বচন। ॥৫৫॥

অতি দুরাচারী, মহাপাপী, পরধনহারী ও পরস্ত্রীতে আসক্ত, চৌর্যবৃত্তি সম্পন্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী, মাতা পিতৃ-বধ-নিরত, যোগিগণের অহিতাচরণকারী পুরুষও শ্রীরামচন্দ্রের বিধিবৎ পূজা করিয়া যদি ভক্তিপূর্বক এই 'রাম-হৃদয়' পাঠ করে তাহা হইলে সেও যোগিরাজ-দুর্লভ সর্বদেবপূজ্য পরমপদ এই জন্মেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
বালকাণ্ডে 'শ্রীরাম-হৃদয়' নামক প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

পাপভারে পীড়িতা পৃথিবীর ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট গমন ও তাহাদের সমবেত প্রার্থনাবশে ভগবানের আশ্বাস প্রদান

পার্বতী বলিলেন — "হে জগৎ স্বামি! আপনার অনুগ্রহে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি এবং আমার সন্দেহরূপ গ্রন্থি মোচন হইয়াছে। ॥১॥

আপনার মুখ নিঃসৃত ভবভয়হারী রামতত্ত্বরূপ দীর্ঘজীবনপ্রদ অমৃত পান করিতে করিতে আমার মনে তৃপ্তি হইতেছে না। ॥২॥

আমি আপনার মুখে শ্রীরামচন্দ্রের কথা সংক্ষেপে শুনিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমি আরও স্পষ্ট বাক্য সহায়ে বিস্তারপূর্বক শুনিতে ইচ্ছা করি।" ॥৩॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন — "হে দেবি! পূর্বকালে **শ্রীরামচন্দ্রজী** আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন সেই মহা গুহ্যাতিগুহ্য অধ্যাত্ম রামচরিত অর্থাৎ **'অধ্যাত্ম রামায়ণ'** আমি তোমাকে বলিতেছি। ॥৪॥

যাহা শ্রবণ করিলে জীব অজ্ঞানোৎপন্ন মহাভয় হইতে মুক্ত হয় এবং পরম ঐশ্বর্য, দীর্ঘ আয়ু ও পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিয়া থাকে, সেই তাপত্রয়াপহারী 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' তোমাকে বলিতেছি। ॥৫॥

কোন সময়ে রাবণাদি রাক্ষসগণের দুষ্কর্মভার-পীড়িতা পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করতঃ দেবতা ও মুনিগণ সহিত কমলাসন শ্রীব্রহ্মাজীর লোকে গমন করিয়াছিলেন, এবং তথায় পৌঁছিয়া রোদন করিতে করিতে আপন সর্বদুঃখ নিবেদন করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা এক মুহূর্ত ধ্যানস্থ হইয়া পৃথিবীর দুঃখ নিবৃত্তির যাবতীয় উপায় আপন মনে অবগত হইলেন, কারণ তিনি সর্বান্তর্যামী। ॥৬॥

তদনন্তর সর্বদেবগণ ও পৃথিবী দেবীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রহ্মা ক্ষীরসাগরতীরে উপস্থিত হইলেন ও সেখানে নির্মল আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া সর্বলোকান্তর্যামী, অজ, সর্বজ্ঞ বিষ্ণুভগবানকে ভক্তিপূর্ণ গদ্‌গদ অতি নির্মল বাণীর সহিত শ্রুতি-সিদ্ধ বিমল পদ এবং পুরাণোক্ত স্তোত্রসমূহের দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন। ॥৭॥

তখন সহস্র সূর্যসম প্রভাকারী ভগবান হরি সর্বদিগস্থ অন্ধকার দূর করতঃ পূর্বদিকে আবির্ভূত হইলেন। ॥৮॥

পাপী পুরুষগণের দুর্দর্শ অমিত তেজস্বী ভগবান বিষ্ণুকে ব্রহ্মা কথঞ্চিৎ দর্শনে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রনীল মণিসদৃশ গাত্রবর্ণ, সুমধুর হাস্য-সমুদভাসিত মুখমণ্ডল কমল সদৃশ বিশাল নেত্র (ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইল)। ॥৯॥

ভগবান কিরীট, হার, কেয়ূর (বাজু), কুণ্ডল, কটক (বলয়) প্রভৃতি ভূষণ সুশোভিত ও শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণির প্রভা সমন্বিত ছিলেন। ॥১০॥

তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া সনকাদি পার্ষদগণ স্তুতি করিতেছিলেন। ভগবানের করধৃত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং কণ্ঠস্থ বনমালা অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। ॥১১॥

ভগবান সুবর্ণ নির্মিত যজ্ঞোপবীত ও পীতাম্বর সুশোভিত এবং লক্ষ্মী ও ভূমি দেবী সহিত বাহন গরুড়োপরি বিরাজমান ছিলেন। ॥১২॥

এইরূপ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া হর্ষ গদ্‌গদ কণ্ঠে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ॥১৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন — "হে দেব! কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য মুমুক্ষুগণ সদা প্রাণ, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সহায়ে যাঁহার নিরন্তর চিন্তন করিয়া থাকেন, সেই আপনার শ্রীচরণ কমলে আমি প্রণাম করিতেছি। ॥১৪॥

স্বীয় ত্রিগুণময়ী মায়া আশ্রয় করতঃ আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ আপনি তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও লিপ্ত নহেন। ॥১৫॥

আপনার বিমল কীর্তি শ্রবণে প্রেমিক ভক্তগণের অন্তঃকরণ যেরূপ নির্মল হইয়া থাকে সেরূপ শুদ্ধি, মলিনচিত্ত পুরুষগণের দান ও অধ্যয়ন আদি শুভকর্মের দ্বারাও কখনও লাভ হয় না। ॥১৬॥

ভক্তমুনিগণ যাঁহাকে নিরন্তর হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন আপনার সেই শ্রীচরণ কমল চিত্তগত সর্বদোষ সদ্য বিনাশ করিবার জন্য দর্শন করিতেছি। ॥১৭॥

স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আমরা আপনার শ্রীচরণকমল পূর্বেও সেবা করিয়াছি এবং জ্ঞানী মুনিগণ অপরোক্ষ জ্ঞানলাভার্থ নিরন্তর হৃদয়ে আপনাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। ॥১৮॥

হে বিভো! আপনার বক্ষস্থলে স্থান লাভ করিয়াও শ্রীলক্ষ্মীজী ভক্তগণ কর্তৃক আপনার শ্রীচরণপূজনকালে সমর্পিত (শ্রীচরণ স্পর্শে সৌভাগ্যবতী) তুলসীমালা দর্শনে তাহাকে সপত্নী ন্যায় দ্বেষ করিয়া থাকেন। ॥১৯॥

অতএব আপনার শ্রীচরণকমল প্রেমী ভক্তগণের প্রতি আপনার প্রেম শ্রীলক্ষ্মীজীর প্রেম অপেক্ষা অধিক। এইজন্য সারগ্রাহী ভক্তজন আপনার প্রতি নিরন্তর শুদ্ধা ভক্তিই কামনা করিয়া থাকেন। ॥২০॥

অতএব আপনার শ্রীচরণকমলে আমার ভক্তি যেন সদা অব্যাহত থাকে, কারণ সংসার-রোগ সন্তপ্ত জীবগণের (ঐ রোগ বিনাশী) ভক্তি-ই একমাত্র ঔষধ।" ॥২১॥

ব্রহ্মা এই প্রকার স্তুতি করিতে থাকিলে ভগবান বিষ্ণু বলিলেন — "আমি তোমার জন্য কি করিব?" তখন ব্রহ্মা অতি প্রসন্নচিত্তে নিবেদন করিলেন — ॥২২॥

"হে ভগবান্! পুলস্তনন্দন বিশ্রবার পুত্র রাবণ রাক্ষসগণের রাজা। সে আমারই প্রদত্ত বরের প্রভাবে অত্যন্ত অভিমানী হইয়া পড়িয়াছে। ॥২৩॥

সে সমগ্র বিশ্বের দুঃখদাতা এবং ত্রিলোক ও লোকপালকগণের অতিশয় দুঃখদায়ক হইয়াছে। হে কল্যাণ স্বরূপ! মনুষ্যের হস্তে তাহার মৃত্যু আমি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। এইজন্য হে প্রভো! আপনি মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবগণের এই শত্রুকে বধ করুন।" ॥২৪॥

শ্রীভগবান বলিলেন —"কশ্যপজীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহাকে বর দিয়াছিলাম। ॥২৫॥

তিনি আমাকে তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম লইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আমিও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। বর্তমান কালে সেই কশ্যপ পৃথিবীতে মহারাজ দশরথরূপে বিদ্যমান। ॥২৬॥

তাঁহার পুত্ররূপে পৃথক পৃথক চারি অংশে প্রকট হইয়া আমি শুভ দিনে মাতা কৌশল্যা এবং অন্য দুই মাতাগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। ॥২৭॥

আমার শক্তি যোগমায়াও সীতারূপে মহারাজ জনকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আমি সর্বকর্ম সম্পাদন করিব।" এইরূপ কথনানন্তর বিষ্ণু তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন এবং তদনন্তর ব্রহ্মাজী দেবগণকে বলিলেন— ॥২৮॥

"ভগবান বিষ্ণু রঘুবংশে মনুষ্যরূপে অবতরিত হইবেন। তোমরা সকল দেবগণও আপন আপন অংশে বানর বংশে পুত্র উৎপাদন কর এবং ভগবান বিষ্ণু যতদিন ভূতলে বিদ্যমান থাকেন, ততদিন তাঁহার সহায়তা কর।" ॥২৯-৩০॥

এইরূপে দেবগণকে আদেশ ও পৃথিবী দেবীকে আশ্বাস প্রদান করতঃ ব্রহ্মা স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন ও নিশ্চিন্ত হইয়া তথায় নিবাস করিতে লাগিলেন। ॥৩১॥

তখন সমস্ত দেবগণ পর্বত ও বৃক্ষসহায়ে রণপটু মহাবলবান বানররূপ ধারণ করতঃ ভগবানের সহায়ার্থ যত্রতত্র অবস্থান করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ॥৩২॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
বাল-কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

ভগবানের জন্ম ও বাল্যলীলা

শ্রীমহাদেব বলিলেন—একবার সর্বলোক প্রসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠ অযোধ্যাপতি বীরশ্রেষ্ঠ, শ্রীমান মহারাজ দশরথ পুত্রাভাবে অত্যন্ত দুঃখাকুলচিত্তে কুলগুরু শ্রীবশিষ্ঠজীকে প্রণাম করিয়া এইরূপ বলিলেন— ॥১-২॥

"স্বামিন্! সর্ব সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্র কি প্রকারে লাভ করিতে পারি তাহা আমাকে উপদেশ করুন, কারণ পুত্র বিনা সমগ্র রাজ্যসুখ আমার দুঃখরূপ প্রতীত হইতেছে।" ॥৩॥

তখন বশিষ্ঠজী রাজা দশরথকে বলিলেন—"সাক্ষাৎ লোকপাল-সদৃশ-সামর্থ্য-সম্পন্ন তোমার চারিটি পুত্র লাভ হইবে। ॥৪॥

তুমি শান্তাপতি তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করতঃ আমাদের সাহচর্যে শীঘ্র পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ॥৫॥

তদনুসারে রাজা দশরথ মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করতঃ নিষ্পাপ মুনিগণের সহায়তায় অতি পবিত্রচিত্তে মন্ত্রিগণ সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। ॥৬॥

যজ্ঞানুষ্ঠান কালে শ্রদ্ধাপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে তপ্ত-সুবর্ণ-তুল্য দীপ্তিমান হব্যবাহন ভগবান অগ্নি পায়সপূর্ণ সুবর্ণপাত্র হস্তে প্রকট হইয়া বলিলেন— ॥৭॥

"হে রাজন্! দেব নির্মিত, পুত্রফলপ্রদ, এই দিব্য পায়স গ্রহণ কর, ইহার সহায়ে তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।" ॥৮॥

অগ্নিদেব এইরূপ কথনান্তর উক্ত পায়স রাজাকে প্রদান করতঃ অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর সফল মনোরথ হইয়া রাজা মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির চরণ বন্দনাপূর্বক এবং তদুভয়ের অনুজ্ঞায় ঐ পায়স মহারানী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে অতি যত্নের সহিত সমান দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন। ॥৯-১০॥

তদনন্তর পুত্র-ফলপ্রদ ঐ পায়সের অংশ লাভেচ্ছায় দশরথের অপরা পত্নী সুমিত্রা তথায় আগমন করিলে আপন পায়সের অর্ধভাগ প্রসন্নচিত্তে কৌশল্যা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ॥১১॥

কৈকেয়ীও প্রীতির সহিত স্বকীয়ভাগের অর্ধাংশ সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন। সেই পায়স ভক্ষণের ফলে তিন রানীই গর্ভবতী হইলেন। ॥১২॥

তৎকালে তিন রানী রাজভবনে দেবতাদের ন্যায় কান্তিমতী ও শোভাধারিণী হইয়াছিলেন। যথাকালে দশম মাসে কৌশল্যা এক অপূর্ব বালক প্রসব করিলেন। ॥১৩॥

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে নবমী তিথি শুভ কর্কট লগ্নে পুনর্বসু নক্ষত্রে যখন পাঁচ গ্রহ তুঙ্গস্থানে এবং সূর্য মেষ রাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন (মধ্যাহ্ন কালে) সনাতন পরমাত্মা জগৎপতির আবির্ভাব হইল। সেই সময় আকাশ দিব্য পুষ্পবৃষ্টিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ॥১৪-১৫॥

নীলকমল সদৃশ শ্যাম বর্ণ, পীতাম্বরধারী, চতুর্ভুজ, তরুণ অরুণ সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট কমলতুল্য শোভাধারী রক্তাভ নয়ন-যুগল প্রান্ত, উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভিত কর্ণদ্বয়, কুঞ্চিত কেশযুক্ত শিরোপরি সহস্রসূর্যতুল্য প্রকাশমান মুকুট, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং গলে বৈজয়ন্তীমালা বিরাজমান। ॥১৬-১৭॥

মুখ কমলের মৃদুহাস্য যেন হৃদয়স্থ অনুগ্রহরূপ চন্দ্রমার বিমল কিরণের সূচকরূপে প্রতিভাত হইতেছিল, করুণারসপূর্ণ কমলদল তুল্য বিশাল নয়ন এবং শ্রীবৎস, হার, কেয়ূর, নূপুর প্রভৃতি দিব্য ভূষণে ভূষিত পরমাত্মাকে এইরূপে পুত্ররূপে প্রকট হইতে দেখিয়া মাতা কৌশল্যা বিস্ময় ব্যাকুল চিত্তে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে করিতে বলিলেন— ॥১৮-১৯॥

"হে দেবদেব! আপনাকে প্রণাম, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর, আপনি অচ্যুত, অনন্ত, পরমাত্মা এবং সর্বত্রপূর্ণ পুরুষোত্তম। ॥২০॥

বেদবাদিগণ আপনাকে বাক্য মনের অগোচর, ইন্দ্রিয়াদির অতীত, সত্তা মাত্র এবং একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন। ॥২১॥

আপনি-ই স্বীয় মায়াসহায়ে সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ যুক্ত হইয়া বিশ্বের রচনা, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ আপনি সর্বদা নির্মল তুরীয় পদে স্থিত। ॥২২॥

আপনি কর্তা নহেন তথাপি কর্তারূপে, গতিহীন হইয়াও গন্তারূপে (গমনকারী রূপে) শ্রবণাদিবিহীন হইয়া শ্রোতারূপে এবং দর্শন ক্রিয়া বিহীন হইয়া দ্রষ্টারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। ॥২৩॥

শ্রুতি ভগবতীও বলেন যে আপনি প্রাণ ও মন রহিত এবং শুদ্ধ। সর্বপ্রাণীতে তুল্যভাবে বিদ্যমান থাকিলেও অজ্ঞানান্ধকারাবৃতচিত্ত পুরুষগণের নিকট আপনি দৃষ্টিগোচর হন না, কিন্তু একমাত্র শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষগণই আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! আপনার উদরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুতুল্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তথাপি আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন, এইরূপে সকলকে বঞ্চনা করিতেছেন। হে রঘুকুল তিলক! ইহাতে আপনার ভক্তবৎসলতাই আমার নিকট অদ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ॥২৪-২৬॥

হে প্রভো! আপনার মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া সংসার-সাগরে নিমগ্না আমি পতি পুত্র ধনাদি-চক্রে এতকাল ভ্রামিত হইতেছিলাম। কিন্তু আজ পরম সৌভাগ্যবশতঃ আমি আপনার চরণকমলে শরণ লইয়াছি। ॥২৭॥

হে দেব! আপনার এই মনোহর মূর্তি আমার হৃদয়ে সদাবিদ্যমান থাকুক এবং আমি যেন আপনার ভুবন-মোহিনী মায়া দ্বারা আর বশীভূত না হই অর্থাৎ আপনার মায়াবরণ আমার উপর যেন আর পরিব্যাপ্ত না হয়। ॥২৮॥

হে বিশ্বাত্মন্! আপনার এই অলৌকিক রূপ উপসংহার করুন এবং সুকোমল আনন্দদায়ক বালকরূপ ধারণ করুন, যাহা সুখপ্রদ আলিঙ্গন ও সম্ভাষণাদি সহায়ে আমি ঘোর অজ্ঞানান্ধকার হইতে চিরতরে মুক্ত হইব।" ॥২৯॥

শ্রীভগবান বলিলেন — "হে মাতঃ! তুমি যেরূপ বাঞ্ছা করিয়াছ সেইরূপই হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না। পূর্বকালে পৃথিবীর ভার (দুঃখ) দূর করিবার জন্য ব্রহ্মা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য রাবণাদি নিশাচরগণ বিনাশ করিবার জন্যই আমি মনুষ্যরূপে অবতরিত হইয়াছি। ॥৩০-৩১॥

হে অনিন্দিতে! পূর্বে (কোন পূর্বজন্মে) দশরথসহ তুমিও আমাকে পুত্ররূপে লাভ করিবার ইচ্ছাবশতঃ তপস্যা সহায়ে আমাকে আরাধনা করিয়াছিলে। আমি এই সময় প্রকট হইয়া তোমাদের সেই বাঞ্ছা পূরণ করিলাম। ॥৩২॥

স্বকীয় পূর্ব তপস্যার ফলেই তুমি আবার দিব্যরূপ দর্শন করিলে। আমার দর্শন মুক্তি ফলপ্রদ। পাপীগণের পক্ষে এইরূপ দর্শন অতি দুর্লভ। ॥৩৩॥

যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই সংবাদ পাঠ করিবে অথবা শ্রবণ করিবে সে আমার সমানরূপতা (স্বারূপ্যমুক্তি) লাভ করিবে এবং মৃত্যুকালেও মদ্বিষয়ক স্মৃতি তাহার অব্যাহত থাকিবে।" ॥৩৪॥

মাতাকে এইরূপ বলিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মানবশিশু রূপ ধারণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই শিশুরূপ ইন্দ্রনীল মণিতুল্য শ্যামবর্ণ এবং বিশাল নয়নযুগল বিশিষ্ট হওয়াতে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। ॥৩৫॥

উহা প্রভাতকালীন বালসূর্য সদৃশ অরুণবর্ণ ও জ্যোতির্ময় ছিল। সুমনোহর ঐরূপ, সর্বলোক পালকদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছিল। অতঃপর পুত্রজন্ম মহোৎসবের শুভ সমাচার শুনিয়া মহারাজ দশরথ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং গুরু বশিষ্ঠজীসহ রাজান্তঃপুরে গমন করিলেন। ॥৩৬॥

সেখানে আসিয়া কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্রের মুখদর্শন করতঃ আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া গুরুদ্বারা নবজাতকের জাতকর্মাদি আবশ্যকীয় কর্তব্য সংস্কারাদি করাইলেন। ॥৩৭॥

তদনন্তর কমলনয়নী কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতের জন্ম হইল এবং সুমিত্রার গর্ভে পূর্ণচন্দ্র সদৃশানন দুইটি যমজ পুত্র উৎপন্ন হইল। ॥৩৮॥

ঐ সময়ে মহারাজ দশরথ অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে এক হাজার গ্রাম, বহু সুবর্ণ, অনেক রত্ন, নানাবিধ বস্ত্র ও বহু শুভলক্ষণ বিশিষ্ট গোদান করিলেন। ॥৩৯॥

পরমাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইবার পর মুনিগণ যে আনন্দসাগরে বিহার করিয়া থাকেন অথবা যিনি আপনার দিব্য সৌন্দর্যদ্বারা ভক্তগণের চিত্ত আনন্দময় করিয়া থাকেন, গুরু বশিষ্ঠজী তাঁহার-ই নাম রাখিলেন 'রাম'। ॥৪০॥

এই প্রকার গুরু বশিষ্ঠজী সংসারের পোষণকারী বলিয়া দ্বিতীয় পুত্রের নাম 'ভরত', সর্বসুলক্ষণ যুক্ত তৃতীয় পুত্রের নাম **'লক্ষ্মণ'** এবং শত্রুগণের ঘাতক বলিয়া চতুর্থ পুত্রের নাম **'শত্রুঘ্ন'** রাখিলেন। ॥৪১॥

কৌশল্যা ও কৈকেয়ী প্রদত্ত পায়সাংশের অনুসারে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের ও শত্রুঘ্ন ভরতের সদা অনুচর হইলেন, অর্থাৎ সদা একত্র অনুচরণ-প্রিয় হইলেন। ॥৪২॥

লক্ষ্মণের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার কালে শ্রীরামচন্দ্রের স্বীয় সুমধুর বাল্যলীলা, নানাবিধ চেষ্টা এবং কর্ণানন্দদায়ী সুমধুর অস্পষ্টরূপে উচ্চারিত শব্দ (শিশুকাকলী) মাতাপিতার পরম আনন্দদায়ক হইয়াছিল। ॥৪৩॥

শ্রীরামচন্দ্রের ললাট মুক্তাফল-শোভিত উজ্জ্বল সুবর্ণময় অশ্বত্থপত্র ও গলদেশ মণিগণ ও ব্যাঘ্রনখ গ্রথিত রত্নহার সুশোভিত ছিল। ॥৪৪॥

কর্ণযুগলে অর্জুনবৃক্ষের অপক্কফল সদৃশ রত্নজটিত সুবর্ণনির্মিত আভূষণ লম্বমান ও মধুর ঝংকারকারী মণিময় নূপুর, সুবর্ণ মেখলা ও বাজুবন্দ বিভূষিত। ॥৪৫॥

ইন্দ্রনীল-মণি সদৃশ বর্ণ-সমুজ্জ্বল ও স্বল্প সংখ্যক দন্ত শোভিত স্মিত মুখমণ্ডল, ক্রীড়াপর, রামচন্দ্রকে যখন অঙ্গনে গোবৎসের পিছনে ধাবমান দেখিতেন তখন মহারাজ দশরথ ও মাতা কৌশল্যা আনন্দে আপ্লুত হইতেন। ভোজনকালে মহারাজ দশরথ বার বার রামকে অতি হর্ষ ও প্রেমের সহিত 'এস-এস' বলিয়া নিকটে আসিতে আহ্বান করিতেন। কিন্তু ক্রীড়ামগ্ন বালক না আসিলে মহারাজ তখন কৌশল্যাকে তাহাকে ধরিয়া আনিতে বলিতেন। কিন্তু যোগিজনচিত্ত দুর্লভ বালককে স্নেহহাস্য-পরায়ণ মাতা কৌশল্যাও দৌড়িয়া ধরিতে পারিতেন না। তখন মাতাকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া বালক স্বয়ং কর্দমাক্ত হস্তে হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিতেন এবং পিতৃদত্ত দুই-এক গ্রাস অন্ন ভক্ষণ করিয়া পুনঃ পলায়ন করিতেন। ॥৪৬-৪৯॥

মাতা কৌশল্যা রামচন্দ্রকে অতি উত্তম বিচিত্র বস্ত্র ও আভূষণ সহকারে সজ্জিত করতঃ নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উৎসব করিতেন। বার্ষিক জন্মোৎসব দিবসে তিনি পিষ্টক, লাড্ডু, জিলাপি, কচুরী ইত্যাদি বিবিধ উপচার সহ উৎসব করিতেন। ॥৫০-৫১॥

বালক রামের চপলতার জন্য মাতা কৌশল্যা গৃহকর্মাদির দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। একদিন রাম মাতার নিকট আসিয়া বলিলেন—মা! আমায় কিছু খেতে দাও, কিন্তু অন্য কর্মে ব্যস্ততাবশতঃ মা তাহা শুনিতে পান নাই। তখন ক্রুদ্ধ বালক দণ্ডপ্রহার দ্বারা সমস্ত ভাণ্ডাদি ভগ্ন করিতে লাগিলেন। ॥৫২-৫৩॥

শিকার উপর রক্ষিত দুগ্ধ ও মাখনের ভাণ্ড নিম্নে ফেলিয়া দিলেন ও তথায় রক্ষিত দুগ্ধ ও ঘৃত ক্রমশঃ লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে বণ্টন করিয়া দিলেন। তখন সুপকারগণ আসিয়া

উহা মা কৌশল্যাকে নিবেদন করিলে তিনি হাস্যমুখে রামকে ধরিবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইলেন। ॥৫৪-৫৫॥

মাতাকে আসিতে দেখিয়া বালকগণ পলায়ন করিলেন। কৌশল্যাও তাহাদের ধরিবার জন্য পশ্চাৎ ধাবিতা হইলেন, কিন্তু তাঁহার পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি রামকে হাতে ধরিলেন কিন্তু তাহাকে তিরস্কার আদি কিছু না করা সত্ত্বেও বালক রাম বালসুলভ ভাববশে ধীরে ধীরে রোদন করিতে লাগিলেন। ॥৫৬-৫৭॥

তখন বালকগণকে ভীতত্রস্ত দেখিয়া মা তাহাদের সকলকে অতি প্রেমের সহিত হৃদয়ে ধারণ করতঃ আদর করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে জগদানন্দদায়ক আনন্দঘন রাম মায়িক বালকরূপ ধারণ করিয়া রাজদম্পতি মহারাজ দশরথ ও মাতা কৌশল্যার আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে বাল-চতুষ্টয় কৌমার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ॥৫৮-৫৯॥

অতঃপর বশিষ্ঠজী কুমার চতুষ্টয়ের উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। লীলা নররূপধারী সর্বলোকাধিপতি ভ্রাতৃচতুষ্টয় সত্বরই সর্ব শাস্ত্রার্থ জ্ঞাতা ও ধনুর্বেদাদি সর্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠিলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে সেব্য-সেবক ভাবে অনুপ্রাণিত লক্ষ্মণ অতি প্রেমপূর্বক সর্বদা রামের অনুগমন করিতেন। শত্রুঘ্নও তদ্রূপ ভরতের সেবায় তৎপর থাকিতেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিদিন ধনুকবাণ ও তূণীর ধারণ করতঃ অশ্বপৃষ্ঠে মৃগয়ার্থ বনগমন করিতেন এবং তথায় সিংহব্যাঘ্রাদি দুষ্ট (হিংস্র) পশুসমূহ বধ করিয়া প্রত্যাবর্তনানন্তর পিতৃসমীপে সর্ববিষয় নিবেদন করিতেন। ॥৬০-৬৩॥

নিত্য প্রাতঃকালে নিদ্রাত্যাগান্তে স্নানাদি করতঃ মাতাপিতাকে তাঁহারা প্রণাম করিতেন ও তৎপর নম্রতার সহিত পৌরজন সম্পর্কিত সর্ব কর্ম সম্পাদন করিতেন। ॥৬৪॥

অতঃপর ভ্রাতৃগণসহ ভোজন সমাপনানন্তর শ্রীরামচন্দ্র নিত্য মুনিজন প্রমুখাৎ সর্বশাস্ত্র রহস্য (মর্মকথা) শ্রবণ করিতেন ও নিজেও ব্যাখ্যান করিতেন। ॥৬৫॥

এই প্রকারে সদা নির্বিকার পরিণাম-বিহীন পরমাত্মা মনুষ্যাবতার ধারণ করতঃ মনুষ্যোচিত সর্ব আচরণ অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্যের ন্যায় সর্বকর্মই সুসম্পন্ন করিলেন। (মায়িক দৃষ্টিতে এইরূপ কথিত হইলেও) বিচার দৃষ্টিতে তিনি কিছুই করেন নাই। (তিনি নিত্য স্বীয় অকর্তা, অভোক্তা, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপেই বিরাজমান।) ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে বাল-কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

বিশ্বামিত্রজীর আগমন, তাঁহার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের গমন এবং তাড়কা বধ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—পরমাত্মা স্বকীয় মায়া শক্তি সহায়ে শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা জানিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র একবার অযোধ্যা নগরীতে পদার্পণ করিলেন। ॥১॥

মুনিকে দর্শন করিবামাত্র মহারাজ দশরথ সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উত্থান করতঃ বশিষ্ঠের সহিত সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বাগত করিলেন এবং যথাবিধি পূজন ও অভিবাদন করতঃ ভক্তি বিনম্রচিত্তে করজোড়ে মুনিকে বলিলেন—"হে মুনীন্দ্র! আপনার শুভাগমনে আমি ধন্য, কৃতার্থ হইয়াছি। ॥২-৩॥

আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যে গৃহে পদার্পণ করেন সেখানে সর্ব সম্পদ একত্রিত হয়। আপনি কি উদ্দেশ্যে শুভাগমন করিয়াছেন তাহা বলুন। আমি নিশ্চয়ই আপনার আজ্ঞা পালন করিব, ইহা আমি সত্যসত্যই বলিতেছি।" ॥৪॥

তখন মহামতি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন—"যখনই কোন পর্বকাল সমুপস্থিত দেখিয়া আমি দেব ও পিতৃগণের জন্য যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করি তখনই মারীচ, সুবাহু ও তাহার অনুচর অন্য দৈত্যগণ সর্বদাই বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। ॥৫-৬॥

অতএব তাহাদের বধার্থ তুমি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে তাহার প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহিত আমাকে দাও, ইহাতে তোমার পরম কল্যাণ হইবে। ॥৭॥

এই বিষয়ে বশিষ্ঠজীর সহিত বিচার করিয়া যদি ইহা তোমার মনঃপূত হয় তবে কুমারদ্বয়কে আমার হস্তে সমর্পণ কর। ইহা শুনিয়া চিন্তাকুলচিত্তে রাজা দশরথ গুরু বশিষ্ঠকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৮॥

"হে গুরো! বহু সহস্রবর্ষ অতিক্রান্ত হইবার পর বহুকষ্টে আমি দেবসদৃশ চারিপুত্র লাভ করিয়াছি। পুত্রগণ মধ্যে রাম আমার অতিশয় প্রিয়। রাম যদি অন্যত্র গমন করে তবে আমি কোন প্রকারেই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। রামের বিচ্ছেদ আমি মনে চিন্তাও করিতে পারিতেছি না। অতএব আমি এখন কি করি? যদি আমি মুনিবাক্য প্রত্যাখ্যান করি তাহা হইলে তিনি আমাকে অভিশাপ প্রদান করিবেন। অতএব আমার কল্যাণ কি প্রকারে হইবে? এবং মিথ্যাভাষণ হইতে কি প্রকারে আমি পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি তাহা বলুন।" ॥৯-১১॥

বশিষ্ঠজী বলিলেন— "হে রাজন্! দেবগণের নিকটও সযত্নে গোপনীয় একটি তত্ত্ব বলিতেছি, শোন। ইহা কোন প্রকারেও অপরের নিকট প্রকট করিও না। তোমার পুত্র রাম মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ পরমাত্মাই স্বমায়া সহায়ে এইরূপে প্রকট হইয়াছেন। ॥১২॥

হে অনঘ! পূর্বকালে পৃথিবীর পাপভার দূর করিবার জন্য ব্রহ্মাজী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উহা পূরণ করিবার জন্যই ভগবান তোমার ভবনে কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ॥১৩॥

পূর্বজন্মে তুমি ব্রহ্মাজীর পুত্র কশ্যপ নামে পরিচিত ছিলে এবং যশস্বিনী কৌশল্যাও দেবমাতা অদিতি নামে পরিচিতা ছিলেন। ঐ সময়ে তোমরা উভয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কামচিত্তে একমাত্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা ও ধ্যান-তৎপর হইয়া বহু বৎসর উগ্র তপস্যা করিয়াছিলে। তখন বরদায়ক ভক্তবৎসল ভগবান প্রসন্নচিত্তে তোমাদের উভয়কে 'বর প্রার্থনা কর' এইরূপ বলিলে তোমরা উত্তরে—'হে নিরঞ্জন! আপনি আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন' এইরূপ প্রার্থনা

করিয়াছিলে। তখন ভূতভাবন ভগবান তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। এইজন্য বিষ্ণু ভগবান-ই রামরূপে তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সর্পরাজ অনন্তদেবও (শেষ-নাগজী) লক্ষ্মণরূপে প্রকট হইয়া রামের সেবার্থ সর্বতোভাবে তাঁহার অনুযায়ী হইয়াছেন। ॥১৪-১৫॥

ভগবান গদাধরের শঙ্খ চক্র ও ভরত শত্রুঘ্নরূপে অবতরিত হইয়াছেন এবং যোগমায়া জনকনন্দিনী সীতারূপে প্রকট হইয়াছেন। ॥১৮॥

বিশ্বামিত্রজী রামের সহিত সীতার সংযোগ করাইবার জন্যই আসিয়াছেন। হে রাজন্! ইহা অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য। ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। ॥১৯॥

অতএব হে রাজন্! তুমি প্রসন্নচিত্তে বিশ্বামিত্রজীর পূজাদি সৎকার পূর্বক লক্ষ্মণ সহ লক্ষ্মীপতি শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁহার সহিত প্রেরণ কর।" ॥২০॥

বশিষ্ঠজী এইরূপ বলিলে রাজা দশরথ নিজেকে অত্যন্ত কৃতকৃত্য মনে করিয়া প্রসন্নচিত্তে আদরপূর্বক—'হে রাম! হে রাম! হে লক্ষ্মণ!' এইরূপে পুত্রদ্বয়কে সাদরে আহ্বান করিয়া তাহাদের আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ অনন্তর উভয়কে মুনি বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ॥২১-২২॥

তখন মহাপ্রতাপশালী ভগবান বিশ্বামিত্রজী অতি প্রসন্নতাপূর্বক রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ দানে অভিনন্দন করিলেন ও ধনুক বাণ তূণীর খড়্গ আদি দ্বারা সুসজ্জিত ও তৎসমীপে আগত তাহাদের লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বিশ্বামিত্রজী ভক্তিপূর্বক রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহাকে দেবনির্মিত 'বলা' ও 'অতিবলা' নামক এমন দুইটি বিদ্যা প্রদান করিলেন যাহার গ্রহণ মাত্রই ক্ষুধা ও দুর্বলতা বিজিত হইয়া থাকে। ॥২৩-২৫॥

তদনন্তর গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা 'তাড়কার' বনে প্রবেশ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্রজী সত্যপরাক্রমী রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥২৬॥

"এখানে 'তাড়কা' নাম্নী কামরূপিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বহুরূপ ধারণকারিণী এক রাক্ষসী নিবাস করে। এই প্রদেশে সকল নিবাসিদিগকে সে অত্যন্ত দুঃখ দিয়া থাকে। তুমি কোন দ্বিধা না করিয়া তাহাকে বধ কর। ॥২৭॥

মুনি বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করতঃ তখন রঘুনন্দন রাম ধনুকে গুণারোপ করিয়া তাহাতে টঙ্কার দিলেন। ইহার শব্দে সম্পূর্ণ বনভূমি গুঞ্জায়মান হইয়া উঠিল। ॥২৮॥

ঐ শব্দ শুনিয়া ও তাহা সহন করিতে না পারিয়া ঘোর রূপিণী তাড়কা ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় মেঘতুল্য গতিতে রামের প্রতি ধাবিতা হইল। ॥২৯॥

তখন রাম শীঘ্রই তাহার বক্ষস্থলে একবাণ নিক্ষেপ করিলেন যাহার প্রভাবে সেই ঘোর রাক্ষসী অপরিমিত রক্ত বমন করিতে করিতে সেই বনভূমিতে পতিত হইল। ॥৩০॥

অনন্তর, শাপবশে পিশাচ শরীর প্রাপ্তা, সেই তাড়কা শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় শাপমুক্ত হইয়া সর্বলঙ্কারভূষিতা পরমাসুন্দরী এক যক্ষিণীরূপ ধারণ করিল এবং রামচন্দ্রকে পরিক্রমা ও প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে স্বর্গলোকে গমন করিল। ॥৩১-৩২॥

অতঃপর অতি আনন্দিত বিশ্বামিত্রজী রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্বক বিচার পুরঃসর রহস্য ও মন্ত্রাদি সহিত, সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পরমপ্রীতি পূর্বক রমণীয়-দর্শন শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
বাল-কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

মারীচ ও সুবাহু এবং অহল্যোদ্ধার

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি! তদনন্তর তাঁহারা বহুমুনি-সেবিত অতি রমণীয় 'কামাশ্রম'* নামক বনে একরাত্রি নিবাসপূর্বক প্রভাত কালে সেখান হইতে ধীরে ধীরে নির্গত হইলেন। ॥১॥

তৎপর সিদ্ধ ও চারণগণ সেবিত 'সিদ্ধাশ্রমে' তাঁহারা গমন করিলেন। তত্রস্থ মুনিগণ বিশ্বামিত্রজীর আদেশে শীঘ্রই রাম ও লক্ষ্মণের সমুচিত অতি উত্তম সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রজীকে বলিলেন—"হে মুনে! আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করুন (সঙ্কল্পপূর্বক যজ্ঞারম্ভ করুন)। ॥২-৩॥

হে মহাভাগ (দয়া আদি অষ্টগুণ যুক্ত)! সেই রাক্ষসাধমদ্বয় মারীচ ও সুবাহু কোথায় আছে ইহা আপনি আমাকে দেখাইয়া দিন।" মুনিবর তাহাতে সম্মত হইয়া অন্য মুনিগণ সহ যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করিলেন। ॥৪॥

মধ্যাহ্ন সময় মারীচ ও সুবাহু নামক, রক্ত ও অস্থি বর্ষণকারী কামরূপী রাক্ষসদ্বয় দৃষ্টিগোচর হইল। ॥৫॥

তখন বুদ্ধিমান রামচন্দ্র ধনুকে দুটি বাণ সন্ধান করিলেন ও আকর্ণ জ্যা আকর্ষণ পূর্বক উহা সেই রাক্ষস দুটির উপর নিক্ষেপ করিলেন। ॥৬॥

উহার একটি বাণের আঘাতে মারীচ আকাশে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে একশত যোজন দূরে সমুদ্রমধ্যে পতিত হইল। ইহা অতি আশ্চর্যজনক দৃষ্টিগোচর হইল। ॥৭॥

দ্বিতীয় অগ্নিময় বাণটি ক্ষণমধ্যেই সুবাহুকে ভস্মীভূত করিল এবং তাহাদের অপর অনুচরগণ লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত হইল। ॥৮॥

ঐ সময় দেবতাগণ লক্ষ্মণ সহ রঘুনাথজীর উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেব দুন্দুভি আদি বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল এবং সিদ্ধ ও চারণগণ তাহাদের নানাপ্রকারে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ॥৯॥

---

* কথিত আছে যে এই স্থানেই মহাদেব কামদহন করিয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্রজী পূজ্য শ্রীরামচন্দ্রকে উত্তমরূপে পূজনানন্তর তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তির সহিত আলিঙ্গন করিলেন। ॥১০॥

ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্রকে সুমিষ্ট পরিপক্ক ফল আদি ভোজন করাইয়া পুরাণ, ইতিহাস আদি মধুর কাহিনী শুনাইলেন। এইরূপে দিবসত্রয় অতীত হইল। ॥১১॥

চতুর্থ দিবস আগত হইলে বিশ্বামিত্রজী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন— "হে রাম! অতঃপর আমরা বিদেহরাজনগর জনকপুরে মহাত্মা জনকের মহাযজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। সেখানে মহাদেব কর্তৃক জনক গৃহে গচ্ছিত এক বিশাল ধনুক আছে। ॥১২-১৩॥

সেই সুদৃঢ় ধনুক তুমি দর্শন করিবে এবং মহারাজ জনকও তোমাদের উত্তমরূপে সৎকার করিবেন।" এইরূপ বলিবার পর বিশ্বামিত্রজী মুনিগণ ও কুমারদ্বয় সহ গঙ্গা সমীপস্থিত দিব্য ও পবিত্র ফলপুষ্প বৃক্ষ সমূহ সুশোভিত মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতমজীর পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন। সেই পবিত্র আশ্রমে অহল্যা তপোরতা ছিলেন। ॥১৪-১৫॥

মৃগপক্ষী আদি নানাজীব বিহীন সেই আশ্রম দর্শন করিয়া কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনিকে বলিলেন— ॥১৬॥

"পত্রপুষ্প ফল সুশোভিত জীববিহীন এই মহান আশ্রম অতি সুন্দর, রমণীয় ও পবিত্র মনে হইতেছে। ভগবন্! এই আশ্রমটি কাহার ? এই স্থান দর্শন করিয়া আমি চিত্তে আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনি এইস্থানের সব বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করুন।" ॥১৭-১৮॥

বিশ্বামিত্রজী বলিলেন—"হে রাম! তুমি এই আশ্রমের পূর্ব বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্বে এই আশ্রমে জগৎবিখ্যাত সর্বধার্মিকগণ-শ্রেষ্ঠ মুনিবর শ্রীগৌতমজী তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির আরাধনায় রত ছিলেন। ॥১৯॥

তাঁহার ব্রহ্মচর্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহার সেবার জন্য লোক-সুন্দরী সেবাপরায়ণা অহল্যা নাম্নী একটি কন্যা প্রদান করিলেন। তপস্বি-শ্রেষ্ঠ গৌতমজী অহল্যার সহিত এখানে বাস করিতেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সম্ভোগ করিবার জন্য নিত্য অবসর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ॥২০-২১॥

একদিন মুনি গৌতম আশ্রম হইতে বহির্দেশে গমন করিলে সেই অবসরে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যাকে সম্ভোগ করতঃ শীঘ্র ঐ স্থান হইতে নির্গত হইতেছিলেন, এমন সময় মুনিও সেখানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ॥২২॥

গৌতমরূপধারী পলায়নপর ইন্দ্রকে যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত কুপিতান্তঃকরণে মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'রে দুষ্ট! হে অধম্! আমার রূপ-ধারী তুই কে ? সত্য বল্, তাহা না হইলে তোকে আমি ভস্ম করিয়া ফেলিব, ইহা নিঃসন্দেহ।' তখন সে বলিল,—'হে ভগবন্! আমি কাম-বশীভূত দেবরাজ ইন্দ্র, আমাকে রক্ষা করুন। পাপাত্মা আমি, বড়ই ঘৃণিত কর্ম করিয়াছি।' তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ-নয়ন গৌতম দেবরাজকে অভিশাপ দিলেন— ॥২৩-২৫॥

'রে দুষ্টাত্মা! তুই যোনি-লম্পট, এইজন্য তোর শরীরে এক সহস্র যোনি চিহ্ন হইবে।' দেবরাজ ইন্দ্রকে এই প্রকার অভিশাপ প্রদানান্তর মুনি আপন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ও সম্মুখে

ভয়ে কম্পমানা করজোড়ে দণ্ডায়মানা অহল্যাকে দেখিয়া গৌতম বলিলেন—'রে দুষ্টা। তুই আমার আশ্রমে শিলামধ্যে অবস্থান কর্। ॥২৬-২৭॥

এখানে তুই নিরাহারে থাকিয়া রৌদ্র, বর্ষা, বায়ু আদি সহন করতঃ দিনরাত তপস্যা কর্ ও একাগ্রচিত্তে হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান্ কর্। আজ হইতে আমার এই আশ্রম নানা জীবজন্তু বিহীন হইবে। এই প্রকারে কয়েক হাজার বৎসর অতীত হইলে দশরথ নন্দন শ্রীরামচন্দ্রজী অনুজ লক্ষ্মণ সহ এখানে আগমন করিবেন। যখন তিনি তোমার আশ্রয়ভূত শিলোপরি স্বকীয় উভয় চরণ ধারণ করিবেন তৎকালে তুমি পাপমুক্ত হইবে। অতঃপর নিষ্পাপা হইয়া তুমি ভক্তিপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের পূজন করতঃ তাঁহাকে পরিক্রমা, নমস্কার ও স্তুতি করিয়া শাপমুক্ত হইবে এবং পূর্ব্ববৎ আমাকে তোমার মনোমত সেবা করিবে।' ॥২৮-৩২॥

এইরূপ বলিয়া মহর্ষি গৌতম পর্বতরাজ হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র! সেই দিন হইতে অহল্যা বায়ুভক্ষণ করতঃ সর্ব প্রাণিগণের অদৃশ্য থাকিয়া এই শুভ আশ্রমে তোমার চরণরজ স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষায় কঠোর তপস্যা করিতেছেন। ॥৩৩-৩৪॥

হে রাম! তুমি এক্ষণে ব্রহ্মার কন্যা মুনিপত্নী অহল্যাকে উদ্ধার কর। এইরূপ কথনান্তর মুনিবর বিশ্বামিত্রজী শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত ধারণ পূর্বক তাঁহাকে উগ্র তপোরতা অহল্যাকে দেখাইলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় চরণদ্বারা ঐ শিলা স্পর্শপূর্বক তপস্বিনী অহল্যাকে দর্শন করিলেন। ॥৩৫-৩৬॥

এবং 'আমি শ্রীরাম' এইরূপ স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া অহল্যাকে প্রণাম করিলেন। তখন রেশমী পীতাম্বরধারী শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম সুশোভিত চতুর্ভুজ, ধনুর্বাণধারী, হাস্যোৎফুল্লবদন, কমলনয়ন, শ্রীবৎস সুশোভিত বক্ষ, দশদিক্‌মণ্ডল প্রকাশকারী, নীলমণি সদৃশ শ্যাম বিগ্রহধারী, রমানাথ শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্মণসহ দর্শন করিয়া অহল্যা হর্ষবিস্ফারিত নেত্রে বহুপূর্বে শ্রুত মহর্ষি গৌতমের বাক্য স্মরণ করিলেন। তৎপর অনিন্দিতা অহল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ নারায়ণবোধে অর্ঘ্যাদিসহ বিধিবৎ পূজন করিয়া আনন্দাশ্রু পরিপূর্ণ নয়নে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পুনঃ দণ্ডায়মানা হইয়া সর্বাঙ্গ পুলকিতা অহল্যা রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতঃ গদ্‌গদস্বরে স্তুতি করিতে লগিলেন। ॥৩৭-৪২॥

অহল্যার স্তুতি

অহল্যা বলিলেন—"হে জগন্নিবাস! আপনার চরণকমল সংলগ্ন রজকণা-স্পর্শে আজ আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার যে পদারবিন্দ ব্রহ্মাশঙ্করাদি দেব একাগ্রচিত্তে সর্বদা চিন্তন করিয়া থাকেন, তাহা আজ আমি স্পর্শ করিতেছি। ॥৪৩॥

হে রাম! আপনার লীলা বড়ই বিচিত্র, আপনার মনুষ্যভাবের লীলায় সম্পূর্ণ জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে। আপনি পূর্ণানন্দস্বরূপ ও মহামায়াবী, কারণ চরণ বিহীন হইয়াও আপনি নিরন্তর বিচরণ-শীল। ॥৪৪॥

যাঁহার চরণারবিন্দের পরাগ স্পর্শে পবিত্র হইয়া শ্রীভাগীরথী গঙ্গা শিব ব্রহ্মাদি জগদীশ্বর-গণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন, আজ তিনিই সাক্ষাৎ আমার নেত্রের বিষয় হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান—অহো! আমি আমার পূর্বকৃত শুভ কর্ম সমূহকে কি প্রকারে বর্ণন করিব ? ॥৪৫॥

যিনি পরমসুন্দর মানবদেহ সহায়ে মর্ত্যলোকে অবতরিত হইয়াছেন, আমি সেই ধনুর্ধারী বিশাল কমললোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজন করিয়া থাকি, আর কাহাকেও আমি ভজন করিতে ইচ্ছা করি না। ॥৪৬॥

যাঁহার চরণকমলরজ ধারণার্থ শ্রুতিসমূহ সদা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, স্বয়ং ভগবান শঙ্কর যাঁহার নামামৃত পান করিবার জন্য রসিক (সদা উৎসুক), সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রজীকে আমি দিবানিশি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকি। ॥৪৭॥

যাঁহার বিচিত্র অবতার চরিত্রসমূহ ব্রহ্মলোকে নারদাদি দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মা এবং শঙ্করাদি দেবেশ্বরগণ, তথা আনন্দাশ্রু দ্বারা কুচমণ্ডল সিঞ্চিত করতঃ স্বয়ং সরস্বতী সদা ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের আমি শরণাগত। ॥৪৮॥

পুরাণ পুরুষ পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র এক অদ্বিতীয় স্বয়ংপ্রকাশ, অনন্ত, আদি কারণ, লোকবিমোহনকারী, মায়াময় এই রামরূপ লোকানুগ্রহ নিমিত্ত ধারণ করিয়াছেন। ॥৪৯॥

যিনি একক হইয়াও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় করিবার জন্য স্বাশ্রিত মায়ার গুণসমূহ আশ্রয় করতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব আদি বিবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, হে রাম! আপনিই সেই পরিপূর্ণ আত্মা। ॥৫০॥

আপনার চরণকমল স্বীয় বক্ষে ধারণ করতঃ লক্ষ্মীজী অতি প্রেমের সহিত সাদরে পালন করিয়া থাকেন। যিনি পূর্বকালে (বামনাবতারে বলিবন্ধন কালে) এক পদক্ষেপেই ত্রিভুবন আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, নিরভিমান মুনিগণ যাঁহা নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন, আপনার সেই চরণ কমল যুগল আমি প্রণাম করি। ॥৫১॥

হে প্রভো! আপনি জগতের আদি কারণ, আপনিই জগদ্রূপ, আপনি-ই জগতের আশ্রয়, তথাপি আপনি সকল প্রাণিগণ হইতে পৃথক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে সদা প্রকাশমান। ॥৫২॥

হে রাম! আপনি ওঙ্কারের বাচ্য, বাণীর অগোচর, পরমপুরুষ। হে প্রভো! বাচ্য ও বাচক (শব্দ-অর্থ, বা নাম-নামী) ভেদে আপনি সম্পূর্ণ জগৎরূপ হইয়াছেন. ॥৫৩॥

হে রাম! আপনি এক হইয়াও বহুরূপধারিণী মায়া আশ্রয় করতঃ কার্য, করণ, কর্তৃত্ব, ফল ও সাধন ভেদে বহুরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। ॥৫৪॥

আপনার মায়াদ্বারা যাহাদের বুদ্ধি মোহিত তাহারা আপনার পারমার্থিকরূপ জানিতে সমর্থ নহে। সেই মূঢ়গণ মায়াপতি পরমেশ্বর আপনাকে সামান্য মনুষ্য মনে করিয়া থাকে। ॥৫৫॥

আপনি আকাশের ন্যায় সর্বত্র সর্বপদার্থের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান, নির্মল, অসঙ্গ, অচল, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, সত্যস্বরূপ এবং অব্যয়। ॥৫৬॥

হে বিভো! আমি মূঢ়া, অজ্ঞানী স্ত্রী-জাতি, আপনার তত্ত্ব আমি কিরূপে জানিতে সমর্থ হইব ? অতএব হে রাম! আমি আপনাকে অনন্যচিত্তে শত শত বার প্রণাম করিতেছি। ॥৫৭॥

হে দেব! আমি যেখানে অবস্থান করি না কেন, সেখানেই সর্বদা যেন আপনার চরণ কমলে আমার অনন্যা ভক্তি বিদ্যমান থাকে। ॥৫৮॥

হে পুরুষাধ্যক্ষ (সর্বভূতগণের কর্মফল সাক্ষী, পুরুষোত্তম)। আপনাকে নমস্কার ; হে হৃষীকেশ (সর্বেন্দ্রিয় নিয়ামক)! আপনাকে প্রণাম ; হে নারায়ণ! আপনাকে বারম্বার প্রণাম। ॥৫৯॥

একমাত্র যিনি সংসারের সর্বভয় দূর করিতে সমর্থ, যিনি কোটিসূর্যতুল্য প্রকাশমান, করকমলে ধনুকধারী, নবীন জলধরকান্তি সমুজ্জ্বল অঙ্গ, সুবর্ণসদৃশ পীতবস্ত্রধারী, রত্নজড়িত কুণ্ডল শোভিত, কমলদলতুল্য বিশাল নেত্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহিত সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমি স্তুতি করিতেছি।" ॥৬০॥

এই প্রকারে সম্মুখে দণ্ডায়মান সাক্ষাৎ পরমপুরুষ শ্রীরাঘব রামচন্দ্রের স্তুতি, পরিক্রমা ও প্রণামানন্তর তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অহল্যা শীঘ্রই আপন পতির নিকট প্রস্থান করিলেন। ॥৬১॥

যে ব্যক্তি অহল্যাকৃত এই স্তোত্র ভক্তিসংযুতচিত্তে পাঠ করেন, সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ॥৬২॥

শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধ্যান করতঃ পুত্রাদি কামনায় ভক্তিপূর্বক এই স্তোত্র পাঠ করিলে বন্ধ্যা নারীও এক বৎসরের মধ্যেই সুপুত্র লাভ করিয়া থাকে এবং শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তাহার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ॥৬৩-৬৪॥

ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুতল্পগামী, চৌর্যবৃত্তিসম্পন্ন, সুরাপায়ী, মাতাপিতা ও ভ্রাতৃদ্বেষী, সদা ভোগাসক্তচিত্ত পুরুষও যদি আপন হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীরঘুনাথকে ভক্তিপূর্বক নিত্য স্মরণ করে ও তাঁহার ধ্যানপূর্বক এই স্তোত্র পাঠ করে, তবে সেও মুক্তিফল প্রাপ্ত হয়। অপর ধর্মপরায়ণ শুভ আচরণশীল পুরুষগণের কথা বলাই বাহুল্য অর্থাৎ তাহাদের মুক্তি অতি অবশ্যই হইয়া থাকে। ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে বাল-কাণ্ডে
অহল্যোদ্ধার নামক পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ

ধনুর্ভঙ্গ এবং বিবাহ

শ্রীসূত বলিলেন—অতঃপর বিশ্বামিত্রজী লক্ষ্মণ সহিত রাঘব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—"বৎস! এখন আমরা মহারাজ জনক-পালিত মিথিলা নগরী দর্শনার্থ যাইব। সেখানে রাজর্ষি জনকানুষ্ঠিত মহান্ যজ্ঞোৎসব দর্শনানন্তর তোমরা অযোধ্যা নগরী প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে।" ইহা বলিয়া শ্রী রাম-লক্ষ্মণ সহ গঙ্গা পার হইবার জন্য নদীতটে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় নাবিক শ্রীরঘুনাথকে নৌকায় আরোহণ করিতে নিষেধ করিলেন। ॥১-২॥

নাবিক বলিলেন—"হে প্রভো! এইরূপ প্রসিদ্ধ কথা আমি শুনিয়াছি যে চরণের রজচূর্ণ স্পর্শে জড় পদার্থও মনুষ্যরূপ ধারণ করে (আপনার চরণ স্পর্শে শিলাখণ্ড স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছে)। হে প্রভো! শিলা ও কাষ্ঠখণ্ডে ভেদ কোথায় ? (অর্থাৎ আপনার চরণ স্পর্শে আমার

নৌকার কাষ্ঠ যদি স্ত্রীরূপ ধারণ করে তবে নৌকা বিনা আমার পরিবার প্রতিপালনের সাধনটি হারাইয়া আমি বিপদগ্রস্ত হইব)। অতএব আমি আপনার চরণকমল প্রক্ষালন করিব। ॥৩॥

আপনার চরণকমল নির্মল করিয়া তৎপর নৌকাতে আপনাকে পরপারে লইয়া যাইব। নতুবা যদি আপনার চরণ-রজ-স্পর্শে আমার নৌকা সুন্দরী যুবতীরূপ ধারণ করে তবে আমার পরিবার প্রতিপালনের সাধনটি নষ্ট হইয়া যাইবে।" ॥৪॥

এইরূপ বলিয়া নাবিক শ্রীরামচন্দ্রের চরণ প্রক্ষালন পূর্বক নৌকাসহায়ে তাঁহাদের গঙ্গার অপর পারে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রজী মিথিলাপুরী গমন করিলেন। ॥৫॥

প্রাতঃকালে জনকপুরে পৌঁছিয়া তাঁহারা ঋষিগণের জন্য নির্দিষ্ট নিবাসস্থলে অবস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ শুনিবামাত্রই শ্রীজনকজী অতি প্রসন্নচিত্তে আপন পুরোহিতসহ বিবিধ পূজন সামগ্রী সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের পূজা করিলেন। ॥৬-৭॥

পুনঃ মহারাজ জনক, চন্দ্রসূর্য সদৃশ স্বকীয় তেজসহায়ে সর্বদিক্‌সমূহ প্রকাশনকারী, সর্বসুলক্ষণ সম্পন্ন রঘুকুমারদ্বয়কে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবপুত্র সদৃশ এই নরশার্দূলদ্বয় কাহার পুত্র ? ইহাদের দর্শন আমার হৃদয়ে নরনারায়ণ দর্শন তুল্য প্রীতি-উৎপন্ন করিতেছে।" ॥৮-৯॥

তখন মুনিবর বিশ্বামিত্রজী প্রসন্নতাপূর্বক রাজর্ষি জনকের হৃদয়ানন্দ বর্ধন করতঃ বলিলেন—"এই দুইটি ভাই শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মহারাজ দশরথের পুত্র। ॥১০॥

আমার যজ্ঞরক্ষণার্থ আমি ইহাদিগকে অযোধ্যা হইতে লইয়া আসিয়াছি। পথিমধ্যে আমার প্রেরণায় এই প্রবল পরাক্রমী শ্রীরঘুনাথ একটিমাত্র বাণ দ্বারাই বিশ্বঘাতিনী তাড়কাকে বধ করিয়াছেন এবং আমার আশ্রমে পৌঁছিয়া আমার যজ্ঞবিধ্বংসকারী সুবাহু আদি রাক্ষসদিগকে নিধন করতঃ মারীচকে বহুদূর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তদনন্তর গঙ্গাতটস্থ মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে আগমন করতঃ সেখানে শিলারূপে অবস্থিতা মুনি গৌতমের পত্নীকে দর্শন করিয়া স্বীয় চরণকমল স্পর্শ দ্বারাই তাঁহাকে পুনঃ মানবীরূপ প্রদান করিয়াছেন। ॥১১-১৪॥

অহল্যাকে দর্শন করিয়া রামজী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহা কর্তৃক সম্যক্‌রূপে প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করতঃ তব গৃহে রক্ষিত শিবের দিব্য ধনুক দর্শনার্থ এই নগরে আগমন করিয়াছেন। ॥১৫॥

আমি শুনিয়াছি ঐ ধনুকের এখানে বিশেষ পূজা হইয়া থাকে এবং অনেক ভূপতিবৃন্দ উহা দর্শন করিয়া গিয়াছেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি মহাদেবের সেই অতি উত্তম ধনুক ইহাদের দর্শন করান, কারণ উহা দর্শনানন্তর ইহারা শীঘ্রই মাতাপিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য অযোধ্যা প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছুক।" ॥১৬॥

মুনির এইরূপ কথা শুনিয়া ধর্মজ্ঞ রাজা জনকজী শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে পূজনীয় জ্ঞানকরতঃ তাহাদের দুইজনকে বিধিবৎ পূজা করিলেন এবং আপন বুদ্ধিমান মন্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তুমি শীঘ্র আমার গৃহে গচ্ছিত হর-ধনুক আনয়ন করতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করাও।" ॥১৭-১৮॥

মন্ত্রী হর-ধনুক আনয়ন করিতে গমন করিবার পর রাজা জনক বিশ্বামিত্রজীকে বলিলেন— "যদি শ্রীরামচন্দ্র ধনুক উঠাইয়া তাহাতে গুণ আরোপ করিতে পারেন তবে আমি তাঁহার সহিত আপন কন্যা সীতার বিবাহ দিব।" বিশ্বামিত্রজী মৃদুহাস্যসহ শ্রীরামচন্দ্রজীকে দর্শন করতঃ বলিলেন—"ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব। ॥১৯-২০॥

হে রাজন! অমিত তেজস্বী শ্রীরামচন্দ্রকে সেই হর-ধনুক দর্শন করান।" মুনীশ্বর এইরূপ বলিতে বলিতেই বলবান পাঁচ হাজার ধনুক-বাহক সেই অপূর্ব ধনুকসহ সেখানে পৌঁছিল। সেই ধনুক শত শত ঘণ্টা, হীরক ও মণি আদি রত্নদ্বারা সুশোভিত ছিল। ॥২১-২২॥

তখন মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে সেই হর-ধনুক দেখাইলেন। প্রসন্নচিত্ত শ্রীরামচন্দ্র ধনুক দর্শন করিয়াই কটিবন্ধ দৃঢ়রূপে বন্ধন করতঃ বামহস্তে অবলীলাক্রমে সেই ধনুক উত্তোলন করিয়া নিমেষ মধ্যে রাজন্যবর্গের সম্মুখে তাহাতে গুণ আরোপণ করিলেন। ॥২২-২৪॥

অতঃপর সর্বজন হৃদয়-সর্বস্ব শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধনুকের ছিলা কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিবামাত্র সেই ধনুক ভঙ্গ হইল এবং তাহার শব্দে দশদিক পূরিত হইল। ॥২৫॥

দিক্, বিদিক্, স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলাদি সকল ভুবন সেই শব্দে গুঞ্জায়মান হইয়া উঠিল। স্বর্গস্থ দেবগণ এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ও দুন্দুভি আদি বাদ্যসহায়ে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ॥২৬-২৭॥

হর-ধনুক দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়া মহারাজ জনক শ্রীরঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অন্তঃপুরস্থিত সীতার মাতৃগণও অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ॥২৮॥

অতঃপর সর্বাভরণভূষিতা, স্বর্ণবর্ণা, মৃদুহাস্যময়ী সীতা স্বর্ণময়ী মালা দক্ষিণ করে ধারণ করতঃ তথায় আগমন করিলেন। তিনি মুক্তাহার, কর্ণফুল, বিচিত্র ঝঙ্কারকারী নূপুর আদি সুশোভিতা ছিলেন এবং তাঁহার পরিহিত উত্তম সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র মধ্য হইতে তাঁর পীন পয়োধর দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ॥২৯-৩০॥

করস্থিত জয়মাল্য অতি নম্রতার সহিত মৃদুহাস্য সহকারে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠে অর্পণ করিয়া অতীব প্রসন্না হইলেন। ঐ সময় সর্বালঙ্কার বিভূষিত শ্রীরামচন্দ্রের ভুবনমোহনরূপ গবাক্ষদ্বারে দর্শন করতঃ রাজমহিষীগণও অতি আনন্দিতা হইলেন। অতঃপর সর্বশাস্ত্র বিশারদ মহারাজ জনক মুনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন— ॥৩১-৩২॥

"হে মুনে! আপনি শীঘ্র মহারাজ দশরথের নিকট পত্র প্রেরণ করুন। তিনি তাঁহার কুমারগণের বিবাহ উৎসব নিমিত্ত অতি শীঘ্র সপুত্র এবং মহিষীবৃন্দ ও মন্ত্রিগণসহ এইস্থানে আগমন করুন।" তখন বিশ্বামিত্রজী 'ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব' এইরূপ বলিয়া অতিদ্রুতগামী দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। ॥৩৩-৩৪॥

দূতগণ অবিলম্বে গমন করতঃ রাজশার্দূল দশরথকে শ্রীরামচন্দ্রের কুশল বার্তা নিবেদন করিল। তাহাদের নিকট রামের অপূর্ব শৌর্যবীর্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহারাজ দশরথ পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। ॥৩৫॥

অতঃপর সত্বর মিথিলাপুরী যাইবার জন্য রাজা দশরথ মন্ত্রিগণকে আহ্বান করতঃ বলিলেন—"আপনারা সকলে হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতিক বাহিনীসহ মিথিলাপুরী যাত্রা করুন। ॥৩৬॥

অবিলম্বে আমার রথ আনয়ন করুন। বিলম্ব না হয়, আমি আজই যাত্রা করিব। অগ্নি-আদি ও অরুন্ধতীসহ মদীয় গুরু মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান বশিষ্ঠজী সর্বাগ্রে রাম-মাতৃগণ সহ যাত্রা করুন।" এই প্রকারে সকলের প্রস্থানের অনন্তর এক বিশাল রথোপরি আরূঢ় হইয়া রাজা দশরথ অপরিমিত দলবল সহ মিথিলা নগরী অভিমুখে দ্রুত যাত্রা করিলেন। রঘুকুলতিলক দশরথজী আগতপ্রায় শুনিয়া মহারাজ জনক অতি আনন্দিত চিত্তে পুরোহিত সদানন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং পূজনীয় রাজা দশরথকে যথোচিৎ রীতি অনুযায়ী পূজন ও সৎকারাদি করিলেন। ॥৩৭-৪০॥

তদনন্তর লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামচন্দ্র পিতা দশরথের চরণ বন্দনা করিলেন। তখন প্রসন্নচিত্তে মহারাজ দশরথ রামকে বলিলেন—"হে রাম! বড় সৌভাগ্যবশতঃ তোমার বিকশিত কমল সদৃশ সুন্দর মুখ আমি দেখিতে পাইলাম। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কৃপায় আমার সর্বপ্রকারে কল্যাণ হইয়াছে।" এইরূপ বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ রামকে হৃদয়ে ধারণ করতঃ তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ও অতি হর্ষাবিষ্ট হইয়া যেন ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইলেন। ॥৪১-৪৩॥

তদনন্তর রাজা জনক মহারাজ দশরথ, রানীগণ ও রাজকুমারগণ সকলেরই সুখপূর্বক অবস্থানের জন্য বহু ভোগ্য সামগ্রীপূর্ণ এক পরম সুন্দর অট্টালিকার ব্যবস্থা করিলেন। ॥৪৪॥

অতঃপর শুভদিনে, শুভ মুহূর্তে ও শুভলগ্নে ব্রহ্মজ্ঞ জনকজী ভ্রাতৃগণ সহ শ্রীরামচন্দ্রকে (বিবাহস্থলে) আনাইলেন, এবং এক সর্বশোভাসম্পন্ন বিস্তীর্ণ পটমণ্ডপ — যাহার রত্নজড়িত স্তম্ভ, সুন্দর বিতান, মুক্তা-পুষ্প-ফল-শোভিত মনোহর তোরণ, —যেস্থান সুবর্ণ ভূষণ-ভূষিত ও বেদপাঠী ব্রাহ্মণসমূহ এবং সুন্দর বস্ত্র ও কণ্ঠদেশে সুবর্ণ ভূষণ-ধারিণী নারীসমাকুল—সেই স্থলে দিব্যরত্নজড়িত সুবর্ণ সিংহাসনে শ্রীরামচন্দ্রকে উপবেশন করাইলেন। ঐ সময় ভেরি দুন্দুভি আদি বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল এবং চতুর্দিক নৃত্যগীতের ঝংকারে মুখরিত হইয়া উঠিল। ॥৪৫-৪৮॥

তখন পুরোহিত সদানন্দ শ্রীবশিষ্ঠজী ও শ্রীবিশ্বামিত্রজীকে যথাক্রমে পূজন করিয়া এবং শ্রীরামের উভয়দিকে তাঁহাদের বসাইয়া বিধিপূর্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিলে নানারত্ন বিভূষিতা সীতাকে লইয়া মহারানী সহিত রাজা জনক কমল নয়ন শ্রীরামের নিকট আগমন করিলেন এবং বিধিবৎ তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেই চরণোদক নিজের মস্তকে ধারণ করিলেন। ॥৪৯-৫১॥

ঐ চরণোদক শিব, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য মুনিগণও সর্বদা স্বকীয় মস্তকোপরি ধারণ করিয়া থাকেন। অতঃপর সীতার হস্তধারণ পূর্বক জল ও তণ্ডুল হস্তে গ্রহণ করিয়া পাণিগ্রহণ রীতি অনুসারে অতিশয় প্রীতির সহিত তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন—"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি সুবর্ণ মুক্তাহার-বিভূষিতা আপন কমলপত্রাক্ষি কন্যা সীতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি প্রসন্ন হও।" ॥৫২-৫৪॥

এই প্রকারে প্রসন্নচিত্তে সীতাকে শ্রীরামের করকমলে সমর্পণ পূর্বক, ক্ষীরসাগর শ্রীবিষ্ণুভগবানের করকমলে শ্রীলক্ষ্মীজীকে সমর্পণ করিয়া যেরূপ আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, শ্রীজনকজীও সেইরূপ আনন্দে মগ্ন হইলেন। পুনঃ শ্রীজনকজী অতি প্রসন্নতাপূর্বক আপনার ঔরসজাত কন্যা উর্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিলেন। ॥৫৫॥

অতঃপর মহারাজ জনক আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী মাণ্ডবী ও শ্রুতিকীর্তির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দিলেন। ॥৫৬॥

এই প্রকার সুলক্ষণ-সম্পন্ন চারি ভাই আপন পত্নীগণসহ লোকপালসদৃশ প্রকাশময় হইয়া বিরাজমান হইলেন। ॥৫৭॥

অতঃপর মিথিলাপতি মহারাজ জনক আপন কন্যা জানকীর বিষয়ে দেবর্ষি নারদ কথিত সর্ববৃত্তান্ত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রজীকে বর্ণন করিলেন— ॥৫৮॥

"কোন সময়ে আমি যজ্ঞভূমি বিশুদ্ধির জন্য হল-কর্ষণ করিতেছিলাম, তখন সেই হলের অগ্রভাগ (সীতা) হইতে শুভলক্ষণা এই কন্যা প্রকট হইয়াছিল। ॥৫৯॥

ঐ সময়ে ইহাকে দর্শন করিয়া ইহার উপর আমার আপন কন্যাবৎ প্রীতি উৎপন্ন হইল। এইজন্য এই শরচ্চন্দ্রনিভাননী কন্যাটিকে আমি আমার প্রিয়া পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলাম। ॥৬০॥

একদিন যখন আমি একান্ত নির্জন স্থানে বসিয়াছিলাম, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহার মহতী বীণা বাদন ও সর্বব্যাপক শ্রীহরিগুণগান করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন। ॥৬১॥

আমাকর্তৃক পূজা সৎকারাদির অনন্তর তিনি তথায় প্রসন্নচিত্তে সুখপূর্বক উপবেশন করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—'হে রাজন্! আপনার পরম মঙ্গলদায়ক একটি গোপনীয় কথা শ্রবণ করুন— ॥৬২॥

সর্ব ইন্দ্রিয়াধিপতি পরমাত্মা ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহকামী হইয়া ও দেবগণের কার্যসিদ্ধি এবং রাবণ বধ নিমিত্ত 'রাম' এই নামে বিখ্যাত মায়া-মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি চারি অংশে মহারাজ দশরথের চারি পুত্ররূপে বর্তমানে অযোধ্যা নগরীতে বিরাজমান। ॥৬৩-৬৪॥

যোগমায়াও তোমার গৃহে 'সীতা' এই নামে আবির্ভূতা হইয়াছেন। অতএব তুমি প্রযত্ন পূর্বক এই কন্যা রাঘব শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিও, অপর কাহাকেও নহে, কারণ তিনি পূর্ব হইতে পরমাত্মা রামের ভার্যা'—এইরূপ কথনানন্তর দেবর্ষি নারদ আকাশ মার্গে প্রস্থান করিলেন। ॥৬৫-৬৬॥

সেদিন হইতে সীতাকে আমি বিষ্ণুভগবানের ভার্যা লক্ষ্মীরূপেই জানিয়াছি। এই শুভলক্ষণা কন্যাকে আমি রঘুনাথ রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পন করিব, এইরূপ চিন্তাবিষ্ট হইয়া আমি এক উপায় নির্ধারণ করিলাম। পূর্বকালে শ্রীমহাদেবজী ত্রিপুরাসুরকে ভস্মীভূত করিয়া এই ধনুক আমার পিতামহের গৃহে গচ্ছিতরূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সীতার পাণি গ্রহণার্থ সর্বগর্বনাশক এই ধনুককেই পণরূপে রাখা কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আমি তদ্রূপই করিয়াছিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার কৃপায় কমলনয়ন রামচন্দ্র হরধনু দর্শনার্থ এখানে আগমন করিয়াছেন এবং আমার মনোরথও সিদ্ধ হইয়াছে। হে রাম! "সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী আপনাকে আজ সীতাসহ

একাসনে বিরাজিত দর্শন করিয়া আমি নিজ জন্ম সফল জ্ঞান করিতেছি। হে প্রভো! আপনার চরণোদক মস্তকে ধারণ করিয়াই শ্রীব্রহ্মাজী সৃষ্টি-চক্র প্রবর্তনে সমর্থ হইয়াছেন। ॥৬৭-৭২॥

আপনার চরণোদক ধারণ করিয়াই 'বলি' ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আপনার চরণরজ স্পর্শে-ই অহল্যা ক্ষণমাত্রেই পতি প্রদত্ত শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা আমার আর কে আছে? ॥৭৩-৭৪॥

যাঁহার চরণ কমলের পরাগ(রেণু)-রসিক, কালচক্রজয়ী যোগিগণ সংসারভয়কেও জয় করিয়াছেন এবং যাঁহার নামকীর্তনে মগ্ন হইয়া দেবগণ দুঃখ ও শোক অতিক্রম করিয়া থাকেন, আমি সেই আপনার নিরন্তর শরণাগত।" ॥৭৫॥

মহাত্মা রঘুনাথজীকে এই প্রকার স্তুতি করিয়া মহারাজ জনক তাঁহাকে (বর-পণরূপে) শতকোটি সুবর্ণমুদ্রা, দশ সহস্র রথ, দশ লক্ষ অশ্ব, ছয় শত হস্তি, এক লক্ষ পদাতি সেনা এবং তিন শত দাসী প্রদান করিলেন। ॥৭৬-৭৭॥

সীতাকেও কন্যাবৎসল জনকজী অতি প্রীতির সহিত দিব্য বস্ত্রসকল এবং মোতি ও রত্নজড়িত বহু উজ্জ্বল সুবর্ণময় হার প্রদান করিলেন। ॥৭৮॥

তদনন্তর তিনি বশিষ্ঠাদিকে যথাযোগ্য পূজা করিলেন ও ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং রাজা দশরথকে যথোচিত ধনদানাদি দ্বারা সৎকার পূর্বক, রঘুশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথকে বিদায়-নমস্কার জানাইলেন। তখন ক্রন্দনপরায়ণা মাতাগণ অশ্রুবিসর্জন করতঃ সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন— ॥৭৯-৮০॥

"হে বৎসে! তুমি শাশুড়ীর সেবাপরায়ণা হইয়া নিত্য শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামিনী হইও এবং পাতিব্রত্য ধর্ম অবলম্বন করতঃ সুখে থাকিও।" ॥৮১॥

তদনন্তর রঘুকুলতিলক শ্রীরঘুনাথজীর প্রস্থান কালে ভেরি, মৃদঙ্গ, আনক ও তুর্য আদি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, আকাশস্থিত দেবগণের ভেরি, কাংস্য তালাদি বাদ্যযন্ত্র এবং তুর্য আদির ধ্বনি সহ মিলিত হইয়া, প্রাণিগণের মহাভয় উৎপন্ন করিল। ॥৮২॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
বাল-কাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তম সর্গ

পরশুরামজী সহ মিলন

শ্রীসূতজী বলিলেন—মিথিলা পুরী হইতে তিন যোজন পথ (যোজন সমান = চারি ক্রোশ) অতিক্রান্ত হইলে পর নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথজী অতি ঘোর অশুভ লক্ষণসমূহ চতুর্দিকে দেখিতে পাইলেন। ॥১॥

তখন তিনি বশিষ্ঠজীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! চারিদিকে আমি ভয়ঙ্কর অমঙ্গল সূচক চিহ্ন সকল দেখিতে পাইতেছি, ইহার কারণ কি?" ॥২॥

বশিষ্ঠজী বলিলেন—"এই চিহ্ন সকল আগামী ভয়ের সূচক হইলেও ইহাও সূচিত হইতেছে যে শীঘ্রই ঐ ভয় দূর হইবে এবং সকলে অভয় প্রাপ্ত হইবে। ॥৩॥

কারণ, দেখুন মৃগগণ আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিতেছে, ইহা শুভসূচক।" বশিষ্ঠজী এইরূপ বলিতে বলিতেই তীব্র প্রচণ্ড বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল। ॥৪॥

সেই ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত ধূলিরাশি সকলের চক্ষু পীড়িত ও আবৃত করিল। তৎপর পুনঃ তাঁহারা অগ্রসর হইতে হইতে সম্মুখে উপস্থিত এক তেজঃপুঞ্জ দেখিতে পাইলেন। ॥৫॥

দেখিলেন কোটি সূর্যসম তেজস্বী, বিদ্যুৎ পুঞ্জসম প্রভাশালী, মহাপ্রতাপবান, তেজোরাশি, নীল মেঘতুল্য দ্যুতি সম্পন্ন, উন্নতকায়, জটাজুটধারী, ধনুক ও কুঠার শোভিতহস্ত, প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অন্তক-কাল সদৃশ, পরশুরাম সম্মুখে দণ্ডায়মান। ॥৬-৭॥

তাঁহারা দেখিলেন—কার্তবীর্যবধকারী ও গর্বিত ক্ষত্রিয়গণের মানমর্দনকারী, দ্বিতীয় যমরাজতুল্য পরশুরামজী মহারাজ দশরথের সম্মুখে উপস্থিত। ॥৮॥

তাঁহাকে দেখিয়াই মহারাজ দশরথ ভয়ভীত হইয়া অর্ঘ্যাদি পূজা প্রদান প্রভৃতি অভ্যর্থনার বিষয় বিস্মৃত হইয়া 'ত্রাহি-ত্রাহি' বলিতে লাগিলেন। ॥৯॥

অতঃপর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন—"আমি আপনার নিকট আমার পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি।" এই প্রকার প্রার্থনাকারী রাজা দশরথকে উপেক্ষা করিয়া ক্রোধ-ব্যাকুলিতচিত্তে পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিলেন—"অরে ক্ষত্রিয়াধম! তুই আমার সমান 'রাম' নাম ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিস্! ॥১০-১১॥

যদি তুই বাস্তবিকই ক্ষত্রিয়, তাহা হইলে আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর্। শিবের একটি প্রাচীন জীর্ণ শীর্ণ ধনুক ভঙ্গ করিয়া তুই বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্। ॥১২॥

হে রঘুকুলোদ্ভব! যদি তুই আমার এই বৈষ্ণব ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে পারিস্, তবে আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিব। নতুবা এই মুহূর্তেই আমি সকলকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিব। কারণ আমি ক্ষত্রিয় কুলান্তকারী।" পরশুরামের কঠোর বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইবা-মাত্র পৃথিবী বারংবার কম্পিতা হইতে লাগিল। ॥১৩-১৪॥

সকলের চক্ষু অন্ধকারাবৃত হইয়া গেল। তখন দাশরথী বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র ভার্গবের প্রতি রোষপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ধনুক আকর্ষণ করতঃ তাহাতে অনায়াসে জ্যা রোপণ করিলেন ও স্বীয় তূণীর হইতে একটি বাণ লইয়া তাহাতে সন্ধান করিলেন এবং জ্যাকর্ষণ করতঃ ভার্গব (পরশুরাম)-কে বলিলেন—"হে ব্রহ্মণ্! আমাব কথা শুনুন! আমার বাণ অমোঘ, ইহা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। অতএব এই বাণের লক্ষ্যবস্তু আপনি শীঘ্র নির্ধারণ করুন। ॥১৫-১৭॥

আপনার পুণ্যদ্বারা অর্জিত লোক, অথবা আপনার চরণ যুগল, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি আমার বাণদ্বারা বিদ্ধ করিব? আমার আজ্ঞায় আপনি তাহা শীঘ্র বলুন। অতঃপর আপনি এই লোক অথবা পরলোক কোথায়ও যাইতে সমর্থ হইবেন না। ॥১৮॥

অতঃপর আপনার প্রতি আমার কি কর্তব্য অবশেষ রহিয়াছে তাহা শীঘ্র বলুন।” শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার বলিবার পর ভৃগুনন্দন পরশুরামজীর মুখ মলিন হইয়া গেল। ॥১৯॥

তখন তিনি পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বলিলেন,—“হে রাম! হে রাম! হে মহাবাহো! আমি জানি আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর! আপনি সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, পুরাণপুরুষ, ভগবান বিষ্ণু। বাল্যকালে আমি তপস্যার সময়ে বিষ্ণুভগবানের আরাধনা করিবার জন্য পবিত্র চক্রতীর্থে গমন করিয়া প্রতি দিন অনন্যচিত্তে তপস্যার দ্বারা নারায়ণ ভগবান বিষ্ণুর প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়াছিলাম। ॥২০-২২॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তখন শঙ্খ, চক্র, গদাধারী প্রসন্নবদন দেবেশ্বর কৃপা করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন— ॥২৩॥

শ্রীভগবান বলিলেন—‘হে ব্রহ্মণ্! তোমার মহান তপস্যা সফল হইয়াছে। তুমি এখন তপস্যা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। তুমি যে উদ্দেশ্যে কষ্টকর তপস্যা করিয়াছ, সেই পিতৃঘাতী হৈ-হয় শ্রেষ্ঠ কার্তবীর্যকে আমার চিদংশযুক্ত হইয়া বধ কর এবং একবিংশতিবার সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে ধ্বংস কর। ॥২৪-২৫॥

তৎপর সম্পূর্ণ পৃথিবী কশ্যপজীকে প্রদান করতঃ শান্তি লাভ কর। আমি অবিনাশী পরমাত্মা, ত্রেতাযুগে দশরথের পুত্র ‘রাম’ রূপে অবতীর্ণ হইব। ঐ সময় আমার পরমা শক্তিরূপা সীতার সহিত তুমি আমাকে দর্শন করিবে। তৎকালে তোমাতে প্রদত্ত আমার চিদংশ (তেজঃ) পুনরায় প্রতিগ্রহণ করিব। ॥২৬-২৬॥

তখন হইতে তুমি তপস্যায় রত হইয়া কল্পান্ত কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিবে।’ এইরূপ বলিয়া ভগবান বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন এবং আমিও তাঁহার আদেশানুসারে সর্বকর্ম সম্পাদন করিয়াছি। ॥২৮॥

হে রাম! আপনিই সেই বিষ্ণু। ব্রহ্মাজীর প্রার্থনাবশতঃ আপনি মানবদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাতে স্থিত আপনার তেজঃ পুনরায় আপনিই উপসংহার করিয়া লইয়াছেন। ॥২৯॥

হে প্রভো! আজ আপনার যথার্থ স্বরূপ জানিয়া আমার জন্ম সফল হইল, কারণ আপনি বস্তুতঃ ব্রহ্মাদিরও অপ্রাপ্য এবং প্রকৃতির সীমারও অতীত। ॥৩০॥

আপনাতে অজ্ঞানজনিত জন্মাদি ষড়ভাববিকার (জন্ম, সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ) নাই ও আপনি গমনাদি ক্রিয়াবিহীন নির্বিকার এবং পূর্ণ। ॥৩১॥

জলে ফেনসমূহ এবং অগ্নিতে ধূমের ন্যায় আপনারই আশ্রিত এবং আপনাকেই বিষয়কারিণী মায়া নানাপ্রকার বিচিত্র কার্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। ॥৩২॥

যতদিন মনুষ্য মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া থাকে ততদিন সে আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের বিরোধী এই অবিদ্যা অবিচারিত-সিদ্ধা, অর্থাৎ তত্ত্ববিচার না করা পর্যন্তই ইহার স্থিতি (বিদ্যাপ্রসূত জ্ঞানোদয় হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি)। ॥৩৩॥

অবিদ্যার জন্য দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতে প্রতিবিম্বিতি চিৎশক্তিই এই মর্ত্যলোকে 'জীব' শব্দ দ্বারা কথিত হইয়া থাকে। ॥৩৪॥

যে পর্যন্ত জীব দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি আদিতে অভিমান করিয়া থাকে ততদিন পর্যন্ত জীব কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভাগী হইয়া থাকে। ॥৩৫॥

বস্তুতঃ আত্মাতে জন্মমরণাদি সংসার কোনকালেই নাই এবং বুদ্ধিতেও কখনও জ্ঞান শক্তি নাই। কিন্তু অবিবেকবশতঃ এই দুটিকে সম্মিলিত করিয়া এবং আমি সংসারী এইরূপ অভিমান সহকারে জীব নানাকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ॥৩৬॥

জল ও অগ্নির পরস্পর সংযোগ হইলে জলে উষ্ণতা এবং অগ্নিতে শীতলতা উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জড়বুদ্ধি ও চেতন আত্মার সংযোগ হইলে বুদ্ধিতে চেতনতা এবং চেতন আত্মাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জড়তা প্রকট হইয়া থাকে। ॥৩৭॥

হে রাম! যে পর্যন্ত মনুষ্য আপনার চরণারবিন্দ সেবী ভক্তগণের সঙ্গসুখ লাভ না করে ততদিন পর্যন্ত তাহার সংসার দুঃখ নিবৃত্ত হয় না। ॥৩৮॥

যখন জীব ভক্তসঙ্গপ্রাপ্ত-ভক্তিসহায়ে আপনার উপাসনা করিয়া থাকে তখনই আপনার মায়া ধীরে ধীরে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়। ॥৩৯॥

অতঃপর সেই সাধকের ভগবৎ-বিষয়ক (অর্থাৎ শ্রীরামস্বরূপ বিষয়ক) তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন সদ্‌গুরু প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে এবং সে সদ্‌গুরুমুখে শ্রুত মহাবাক্যের অর্থজ্ঞান সাক্ষাৎকার করতঃ আপনারই কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ॥৪০॥

সুতরাং আপনার প্রতি ভক্তিহীন জনগণের শতকোটি কল্পেও মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনা নাই এবং এইজন্যই তাহাদের বাস্তব সুখও লাভ হয় না। ॥৪১॥

অতএব আপনার চরণকমল যুগলে জন্ম-জন্মান্তরেও যেন আমার ভক্তি অব্যাহত থাকে (ইহাই আমার প্রার্থনা)। এবং আপনার ভক্তগণের সঙ্গ যেন আমি সর্বদা লাভ করি, কারণ এই দুইটি সাধন দ্বারা অবিদ্যা নাশ হইয়া থাকে। ॥৪২॥

এই সংসারে আপনার প্রতি ভক্তিতে লীন এবং ভগবৎ ধর্মরূপ অমৃত বর্ষাকারী (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশকারী) ভক্তগণ সম্পূর্ণ লোকসমূহ পবিত্র করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজবংশোদ্ভব সকলকে পবিত্র করেন, ইহা বলাই বাহুল্য। ॥৪৩॥

হে জগন্নাথ! আপনাকে নমস্কার। হে ভক্তিভাবন! আপনাকে নমস্কার। হে পরম করুণাময়! হে অনন্ত! আপনাকে নমস্কার। হে রামচন্দ্র! আপনাকে বারম্বার নমস্কার। ॥৪৪॥

হে দেব! পুণ্যলোকপ্রাপ্তিকামী হইয়া, আমি যে সমস্ত পুণ্যকর্ম করিয়াছি, সেই সকল আপনার বাণের লক্ষ্য হউক! (অর্থাৎ আপার্নার বাণের লক্ষ্যরূপে অর্পিত আমার বাঞ্ছিত পুণ্যলোক সকল বিনষ্ট হউক এবং আপনার শ্রীচরণে আমার অচলা ভক্তি নিরন্তর বিদ্যমান থাকুক)। হে রাম! আপনাকে পুনরায় নমস্কার।" ॥৪৫॥

তখন করুণাময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—"হে ব্রহ্মন! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার হৃদয়স্থ সর্বকামনা আমি পূর্ণ করিব, ইহাতে সন্দেহ করিও না।" তখন পরশুরাম প্রসন্নচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥৪৬-৪৭॥

"হে মধুসূদন রাম! যখন আমার প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে—তখন আপনার প্রতি আমার এই প্রার্থনা যে আমার যেন সর্বদা আপনার ভক্তগণের সঙ্গ লাভ হয় এবং আপনার চরণকমলে আমার সুদৃঢ় ভক্তি থাকে। ॥৪৮॥

যদি কেহ ভক্তিহীন হইয়াও সর্বদা এই স্তোত্র পাঠ করে তবে তাহার যেন ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয় এবং অন্তকালে তোমার স্মৃতি জাগরূক থাকে।" ॥৪৯॥

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—'হাঁ, এইরূপই হইবে।' তখন পরশুরামজী শ্রীরামচন্দ্রকে পরিক্রমা ও প্রণাম করিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা পূজিত ও তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া মহেন্দ্র পর্বতে প্রস্থান করিলেন। ॥৫০॥

মহারাজ দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ হইতে প্রত্যাগতজ্ঞানে অত্যন্ত হর্ষের সহিত বারবার আলিঙ্গন এবং উভয় নেত্রে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ॥৫১॥

অতঃপর প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা সকলে অযোধ্যাপুরী আগমন করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন স্ব স্ব পত্নীগণসহ তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট মনোরম বাসভবনে দেবতাদের ন্যায় আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ॥৫২॥

বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীসহ বিহারকারী ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রও মাতাপিতার আনন্দবর্ধন করতঃ সীতার সহিত আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। ॥৫৩॥

সেই সময়ে কৈকেয়ীর ভ্রাতা, ভরতের মাতুল যুধাজিত ভরতকে অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক আপন রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলেন। ॥৫৪॥

শত্রুদমন মহারাজ দশরথও যুধাজিতের যথোচিত সৎকার করতঃ স্নেহবশীভূত হইয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য বিদায় দিলেন। ॥৫৫॥

অতঃপর পুলোম কন্যা শচী ও দেবরাজ ইন্দ্রসহ দেবমাতা অদিতির ন্যায় মহারানী কৌশল্যাও সীতা এবং রামসহ শোভা পাইতে লাগিলেন। ॥৫৬॥

যাঁহার গুণসমূহ ব্রহ্মাদি সকল লোকপালগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ, যাঁহার অপূর্ব কীর্তিসমূহ সর্বলোকে গীত হইয়া থাকে, সম্পূর্ণ প্রাণিগণের যিনি আনন্দঘনমূর্তি, যিনি নিত্য শোভাধাম, নির্বিকার, অনন্ত বৈভবসম্পন্ন এবং সর্বদা মায়াতীত হইয়াও মায়াকার্যের অনুসরণ করতঃ মনুষ্যতুল্য প্রতীত হইয়া থাকেন সেই অখিলেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা সহিত সাকেত পুরীতে শোভা পাইতে লাগিলেন। ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে বাল-কাণ্ডে সপ্তম সর্গ
বাল-কাণ্ড সমাপ্ত

শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন

অযোধ্যা কাণ্ড

প্রথম সর্গ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকট দেবর্ষি নারদের আগমন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি! একদিন সর্বালঙ্কার বিভূষিত শ্রীরামচন্দ্র আপন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে রত্নসিংহাসনোপরি সুখাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন নীলোৎপলদলশ্যাম, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি-শোভিত তাঁহাকে শ্রীসীতা রত্নদণ্ডযুক্ত চামর সহায়ে বীজন করিতে-ছিলেন। ॥১-২॥

তখন শ্রীরঘুনাথ সাদরে প্রদত্ত তাম্বুল চর্বণ করতঃ আনন্দ করিতেছিলেন ও সেই সময় সেই স্থলে তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশ হইতে দেবর্ষি নারদ অবতীর্ণ হইলেন। ॥৩॥

শুদ্ধ স্ফটিক মণিতুল্য স্বচ্ছ কান্তিমান এবং শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্মল দিব্যদর্শন দেবর্ষি নারদকে অকস্মাৎ সেখানে আসিতে দেখিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সীতা সহিত প্রেম ও ভক্তিপূর্বক করজোড়ে ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ॥৪-৫॥

অতঃপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পরম প্রীতির সহিত দেবর্ষি নারদকে বলিলেন — "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত সংসারী জীবের পক্ষে আপনার দর্শনলাভ অতি দুর্লভ। হে মুনে! আমার পূর্বজন্মকৃত ফলীভূত পুণ্যপুঞ্জ উদয়বশতই আজ আপনার দর্শন লাভ করিলাম। কারণ হে মুনে! বহুপুণ্যফলবশতই সংসারীগণেরও সৎসঙ্গ লাভ ঘটিয়া থাকে। ॥৬-৭॥

অতএব হে মুনীশ্বর! আজ আপনার দর্শন লাভ করিয়াই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আপনার কি কার্য আমাকে সম্পাদন করিতে হইবে তাহা বলুন, আমি অচিরেই তাহা পূর্ণ করিব। ॥৮॥

নারদের স্তুতি

তখন নারদ ভক্তবৎসল রামচন্দ্রকে বলিলেন — "হে রাম! আপনি অজ্ঞানীজনসুলভ বাক্য সহায়ে কেন আমাকে মোহিত করিতেছেন? হে বিভো! আপনি বলিয়াছেন যে আপনি সংসারী — ইহা অতীব সত্য, কারণ সর্বজগতের আদি কারণ মায়া আপনার গৃহিণী। ॥৯-১০॥

হে প্রভো! আপনার সান্নিধ্যবশতই সেই মায়া দ্বারা ব্রহ্মা আদি সর্ব প্রজা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ, তমোময়ী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সর্বদা আপনার আশ্রিতা বলিয়া ভাসমান হইয়া থাকে এবং ঐ মায়া উক্ত ত্রিগুণানুরূপ শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রজা অর্থাৎ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ প্রধান প্রজা উৎপন্ন করিয়া থাকে। (এ বিষয়ে শ্বেঃ উঃ ৪/৫ দ্রষ্টব্য)। অতএব লোকত্রয়রূপ মহাগৃহে আপনি গৃহস্থ।" ॥১১-১২॥

পুনরায় শ্রীনারদ বলিতেছেন — "হে রাম! আপনি ভগবান বিষ্ণু, ও জানকী সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী ; আপনি শিব, সীতা পার্বতী ; আপনি ব্রহ্মা সীতা সরস্বতী ; আপনি সূর্য সীতা প্রভা। আপনি চন্দ্রমা সীতা শুভ লক্ষণা রোহিণী ; আপনি ইন্দ্র সীতা পুলম কন্যা শচী ; আপনি অগ্নি সীতা স্বাহারূপা। ॥১৩-১৪॥

হে প্রভো! আপনি মহাকালরূপ সীতা সংযমনী। হে জগন্নাথ! আপনি নির্ঋতি শুভলক্ষণা জানকী তামসী। হে রাম! আপনি বরুণ শুভলক্ষণা জানকী ভৃগুকন্যা বারুণী। হে রাম! আপনি বায়ু, সীতা তাহার সদা গতিরূপে প্রসিদ্ধা। ॥১৫-১৬॥

হে রাম! আপনি কুবের আর সীতা তাঁহার সর্ব সম্পদ্‌রূপা, আপনি সর্বলোক সংহারী রুদ্র ও সীতা রুদ্রাণী। হে রাঘব! ইহা নিঃসন্দেহ যে সংসারে পুরুষবাচক যাহা কিছু তাহা সব আপনারই রূপ এবং স্ত্রীবাচক যাবতীয় বস্তুই শুভলক্ষণা শ্রীজানকীর রূপ। অতএব হে দেব! এই ত্রিভুবনে আপনাদের উভয়রূপ হইতে ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ॥১৭-১৯॥

আপনার আভাস (প্রতিবিম্ব) হইতে উৎপন্ন অজ্ঞানকেই অব্যাকৃত বলা হইয়া থাকে। তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ), সূত্রাত্মা হইতে সর্ব স্থূল শরীর, ব্যাপক লিঙ্গ দেহ উৎপন্ন হয়। ॥২০॥

অহঙ্কার, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখাদি ধর্মবিশিষ্ট লিঙ্গদেহ বলিয়া থাকেন। ॥২১॥

ঐ লিঙ্গদেহাভিমানী চেতনাভাস বাহ্যজগতে তন্ময়তাবশতঃ জীব নামে বিখ্যাত এবং অনির্বচনীয় অনাদি অবিদ্যাকেই কারণোপাধি বলা হইয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্যেরই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ নামক তিনটি উপাধি। এই উপাধি সহ যুক্ত হইলেই তাহাকে জীব বলা হয়, এবং উপাধি রহিত হইলেই তিনি 'পরমেশ্বর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ॥২২-২৩॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! সৃষ্টি তিন প্রকার—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। আপনি সর্ব সৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক এবং সাক্ষীচৈতন্যমাত্র স্বরূপ। ॥২৪॥

এই সম্পূর্ণ জগত আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আপনাতে প্রতিষ্ঠিত ও আপনাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আপনি সকলের মূল কারণ। ॥২৫॥

রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় নিজেকে জীব মনে করিয়া মনুষ্য ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু উক্ত জীব যখন নিজেকে 'আমি পরমাত্মা' এইরূপ দৃঢ়রূপে জানিতে সমর্থ হয় তখন জীব সম্পূর্ণ ভয় ও দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। ॥২৬॥

যেহেতু আপনি চিন্মাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব দেহে স্থিত হইয়া সর্ববুদ্ধির প্রকাশক, সেই-হেতু আপনি সকলের আত্মা। ॥২৭॥

রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানবশতঃ আপনাতে এই দৃশ্য সম্পূর্ণ জগত কল্পিত হইয়া থাকে ও পুনঃ আপনার স্বরূপ জ্ঞান লাভ হইলেই উহা বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং সর্বদা জ্ঞানাভ্যাস করাই মনুষ্যগণের কর্তব্য। ॥২৮॥

আপনার চরণকমলে ভক্তিমান্ পুরুষগণেরই ক্রমশঃ জ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং আপনার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন জনগণই বস্তুত মুক্তির পাত্র। ॥২৯॥

হে প্রভো! আমি আপনার ভক্তের ভক্ত ও যে তাঁহার ভক্ত আমি তাঁহার দাস। অতএব আপনি আমাকে আর আপনার ভুবনমোহিনী মায়ায় মোহমুগ্ধ করিবেন না—আমার প্রতি কৃপা করুন ॥৩০॥

হে প্রভো! (বিষ্ণুরূপে) আপনার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাই আমার জনক। অতএব হে প্রভো! সম্পর্কে আমি আপনার পৌত্র। হে রাঘব! আপনার একান্ত ভক্ত আমাকে আপনি রক্ষা করুন।" ॥৩১॥

এই প্রকার কথন ও বারম্বার প্রণাম পুরঃসর শ্রীনারদ আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইয়া পুনরায় বলিলেন—"হে রাম! হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমাকে ব্রহ্মা আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ; আপনি রাবণ বধের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু পিতা দশরথ রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত আপনাকে অভিষিক্ত করিবার উদ্যোগ করিবেন। ॥৩২-৩৩॥

হে রাম! যদি রাজ্যে আসক্ত হইয়া আপনি রাবণ বধ না করেন, তবে পৃথিবীর ভার হরণার্থ আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কি উপায় হইবে? ॥৩৪॥

অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন। কারণ আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ!" নারদের উক্ত বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন— ॥৩৫॥

"হে দেবর্ষি নারদ! শুনুন—আমার অবিদিত কিছু সংসারে আছে কি? পূর্বে যাহা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা আমি নিঃসন্দেহে পূর্ণ করিব। ॥৩৬॥

কিন্তু কালানুসারে যাহাদের প্রারব্ধ ক্ষীণ হইবে, আমি সেই সেই দৈত্যগণকে বধপূর্বক ক্রমশঃ পৃথিবীর ভার অর্থাৎ দুঃখ হরণ করিব। ॥৩৭॥

রাবণ বধের নিমিত্ত আমি আগামী কল্যই মুনিবেশ ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিব এবং চতুর্দশ বর্ষ সেখানে নিবাস করিব। তখন সীতা হরণছলে ঐ দুষ্ট রাবণকে আমি সবংশে নিধন করিব।" শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ॥৩৮-৩৯॥

তদনন্তর তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া আকাশমার্গে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ॥৪০॥

যে ব্যক্তি নারদ ও শ্রীরামচন্দ্রের এই সংবাদ নিত্য ভক্তিপূর্বক পাঠ, শ্রবণ ও স্মরণ করিয়া থাকে তাহার ক্রমশঃ বৈরাগ্যপূর্বক দেবগণেরও অত্যন্ত দুর্লভ কৈবল্য মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে

অযোধ্যা কাণ্ডে প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতি এবং বশিষ্ঠ ও শ্রীরামচন্দ্রের সংবাদ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি।

একদিন একান্তস্থানে উপবিষ্ট মহারাজ দশরথ কুলগুরু শ্রীবশিষ্ঠজীকে আহ্বান করতঃ বলিলেন —"হে ভগবন্! পুরবাসিগণ, বেদার্থাভিজ্ঞ বৃদ্ধজন এবং মন্ত্রিগণ সকলেই বিশেষরূপে বারম্বার শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ॥১-২॥

অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্বগুণাধার জ্যেষ্ঠপুত্র কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে আমি রাজ্যাভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিতেছি। কারণ আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। ॥৩॥

এ সময়ে শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া ভরত স্বীয় মাতুলকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছে, তথাপি শীঘ্র আগামীকল্যই শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক করিবার আমার ইচ্ছা। এ বিষয়ে আপনার সম্মতি প্রার্থনা করিতেছি। ॥৪॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অভিষেকের সর্ব সামগ্রী সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করুন এবং শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আপনার যথোচিৎ সম্মতি জ্ঞাপন করুন। নগরে বিচিত্র নানাবর্ণের পতাকাসমূহ সর্বত্র শোভিত হউক। ॥৫॥

বিচিত্র সুবর্ণ ও মুক্তানির্মিত শোভন তোরণ সমূহ সজ্জিত হইক।" এই সময় মহারাজ দশরথ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান করতঃ এইরূপ আজ্ঞা করিলেন—"আগামীকল্য আমি রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যপদে অভিষিক্ত করিব। অতএব মুনিবর বশিষ্ঠজী যে সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিবার আদেশ দিবেন তাহা সত্বর সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিও।" ॥৬-৭॥

'যথা আজ্ঞা', মহারাজ দশরথকে এইরূপ বলিয়া সুমন্ত্র অতি হর্ষের সহিত মুনিবর বশিষ্ঠকে আপনার কর্তব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী বশিষ্ঠজী তাঁহাকে বলিলেন— ॥৮॥

"আগামী কল্য প্রাতঃকালে মধ্যদ্বারে স্বর্ণভূষিত ষোলটি কন্যা দণ্ডায়মান থাকিবে এবং সুবর্ণ ও রত্নাদি ভূষিত ঐরাবত কুলজাত চতুর্দন্ত বিশিষ্ট হস্তি তথায় বিদ্যমান থাকিবে। নানাতীর্থ জলপূর্ণ সহস্র সহস্র সুবর্ণ কলস সংগ্রহ করিতে হইবে। ॥৯-১০॥

তিনটি নূতন ব্যাঘ্রচর্ম আনয়ন করিয়া রাখিও এবং মণিমুক্তা সুশোভিত রত্নদণ্ডযুক্ত একটি শ্বেতছত্র সংগ্রহ করিও। ॥১১॥

অভিষেক স্থানে বহুদিব্যমালা, দিব্যবস্ত্র ও দিব্য আভূষণ সংগ্রহ করিয়া রাখিও এবং সম্মানিত মুনিগণ হস্তে পবিত্র কুশ ধারণ করতঃ সেই স্থলে উপস্থিত থাকিবেন। ॥১২॥

বহু নর্তকী, বারাঙ্গনা, গায়ক, বেণুবাদক, নানা বাদ্যযন্ত্রবাদনকুশলী, মহারাজ দশরথের প্রাঙ্গণ সঙ্গীত এবং নৃত্য বাদ্যঘোষে মুখরিত করিবে। অভিষেক প্রাঙ্গণের বাহিরে হস্তি, অশ্ব,

রথ, পদাতি সহ চতুরঙ্গিণী সেনা অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। নগরের যাবতীয় দেবমন্দিরে বিবিধ উপহার সামগ্রী সহ দেবগণের বিশেষ পূজা হইবে এবং রাজেন্দ্রবর্গ শীঘ্রই নানাপ্রকার উপহার হস্তে ধারণ করতঃ সে স্থানে উপস্থিত হইবেন।" ॥১৩-১৫॥

রাজমন্ত্রী সুমন্ত্রকে এই প্রকার আদেশ দানের অনন্তর শ্রীমান বশিষ্ঠজী স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের শোভনীয় বাসভবনে গমন করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান বশিষ্ঠজী রথে আরোহণ করতঃ ভবনের তিনটি কক্ষা (গৃহ প্রকোষ্ঠ) অতিক্রম করিয়া ভূমিতে অবতরণ করিলেন। কুলগুরু বলিয়া বিনা বাধায় ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গুরুকে আসিতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রজী শীঘ্র করজোড়ে তাঁহাকে স্বাগত করতঃ ভক্তিপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং সীতাও সুবর্ণপাত্রে সুশীতল পানীয় (জল) আনয়ন করিলেন। ॥১৬-১৯॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবশিষ্ঠজীকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিলেন ও সেই চরণোদক ভক্তিপূর্বক সীতা ও আপন শিরোপরি ধারণ করতঃ বলিলেন—"হে মুনে! অদ্য আপনার চরণোদক ধারণ করতঃ ধন্য, কৃতকৃত্য হইলাম।" শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার বলিবার পর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠজী হাস্য সহকারে বলিলেন— ॥২০-২১॥

"হে রাম! তোমার পাদোদক পার্বতী-বল্লভ ভগবান শঙ্কর মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন এবং আমার পিতা ব্রহ্মাজীও তোমার পাদতীর্থ সেবন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন। ॥২২॥

গুরুর সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত ইহা সকলকে উপদেশ দিবার জন্যই তুমি ইদানীং আমার সহিত এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছ। আমি নিশ্চিৎরূপে ইহা অবগত আছি যে তুমি লক্ষ্মী-সহ অবতীর্ণ সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু। ॥২৩॥

হে রাঘব! আমি জানি যে তুমি দেবকার্য সিদ্ধি ও ভক্তগণের ভক্তি সফল করিবার জন্য এবং রাবণ বধ করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছ। ॥২৪॥

তথাপি দেবকার্য সিদ্ধির জন্যই এই গুপ্তরহস্য আমি সকলের নিকট উদ্‌ঘাটন করি না। হে রঘুনন্দন! তুমি যে প্রকার মায়া আশ্রয় করতঃ সর্বকর্ম সম্পাদন করিয়া থাক আমিও সেইরূপ 'তুমি শিষ্য ও আমি গুরু' এইরূপ সম্বন্ধের অনুকূল ব্যবহারই করিব। কিন্তু হে দেব! বস্তুতঃ তুমি গুরুরও গুরু এবং পিতৃগণেরও পিতামহ। ॥২৫-২৬॥

তুমি অন্তর্যামী, যাবতীয় জগৎ ব্যবহারের প্রবর্তক, মনবাণীর অবিষয়, স্বেচ্ছাপূর্বক শুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহধারণ করতঃ যোগমায়া সহায়ে ইহলোকে মনুষ্যতুল্য প্রতীয়মান হইতেছ। আমি জানি পৌরোহিত্য কর্ম অতি নিন্দিত এবং উক্ত জীবিকা অতি দূষিত। ॥২৭-২৮॥

তথাপি পূর্বকালে ব্রহ্মার মুখে শ্রবণ করিয়া ইহা অবগত হইয়াছিলাম যে ইক্ষ্বাকুবংশে পরমাত্মা রাম অবতার ধারণ করিবেন। ॥২৯॥

তখন হইতে তোমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন-ইচ্ছায় তোমার আচার্য হইবার জন্য আমি এই নিন্দনীয় আজীবিকা গ্রহণ করিয়াছি। ॥৩০॥

হে রঘুনন্দন! অদ্য আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। যদি তুমি গুরু-ঋণ হইতে মুক্ত হইতে চাও তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান কর যেন তোমার আশ্রিতা ভুবনমোহিনী মহামায়ায় আমি মুগ্ধ না হই। ॥৩১-৩২॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথা তোমাকে আমি এখন বলিলাম, তাহা আর কখনই বলিব না। (এখন শোন) হে রাঘব! মহারাজ দশরথ আগামীকল্য তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, ইহার সূচনা দিবার জন্যই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আজ সীতা সহিত তুমি বিধিপূর্বক উপবাস ও শুদ্ধ পবিত্রভাবে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিও। এখন আমি মহারাজের নিকট যাইতেছি। তুমিও আগামীকল্য প্রাতঃকালে সেখানে যাইও।" ॥৩৩-৩৫॥

রাজপুরোহিত গুরু বশিষ্ঠজী ইহা বলিয়া শীঘ্রই রথে আরোহণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্রজী লক্ষ্মণকে দেখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—"হে সৌমিত্রি! আগামীকল্য আমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে, আমি নিমিত্ত মাত্র, বস্তুতঃ কর্তা ও ভোক্তা তুমিই হইবে। ॥৩৬-৩৭॥

কারণ তুমি আমার বাহ্য প্রাণ, ইহাতে কোন বিচারের আবশ্যকতা নাই।" অতঃপর বশিষ্ঠজী যেরূপ বলিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র তদনুরূপই সকল অনুষ্ঠান করিলেন। ॥৩৮॥

বশিষ্ঠজীও মহারাজ দশরথের নিকট গমন করতঃ যাহা কিছু কর্তব্য করিয়া আসিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিলেন। মহারাজ দশরথ যখন বশিষ্ঠজীকে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক বিষয়ে বলিতেছিলেন তখন কোন ব্যক্তি তাহা গোপনে শ্রবণ করিয়া সেই বার্তা নগরে প্রচার করিল এবং রামমাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকেও সেই সংবাদের সূচনা দিল। ॥৩৯-৪০॥

তাঁহারা উভয়েই এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র পরম হর্ষান্বিত চিত্তে তাহাকে একটি অতি উত্তম হার উপহার দিলেন। অতঃপর পুত্রবৎসলা কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রের ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অত্যন্ত প্রীতির সহিত লক্ষ্মীদেবীর পূজন করিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মহারাজ দশরথ সত্যবাদী এবং আপন প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পালন করিয়া থাকেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ॥৪১-৪২॥

কিন্তু তিনি কামুক ও কৈকেয়ীর বশীভূত। তিনি কি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন? এইরূপ চিন্তাব্যাকুল হইয়া মাতা কৌশল্যা দুর্গা দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ॥৪৩॥

দেবতাগণ এই সময়ে দেবী সরস্বতীকে আগ্রহপূর্বক বলিলেন—"হে দেবি! তুমি প্রযত্ন পূর্বক ভূর্লোকে অযোধ্যা নগরে গমন কর। ॥৪৪॥

ব্রহ্মাজীর আদেশে সে স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার প্রযত্ন কর। প্রথমতঃ তুমি দাসী মন্থরার মধ্যে প্রবেশ কর ও অতঃপর কৈকেয়ীর মধ্যে প্রবেশ কর (অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দাও)। ॥৪৫॥

অতঃপর হে শুভে! অভিষেক ক্রিয়ার বিঘ্ন উপস্থিত হইবার পর তুমি পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিও।" তখন সরস্বতীজী ঐ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করতঃ কার্যতঃ তদ্রূপই সব করিলেন ও মন্থরার বুদ্ধিতে আবিষ্ট হইলেন। ॥৪৬॥

তখন ত্রিবক্রা কুব্জা মন্থরা, প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করতঃ দেখিল যে নগর সর্বত্র অপূর্ব শোভা-সমলঙ্কৃত হইয়াছে। ॥৪৭॥

চিত্রবিচিত্র পতাকা শোভিত নানা তোরণসমূহ নির্মিত হইয়াছে এবং সর্বত্র মহা উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে সে নিম্নে অবতরণ করিল। ॥৪৮॥

অতঃপর কুব্জা ধাত্রীকে (ধাই-মাকে) জিজ্ঞাসা করিল—"হে মাতঃ! আজ নগর বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াছে কেন? মহারানী কৌশল্যাই বা অতিশয় আনন্দ পূর্বক নানা উৎসবের আয়োজন করতঃ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্ত্রাভূষণই বা বিতরণ করিতেছেন কেন?" তখন ধাত্রী তাহাকে বলিল যে আগামী কল্য শ্রীরামচন্দ্রের (যৌব) রাজ্যাভিষেক (অর্থাৎ রামচন্দ্র রাজ্যের উত্তরাধিকারীর পদে বৃত) হইবে এবং সেইজন্যই অদ্য নগরী সুসজ্জিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিবামাত্রই কুব্জা অতি শীঘ্র কৈকেয়ীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল। ॥৪৯-৫১॥

বিশালাক্ষী কৈকেয়ী তখন একান্তে পালঙ্কোপরি উপবিষ্টা ছিলেন। মন্থরা বলিল—"হে অভাগিনী মূর্খা! মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। তুমি নিজেকে পরমা সুন্দরী মনে কর —এই গর্ববশতঃ হে মত্তগামিনী। তুমি অন্য কোন বিষয়ে সংবাদই রাখ না। দেখ, মহারাজের কৃপায় আগামীকল্য রামের রাজ্যাভিষেক হইবে।" ইহা শ্রবণ করিবামাত্র প্রিয়বাদিনী কৈকেয়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাহাকে দিব্যরত্ন জড়িত সুবর্ণ নূপুর প্রদান করতঃ বলিলেন—'ইহা তো অতীব আনন্দের সংবাদ। ইহাতে পরম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ বলিতেছিস কেন? ॥৫২-৫৫॥

রাম তো ভরতের অপেক্ষাও আমার অধিক হিতকারী ও মধুরভাষী। সে কৌশল্যা ও আমাকে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকে এবং সর্বদা আমার সেবাপরায়ণ। ॥৫৬॥

রে মূর্খা! রামকে ভয়ের কারণ কেন মনে করিতেছিস্ তাহা আমাকে বল্।' ইহা শুনিয়া বিনাকারণে শত্রুতাকারিণী কুব্জা মন্থরা অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে বলিতে লাগিল- —"দেবি! আমার কথা শোন, বাস্তবিকই তোমার অতিশয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। মহারাজ তোমার মনোরঞ্জন করিবার জন্য সর্বদা শ্রুতিমধুর বাক্য বলিয়া থাকেন। ॥৫৭-৫৮॥

তিনি কিন্তু অতিশয় কামুক ও মিথ্যাবাদী। তোমাকে কেবল বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া রামের মাতার ইচ্ছানুযায়ী সর্বকর্ম সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। ॥৫৯॥

দেখ, আপনার মনে (গোপনে) এইরূপ ইচ্ছা করিয়াই তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন সহিত তোমার পুত্র ভরতকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ॥৬০॥

সুমিত্রার সর্ব বিষয়ে অনুকূলই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ লক্ষ্মণ রামের অনুগামী বলিয়া সেও রামের সহিত রাজ্যভোগ করিবে। ভরত রামের দাস্যবৃত্তি করিবে বা নগর হইতে বহিষ্কৃত হইবে অথবা অচিরেই ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইবে। ॥৬১-৬২॥

আর তুমি দাসীর ন্যায় নিত্য কৌশল্যার পরিচর্যা করিবে। সপত্নী কর্তৃক এই প্রকারে অপমানিতা হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়। ॥৬৩॥

অতএব তুমি ভরতের রাজ্যাভিষেক ও রামের চতুর্দশ বর্ষ বনবাসের জন্য শীঘ্র প্রযত্ন কর। ॥৬৪॥

হে রানী! এইরূপ হইলে তোমার পুত্র ভরত নিষ্কণ্টক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। এইজন্য আমি পূর্ব হইতে বিচার করতঃ উহার সুনিশ্চিত উপায় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি। ॥৬৫॥

পূর্বে দেবাসুর সংগ্রামকালে স্বয়ং ইন্দ্র ধনুর্ধর মহামতি রাজা দশরথকে সহায়তার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ॥৬৬॥

হে শুভাননে! ঐ সময় সেনাসহিত মহারাজ তোমাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ধনুর্ধর মহারাজ দশরথ রাক্ষসগণসহ যুদ্ধে মত্ত ছিলেন, তখন সহসা তাঁহার অজ্ঞাতসারে রথের একটি কীলক ভগ্ন হইয়া ভূপতিত হইলে তুমি অতীব ধৈর্যের সহিত আপন হস্ত দ্বারা সেই কীলকছিদ্র রক্ষা করিয়াছিলে। ॥৬৭-৬৮॥

হে কৃষ্ণাক্ষি! পতির প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য তুমি দীর্ঘকাল ঐরূপ স্থিতি সহ্য করিয়াছিলে। তদনন্তর সমস্ত দৈত্যবল সংহার করিয়া শত্রুদমন মহারাজ দশরথ তোমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন— ॥৬৯॥

এবং তোমার ঐরূপ স্থিতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া অতি প্রসন্নতাপূর্বক তোমাকে আলিঙ্গন করতঃ বলিয়াছিলেন—'আমি তোমাকে বর দিতে ইচ্ছা করি। তুমি ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা কর। ॥৭০॥

এ সময়ে তুমি দুইটি বর গ্রহণ করিতে পার।' মহারাজ দশরথ স্বয়ং এইরূপ বলিবার পর, তুমি প্রত্যুত্তর করিয়াছিলে—'হে রাজন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে দুইটি বর দিতে ইচ্ছুক, তবে হে অনঘ! এই বরদ্বয় দীর্ঘকাল আপনার নিকটই গচ্ছিত থাকুক। যখন প্রয়োজন হইবে সেই অবসরে এই দুটি বর আমাকে প্রদান করিবেন।' ॥৭১-৭২॥

তখন মহারাজ উহাতে সম্মত হইয়া তোমাকে বলিয়াছিলেন, 'তাহাই হইবে। হে সুব্রতে এখন ঘরে চল।' (পুনরায় মন্থরা বলিল) — "হে মহারানী! এই সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত তোমার নিকট হইতেই আমি শুনিয়াছিলাম। উহাই এখন আমার স্মরণ হইয়াছে। ॥৭৩॥

অতএব হে ভামিনি (কোপন স্বভাব)! তুমি রোষান্বিত হইয়া শীঘ্রই কোপভবনে প্রবেশ কর এবং শরীরের সর্বাভরণ সমূহ সর্বত্র বিকীর্ণ করিয়া যে পর্যন্ত মহারাজ দশরথ তোমার বাঞ্ছিত কার্য করিবার জন্য সত্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হন, সে পর্যন্ত ভূমিপর নিঃশব্দে শয়ন করিয়া থাক।" ত্রিবক্রা মন্থরার কথা শুনিয়া দুষ্ট সঙ্গবশতঃ বুদ্ধিভ্রষ্টা দুষ্টা কৈকেয়ী তাহার কথা যথার্থ বোধ করিয়া বলিলেন—"তোর এত বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? ॥৭৪-৭৬॥

ওহে বক্রসুন্দরী! তোর এত বুদ্ধি তাহা আমি জানিতাম না। আমার প্রিয়পুত্র ভরত যদি রাজা হয় তাহা হইলে তোকে আমি একশত গ্রাম পুরস্কার দিব। তুই আমার প্রাণের ন্যায় প্রিয়।" এইরূপ বলিয়া কৈকেয়ী অত্যন্ত ক্রোধের সহিত কোপভবনে প্রবেশ করিলেন এবং গাত্রস্থ সর্বাভরণসমূহ ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করতঃ মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া অত্যন্ত মলিনদশায় ভূমিপর শয়ন করিয়া বলিলেন—"কুব্জা! শোন, যে পর্যন্ত রাম বনগমন না করিবে সে পর্যন্ত প্রাণত্যাগ হইলেও আমি এইরূপ পড়িয়া থাকিব।" ॥৭৭-৮০॥

তখন কুব্জা—"হে কল্যাণি! তুমি নিঃসন্দেহে এইরূপই করিও, ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে—" এইরূপ বলিয়া সে আপন নিবাস স্থানে প্রস্থান করিল এবং কৈকেয়ীও কুব্জার কথানুসারে তদ্রূপই করিলেন। ॥৮১॥

ইহা অতি সত্য যে অত্যন্ত ধৈর্যবান, দয়ালু, সদ্‌গুণী, সদাচারী, নীতিজ্ঞ, কর্তব্যপরায়ণ, গুরুভক্ত এবং বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন হইলেও যদি কোন ব্যক্তি নিরন্তর অত্যন্ত পাপবুদ্ধি দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধিও সেই দুষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধিদ্বারা প্রভাবিত হইয়া তদ্রূপ হইয়া যায়। ॥৮২॥

অতএব দুষ্টগণের সঙ্গ সর্বদাই পরিত্যাজ্য। কারণ দুষ্টসঙ্গবশতঃ পুরুষ এই রাজকন্যকার (কৈকেয়ীর) ন্যায় স্বকীয় পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে অযোধ্যা কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

রাজা দশরথ কর্তৃক কৈকেয়ীকে বর প্রদান

শ্রী মহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

অতঃপর মহারাজ দশরথ শ্রীরামচন্দ্রের অভ্যুদয়ের (মঙ্গল) নিমিত্ত প্রজাবর্গ এবং মন্ত্রিগণকে তদনুরূপ কার্যার্থ আদেশ প্রদান করতঃ সানন্দে স্বীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সেখানে আপন প্রিয়া পত্নী কৈকেয়ীকে না দেখিতে পাইয়া তিনি অত্যন্ত বিহ্বলচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন—একি হইল! যাঁহার বাসগৃহে আমি প্রবেশ করিবামাত্র সদা হাস্যময়ী কৈকেয়ী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত, তাঁহাকে আজ দেখিতে পাইতেছি না কেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত মনে পরিচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তোমাদের শুভলক্ষণা স্বামিনী কোথায়? প্রিয়দর্শনা আমার প্রিয়া আজ পূর্বের ন্যায় আমার নিকট আসিতেছেন না কেন?" ॥১-৪॥

পরিচারিকারা বলিল—'জানি না কি কারণ, আজ তিনি কোপভবনে প্রবেশ করিয়াছেন, আপনি স্বয়ং সেখানে যাইয়া নিশ্চিতরূপে সব জানিতে পারিবেন।' দাসিগণের কথা শুনিয়া ভয়-সন্ত্রস্ত চিত্তে মহারাজ সেখানে গমন করিলেন এবং কৈকেয়ীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহাকে স্পর্শ ও তাহার অঙ্গে ধীরে ধীরে মৃদু হস্ত সঞ্চালন করতঃ বলিলেন— ॥৫-৬॥

"হে ভয়শীলা! পালঙ্কাদি পরিত্যাগ করতঃ তুমি ভূমির উপর কেন শয়ন করিয়াছ? তুমি আমার সহিত কথা বলিতেছ না, ইহাতে আমার মনে বড়ই দুঃখ হইতেছে। ॥৭॥

সর্ব অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ও মলিন বস্ত্র ধারণ করতঃ তুমি ভূমিশায়ী হইয়াছ কেন? তোমার যাহা ইচ্ছা বল, আমি তাহা সম্পূর্ণ সম্পাদন করিব। ॥৮॥

তোমার অনিষ্টকারী কে? সে স্ত্রী বা পুরুষ যে কেহ হউক, তাহাকে আমি দণ্ডবিধান করিব, অথবা বধ পর্যন্ত করিব, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৯॥

হে দেবি! কি প্রকারে তোমার প্রসন্নতা সম্পাদন হইবে, তাহা আমাকে অবশ্য বল। অত দুর্লভ হইলেও আমি তাহা সেইক্ষণেই পূর্ণ করিব। ॥১০॥

তুমি আমার মন জ্ঞাত আছ, আমি তোমার অত্যন্ত প্রিয় ও বশীভূত, তথাপি তুমি আমাকে বৃথা দুঃখ দিতেছ কেন? তোমার এই পরিশ্রম ব্যর্থ। ॥১১॥

বল, তোমার প্রীতি সম্পাদনকারী কোন্ দরিদ্রকে ধনবান করিব? অথবা তোমার অপ্রিয়কারী কোন্ ধনপতিকে নিঃস্ব দরিদ্র করিয়া দিব? ॥১২॥

বল, কোন্ অবধ্যকে বধ করিব? অথবা কোন্ বধ্যকে মুক্তিপ্রদান করিব? হে প্রিয়ে! এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব? তোমার জন্য আমি আমার প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারি। ॥১৩॥

কমল নয়ন রাম আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। আমি তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে তোমার যাহা কিছু প্রিয় তাহা আমি সম্পাদন করিব।" ॥১৪॥

মহারাজ দশরথ রামের নামে এই প্রকার শপথ করিবার পর কৈকেয়ী ধীরে ধীরে নয়নাশ্রু বস্ত্রাঞ্চলে মার্জন করিয়া রাজাকে বলিলেন— ॥১৫॥

"হে রাজন্! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং শপথও গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি যাহা কিছু প্রার্থনা করিব তাহা তৎকাল সফল করিতে হইবে। ॥১৬॥

পূর্বে দেবাসুর সংগ্রামকালে আমি আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম। তখন প্রসন্নচিত্ত হইয়া আপনি আমাকে দুইটি বর দিবেন বলিয়াছিলেন। ॥১৭॥

হে উত্তমব্রতধারী! সেই দুইটি বর আমি আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। বরদ্বয় মধ্যে একটি প্রার্থিত বর এই যে আপনি শীঘ্রই আমার প্রিয়পুত্র ভরতকে রামরাজ্যাভিষেকের জন্য সংগৃহীত সামগ্রী সমূহের দ্বারা যৌবরাজ্যপদে অভিষিক্ত করুন, এবং দ্বিতীয় বর এই যে শীঘ্রই রাম দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করুক। ॥১৮-১৯॥

রাম সেখানে জটাবল্কলাদি মুনিবেশ ধারণ করিয়া এবং কন্দমূল ফলাদি সহায়ে জীবন ধারণ করতঃ চতুর্দশ বৎসর বাস করিবে। ॥২০॥

তৎপর ইচ্ছা হইলে সে অযোধ্যায়ও প্রত্যাবর্তন করিতে পারে অথবা বনেও অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু কমলনয়ন রামকে আগামীকল্য প্রভাতেই বনগমন করিতে হইবে। ॥২১॥

যদি এই বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও বিলম্ব হয়, তাহা হইলে আমি আপনার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব। অতএব আপনি স্বীয় প্রতিজ্ঞার সত্যতা রক্ষা করুন। ইহাই আমার প্রিয় কার্য।" ॥২২॥

কৈকেয়ীর এই প্রকার রোমাঞ্চকারী কঠোর বচন শ্রবণ করিবামাত্র মহারাজ দশরথ বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। ॥২৩॥

তৎপশ্চাৎ ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্বক সভয়ে অশ্রু সম্বরণ করতঃ মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—'আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি? অথবা আমার চিত্তভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?' ॥২৪॥

এই সময়ে আপন সম্মুখে ব্যাঘ্রীর ন্যায় উপবিষ্টা রানী কৈকেয়ীকে দেখিয়া মহারাজ দশরথ বলিতে লাগিলেন—"হে ভদ্রে! তুমি আমার প্রাণ-হরণকারী এ কি বচন বলিতেছ? ॥২৫॥

কমলনয়ন রাম তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি তো দিবানিশি আমার সম্মুখে রামের গুণগান কীর্তন করিতে। ॥২৬॥

তুমি তো পূর্বে আমাকে বলিতে 'রাম আমাকে ও কৌশল্যাকে সমভাবে দর্শন করতঃ সর্বদা আমার সেবা করিয়া থাকে।' এখন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাষণ কি প্রকারে করিতেছ? ॥২৭॥

তুমি স্বীয় পুত্র ভরতের জন্য রাজ্যগ্রহণ কর কিন্তু রামকে স্বগৃহে থাকিতে দাও। হে বামে, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। রাম তোমার কোন ভয়ের কারণ হইবে না।" ॥২৮॥

এইরূপ বলিয়া মহারাজ দশরথ অশ্রুপূর্ণনেত্রে কৈকেয়ীর চরণে নিপতিত হইলেন। তখন কৈকেয়ী (ক্রোধে) চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া এইরূপ বলিলেন— ॥২৯॥

"হে রাজেন্দ্র! আপনি কি ভ্রান্ত হইয়াছেন, কারণ আপনার প্রতিজ্ঞার বিপরীত ভাষণ করিতেছেন? জানিবেন যদি আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন তাহা হইলে আপনার নরকে গতি হইবে। ॥৩০॥

যদি আগামী কল্য প্রাতঃকালেই রামচন্দ্র মৃগচর্ম ও বল্কল পরিধান করতঃ বনগমন না করে তবে আপনার সম্মুখেই আমি উদ্বন্ধনে বা বিষভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিব। ॥৩১॥

আপনি এতাবৎকাল সর্বসভাগৃহে—'আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ' এইরূপ বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। এখন রামের নামে শপথ করিয়াও আপন প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছেন। অতএব আপনার নিশ্চয় নরকে গতি হইবে।" ॥৩২॥

আপন প্রিয়তমা পত্নীর এইরূপ কঠোর বচন শ্রবণ করিয়া মহারাজ দশরথ দুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন তাঁহার দেহ সংজ্ঞাহীন ও মূর্চ্ছিত হইয়া শবদেহের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। ॥৩৩॥

এই প্রকারে অত্যন্ত দুঃখের সহিত মহারাজ দশরথের সেই রাত্রি এক বৎসর তুল্য দীর্ঘ প্রতীত হইতেছিল। অরুণোদয় কালে গায়ক ও স্তুতিপাঠকবৃন্দ যথারীতি স্তুতিপাঠ ও বন্দনা গান করিতে আরম্ভ করিল। ॥৩৪॥

কিন্তু কৈকেয়ী তাহাদের নিবারণ করতঃ অত্যন্ত ক্রোধভরে বসিয়া রহিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইবামাত্র (পূর্ব ব্যবস্থামত) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ঋষিগণ, কন্যাগণ, দিব্যছত্র ও চামর এবং হস্তি, অশ্ব প্রভৃতি অভিষেকের উপযোগী যাবতীয় বস্তু মধ্যদ্বারে একত্রিত হইয়াছে। ॥৩৫-৩৬॥

বশিষ্ঠজীর আজ্ঞানুসারে মুখ্যবারাঙ্গনাগণ, জনপদবাসিগণও সকলে সেখানে উপস্থিত। ॥৩৭॥

সেই রাত্রিতে অযোধ্যানগরীর স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ কাহারও নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। সকলেরই মনে এই উৎকণ্ঠা প্রবল ছিল যে আমরা কখন রেশমী পীতাম্বরধারী রামচন্দ্রকে দর্শন করিব। ॥৩৮॥

অহো! সর্বাভরণ সুসজ্জিত, উজ্জ্বল কিরীট ও কটক পরিহিত, কৌস্তুভমণি বিভূষিত, শত কামদেব তুল্য সুন্দর শ্যামবর্ণ এবং সর্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন শ্রীলক্ষ্মণজী যাঁহার শিরোপরি শ্বেতছত্র ধারণ করিয়াছেন, রাজ্যাভিষেকের অনন্তর মৃদুমন্দ হাস্যকারী হস্তি পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আসিতে কখন দেখিতে পাইব? মঙ্গলময় প্রভাতকাল কখন হইবে, শ্রীরামচন্দ্রকে কখন আমরা দেখিতে পাইব? এই প্রকারে সর্ব পুরবাসিগণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ॥৩৯-৪০॥

এই সময়ে মন্ত্রিবর সুমন্ত্র—'মহারাজের আজ এখনও কেন নিদ্রাভঙ্গ হইল না?' ভাবিয়া ধীরে ধীরে মহারাজ দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ॥৪২॥

সেখানে পৌঁছিয়া ও 'মহারাজের জয় হউক', উচ্চারণ করতঃ নত মস্তকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অতি খিন্ন অবস্থা দর্শনে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৪৩॥

"দেবি কৈকেয়ী। আপনার মঙ্গল হউক। আজ মহারাজকে এরূপ খিন্ন ও মলিন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাইতেছে কেন?" প্রত্যুত্তরে কৈকেয়ী বলিলেন—"আজ রাত্রিতে মহারাজের কিঞ্চিৎমাত্রও নিদ্রা হয় নাই। ॥৪৪॥

সমস্ত রাত্রি তিনি রামের চিন্তায় ও 'রাম-রাম-রাম' এইরূপ উচ্চারণ করতঃ বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন। রাত্রি জাগরণের জন্যই মহারাজকে এরূপ অস্বস্থ দেখাইতেছে। মহারাজ রামচন্দ্রকে এখানে দেখিতে ইচ্ছা করেন। অতএব তাহাকে শীঘ্র এইস্থানে আনয়ন করুন।"

(সুমন্ত্র বলিলেন) 'হে ভামিনি! মহারাজের আজ্ঞা বিনা আমি কি প্রকারে যাইব?' মন্ত্রীর এরূপ বচন শুনিয়া মহারাজ বলিলেন— ॥৪৬॥

"সুমন্ত্র! আমি সুদর্শন রামকে দেখিব। তুমি তাহাকে শীঘ্র এস্থানে আনয়ন কর।" রাজার এইরূপ আদেশ শুনিবামাত্র ত্বরিত গতিতে সুমন্ত্র রামচন্দ্রের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ॥৪৭॥

এবং বিনা বাধায় অন্দরে প্রবেশ করতঃ রামচন্দ্রকে বলিলেন—"হে কমলনয়ন রাম। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি অতি শীঘ্রই আমার সহিত পিতৃ-ভবনে আগমন কর। মহারাজ তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক।" ইহা শুনিবামাত্র সশংকচিত্তে রামচন্দ্র অতি শীঘ্র গমনার্থ রথারূঢ় হইলেন। ॥৪৮-৪৯॥

সারথি ও লক্ষ্মণ সহিত রামচন্দ্র মধ্যদ্বারে অপেক্ষমান বশিষ্ঠাদি গুরুজনদিগকে কেবল দর্শনমাত্র দ্বারাই শ্রদ্ধা সৎকারাদি প্রদর্শন পূর্বক অতি সত্বর পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তখন রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উঠিয়া আবেগভরে হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র অতি দুঃখের সহিত—'হা রাম — হা রাম' বলিতে বলিতে ভূপতিত হইলেন। তখন রামচন্দ্রও হাহাকার করিয়া অতি শীঘ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ আপন অঙ্কে উপবেশন করাইলেন। ॥৫০-৫২॥

মহারাজকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া রানীমহলের সমস্ত মহিলাগণ রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই রোদন কোলাহল শ্রবণ করিয়া 'অকস্মাৎ রোদন ধ্বনি শ্রুত হইতেছে কেন'—ইহা চিন্তা করিয়া বশিষ্ঠজীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ॥৫৩॥

শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাতঃ! মহারাজের এরূপ দুঃখের কারণ কি?" শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কৈকেয়ী বলিলেন— ॥৫৪॥

"হে রাম! মহারাজের এইরূপ দুঃখের কারণ তুমি। এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তাঁহার অভীপ্সিত কিছু প্রিয়কার্য তোমাকে করিতে হইবে। ॥৫৫॥

তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ। রাজাকেও সত্যবাদী প্রতিপন্ন কর। তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে দুইটি বর প্রদান করিয়াছেন। ॥৫৬॥

কিন্তু উহার সফলতা সম্পাদন তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। মহারাজ উহা তোমাকে বলিতে সঙ্কোচ ও লজ্জাবোধ করিতেছেন। সত্যপাশে আবদ্ধ তোমার পিতাকে এখন একমাত্র তুমিই পরিত্রাণ করিতে পার। ॥৫৭॥

কারণ পুত্র শব্দের ইহাই অর্থ যে সে পিতাকে নরক হইতে ত্রাণ করে।" কৈকেয়ীর এই বাক্য শুনিয়া শূলবিদ্ধবৎ ব্যথিতান্তঃকরণে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"মাতঃ! আজ এরূপ বাক্য আপনি আমাকে কেন বলিতেছেন। পিতার জন্য আমি জীবন বিসর্জন করিতে পারি এবং প্রাণনাশক ভয়ঙ্কর বিষও ভক্ষণ করিতে পারি। ॥৫৮-৫৯॥

এবং সীতা, মাতা কৌশল্যা ও রাজ্যপরিত্যাগও করিতে পারি। যে পুত্র পিতৃ-আজ্ঞা বিনাই তাঁহার অভীষ্ট কর্ম সম্পাদন করে, সে উত্তম পুত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। ॥৬০॥

যে পিতার আজ্ঞানুসারে সেই কর্ম সম্পাদন করে, তাহাকে মধ্যমপুত্র বলে। আর যে পুত্র পিতার আদেশ হইলেও তাহা সম্পাদন করে না, সে পুত্র মল অর্থাৎ বিষ্ঠাতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ॥৬১॥

অতএব পিতা আমার প্রতি যাহা কিছু আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা আমি অবশ্যই সম্পন্ন করিব। ইহা সর্বথা সত্য। রাম কখনও এক কথা দুইবার বলে না।" ॥৬২॥

রামের এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী বলিতে আরম্ভ করিলেন—"হে রাম! তোমার রাজ্যাভিষেকের জন্য যে সমস্ত সামগ্রী একত্রিত হইয়াছে, উহার দ্বারা আমার প্রিয়পুত্র ভরতকে অভিষিক্ত করিতে হইবে। (ইহাই আমার প্রথম বর)। দ্বিতীয় বর অনুসারে তুমি পিতৃ আজ্ঞায় অদ্যই অতি শীঘ্র বল্কল বস্ত্র ও জটা ধারণ করিয়া বনে গমন কর এবং সেখানে মুনিজনোচিত ফল-মূলাদি ভক্ষণ করতঃ চতুর্দশ বর্ষ অবস্থান কর। ॥৬৩-৬৫॥

ইহাই তোমার পিতার অভীপ্সিত কর্ম, যাহা তোমাকে আজ করিতে হইবে। কিন্তু হে রঘুনন্দন! রাজা স্বয়ং তোমাকে ইহা বলিতে সঙ্কোচ বা লজ্জা অনুভব করিতেছেন।" ॥৬৬॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"হে মাতঃ! ভরত আনন্দের সহিত এই রাজ্য উপভোগ করুক, আমি এইক্ষণেই দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি। কিন্তু মহারাজ আমার সহিত কোন কথা কহিতেছেন না—ইহার কারণ কি, তাহা আমি বুঝিতেছি না।" ॥৬৭॥

শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ বচন শুনিয়া ও তাহাকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া দুঃখাতুর মহারাজ দশরথ পরম দুঃখপূর্ণ খেদোক্তি করিতে লাগিলেন— ॥৬৮॥

"রাম! আমি স্ত্রী পরবশ, ভ্রান্তচিত্ত, কুমার্গগামী পাপাত্মা, আমাকে বন্ধন করতঃ তুমি এই রাজ্য গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। ॥৬৯॥

হে রঘুনন্দন! এইরূপ করিলে আমাকেও কোন অসত্য স্পর্শ করিবে না।" এইরূপ কথন করতঃ দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া রাজা দশরথ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ॥৭০॥

"হা রাম! হা রাম! হা জগন্নাথ! হা আমার প্রাণবল্লভ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি ঘোর অরণ্যে প্রস্থান কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছ?" ॥৭১॥

এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি রামকে আলিঙ্গন করতঃ মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন রাম হস্তে জল লইয়া পিতার অশ্রু মার্জন করিয়া দিলেন। ॥৭২॥

অনন্তর নীতিকুশল শ্রীরামচন্দ্র ধীরে ধীরে মহারাজ দশরথকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"হে প্রভো! যদি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত রাজ্য শাসন করে, ইহাতে দুঃখিত হইবার কি আছে। ॥৭৩॥

আমিও প্রতিজ্ঞা পালন করতঃ পুনরায় আপনার নিকট অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাগমন করিব। হে রাজন্! বনবাস আমার রাজ্যাপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক সুখকর হইবে। ॥৭৪॥

ইহাতে আপনার সত্যরক্ষা, দেবগণের কার্যসিদ্ধি এবং মাতা কৈকেয়ীরও প্রিয় কার্য সাধিত হইবে। অতএব হে রাজন্! বনবাস সর্বপ্রকারে মহাগুণদায়ক হইবে। ॥৭৫॥

এখন শীঘ্রই আমি বনে প্রয়াণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মাতা কৈকেয়ীর হৃদয়ের ব্যথা শান্ত হউক। অভিষেকের নিমিত্ত একত্রিত যাবতীয় সামগ্রী (ভরতের আগমন কাল পর্যন্ত) পৃথক ভাবে রক্ষিত হউক। ॥৭৬॥

মাতা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা প্রদান ও জানকীকে আশ্বস্ত করিয়া আমি এখনই ফিরিয়া আসিব এবং আপনার চরণ বন্দনাপূর্বক পরমানন্দে বনগমন করিব।" ॥৭৭॥

এইরূপ বলিয়া তিনি পিতাকে পরিক্রমা করিলেন এবং মাতাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিলেন। এই সময় মাতা কৌশল্যা রামের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণু ভগবানের পূজা করিতেছিলেন। ॥৭৮॥

কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে হবন করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করতঃ মৌনাবলম্বন পূর্বক সমাহিত চিত্তে শ্রীবিষ্ণু ভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন। ॥৭৯॥

(বনগমনের পূর্বে মাতা কৌশল্যাকে প্রণাম ও তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র মাতৃসমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু) হৃদ্‌কমলে অন্তর্যামী চিদ্‌ঘন, জ্যোতি-স্বরূপ, জগদতীত, নিরতিশয় স্বরূপ, সদানন্দময় ভগবান বিষ্ণুর ধ্যানে তন্ময় হইয়াছিলেন বলিয়া মাতা কৌশল্যা সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না। ॥৮০॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে অযোধ্যা কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

ভগবান রামচন্দ্রের মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ এবং সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত বনগমনের উদ্যোগ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

তখন মহারানী সুমিত্রা রামকে দেখিয়া হর্ষ-ভয়াদিজনিত আবেগের সহিত মহারানী কৌশল্যাকে তাঁহার ধ্যান হইতে বুত্থিত করিয়া 'রাম সম্মুখে দণ্ডায়মান' ইহা জ্ঞাপন করিলেন। ॥১॥

'রাম' এই নাম শ্রবণ করিবামাত্র মাতা কৌশল্যার দৃষ্টি বহিঃপ্রসারিত হইল এবং তিনি বিশাল নয়ন রামকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ আপন ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন। ॥২॥

রামের মস্তক আঘ্রাণ করতঃ মাতা তাহার নীল কমল সদৃশ শ্যাম শরীরে সাদর হস্ত সঞ্চালন পূর্বক বলিলেন—"হে বৎস! তোমার নিশ্চয় ক্ষুধা পাইয়াছে, তুমি কিছু মিষ্টান্ন ভোজন কর।" ॥৩॥

তখন রাম বলিলেন "মাতঃ! আমার এখন কিছু ভোজন করিবার সময় নাই। কারণ ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে আজ আমাকে অতি শীঘ্র এইক্ষণেই দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে হইবে। ॥৪॥

আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব মাতা কৈকেয়ীকে বরপ্রদান দ্বারা ভরতকে রাজ্য এবং আমাকে উত্তম বনবাস দিয়াছেন। ॥৫॥

মুনিবেশ ধারণ করতঃ সেখানে চতুর্দশ বর্ষ বাস করিয়া আমি শীঘ্রই পুনঃ প্রত্যাগমন করিব। তুমি আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না।" ॥৬॥

অকস্মাৎ ইহা শ্রবণ করিয়া মাতা কৌশল্যা দুঃখাঘাতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন, পুনরায় সচেতন হইয়া দুঃখসাগরে যেন হাবুডুবু খাইতে খাইতে পরম দুঃখে আতুর হইয়া রামকে বলিতে লাগিলেন— ॥৭॥

"রাম! যদি তুমি সত্য সত্যই বনে গমন কর তবে আমাকেও সঙ্গে লইয়া চল, কারণ তোমার অবর্তমানে আমি ক্ষণার্ধও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। ॥৮॥

অল্পবয়স্ক গোবৎসকে হারাইয়া গোমাতা যে প্রকার অন্যত্র থাকিতে পারে না, সেই প্রকার আমিও আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ॥৯॥

যদি মহারাজ ভরতের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে তিনি তাহাকে রাজ্য প্রদান করুন কিন্তু তোমা-সদৃশ প্রিয়পুত্রকে বনবাসের আজ্ঞা কেন দিতেছেন? ॥১০॥

কৈকেয়ীকে বরপ্রদান করতঃ মহারাজ তাহাকে সর্বস্ব প্রদান করুন (তাহাতে কোন আপত্তি নাই), কিন্তু তুমি মহারাজ অথবা কৈকেয়ীর কি অপরাধ বা অনিষ্ট করিয়াছ? ॥১১॥

হে রাম! পিতা যে প্রকার তোমার গুরু সেই প্রকার আমি মাতা তোমার পিতা অপেক্ষাও অধিকতর গুরু। যদি পিতা তোমাকে বনগমনের আদেশ দিয়া থাকেন তবে আমি তাহা নিষেধ করিতেছি। ॥১২॥

যদি তুমি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া মহারাজের আদেশ শিরোধার্য করতঃ বনে গমন কর তবে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যমালয়ে চলিয়া যাইব।" ॥১৩॥

তখন লক্ষ্মণ মাতা কৌশল্যার বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ ত্রিলোক বিধ্বংসী রোষপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন— ॥১৪॥

"উন্মত্ত, বিভ্রান্তচিত্ত ও কৈকেয়ীর বশীভূত মহারাজ দশরথকে আমি (রজ্জুদ্বারা) বন্ধন করিব এবং ভরত ও তাহার সহায়ক মাতুলগণকে হত্যা করিব। ॥১৫॥

আজ সমগ্রলোক-দাহকারী কালানল সদৃশ আমার পৌরুষ (শৌর্য-বীর্য) সর্বলোক দর্শন করুক। হে শত্রুদমন রাম! আপনি অভিষেকের জন্য যত্নবান হউন। ॥১৬॥

যদি কেহ ইহাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে তবে আমি হস্তে ধনুক বাণ ধারণ করতঃ তাহাকে বধ করিব।" সুমিত্রানন্দন শ্রীলক্ষ্মণ এই প্রকার বলিলে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন— ॥১৭॥

"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাবীর এবং আমার পরম হিতকারী। তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ সে সবই আমি সত্য বলিয়া মনে করি, কিন্তু এখন তাহার সময় নহে (তোমার শৌর্য প্রদর্শন করিবার সময় এখন নহে)। ॥১৮॥

"ভাই লক্ষ্মণ! এই রাজ্য এবং দেহাদি যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা যদি সত্য হইত তবে তোমার এইরূপ পরিশ্রম (শৌর্য প্রকাশ) সফল হইত। ॥১৯॥

বিষয়ভোগ বিস্তৃত মেঘরূপ পটমণ্ডপস্থ প্রকাশমান বিদ্যুল্লেখার ন্যায় চঞ্চল ও জীবের আয়ু অগ্নিসুতপ্ত লৌহখণ্ডোপরি নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণিক। ॥২০॥

সর্পমুখস্থিত ভেক যেমন মশকাদি ভোজনের জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে, সেইপ্রকার কালরূপ-সর্প-গ্রসিত জীবগণও অনিত্য ভোগের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ॥২১॥

ইহা বড়ই আশ্চর্য যে মনুষ্য, শরীরের ভোগের জন্য দিবানিশি নানাপ্রকার কষ্টজনক কার্য করিয়া থাকে। যদি তাহারা ইহা বুঝিত যে—শরীর আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা হইলে কোন পুরুষই ভোগের জন্য ব্যস্ত হইত না। ॥২২॥

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু আদি সহ সংযোগ জলচ্ছত্রস্থলে একত্রিত জীবগণের ন্যায় অথবা নদীপ্রবাহে প্রবহমান ও দৈববশাৎ একত্রীভূত কাষ্ঠখণ্ড-সকলের ন্যায় চঞ্চল। ॥২৩॥

ইহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে যে লক্ষ্মী ছায়ার ন্যায় চঞ্চল, যৌবন জলতরঙ্গবৎ অনিত্য, স্ত্রী সুখস্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা এবং মনুষ্যগণের পরমায়ু অতিশয় অল্প। তথাপি প্রাণিগণের এই সকল ভোগের উপর কত অভিমান! ॥২৪॥

এই সংসার সর্বদা রোগাদিসঙ্কুল, স্বপ্ন ও গন্ধর্বনগরের তুল্য মিথ্যা ; মুর্খ ব্যক্তিগণই সত্য মনে করিয়া ইহার অনুসরণ করিয়া থাকে। ॥২৫॥

সূর্যের উদয় এবং অস্ত দ্বারা আয়ু ক্ষীণ হইতেছে, নিত্য বহুপ্রাণীর বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াও জীবগণের কিছুতেই চৈতন্য হয় না। নিত্য একই প্রকার দিন ও রাত্রি হইতেছে, কিন্তু মূঢ়মতি পুরুষ ভোগের পশ্চাৎ নিরন্তর ধাবিত হইতেছে, কালের গতিকে লক্ষ্য করিতেছে না। ॥২৬-২৭॥

মৃত্তিকা নির্মিত অপক্ক ঘটস্থ জলের ন্যায় আয়ু প্রতিক্ষণ ক্ষীণ হইতেছে। রোগসমূহ শত্রুর ন্যায় শরীরকে সন্তপ্ত করিতেছে। বৃদ্ধাবস্থা ব্যাঘ্রীর ন্যায় তর্জন করতঃ সম্মুখে স্থিত, উহার সহিত মৃত্যুও অন্ত্যসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু দেহে অহং বুদ্ধি করতঃ জীব এই ক্রিমি, বিষ্ঠা ও ভস্মরূপ শরীরকেই 'আমি লোক-প্রসিদ্ধ রাজা' এইরূপ মনে করিয়া থাকে। ॥২৮-৩০॥

হে লক্ষ্মণ! তুমি ইহা বিচার করিয়া বল, যে আশ্রয় অর্থাৎ শরীর দ্বারা তুমি সংসারকে দগ্ধ করিতে চাহিতেছ সেই ত্বক, অস্থি, মাংস, বিষ্ঠা, মূত্র, রেতঃ ও রুধিরাদি নির্মিত এই বিকারী ও পরিণামী দেহ কি প্রকারে আপন হইতে পারে? হে ভাই! দেহাভিমানী পুরুষেরই সর্ব প্রকার দোষ হইয়া থাকে। ॥৩১-৩২॥

'আমি দেহ' এইরূপ বুদ্ধির নামই অবিদ্যা। 'আমি দেহ নহি, আমি চেতন আত্মা' এইরূপ বুদ্ধিকে বিদ্যা বলে। ॥৩৩॥

অবিদ্যা জন্ম-মরণ রূপ সংসারের কারণ এবং বিদ্যা উহা নিবৃত্তি করিয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষুগণের সর্বদা বিদ্যালাভের জন্যই প্রযত্ন করা কর্তব্য। হে শত্রুদমন! এই সাধনপথে বিঘ্ন সম্পাদনকারী কাম-ক্রোধাদিই প্রবল শত্রু। ॥৩৪॥

ইহাদের মধ্যেও মোক্ষমার্গের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে একমাত্র ক্রোধই পর্যাপ্ত, কারণ ক্রোধের আবেশ হইলে পুরুষ পিতামাতা, সুহৃদ এবং বন্ধুগণকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ॥৩৫॥

ক্রোধই মনের সর্ব সন্তাপের মূল এবং ক্রোধই সংসার বন্ধনকারী ও ধর্মনাশক। এইজন্য তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ক্রোধ মহাশত্রু, তৃষ্ণা বৈতরণী নদী, সন্তোষ নন্দনবন, এবং শান্তিই কামধেনু। ॥৩৬-৩৭॥

এই জন্য তুমি শান্তি ধারণ কর, ইহাতে তোমার উপর ক্রোধরূপী শত্রুর কোন প্রভাব হইবে না। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি আদি হইতে পৃথক, শুদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ, অবিকারী এবং নিরাকার। যতদিন পর্যন্ত মনুষ্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ আদি হইতে আত্মার ভিন্নত্ব অবগত না হয়, ততদিন পর্যন্ত সে মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া সংসার-দুঃখ সমূহ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে। অতএব তুমি সর্বদা আপন হৃদয়ে আত্মা, 'দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক', ইহা অনুভব কর। বাহ্য জাগতিক ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অনুবর্তন কর। এবং সুখ বা দুঃখ প্রারব্ধ বশে যাহা হউক না কেন, তাহা ভোগ করতঃ কোন খেদ অর্থাৎ শোক বা দুঃখ প্রাপ্ত হইও না। ॥৩৮-৪১॥

হে রঘুকুলোদ্ভব লক্ষ্মণ! বাহিরে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রকট হইলেও প্রারব্ধবশে উপস্থিত সেই কার্য করিয়াও তুমি তাহাতে লিপ্ত হইবে না এবং তদ্দ্বারা তোমার কোন বন্ধন হইবে না। ॥৪২॥

অন্তরে রাগ-দ্বেষ রাহিত্য ও শুদ্ধ-স্বভাবত্ব বশতঃ তুমি কোন কর্মে লিপ্ত হইবে না। আমার কথিত এই সকল বাক্যসমূহ আপন হৃদয়ে বিচার কর। ॥৪৩॥

এইরূপ করিলে তুমি কখনও সাংসারিক জগতের দুঃখে বাধিত অর্থাৎ অভিভূত হইবে না।" (মাতা কৌশল্যার সম্মুখেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই উপদেশ প্রদান করতঃ অতঃপর মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন)—"হে মাতঃ! তুমিও আমার এই উপদেশ-বাক্যসমূহ নিত্য বিচার করিও। ॥৪৪॥

তুমি আমার পুনর্মিলনের প্রতীক্ষা করিও। তোমাকে অধিককাল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। কর্মবন্ধনে বদ্ধ জীবগণের সর্বদা একত্র বাস সম্ভব হয় না। ॥৪৫॥

নদী-প্রবাহে পতিত, বহমান নৌকাসমূহ সর্বদা একত্র অগ্রসর হয় না (মনুষ্যগণের জীবনতরীও তদ্রূপ)। হে মাতঃ! চতুর্দশ বৎসর (আমার বনবাস) একক্ষণার্ধের ন্যায় অতিবাহিত হইয়া যাইবে। তুমি এখন দুঃখ দূর করিয়া আমাকে বনগমনের অনুমতি প্রদান কর। এইরূপ করিলে অর্থাৎ তোমার আশীর্বাদে আমার বনবাস সুখপ্রদ হইবে।" ॥৪৬-৪৭॥

এই প্রকার কথনানন্তর শ্রীরামচন্দ্র দীর্ঘকাল পর্যন্ত মাতৃচরণে দণ্ডবৎ পড়িয়া রহিলেন। তদনন্তর মাতা তাহাকে উঠাইয়া আপন ক্রোড়ে বসাইলেন এবং আশীর্বাদ প্রদান করতঃ তাহার প্রশংসা করিলেন। ॥৪৮॥

মাতা বলিলেন—"হে পুত্র! তোমার গমন, উপবেশন, অথবা নিদ্রার্থে শয়ন—সর্বকালে গন্ধর্বগণ সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি সর্বদেবগণ তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন।" ॥৪৯॥

এই প্রকার বলিয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করতঃ মাতা শ্রীরামকে বিদায় দিলেন। শ্রীমান লক্ষ্মণও তখন আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"হে রাম! আমার অন্তরের যাবতীয় সংশয় তুমি দূর করিয়াছ। তোমার সেবার নিমিত্ত আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিব, আমাকে এই অনুমতি দাও। ॥৫০-৫১॥

"হে প্রভো! আমার প্রতি কৃপা কর। নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করিব।" তখন রঘুনাথ লক্ষ্মণকে বলিলেন—'আচ্ছা চল, কিন্তু আর দেরি করিও না।' ॥৫২॥

অতঃপর সীতাপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত আপন বাসভবনে গমন করিলেন। পতিদেবকে আসিতে দেখিয়া সুস্মিতভাষিণী সীতা এক সুবর্ণপাত্রে জল গ্রহণ করিয়া অতি ভক্তিসহকারে শ্রীরামচন্দ্রের চরণ প্রক্ষালন পূর্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে দেব! আপনি সেনা-সহকার বিনা কেন আসিলেন? আপনি প্রাতঃকালে কোথায় গিয়াছিলেন? আপনার শ্বেতছত্র বা কোথায়? বাদ্যসমূহের শব্দ কেন শুনিতে পাইতেছি না এবং আপনার রাজোচিত কিরীট আদি ভূষণাদিই বা কোথায়? সামন্ত রাজন্যবর্গ সহ একত্রে সাড়ম্বরে কেন আসেন নাই?" সীতা এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন— ॥৫৩-৫৬॥

"হে শুভে! পিতা আমাকে সম্পূর্ণ দণ্ডকারণ্য রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব হে ভামিনি! আমি সেই রাজ্য পালন করিবার জন্য শীঘ্রই সেখানে যাইব। ॥৫৭॥

আমি আজই বনে যাত্রা করিব। তুমি আপন শ্বশ্রূমাতার নিকট বাস করিয়া তাঁহার (মাতা কৌশল্যার) সেবা-শুশ্রূষায় সদা রত থাকিও। আমি মিথ্যাভাষণ করিতেছি না।" ॥৫৮॥

শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া ভয়ভীতান্তঃকরণে সীতা বলিলেন, "আপনার মহামনা পিতৃদেব আপনাকে বনরাজ্য কেন দিয়াছেন?"

তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"হে অনঘে (নিষ্পাপা) সীতে! মহারাজ প্রসন্নতাপূর্বক (মাতা) কৈকেয়ীকে বরদান করতঃ ভরতকে রাজ্য এবং আমাকে বনবাস প্রদান করিয়াছেন। দেবী কৈকেয়ী আমার জন্য চতুর্দশ বর্ষ বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন এবং সত্যবাদী দয়ালু মহারাজ তাহা প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ॥৬০-৬১॥

অতএব হে ভামিনি! আমি শীঘ্রই সেখানে যাইব, তুমি ইহাতে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিও না।" শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া অতি প্রীতির সহিত সীতা বলিলেন—"আমি প্রথম বনে যাত্রা করিব, তৎপর আপনি আসিবেন। হে রাঘব! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার বনগমন উচিত হইবে না"। ॥৬২-৬৩॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র অতি প্রীতির সহিত আপনার প্রিয়া প্রিয়বাদিনী সীতাকে বলিলেন—"ব্যাঘ্রাদি বহু বন্যপশুসঙ্কুল বনে তোমাকে আমি কি প্রকারে সাথে লইয়া যাইব? ॥৬৪॥

সেখানে মনুষ্যভোজী ভয়ঙ্কর রাক্ষস বাস করে এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকরাদি হিংস্র পশু চতুর্দিকে বিচরণ করে। ॥৬৫॥

হে সুমধ্যমে (সুন্দর কটিদেশ বিশিষ্টা) সীতা! সেখানে ভোজনের নিমিত্ত কটু এবং কষায় ও অম্লস্বাদযুক্ত ফলমূলাদি মাত্র পাওয়া যায়, বিবিধ পিষ্টক এবং ব্যঞ্জনাদি কোথাও কখনও পাওয়া যায় না। ॥৬৬॥

হে সুন্দরি! বিবিধ ফলও কোন কোন সময় পাওয়া যায়, সর্বদা উহা দুষ্প্রাপ্য। বনস্থলীর বিচরণ মার্গও স্থানে স্থানে ধূলি ও কণ্টকাবৃত থাকাতে দৃষ্টিগোচর হয় না। ॥৬৭॥

দণ্ডকারণ্য বহুদোষসঙ্কুল, সেইস্থানে বহু গুহা, গহ্বর এবং ঝিল্লী ও বনমক্ষিকাদি পরিপূর্ণ। শীত, বায়ু এবং গ্রীষ্মকালেও সেখানে পাদচারণ দ্বারাই গমনাগমন করিতে হয়। বনে রাক্ষসাদির ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শনে তুমি তৎকালেই প্রাণত্যাগ করিবে। ॥৬৮-৬৯॥

এইজন্য হে ভদ্রে! তুমি গৃহে অবস্থান কর। আমাকে শীঘ্রই পুনরায় দেখিতে পাইবে।" শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ বচন শুনিয়া সীতা অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন ও কিঞ্চিৎ ক্রোধ পরবশ হইয়া কম্পিত ওষ্ঠ সহকারে বলিলেন—"পতিব্রতা ধর্মপত্নী আমাকে গৃহে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কেন যাইতে চাহিতেছেন? ॥৭০-৭১॥

আপনি ধর্মজ্ঞ এবং দয়ালু হইয়াও আপনার অনন্যাভক্তা এবং দোষহীনা পত্নী আমাকে কেন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? হে রাম! বনে আপনার সমীপে স্থিত আমাকে কে অবজ্ঞা বা অপমানিত করিতে সমর্থ হইবে? ॥৭২॥

ফলমূলাদি যাহা কিছু আপনার ভুক্তাবশেষ থাকিবে, তাহাই আমার নিকট অমৃততুল্য এবং তদ্দ্বারাই আমি সন্তুষ্ট থাকিয়া সানন্দে কালাতিপাত করিব। ॥৭৩॥

আপনার সহিত বন-বিচরণ কালে কুশ-কাশ এবং কণ্টকাদি আমার নিকট পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যার ন্যায় প্রতীত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৭৪॥

আমি আপনাকে কোনপ্রকার ক্লেশ প্রদান করিব না। বরং আপনার কার্যের সহায়িকা হইব। এক জ্যোতিষ-শাস্ত্র-বিশারদ আমাকে বাল্যাবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'তুমি পতিসহ বনে বাস করিবে।' সেই ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎ বাক্য সত্য হউক, আমি অবশ্যই আপনার সহিত বনে গমন করিব। ॥৭৫-৭৬॥

আর একটি কথা আমি বলিতেছি, তাহা শুনিয়া আপনি আমাকে বনে লইয়া চলুন। আপনি অবশ্যই ব্রাহ্মণগণের মুখে বহু রামায়ণের কথা শুনিয়া থাকিবেন। ॥৭৭॥

বলুন, কোন কথাতেই কি আপনি শুনিয়াছেন যে সীতা বিনা রাম বনগমন করিয়াছেন? অতএব আমি পূর্ণরূপে আপনার সহকারিণী হইয়া আপনার সঙ্গে বনগমন করিব। ॥৭৮॥

যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করেন তবে আপনার সম্মুখেই আমি প্রাণ ত্যাগ করিব।" সীতার এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"দেবি! তুমি শীঘ্রই আমার সঙ্গে বনে যাত্রা কর এবং তোমার কণ্ঠহার ও আভরণ সমূহ কুলগুরু বশিষ্ঠজীর পত্নী অরুন্ধতীকে প্রদান কর। ॥৭৯-৮০॥

আমিও আমার ধনরত্নাদি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া বন যাত্রা করিব।" অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের দ্বারা ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করাইলেন। ॥৮১॥

অতঃপর রঘুকুলকেতু শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে শত শত গাভী, প্রচুর ধন রত্ন, দিব্যবস্ত্র এবং আভূষণ বিদ্বান, উত্তম চরিত্রবান পোষ্যবর্গ সমন্বিত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের প্রদান করিলেন। ॥৮২॥

সীতাও আপন মুখ্য মুখ্য আভূষণ সমূহ অরুন্ধতীকে প্রদান করিলেন, এবং শ্রীরামচন্দ্রও মাতা কৌশল্যার সেবকগণকে বহু ধন বিতরণ করিলেন, এই প্রকার আপন অন্তঃপুরবাসী সেবকগণকে, পুরবাসী, দেশবাসী এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুতর ধন প্রদান করিলেন। ॥৮৩-৮৪॥

শ্রীলক্ষ্মণও স্বীয় মাতা সুমিত্রাকে মাতা কৌশল্যার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং ধনুর্বাণ হস্তে ধারণ করতঃ শ্রীরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা একত্রে মহারাজ দশরথের নিকট গমন করিলেন। ॥৮৫-৮৬॥

সহস্র কামদেবের ন্যায় সুন্দর শ্যামবর্ণ শরীরধারী শ্রীরামচন্দ্র আপন দেহকান্তি দ্বারা দিক্‌সমূহ প্রকাশিত করিতে করিতে সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ ধীরে ধীরে রাজমার্গে চলিলেন। ঐ সময় পুরবাসী ও জনপদবাসী যাহারা কুতূহলবশে তাঁহাদের দর্শন করিতেছিল শ্রীরাম উহাদের প্রতি শনৈঃ শনৈঃ আনন্দের সহিত দৃষ্টিপাত করতঃ এবং আপন চরণ স্পর্শে সম্পূর্ণ সংসার পবিত্র করিতে করিতে পিতা মহারাজ দশরথের ভবনে পৌঁছিলেন। ॥৮৭॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অযোধ্যা কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন

শ্রী মহাদেব বলিলেন-হে পার্বতি!

জানকী ও লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে রাজমার্গে আসিতে দেখিয়া এবং কৈকেয়ীকে মহারাজের বর-প্রদানাদি সমাচার শুনিয়া সমস্ত নগরবাসী দুঃখ-ব্যাকুল-চিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিল—"হায়! কামপরবশ রাজা দশরথ স্বীয় সত্যপরায়ণ প্রিয় পুত্রকে স্ত্রীর স্বার্থে (স্ত্রী পরিতোষের জন্য) পরিত্যাগ করিলেন! মহারাজের সত্যপরায়ণতা কোথায় রহিল? দুষ্টা কৈকেয়ীই বা সত্যবাদী ও প্রিয়কারী রামকে কেন বনবাস দিলেন? কৈকেয়ী এইরূপ নিষ্ঠুরা এবং বিকৃত-বুদ্ধি-সম্পন্না কেন হইলেন? হে জনগণ (ভাইগণ), আমাদেরও এই নগরে বাস করা উচিত নহে। স্ত্রী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহিত শ্রীরামচন্দ্র যেখানে যাইতে ইচ্ছুক আমরাও আজই সেই বনে গমন করিব। অহো! সকলে দেখ শ্রীজানকীও পদব্রজে গমন করিতেছেন। ॥১-৫॥

হায়! ত্রিলোক-সুন্দরী জানকীকে পূর্বে কোন পুরুষ এরূপ দর্শন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ! তিনি কিনা আজ আব্রুবিহীন জনসমূহের সম্মুখে পদব্রজে গমন করিতেছেন! ॥৬॥

দেখ, সর্বলোক-সুন্দর ভগবান রামচন্দ্রও আজ হস্তি অশ্বাদি আরূঢ় না হইয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন। ॥৭॥

কৈকেয়ী নাম্নী রাক্ষসী সকলকে নাশ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সীতাকে পদব্রজে যাইতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মনেও অতিশয় দুঃখ অবশ্যই হইতেছে। ॥৮॥

কিন্তু কি করা যাইবে? সর্বত্র দৈবই প্রবল। কোন পুরুষপ্রযত্ন সর্বথা দুর্বল।" এই প্রকারে সর্ব সজ্জনমণ্ডলীকে দুঃখার্ত দেখিয়া মণ্ডলীমধ্যস্থ মুনিশ্রেষ্ঠ বামদেব তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—"আমি আপনাদিগকে যথার্থ বার্তা বলিতেছি, আপনারা শ্রীরাম ও সীতার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। ॥৯-১০॥

এই রাম আদি নারায়ণ ভগবান বিষ্ণু এবং এই জানকী যোগমায়া নামে প্রসিদ্ধা শ্রীলক্ষ্মী। ॥১১॥

এই সময় লক্ষ্মণ নাম ধারণ করিয়া যিনি ইহাদের অনুগমন করিতেছেন তিনি স্বয়ং 'শেষাবতার' (শেষনাগের অবতার)। এই ভগবান পুরুষোত্তমই মায়াগুণ যুক্ত হইয়া বিভিন্ন আকারে প্রতীত হইতেছেন। ॥১২॥

রজোগুণ যুক্ত হইয়া তিনিই বিশ্বরচয়িতা ব্রহ্মারূপ ধারণ করেন এবং সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট হইয়া তিনি ত্রিলোক পালক বিষ্ণুরূপে প্রসিদ্ধ। ॥১৩॥

কল্পান্তঃকালে তমোগুণ আশ্রয় করতঃ তিনি জগতের প্রলয়ের কারণ রুদ্ররূপ হইয়া থাকেন। পূর্বে এই শ্রীরামচন্দ্র মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া স্বীয় ভক্ত বৈবস্বত মনুকে নৌকাতে আরোহণ করাইয়া প্রলয় কালে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থনের সময় মন্দরাচল পাতাললোকে গমনোন্মুখ হইলে— ॥১৪-১৫॥

তখন এই রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রই কূর্মরূপে সেই মন্দরাচলকে আপন পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে পৃথিবী রসাতলে গমন করিলে এই রঘুনাথ শূকররূপ হইয়াছিলেন। ॥১৬॥

তখন তিনি পৃথিবীকে দংষ্ট্রাগ্রে উত্তোলন করিয়াছিলেন। পুনঃ পূর্বকালে ভক্ত প্রহ্লাদকে বরদানার্থ তিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া— ॥১৭॥

ত্রিলোক-কণ্টক-সদৃশ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে আপন নখ-সহায়ে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। এক সময়ে পুত্র ইন্দ্রকে হৃতরাজ্য দর্শন করিয়া দুঃখিতা মাতা অদিতির প্রার্থনা বশে— ॥১৮॥

বামনরূপ ধারণ করিয়া মহারাজ বলির নিকট যাচনাসহায়ে সেই হৃতরাজ্য উদ্ধার করতঃ তাহা ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর ভারস্বরূপ দুষ্ট ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিবার জন্য ভৃগুপুত্র পরশুরামরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ॥১৯॥

সেই প্রভু জগন্নাথ এই সময়ে রামরূপে প্রকট হইয়াছেন এবং তিনি রাবণাদি কোটি কোটি রাক্ষসগণকে নিধন করিবেন। ॥২০॥

এই দুরাত্মা রাক্ষসের, মনুষ্য হস্তেই নিধন হইবে, ইহা বিধি নির্দিষ্ট আছে। (পূর্ব জন্মে) মহারাজ দশরথ ভগবান বিষ্ণুকেই পুত্ররূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যার দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই ভগবান রাজা দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই ভগবান বিষ্ণুই শ্রীরামচন্দ্র। আজই তিনি রাবণবধের নিমিত্ত লক্ষ্মণ সহিত বনযাত্রা করিবেন। এই সীতা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী, ভগবানের সাক্ষাৎ মায়াশক্তি। ॥২১-২৩॥

রাজা দশরথ বা কৈকেয়ী ইহাদের বনগমনের কিঞ্চিৎমাত্রও কারণ নহেন। গতকল্যই দেবর্ষি নারদ পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ॥২৪॥

তখন রাম স্বয়ং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে 'আগামীকল্যই আমি বনে গমন করিব।' অতএব হে শিশুতুল্য সরল ভ্রাতৃগণ, তোমরা রামের জন্য কোন চিন্তা করিও না। ॥২৫॥

সংসারে যাহারা নিত্য 'রাম' 'রাম' এইরূপ জপ করেন তাহাদের কখনও মৃত্যুভয় হয় না। ॥২৬॥

পুনঃ সেই মহাত্মা রামচন্দ্রের দুঃখ শঙ্কা কি প্রকারে হইতে পারে? কলিযুগে একমাত্র রামনাম দ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে নহে। ॥২৭॥

ভক্তগণকে আপন গুণ কীর্তনের সুযোগ দিবার জন্য এবং রাবণকে বধ করিবার জন্যই জগৎকর্তা রঘুনাথ মায়া মানুষরূপে সংসারে লীলা করিতেছেন। ॥২৮॥

পুনঃ রাজা দশরথের মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্তও তিনি এই মায়া মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়াছেন।" সর্বজন সমক্ষে এইরূপে রামতত্ত্ব ব্যাখ্যান করিয়া মহামুনি বামদেব মৌনাবলম্বন করিলেন। ॥২৯॥

ইহা শ্রবণ করিয়া তথায় একত্রিত সর্বদ্বিজগণ এই রামচন্দ্রকে সর্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণু-ভগবানরূপে জানিলেন এবং হৃদ্‌গত সর্ব সংশয় পরিত্যাগ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। ॥৩০॥

"যে ব্যক্তি নিত্য শ্রীরাম ও সীতার এই স্বরূপ-রহস্য চিন্তা করিবে তাহার ভগবান রামের প্রতি বিজ্ঞান সহিত বিশুদ্ধা ভক্তি লাভ হইবে। ॥৩১॥

আপনারা সকলে শ্রীরামচন্দ্রের পরমপ্রিয়, সুতরাং রাম বিষয়ক এই রহস্য আপনারা গুপ্ত রাখিবেন।" এইরূপ বলিয়া বিপ্রবর বামদেব সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পুরবাসীরাও জানিলেন শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ পরমাত্মা। ॥৩২॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র বিনা বাধায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সেখানে পৌঁছিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন— ॥৩৩॥

"হে মাতঃ! আপনার কথানুসারে আমরা তিনজন বনগমনের নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়া এবং সেজন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। এখন শীঘ্রই পিতা আমাদের বনযাত্রার আদেশ করুন।" ॥৩৪॥

রাম এইরূপ বলিবার পর কৈকেয়ী সহসা উঠিয়া নিজেই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে পৃথক পৃথক বল্কল বস্ত্র (চীর) প্রদান করিলেন। ॥৩৫॥

তখন রামচন্দ্র স্বীয় পরিহিত রাজোচিত বস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ চীর (বনবাসিগণের বল্কল বস্ত্র) ধারণ করিলেন, লক্ষ্মণও তদনুরূপ করিলেন। কিন্তু সীতা বল্কল বস্ত্র কি প্রকারে পরিধান করিতে হয় তাহা জানিতেন না। ॥৩৬॥

অতএব তিনি সেই বস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া সলজ্জভাবে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র সেই চীরবস্ত্র সীতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া তাহার পরিহিত রাজকুল বধূচিত বস্ত্রের উপর বেষ্টন করিয়া দিলেন। ॥৩৭॥

ইহা দর্শন করিয়া রানী-মহলের সকল রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া বশিষ্ঠজী তথায় আগমন করতঃ সক্রোধে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—"অয়ি দুঃশীলে (দুর্বৃত্তা)! তুমি কেবল রামের বনগমনই প্রার্থনা করিয়াছিলে, বনবাসের উপযোগী চীরবস্ত্র সীতাকে কেন প্রদান করিতেছ? ॥৩৮-৩৯॥

যদি পতিব্রতা সীতা ভক্তিপরবশ হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সর্ব আভূষণ ভূষিতা হইয়া দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়াই যাইবেন। ॥৪০॥

এবং সেখানে প্রতিদিন শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস দুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট হইয়া তাঁহার আনন্দ বিধান করিবেন।" তখন মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন—"হে সুমন্ত্র! তুমি রথ আনয়ন কর। ॥৪১॥

বনবাসিগণের প্রিয় ইহারা রথারোহণ করিয়াই বনে যাইবে।" এইরূপ বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবামাত্রই মহারাজ দশরথ অতি দুঃখে ভূপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরামের দৃষ্টির সম্মুখেই সীতা অতি শীঘ্র রথে আরূঢ়া হইলেন। ॥৪২-৪৩॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ দুইটি খড়্গ, দুইটি ধনুক ও দুইটি তূণীরসহ লক্ষ্মণ রথারূঢ় হইয়া সারথিকে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন। তখন রাজা দশরথ (বিরহ-ব্যাকুল-চিত্তে) বলিয়া উঠিলেন—"হে সুমন্ত্র! দাঁড়াও! দাঁড়াও! ॥৪৪-৪৫॥

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র "রথ চালাও চালাও" এইরূপে শীঘ্র গমনের জন্য আদেশ দিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে সুমন্ত্র রথ চালাইয়া দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র দূরে গমন করিলে মহারাজ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। ॥৪৬॥

তদনন্তর সমস্ত পুরবাসী, বালক, বৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ মুনিগণ "হে রাম! দাঁড়াও, যেও না" এই প্রকার চিৎকার করিতে করিতে সকলে রথের পিছনে পিছনে চলিলেন। ॥৪৭॥

রাজা দশরথ সুদীর্ঘকাল রোদন করিতে লাগিলেন ও অনন্তর আপন সেবকগণকে বলিলেন—"আমাকে রামের মাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল। ॥৪৮॥

সেখানে আমার এই দুঃখভারাক্রান্ত জীবন কিছুকাল বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু রামের বিরহে আমি অধিককাল জীবিত থাকিতে পারিব না।" ॥৪৯॥

অতঃপর কৌশল্যার ভবনে পৌঁছিয়াই সংজ্ঞাহীন হইয়া মহারাজ ভূপতিত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে তিনি বাহ্যচৈতন্য লাভ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। ॥৫০॥

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র তমসা নদী তীরে পৌঁছিয়া সেখানে পরম সুখে বিশ্রাম করিলেন এবং রাত্রিকালে নিরাহারে থাকিয়া কেবল জলপান করতঃ সীতাসহ বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইলেন। সুমন্ত্রসহ ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ ধনুক ধারণ করিয়া তাঁহাদের রক্ষা করিতে লাগিলেন। ॥৫১-৫২॥

পুরবাসীগণও সকলে সেথায় আসিয়া অদূরে অবস্থান করিল। তাহারা নিশ্চয় করিল যে আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইব, নতুবা আমরাও শ্রীরামসহ বন গমন করিব। ॥৫৩॥

পুরবাসীগণের এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতি বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন যে আমি তো অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাবর্তন করিব না, কিন্তু এই জনগণ বৃথাই ক্লেশভাগী হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন—"হে সুমন্ত্র! তুমি এখনই রথ লইয়া আইস, আমি এখন যাত্রা করিব।" ॥৫৪-৫৫॥

শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ আদেশ পাইয়া সুমন্ত্র রথে অশ্বযোজন করিলেন। তখন শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ রথে আরোহণ করিয়া শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। ॥৫৬॥

তিনি অযোধ্যাভিমুখে কিছুদূর পর্যন্ত গমন করিয়া পুনঃ বনাভিমুখে রথ চালাইলেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া পুরবাসিগণ সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ॥৫৭॥

রথচক্রচিহ্ন-নির্দিষ্ট মার্গ দর্শন করতঃ তাঁহারা সকলে অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করতঃ হৃদয়ে প্রতিদিন শ্রীরাম ও সীতার ধ্যান সহকারে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ॥৫৮॥

এদিকে সুমন্ত্রও সযত্নে রথ শীঘ্র বনাভিমুখে চালাইলেন। এইরূপে সীতাসহিত শ্রীরামচন্দ্র সমৃদ্ধ দেশসমূহ দর্শন করিতে করিতে শৃঙ্গবের পুরের নিকট গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাদর্শন করিয়া প্রণামানন্তর তাঁহারা অতি আনন্দে স্নান করিলেন। ॥৫৯-৬০॥

অতঃপর রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র শিংশপা (শিশু বা শিশম্) বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিলেন। ঐ সময় নিষাদরাজ গুহক লোকমুখে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনরূপ মঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিবামাত্রই অতি শীঘ্র সহর্ষে তাহার পরমসখা ও স্বামী শ্রীরঘুনাথকে দর্শন করিবার জন্য অতি ভক্তির সহিত ফল, মধু এবং পুষ্পাদি হস্তে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ॥৬১-৬২॥

সংগৃহীত উপহার সামগ্রী শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া নিষাদরাজ গুহক ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন শ্রীরঘুনাথও শীঘ্রই তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। ॥৬৩॥

কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার অনন্তর গুহক করজোড়ে বলিলেন—"হে লোকপাবন! আমি ধন্য! নিষাদকুলে আমার জন্মগ্রহণ আজ সফল হইয়াছে। ॥৬৪॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনার অঙ্গ স্পর্শে আজ আমার পরমানন্দ লাভ হইয়াছে। হে রঘুবর! দাসের এই নৈষাদরাজ্য আপনারই। অতএব হে রঘুনাথ! ইহা আপনার অধীনে গ্রহণ এবং আপনি এখানে নিবাস করতঃ আমাদিগকে পালন করুন এবং নগরে পদার্পণ করতঃ আমার গৃহ পবিত্র করুন। ॥৬৫-৬৬॥

আপনার নিমিত্ত যাহা কিছু ফলমূলাদি আমি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা স্বীকার করতঃ হে ভগবন্! আমার প্রতি কৃপা করুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার দাস।" ॥৬৭॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র অতি প্রসন্নচিত্তে তাহাকে বলিলেন—"হে সখা! শোন, আমি চতুর্দশ বৎসর পর্যন্ত কোন গ্রামে বা গৃহে প্রবেশ করিব না। ॥৬৮॥

অপর কাহারও প্রদত্ত ফলমূলাদিও ভোজন করিব না। হে মিত্র! তোমার এই সম্পূর্ণ রাজ্য আমারই এবং তুমিও আমার অত্যন্ত প্রিয়সখা।" ॥৬৯॥

তদনন্তর নিষাদরাজ কর্তৃক বটদুগ্ধ আনয়ন করাইয়া লক্ষ্মণ সহ শ্রীরঘুনাথ তদ্দারা অতি প্রেমের সহিত শিরে জটা মুকুট বন্ধন করিলেন। ॥৭০॥

লক্ষ্মণ কুশ পত্রাদিসহ শয্যা রচনা করিলে, সীতাসহ শ্রীরঘুনাথ কেবল জলপান করতঃ তাহাতে শয়ন করিলেন এবং পূর্বে যেমন অযোধ্যাপুরীতে দিব্যমহলাভ্যন্তরে জনকনন্দিনী সহ সুসজ্জিত পালঙ্কোপরি নিদ্রা যাইতেন, সেইরূপ আজ কুশ শয্যোপরি সুখে নিদ্রিত হইলেন। ॥৭১-৭২॥

অদূরে শ্রীলক্ষ্মণ ধনুকবাণ ও তূণীর সহ ধনুকে জ্যারোপণ করতঃ ধনুর্ধারী গুহককে লইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রকে রক্ষার্থ ব্রতী হইলেন। ॥৭৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে অযোধ্যা কাণ্ডে পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ

গঙ্গোত্তরণ এবং ভরদ্বাজ ও বাল্মীকির সহিত মিলন

শ্রী মহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

ঐ সময় নিদ্রিত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিষাদরাজ গুহক নম্রতার সহিত লক্ষ্মণকে বলিলেন—"ভাই! দেখ, যে রঘুনাথ আপন দিব্যভবনে সুবর্ণনির্মিত পালঙ্কে দিব্যশয্যায় শয়ন করিতেন, তিনি আজ সীতাসহ কুশ ও পত্র নির্মিত শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। ॥১-২॥

শ্রীরামচন্দ্রের ঈদৃশ দুঃখের কারণ বিধাতা কৈকেয়ীকেই করিয়াছেন। মন্থরার কুমন্ত্রণাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কৈকেয়ী মহাপাপ করিয়াছেন।" ॥৩॥

গুহক-বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন—'ভাই! আমার কথা শোন। এই সংসারে কে কার দুঃখের হেতু এবং কে কাহার সুখের হেতু (অর্থাৎ কেহ নহে)! মনুষ্যের নিজের পূর্বকৃত কর্মই তাহার সুখ বা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ॥৪-৫॥

জীবের সুখ বা দুঃখদাতা অন্য কেহ নাই—অন্য কেহ সুখ বা দুঃখ প্রদান করিতেছে—এইরূপ মনে করাই দুর্বুদ্ধি। 'আমি কিছু করিতেছি' এইরূপ অভিমান বৃথা, কারণ সর্বলোক আপন আপন কর্মসূত্রে বদ্ধ। ॥৬॥

মনুষ্য স্বয়ং বিভিন্ন আচরণ করতঃ তদনুসারে সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, দ্বেষ্য, মধ্যস্থ এবং বন্ধু ইত্যাদি নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া থাকে। ॥৭॥

অতএব মনুষ্যগণের ইহাই কর্তব্য যে প্রারব্ধ অনুসারে সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু এবং যে প্রকারেই আসুক না কেন তাহা ভোগ করিয়া সদা প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করিবে। ॥৮॥

(এবং সর্বদা ভাবিবে যে) আমার ভোগ প্রাপ্তি বা ভোগ ত্যাগ কোন কিছুর ইচ্ছা নাই। ভোগ আসুক বা যাউক আমি ভোগের অধীন নহি। ॥৯॥

যে দেশে বা যে কালে, যাহার দ্বারা, যে কোন প্রকারে, শুভ বা অশুভ কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা ঐ প্রকারেই ভোগ করিতে হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥১০॥

সুতরাং শুভ বা অশুভ কর্ম ফলোদয়ে হর্ষ বা বিষাদ ব্যর্থ, কারণ বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট বিধান দেবতা বা দৈত্য কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। ॥১১॥

মনুষ্য সর্বদাই সুখ বা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে কারণ মনুষ্য শরীর পুণ্য ও পাপের মিলনে উৎপন্ন বলিয়া সুখ-দুঃখময় হইয়া থাকে। ॥১২॥

জীবনে সুখের অনন্তর দুঃখ ও দুঃখের অনন্তর সুখ আসিয়া থাকে। এই উভয়ই দিন ও রাত্রির সমান জীবের অনুল্লঙ্ঘনীয়। জল ও কর্দমের ন্যায় সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে, এইরূপ কথিত হয়। ॥১৩-১৪॥

এইজন্য বিদ্বানগণ সবকিছুই মায়াময় এইরূপ ভাবিয়া ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে ধৈর্য ধারণ করতঃ হর্ষ বা শোক প্রাপ্ত হন না।" ॥১৫॥

গুহক ও লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন কালে পূর্বাকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে অর্থাৎ অরুণোদয় হইলে শ্রীরামচন্দ্র প্রাতে সাবধানতার সহিত আচমন ও সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপন পূর্বক স্বস্থচিত্ত হইলেন। ॥১৬॥

এবং গুহককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে সখে! আমাদের জন্য শীঘ্রই একটি সুদৃঢ় নৌকা আনয়ন কর।" রামের বচন শুনিয়া নিষাদরাজ গুহক স্বয়ং একটি সুন্দর সুলক্ষণ-সম্পন্ন নৌকা আনয়ন করতঃ বলিলেন—"হে প্রভো! সীতা ও লক্ষ্মণ সহ নৌকাতে আরোহণ করুন। ॥১৭-১৮॥

আপন জ্ঞাতিগণ সহ আমি স্বয়ং নৌকা পরিচালনা করিব।" এই প্রস্তাবে স্বীকৃতি প্রদান পূর্বক শ্রীরঘুনাথ সর্বাগ্রে শুভলক্ষণা সীতাকে নৌকায় আরোহণ করাইলেন। ॥১৯॥

তদনন্তর গুহকের হস্তধারণ করতঃ অচ্যুত শ্রীভগবান রঘুনাথ স্বয়ং নৌকায় আরোহণ করিলেন। তৎপশ্চাৎ আপন অস্ত্রশস্ত্রাদি নৌকায় রাখিয়া লক্ষ্মণও তাহাতে আরূঢ় হইলেন। ॥২০॥

তখন গুহক জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণসহ স্বয়ং নৌকা পরিচালনা করিলেন। নৌকা গঙ্গার মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে জানকী গঙ্গামাতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন— ॥২১॥

"হে দেবি গঙ্গে! তোমাকে প্রণাম করিতেছি। বনবাস হইতে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণসহ প্রত্যাবর্তন কালে তোমার বিশেষ পূজা দিব।" ॥২২॥

এই প্রকার প্রার্থনার অনন্তর অপর তীরে উপনীত হইয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ॥২৩॥*

তখন গুহক শ্রীরঘুনাথকে বলিলেন—"হে রাজেন্দ্র! আমিও আপনার সহিত বনে গমন করিব, আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করিব।" ॥২৪॥

নিষাদপুত্রের এই বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন—"চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে নিবাস করতঃ আমি এই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিব। আমি যাহা কিছু বলি তাহা সত্য। রাম কখনও

---

*এই ২৩নং শ্লোকটি বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ দৃষ্ট হয়। গোরখপুর গীতা প্রেস হইতে মুদ্রিত পুস্তক এবং বারাণসেয় সংস্কৃত সংস্থান হইতে মুদ্রিত পুস্তকে বর্তমান শ্লোকের কেবল উত্তরার্ধ অংশটুকুই গ্রহণ করা হইয়াছে। পূবার্ধ অংশ গৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ আমরা অবগত নহি। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস মুদ্রিত পুস্তকে পূর্বার্ধসহ সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই ঃ—

"সুরা মাংসোপহারৈশ্চ নানাবলিভিরাদৃতা।

ইত্যুক্তা পরকূলং তৌ শনৈরুত্তীর্য্য জগ্মতুঃ।" ॥২৩॥

অর্থাৎ সীতার প্রার্থনা এই (হে গঙ্গে! তোমাকে প্রণাম। বনবাস হইতে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহিত প্রত্যাবর্তন কালে) 'মদিরা মাংস ফল পুষ্প ও বহুপ্রকার উপচারসহ সাদরে তোমাকে পূজা করিব।' এই প্রকার প্রার্থনার অনন্তর অপর তীরে......

মিথ্যাভাষণ করে না।" এইরূপ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র গুহককে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন ও আশ্বাস প্রদান করিলেন। তখন নিষাদরাজ গুহক অতি দুঃখিতান্তঃকরণে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ॥২৫-২৭॥*

তদনন্তর জানকী, লক্ষ্মণ ও শ্রীরামচন্দ্র ভরদ্বাজ আশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় একটি ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন—"হে ব্রহ্মচারি! মুনিবরকে যাইয়া বল—দশরথ-পুত্র রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত আপনার দর্শনপ্রার্থী হইয়া আশ্রমের বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছেন।' ॥২৮-৩০॥

শ্রীরামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী অতি সত্বর মুনিবরের নিকট গমন করতঃ তাঁহার চরণে প্রণতি পূর্বক নিবেদন করিল—"ভগবন্! পত্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ শ্রীরামচন্দ্র বনের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। দেবতুল্য শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন—'মুনিবর ভরদ্বাজকে এই বিষয়ে যথাশীঘ্র সূচনা প্রদান কর।' ॥৩১-৩২॥

এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র মুনীশ্বর ভরদ্বাজ সহসা উত্থান করতঃ অর্ঘ্য পাদ্যাদি সহ শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে আগমন করিলেন। এবং শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া ও লক্ষ্মণ সহিত তাঁহার পূজা করতঃ বলিলেন—"হে রাম! হে কমলনয়ন রঘুনন্দন! আসুন, আপন পদরজ দ্বারা আমার পর্ণশালা পবিত্র করুন।" এইরূপ অভ্যর্থনা করিয়া তিনি সীতাসহিত উভয় রঘুকুমারকে আপন কুটিরে আনয়ন করিলেন। ॥৩৩-৩৫॥

পুনরায় সেখানে ভক্তিপূর্বক তাঁহাদের পূজন করতঃ উত্তমরূপে আতিথ্য সৎকার করিলেন। তদনন্তর মুনিবর বলিলেন—"হে রাম! আজ আপনার আগমনে আমার তপস্যা পূর্ণ হইল। ॥৩৬॥

হে রঘুনন্দন! আমি আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ সর্ববৃত্তান্ত অবগত আছি। আমি ইহাও জানি যে আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা, বিশেষ কার্য সিদ্ধির জন্যই মায়া-মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। ॥৩৭॥

পূর্বকালে ব্রহ্মার প্রার্থনাবশে আপনি যে জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে জন্য আপনার বনবাস হইয়াছে এবং আপনি অতঃপর যাহাকিছু করিবেন, —আপনার উপাসনার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানদৃষ্টিবলে সে সবই আমি অবগত আছি। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! অতঃপর আপনাকে আমি আর অধিক কি বলিব? আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আজ প্রকৃতির পারে অবস্থিত সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম কাকুৎস্থ (সূর্যবংশীয় রাজনন্দন) কে দর্শন করিতেছি, ইহাতে আমি কৃতার্থ।" তখন সীতা ও লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন— ॥৩৮-৪০॥

---

*অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র একটি পবিত্র মৃগ বধ ও তাহা অগ্নিপক্ক করিয়া তদ্দ্বারা হবন করিলেন এবং হুতাবশেষ ভোজন করতঃ বৃক্ষতলে তাঁহারা তিনজনে সুখে রাত্রি যাপন করিলেন। (এই শ্লোকটি বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় কিন্তু গীতা প্রেস ও বারাণসেয় সংস্কৃত সংস্থান পুস্তকে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মূল শ্লোকটি এই ঃ—

'তত্র মেধ্যং মৃগং হত্বা পক্ত্বা হুত্বা চ তে ত্রয়ঃ।
ভুক্ত্বা বৃক্ষতলে সুপ্তা সুখমাসত তাং নিশাম্।।"

"হে ব্রহ্মণ্! আমরা ক্ষত্রিয়-কুলোৎপন্ন, অতএব আপনার কৃপার পাত্র।" এইপ্রকার পরস্পর বাক্যালাপের পর তাঁহারা মুনির আশ্রমে সে রাত্রি অবস্থান করিলেন। ॥৪১॥

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহারা মুনিকুমারগণ কর্তৃক নির্মিত নৌকাতে আরোহণ করিয়া যমুনা নদীর অপর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং মুনিবরের বাক্যানুযায়ী নির্দিষ্ট মার্গ অনুসরণ করতঃ যেখানে বাল্মীকি মুনির আশ্রম বিদ্যমান সেই চিত্রকূট পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঋষিগণ সমাবৃত নানা মৃগ ও পক্ষিগণ সমাকুল এবং নিত্য ফল পুষ্পাদি পরিপূর্ণ বাল্মীকির আশ্রমে পৌঁছিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন যে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সেখানে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। ॥৪২-৪৪॥

তখন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্র অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বাল্মীকিও সুন্দর কমলনয়ন কামদেব-সদৃশ-আকৃতি-বিশিষ্ট, জটামুকুটধারী, ত্রিলোকমোহন, লক্ষ্মীপতি শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত দেখিতে পাইলেন। ॥৪৫-৪৬॥

তাঁহাদের দেখিবামাত্রই শ্রীবাল্মীকি মুনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার নেত্রযুগল বিস্ময়ে নিমেষশূন্য হইয়া গেল এবং তিনি আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে পরমানন্দস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ॥৪৭॥

অতঃপর অতি ভক্তির সহিত জগৎপূজ্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে মুনিবর অর্ঘ্যাদি প্রদানে সাদর পূজন করতঃ সুমিষ্ট ফলমূলাদি ভক্ষণ করাইয়া তাঁহাদের প্রসন্নতা সম্পাদন করিলেন। ॥৪৮॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র করজোড়ে অতি নম্রতার সহিত শ্রীবাল্মীকি মুনিকে বলিলেন—"আমরা পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ এই দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছি। ॥৪৯॥

আপনি সর্ববৃত্তান্ত অবগত আছেন, অতএব আপনাকে ইহার কারণ আর কি বলিব! আমরা যাহাতে এখানে সুখপূর্বক নিবাস করিতে পারি এইরূপ একটি স্থান নির্দেশ করুন। ॥৫০॥

আপনার নির্দিষ্ট স্থানে সীতা সহিত আমি কিছুকাল অতিবাহিত করিব।" রঘুনাথ এইপ্রকার বলিবার পর সহাস্যবদন মুনিবর বলিলেন— ॥৫১॥

হে রাম! আপনিই সর্বপ্রাণিগণের উত্তম নিবাসস্থান, পুনঃ সর্বজীবগণও আপনার নিবাস গৃহ। ॥৫২॥

হে রঘুনন্দন! আমি আপনার সাধারণ নিবাসস্থানের বিষয় বলিলাম, কিন্তু আপনি বিশেষরূপে সীতার সহিত নিবাস করিবার স্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অতএব হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিশ্চিত বাসগৃহ বিষয়ে বলিতেছি। যাহারা শান্ত, সমদর্শী, সর্বজীবের প্রতি দ্বেষহীন এবং অহর্নিশি আপনার ভজন করিয়া থাকেন, তাহাদের হৃদয় আপনার প্রধান নিবাস স্থান। ॥৫৩-৫৪॥

যাহারা সর্ব ধর্ম ও অধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক নিরন্তর আপনার ভজন করিয়া থাকেন, হে রাম! তাহাদের হৃদয়মন্দিরেই আপনি সীতাসহিত পরমানন্দে নিবাস করেন। ॥৫৫॥

যিনি আপনার মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, আপনারই শরণাগত, দ্বন্দ্বহীন ও নিস্পৃহ তাঁহার হৃদয়ই আপনার নিবাসযোগ্য সুন্দর মন্দির। ॥৫৬॥

যিনি অহঙ্কার শূন্য, শান্ত স্বভাব, রাগদ্বেষ রহিত এবং মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর খণ্ড ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি সম্পন্ন, তাঁহার হৃদয়ই আপনার আবাসস্থান। ॥৫৭॥

যিনি আপনাতে মনবুদ্ধি স্থিরপূর্বক সদা সন্তুষ্ট থাকেন, এবং স্বকীয় সর্ব কর্ম আপনাকে সমর্পণ করেন, তাঁহার মনই আপনার শুভ নিবাসগৃহ। ॥৫৮॥

যিনি অপ্রিয় প্রাপ্তিতে কোন দ্বেষ করেন না ও প্রিয় প্রাপ্তিতে কখনও হর্ষিত হন না এবং 'এই সম্পূর্ণ জগৎ মায়া মাত্র' এইরূপে নিশ্চিত জানিয়া আপনাকে ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহার মনই আপনার বাসগৃহ। ॥৫৯॥

যিনি ছয় প্রকার বিকার (সত্তা, জন্ম, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ) শরীরেই দর্শন করেন আত্মাতে নহে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ এবং ভয়াদি প্রাণ ও বুদ্ধির বিকার বলিয়া জানেন, যিনি স্বয়ং সংসারীধর্ম হইতে মুক্ত, তাঁহার চিত্তই আপনার আবাসগৃহ। ৬০-৬১॥

যাঁহারা চিৎঘন স্বরূপ এক নির্লেপ, সর্বগত এবং বরেণ্য পরমেশ্বর আপনাকে সর্বপ্রাণীর হৃদয় গুহাতে বিরাজিত দর্শন করেন, হে রাম! তাঁহাদের হৃদয় কমলে সীতাসহ আপনি নিবাস করুন। ॥৬২॥

নিরন্তর অভ্যাসবশে স্থির চিত্ত যাঁহারা আপনার শ্রীচরণ সেবায় সর্বদা রত এবং আপনার নাম সংকীর্তন প্রভাবে যাঁহাদের পাপ বিগত হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়কমলই সীতা সহিত আপনার নিবাস গৃহ। ॥৬৩॥

হে রাম। যাহার প্রভাবে আমি মহর্ষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনার সেই নাম মহিমা কেই বা, কি প্রকারেই বা, বর্ণন করিতে সমর্থ? (অর্থাৎ কেহই নহে)। ॥৬৪॥

পূর্বকালে আমি ব্যাধগণের সহিত নিবাস করিতাম এবং তাহাদের মধ্যেই বর্ধিত হইয়াছিলাম। আমি সর্বদা শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিতাম, আমার ব্রাহ্মণত্ব কেবল জন্মমাত্রেই নিবদ্ধ ছিল। ॥৬৫॥

এক শূদ্রাণীর গর্ভে ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত আমার বহু পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই কালে তস্করগণের সঙ্গদোষে আমিও চৌর্যকার্যে বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলাম। ॥৬৬॥

জীবগণের যমসদৃশ আমি সর্বদা ধনুকবাণ ধারণ করিয়া থাকিতাম। এক ঘোর বনে একদিন স্বীয় প্রভা দ্বারা অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় সাক্ষাৎ প্রকাশমান সপ্তর্ষিগণকে আমি বনভূমি অতিক্রম করিতে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাদের বস্ত্রাদি সর্ব পদার্থ অপহরণ করিবার ইচ্ছায়, লোভবশীভূত হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহাদিগকে 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এরূপ সম্বোধন করিয়াছিলাম। মুনীশ্বরগণ আমাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ওহে দ্বিজাধম! তুমি আমাদের পশ্চাৎ কেন আসিতেছ"? ॥৬৭-৬৯॥

আমি বলিয়াছিলাম—"হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমার গৃহে ক্ষুধাপীড়িত বহু পুত্র, স্ত্রী আদি বিদ্যমান। তাহাদের পোষণার্থ কিছু দ্রব্যাদি অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যেই আমি আসিয়াছি। ॥৭০॥

তাহাদের সংরক্ষণ করিবার জন্যই আমি বন-পর্বতাদিতে বিচরণ করি।" তখন মুনীশ্বরগণ নির্ভয়ে আমাকে বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি একবার তোমার কুটুম্বগণের নিকটে যাইয়া প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা কর—'আমি তোমাদের প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিন যে পাপ সঞ্চয় করিতেছি তোমরা তাহার অংশভাগী হইবে কি না।' ॥৭১-৭২॥

তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে তোমার প্রত্যাগমন কাল পর্যন্ত আমরা এখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।" আমি তাহাতে সম্মত হইয়া আপন গৃহে গমন করিলাম এবং মুনীশ্বরগণ আমাকে যেমন বলিয়াছিলেন—স্ত্রী, পুত্র আদিকে আমি সেইরূপই জিজ্ঞাসা করিলাম। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তখন উত্তরে তাহারা বলিল ঐ সব পাপ তোমারই হইবে। আমরা তো তোমার পাপ কর্মদ্বারা প্রাপ্ত ধনাদি উপভোগ করিয়া থাকি মাত্র।' ॥৭৩-৭৪॥

তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার বৈরাগ্যের উদয় হইল। তখন বিচার করিতে করিতে পরম করুণ হৃদয় মুনীশ্বরগণ যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় পুনরাগমন করিলাম। ॥৭৫॥

মুনীশ্বরগণের দর্শনমাত্রই আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গেল, এবং আমি ধনুর্বাণ আদি দূরে পরিত্যাগ করতঃ ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া বলিলাম— ॥৭৬॥

'হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। পাপ সমুদ্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন'—এই প্রকার প্রার্থনাকারী আমাকে সম্মুখে ভূপতিত দেখিয়া তাঁহারা আমাকে বলিলেন— ॥৭৭॥

'ওঠ-ওঠ', তোমার সৎসঙ্গ সফল হইয়াছে। তোমার অবশ্য কল্যাণ হইবে। তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতেছি, তাহাতে তুমি মোক্ষলাভ করিবে। তখন তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বিচার করিলেন যে যদ্যপি এই ব্রাহ্মণাধম অত্যন্ত দুরাচারী এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সদা উপেক্ষার পাত্র, তথাপি সে এখন শরণাগত, অতএব ইহাকে যত্নের সহিত মোক্ষমার্গের উপদেশ প্রদানে রক্ষা করা কর্তব্য। ॥৭৮-৭৯॥

হে রাম! এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহারা আমাকে আপনার নামের অক্ষর উল্টা করিয়া বলিলেন—'তুমি এইস্থানে অবস্থান করিয়া একাগ্রচিত্তে সর্বদা 'মরা-মরা' এইরূপ জপ কর। আমাদের প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত তুমি সর্বদা এইরূপ জপ করিতে থাকো।" আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া দিব্যদর্শন মুনীশ্বরগণ প্রস্থান করিলেন। ॥৮০-৮১॥

তখন তাঁহারা যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ করিলাম, এবং নিরন্তর একাগ্রচিত্তে জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলাম। ॥৮২॥

এই প্রকারে বহুকাল ব্যতীত হইলে নিশ্চলরূপে উপবিষ্ট সর্ব সঙ্গবিহীন আমার শরীর উইএর ঢিপি দ্বারা আচ্ছাদিত হইল। ॥৮৩॥

তদনন্তর এক সহস্র যুগ ব্যতীত হইলে ঋষিগণ পুনরায় তথায় আগমন করতঃ আমাকে বলিলেন—'বল্মীক স্তূপ হইতে বহিরাগমন কর।' ইহা শ্রবণ করিয়া আমি শীঘ্রই গাত্রোত্থান করিলাম। ॥৮৪॥

যেমন ঘন কুয়াশা ছিন্ন করতঃ সূর্য নির্গত হয়, আমিও তদ্রূপ বল্মীক স্তূপ হইতে নির্গত হইলাম। তখন মুনিগণ আমাকে বলিলেন—"হে মুনিবর! তুমি এখন 'বাল্মীকি' নাম প্রাপ্ত হইলে। ॥৮৫॥

বল্মীক স্তূপ হইতে নির্গত হইয়াছ বলিয়া তোমার এই 'পুনর্জন্ম হইল'। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এইরূপ কথনানন্তর তাঁহারা দিব্যলোকে প্রস্থান করিলেন। ॥৮৬॥

হে রাম! আপনার নামের প্রভাবে আমি আজ সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত কমলনয়ন আপনার সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছি। অহো! আমি মুক্ত হইয়াছি, ইহা নিঃসন্দেহ। হে রাম! আপনার মঙ্গল হউক, আসুন, আমি আপনাকে আপনার নিবাসযোগ্য স্থান নির্দেশ করিব।" ॥৮৭-৮৮॥

অনন্তর শিষ্য পরিবৃত মুনিবর বাল্মীকি লক্ষ্মণসহ গঙ্গা (মন্দাকিনী) এবং পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে গমন করিয়া তথায় ভগবান রামচন্দ্রের নিবাসার্থ একটি সুবিস্তীর্ণ পর্ণশালা নির্মাণ করাইলেন। উহাতে একটি পূর্ব-পশ্চিম আর একটি উত্তর-দক্ষিণ দুটি সুন্দর মন্দির (নিবাস গৃহ) নির্মিত হইল। ॥৮৯-৯০॥

সেই মনোরম গৃহে জানকীসহ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দেবগণের ন্যায় নিবাস করিতে লাগিলেন। ॥৯১॥

স্বর্গলোকে শচীসহ দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ আনন্দে কালাতিপাত করেন, মহর্ষি-বাল্মীকি-সুপূজিত শ্রীরামচন্দ্রও দেবতা, মুনিগণ এবং সীতা ও লক্ষ্মণ সহ তদ্রূপ অতি আনন্দের সহিত এইস্থানে নিবাস করিতে লাগিলেন। ॥৯২॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে অযোধ্যা কাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তম সর্গ

সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, রাজা দশরথের স্বর্গ গমন, মাতুলালয় হইতে ভরতের প্রত্যাগমন এবং গুরু বশিষ্ঠের আদেশে ভরত কর্তৃক রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

(লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া)—সুমন্ত্র বস্ত্রদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে সায়ংকালে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ॥১॥

বহির্দেশে রথ পরিত্যাগ করতঃ রাজদর্শনার্থ তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং 'জয়' শব্দ উচ্চারণ পূর্বক মহারাজের স্তুতি করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ॥২॥

সুমন্ত্রকে প্রণাম করিতে দেখিয়া দুঃখে ব্যাকুল মহারাজ দশরথ বলিলেন—"সুমন্ত্র! লক্ষ্মণ ও সীতাসহ শ্রীরাম এখন কোথায়? তুমি রামকে কোথায় পরিত্যাগ করিয়া আসিলে? ॥৩॥

আমার ন্যায় পাপীকে সে কি বলিল? সীতা এবং লক্ষ্মণও আমার ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে কি বলিল? ॥৪॥

হা রাম! হা গুণনিধি! হা প্রিয়বাদিনী সীতা! দুঃখ সমুদ্রে মজ্জমান এবং ম্রিয়মাণ আমাকে কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?" ॥৫॥

দীর্ঘকাল পর্যন্ত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মহারাজ দশরথ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। মহারাজকে এইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া মন্ত্রী করজোড়ে নিবেদন করিলেন— ॥৬॥

"মহারাজ! আমি শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে আপনার রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারা গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে অবস্থান করিলেন। ॥৭॥

সেখানে নিষাদরাজ গুহক কিছু ফলমূলাদি আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাম তাহা গ্রহণ করিলেন না, কেবল অতি প্রীতির সহিত হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ॥৮॥

তদনন্তর শ্রীরঘুনাথ গুহকদ্বারা বটক্ষীর (বট-দুগ্ধ) আনাইয়া আপন শিরে জটা-মুকুট ধারণ করতঃ আমাকে বলিলেন— ॥৯॥

'হে সুমন্ত্র! মহারাজকে বলিও তিনি যেন আমার জন্য কোন শোক না করেন, অযোধ্যা হইতে অধিক সুখ আমি বনে প্রাপ্ত হইব। ॥১০॥

মাতা কৌশল্যাকে আমার প্রণাম নিবেদন করতঃ বলিও তিনিও যেন আমার জন্য শোক পরিত্যাগ করেন। মহারাজ বৃদ্ধ ও শোকাতুর, তুমি তাঁহাকে উত্তমরূপে আশ্বাস প্রদান করিও।' ॥১১॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তৎপশ্চাৎ সজলনেত্রে শ্রীরামের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ অতি দুঃখে গদ্‌গদকণ্ঠে সীতা আমাকে বলিলেন— ॥১২॥

'আমার উভয় শ্বশ্রূমাতার চরণকমলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবেন।' ইহা বলিয়া অবনত শিরে রোদন করিতে করিতে সীতা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। ॥১৩॥

অতঃপর তাঁহারা সকলে অশ্রুপূর্ণ লোচনে নৌকায় আরোহণ করিলেন। গঙ্গার অপর তীরে তাঁহাদের পৌঁছানো পর্যন্ত আমি তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। ॥১৪॥

অতঃপর সেখান হইতে যাত্রা করিয়া অতি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি এখানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি।" তখন ক্রন্দন করিতে করিতে কৌশল্যা মহারাজকে এই প্রকার বলিলেন— ॥১৫॥

"মহারাজ! আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রিয়া পত্নী কৈকেয়ীকে বর দিয়াছেন। তাহার পুত্রকে আপনি রাজ্য প্রদান করিতে হয় করুন, কিন্তু আপনি আমার পুত্রকে বনবাস কেন দিলেন? ॥১৬॥

আপনি নিজেই সব ব্যাপার করিয়া, এখন কেন ক্রন্দন করিতেছেন?" কৌশল্যার এইরূপ বচন শুনিয়া ক্ষতস্থানে অগ্নি স্পর্শের ন্যায় বেদনা অনুভব করিয়া শোকাশ্রুপূর্ণ নেত্রে কৌশল্যাকে

মহারাজ বলিলেন—"আমি দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছি, পুনঃ আমাকে এই প্রকার বৃথা অধিক দুঃখ তুমি কেন দিতেছ? তাহাতে কি লাভ? ॥১৭-১৮॥

ইহা নিশ্চিৎ যে আমার প্রাণ দেহ হইতে এখনই নির্গত হইবে। পূর্বকালে আমার মূর্খতার জন্য এক মুনীশ্বর আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন।

(ঘটনাটি এইরূপ)—পূর্বে একবার আমি যৌবনমদে মত্ত হইয়া মৃগয়াসক্তি বশতঃ রাত্রিকালে ধনুর্বাণ হস্তে এক ঘোর বনমধ্যে নদীতীরে বিচরণ করিতেছিলাম। ॥২০॥

সেখানে অর্ধরাত্রিকালে পিপাসার্ত এক মুনীশ্বর আপন তৃষিত মাতাপিতার জন্য পানীয় জল আনয়নার্থ জলে কুম্ভ নিমজ্জন কালে মহান (ভক্-ভক্) শব্দ হইতেছিল। ॥২১॥

তখন আমি সেই ঘোর রাত্রিকালে কোন হস্তি জলপান করিতেছে মনে করিয়া আমার ধনুকে শব্দবেধি (শব্দভেদী) বাণ সন্ধান করতঃ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। ॥২২॥

তখন "হায়! আমি মরিলাম! হে বিধি! আমি তো কাহারও কোন অপকার করি নাই, তবে আমাকে কে মারিল?" এইরূপ মনুষ্য কণ্ঠের বিলাপ ধ্বনি আমি শুনিতে পাইলাম। ॥২৩॥

"হায়! জলের নিমিত্ত (পিপাসার্ত) মাতাপিতা আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করিতেছেন।" এই মনুষ্য কণ্ঠোচ্চারিত বচন শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভয়-ভীত হইলাম এবং ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলাম—"হে প্রভো! আমি দশরথ, না জানিয়া আমি এই বাণ নিক্ষেপ করিয়াছি। হে মুনে! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" ॥২৪-২৫॥

গদ্‌গদ কণ্ঠে এইরূপ বলিয়া আমি তাঁহার উভয় চরণে নিপতিত হইলাম। তখন সেই মুনীশ্বর আমাকে বলিলেন—'হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ভয় পাইও না। ॥২৬॥

তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ হইবে না। কারণ আমি তপস্যায় রত একজন বৈশ্য। আমার মাতা-পিতা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। ॥২৭॥

অতএব অন্য কিছু বিচার না করিয়া তাঁহাদিগকে পানীয় জল প্রদান কর, নতুবা কোপাবিষ্ট হইলে আমার পিতা তোমাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। পানীয় জল প্রদান অনন্তর নমস্কার করিয়া তোমার কৃতকর্ম সব তাঁহাদের বলিও। আমার অত্যন্ত ব্যথা অনুভব হইতেছে, তুমি শীঘ্রই আমার শরীর হইতে এই বাণ উৎপাটন কর। আমার এখনই প্রাণত্যাগ হইবে।' ॥২৮-২৯॥

মুনির এইরূপ বচন শুনিয়া আমি শীঘ্রই তাঁহার শরীরে বিদ্ধ বাণ উৎপাটন করিলাম এবং জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া তাঁহার মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলাম। ॥৩০॥

ঐ সময়ে তাঁহারা এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছিলেন—'আমরা অতি বৃদ্ধ দৃষ্টিহীন অন্ধ, ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত, কিন্তু এই রাত্রিতেও আমাদের পুত্র এখন পর্যন্ত জল লইয়া কেন আসিতেছে না, আমাদের আর কেহ সাহায্যকারী নাই। ভক্তিমান পুত্র কি আমাদের উপেক্ষা করিতেছে? আমরা বৃদ্ধ, শোচনীয় এবং পিপাসায় অত্যন্ত ব্যাকুল।' এই সময় আমার পদধ্বনি শুনিয়া পিতা বলিলেন—'বৎস! আজ তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? ॥৩১-৩৩॥

আমাদের পবিত্র পানীয় জল শীঘ্রই প্রদান কর, এবং তুমিও পান কর।' তাঁহার এইপ্রকার কথা শুনিবার পর আমি অতি ভয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপে গমন করিলাম। ॥৩৪॥

এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করতঃ অতি বিনয়ের সহিত বলিলাম—"আমি আপনাদের পুত্র নহি ; আমি অযোধ্যার রাজা দশরথ। ॥৩৫॥

আমি পাপাত্মা, মৃগয়াতে আসক্তিবশতঃ রাত্রিকালে পশুবধ করিয়া থাকি। যদিও আমি ঐ সময় নদীতীর হইতে দূরে ছিলাম তথাপি জলপূর্ণ হইবার কালে কুম্ভ-মধ্যস্থ ধ্বনি শুনিয়া উহা কোন পশু মনে করিয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত একটি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। তৎপর 'হায়! আমি মরিলাম'—এইরূপ শব্দ শুনিয়া আমি ভয় ভীতান্তঃকরণে সেই স্থানে গমন করিলাম। ॥৩৬-৩৭॥

কিন্তু যাইয়া দেখিলাম যে সেখানে এক মুনিকুমার ভূমিতে পতিত হইয়া আছেন এবং তাঁহার জটাজাল চতুর্দিকে বিকীর্ণ। আমি ভয়ে তাঁহার দুই চরণ হস্তে ধারণ করিয়া 'আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর' এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ॥৩৮॥

তখন তিনি আমাকে বলিলেন—'ভয় পাইও না। ব্রহ্মহত্যা পাপের জন্য ভীত হইও না। আমার মাতাপিতাকে পানীয় জল প্রদান করতঃ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া জীবন-দান ভিক্ষা প্রার্থনা করিও। ॥৩৯॥

মুনিকুমার এইরূপ বলিবার পর মুনি-হিংসক আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনারা উভয়ে দয়াশীল, আমি আপনাদের শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন।" ॥৪০॥

ইহা শুনিয়া দুঃখকাতর তাঁহারা উভয়ে পুত্রের জন্য শোক করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ভূপতিত হইয়া আমাকে বলিলেন—'যেখানে আমাদের পুত্রের মৃতদেহ রহিয়াছে অবিলম্বে আমাদের উভয়কে তথায় লইয়া চল।' ॥৪১॥

তখন সেই অন্ধ বৃদ্ধ দম্পতিকে আমি সেখানে লইয়া গেলাম এবং তখন তাঁহারা মৃত পুত্রের শরীর হস্তদ্বারা স্পর্শ করতঃ অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। ॥৪২॥

তাঁহারা 'হা পুত্র! হা পুত্র'! এইরূপ বিলাপ করতঃ ক্রন্দনপরায়ণ হইয়া বলিলেন—'বৎস! আমাদের পানীয় জল দাও! জল কেন দিতেছ না।' ॥৪৩॥

পুনরায় তাঁহারা আমাকে বলিলেন—'রাজন্! শীঘ্র চিতা প্রস্তুত কর।' আমি তখন অবিলম্বে চিতা প্রস্তুত করিলাম। তখন তাঁহারা পুত্রসহ উভয়ে চিতাতে আরোহণ করিলেন এবং অগ্নি সংযোগে তাঁহাদের দেহ ভস্মীভূত হইলে তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ॥৪৪॥

ঐ সময় বৃদ্ধ পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন—'তোমারও এই প্রকার হইবে। আমার অভিশাপে পুত্রশোকেই তোমার মৃত্যু হইবে।' ॥৪৫॥

সেই অনিবার্য অভিশাপ কাল আমার উপস্থিত হইয়াছে।" এইরূপ বলিয়া রাজা দশরথ পুত্রশোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ॥৪৬॥

"হা পুত্র রাম! হা সীতা! হা গুণাকর লক্ষ্মণ! তোমাদের বিয়োগে আমি কৈকেয়ীর কারণেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছি।" ॥৪৭॥

এই প্রকার বলিয়া মহারাজ দশরথ প্রাণত্যাগ করতঃ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তখন কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজমহিষিগণ বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে

বিলাপ এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে মন্ত্রিগণ সহিত মুনিবর শ্রীবশিষ্ঠ সেখানে আগমন করিলেন। ॥৪৮-৪৯॥

তিনি রাজা দশরথের শবদেহ এক তৈলপূর্ণ নৌকাতে স্থাপন করতঃ দূতগণকে বলিলেন—"তোমরা অবিলম্বে অশ্বারোহণে ভরতের মাতুল যুধাজিতের রাজধানীতে গমন কর। ॥৫০॥

সেখানে শত্রুঘ্ন সহিত প্রতাপশালী শ্রীমান ভরত রহিয়াছেন, আমার আদেশে তোমরা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভরতকে বলিবে যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে মহারাজ দশরথ ও কৈকেয়ীকে দর্শনার্থ অযোধ্যাপুরী আগমন করেন।" মুনিবর বশিষ্ঠের আদেশে দূতগণ অতি সত্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া ভরতের মাতুল যুধাজিত এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন সহিত ভরতকে প্রণাম করিয়া বলিল—"রাজন্! মুনিবর বশিষ্ঠ আপনাকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন সহিত আপনি অগ্রপশ্চাৎ কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে অযোধ্যাপুরীতে আগমন করুন।" গুরু বশিষ্ঠের এইরূপ আজ্ঞা শুনিয়া ভয়ে ব্যাকুল-চিত্ত ভরত অবিলম্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া দূতগণ সহ যাত্রা করিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় অবশ্যই মহারাজ অথবা শ্রীরামচন্দ্রের ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ॥৫১-৫৫॥

পথিমধ্যে এইরূপ নানা চিন্তাপরায়ণ হইয়া তাঁহারা অযোধ্যাপুরী পৌঁছিলেন, কিন্তু দেখিলেন নগর লক্ষ্মীশ্রী বিহীন, জনসমূহ বর্জিত এবং উৎসব রহিত। ইহা দেখিয়া ভরত অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। রাজভবনে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, ভবন রাজলক্ষ্মীশ্রী বিহীন এবং আরও দেখিলেন যে কৈকেয়ী একাকিনী আসনোপরি উপবিষ্টা। তখন মাতাকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্বক মাতৃচরণে মস্তক স্থাপন করতঃ প্রণাম করিলেন। ॥৫৬-৫৮॥

ভরতকে আসিতে দেখিয়া মাতা কৈকেয়ী অত্যন্ত প্রীতির সহিত শীঘ্র গাত্রোত্থান করতঃ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ ক্রোড়ে বসাইলেন। ॥৫৯॥

অতঃপর তাহার মস্তক আঘ্রাণ করতঃ আপন পিতৃকুলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমার পিতা, ভ্রাতা ও শুভলক্ষণা মাতা সব কুশলে আছেন তো? ॥৬০॥

"বৎস! আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে তোমাকে সকুশল দেখিতেছি।" মাতা এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে ভরত অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া ব্যাকুলচিত্তে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! আমার পিতা কোথায়? তুমি যে এখানে একাকিনী বসিয়া আছ? ॥৬১-৬২॥

মা! তোমাকে বিনা পিতা কখনও একান্তে অবস্থান করিতেন না। কিন্তু আজ তাঁহাকে এই সময় এখানে দেখিতেছি না। তিনি কোথায়, তাহা বল। ॥৬৩॥

পিতাকে দেখিতে না পাইয়া আজ আমার মনে যুগপৎ অত্যন্ত দুঃখ ও ভয় হইতেছে।" তখন কৈকেয়ী বলিলেন—"হে অনঘ (নিস্পাপ)! তুমি দুঃখ করিতেছ কেন? ॥৬৪॥

হে পিতৃবৎসল! অশ্বমেধাদি যজ্ঞসম্পাদনকারী ধর্মপরায়ণ পুরুষগণের যে গতি হইয়া থাকে, আজ তোমার পিতা সেই লোকই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ॥৬৫॥

ইহা শুনিবামাত্রই শোকাকুল ভরত ভূপতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—"হা তাত! হা তাত! আমাকে দুঃখ সমুদ্রে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় চলিয়া গেলেন? ॥৬৬॥

শ্রীরামের হস্তে আমাকে সমর্পণ না করিয়া আপনি কোথায় চলিয়া গেলেন?" এই প্রকার পুত্রকে বিলাপ করিতে দেখিয়া এবং অবিন্যস্তকেশ ভূলুণ্ঠিত তাহাকে উঠাইয়া কৈকেয়ী স্বীয় অঞ্চল সহায়ে তাহার নয়নাশ্রু মার্জন করতঃ বলিলেন—"বৎস! ধৈর্য ধারণ কর। তোমার কল্যাণ হউক! আমি তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।" ॥৬৭-৬৮॥

তখন ভরত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মৃত্যুকালে মহারাজ কি বলিয়াছিলেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে নির্ভয় হইয়া কৈকেয়ী ভরতকে বলিলেন—"তিনি 'হা রাম! হা রাম! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' এই প্রকার দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিলাপ করিতে করিতে দেহত্যাগ পূর্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন।" ॥৬৯-৭০॥

তখন ভরত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মাতা! তাহা হইলে কি পিতার মৃত্যুকালে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না? ঐ তিনজন তাহা হইলে তখন কোথায় গিয়াছিলেন?" ॥৭১॥

কৈকেয়ী বলিলেন—"তোমার পিতা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য সর্ব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সময় তোমাকে রাজ্য দিবার জন্য আমি কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছি। ॥৭২॥

পূর্বে কোন সময়ে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে দুইটি বর দান করিবার জন্য বরদাতা মহারাজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। বর্তমান সময়ে সেই দুইটি বরের মধ্যে একটি বর দ্বারা আমি তোমার জন্য সম্পূর্ণ রাজ্য এবং দ্বিতীয় বর দ্বারা রামের জন্য মুনিব্রত ধারণ পূর্বক চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এইজন্য তোমার পিতা সত্যপরায়ণ মহারাজ দশরথ তোমাকে রাজ্য প্রদান করতঃ রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন। পতিব্রত ধর্মপালনকারিণী সীতাও রামসহ বনগমন করিয়াছেন। ॥৭৩-৭৫॥

ভ্রাতৃস্নেহ পরবশ হইয়া লক্ষ্মণও রামের অনুগামী হইয়াছেন। তাহারা সকলে বনগমন করিবার পর তাহাদিগকে স্মরণ এবং 'রাম! রাম!' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ দেহত্যাগ করিয়াছেন।" মাতার এইরূপ বচন শ্রবণমাত্র ভরত অচেতন হইয়া বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। ভরতের এইরূপ দশা দেখিয়া কৈকেয়ী দুঃখিতান্তঃকরণে পুনরায় বলিলেন—"বৎস! তুমি শোক করিতেছ কেন? ॥৭৬-৭৮॥

এই সুবিশাল রাজ্য প্রাপ্তির পর দুঃখের অবসর (সময়) কোথায়?" মাতাকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া ভরত ক্রোধাগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলিলেন— ॥৭৯॥

"পাপিনী! তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করাও অনুচিত। রে নিষ্ঠুরা! তুই পতিঘাতিনী! পাপিনী! তোর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছি বলিয়া আমিও মহাপাপী। আমি অগ্নিপ্রবেশ বা বিষভক্ষণ করতঃ এই দেহ পরিত্যাগ করিব। ॥৮০॥

অথবা খড়গ সহায়ে আত্মহত্যা করতঃ আমি যমলোকে গমন করিব। হে পতিপ্রাণঘাতিনী! হে দুষ্টে! তুইও কুম্ভীপাক নরকে যাইবি।" ॥৮১॥

কৈকেয়ীকে এই প্রকার ভর্ৎসনার অনন্তর ভরত মাতা কৌশল্যার ভবনে গমন করিলেন। ভরতকে দেখিয়াই মাতা কৌশল্যা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ॥৮২॥

ভরতও তাঁহার চরণে পতিত হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। সাধ্বী, যশস্বিনী, কৃশা ও দীনবদনা রামমাতা কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন— ॥৮৩॥

"বৎস! তুমি দূরদেশে যাইবার অনন্তর যাহা কিছু অনর্থ ঘটিয়াছে এবং তোমার মাতা যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা তুমি তাঁহার মুখেই শুনিয়া থাকিবে। ॥৮৪॥

আমার পুত্র রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র, পত্নী সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণের সহিত চীর বস্ত্রধারণ এবং মস্তকে জটাজুট বন্ধন করতঃ আমাকে দুঃখ সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া বনগমন করিয়াছে। ॥৮৫॥

হা রাম! হা আমার রঘুবংশনাথ! তুমি সাক্ষাৎ পরমপুরুষ পরমাত্মা, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তথাপি আমার দুঃখের অন্ত নাই। ইহাতে ইহাই দৃঢ় ধারণা হইতেছে যে 'বিধাতাই' (প্রারব্ধই) বলবান।" ॥৮৬॥

মাতা কৌশল্যাকে এইরূপ করুণ বিলাপ করিতে দেখিয়া ভরত তাঁহার চরণ ধারণ পূর্বক বলিলেন—"হে মা! আমার কথা শ্রবণ করুন— ॥৮৭॥

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সময় কৈকেয়ী যাহা কিছু অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন অথবা তিনি অন্য যাহা কিছু দুরাচরণ করিয়াছেন তাহা যদি আমার জ্ঞাতসারে বা অনুমোদন ক্রমে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে— ॥৮৮॥

তাহা হইলে হে মাতঃ! আমার শতব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে অথবা অরুন্ধতীসহ গুরু শ্রীবশিষ্ঠকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিবার সর্ব পাপ আমার হইবে।" এই প্রকার শপথ করিয়া ভরত রোদন করিতে লাগিলেন। ॥৮৯-৯০॥

তখন কৌশল্যা তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—"হে বৎস! আমি সব জানি, তুমি কোন চিন্তা করিও না।" ইতিমধ্যে ভরতের আগমন বার্তা শুনিয়া মন্ত্রিগণ সহ গুরু শ্রীবশিষ্ঠ রাজভবনে আগমন করিলেন এবং ক্রন্দনরত ভরতকে দেখিয়া অতি আদরের সহিত তাহাকে বলিলেন— ॥৯১-৯২॥

"মহারাজ দশরথ বৃদ্ধ, জ্ঞানী এবং সত্যপরাক্রমী ছিলেন। তিনি মনুষ্যজন্মের সর্বসুখ ভোগ করিয়াছেন। বহুবিধ দক্ষিণা প্রদান করতঃ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণু ভগবানকেই পুত্র শ্রীরামচন্দ্ররূপে লাভ করিয়া অন্তকালে স্বর্গলোক গমন করতঃ দেবরাজ ইন্দ্রের অর্ধ আসনের অধিকারী হইয়াছেন। ॥৯৩-৯৪॥

তিনি মোক্ষলাভের যোগ্যপাত্র এবং শোকের যোগ্য নহেন। তাঁহার জন্য তুমি বৃথাই শোক করিতেছ। দেখ, আত্মা নিত্য, অবিনাশী, শুদ্ধ এবং জন্মমরণ রহিত। ॥৯৫॥

আরও দেখ শরীর জড়, অত্যন্ত অপবিত্র ও বিনাশী। এই প্রকার বিচার করিলে শোকের আর কোন অবকাশ থাকে না। ॥৯৬॥

পিতা বা পুত্র মৃত হইলে মূঢ় ব্যক্তিরাই তাহার জন্য বক্ষে করাঘাত করতঃ রোদন করিয়া থাকে। কিন্তু এই অসার সংসারে যদি কোন জ্ঞানীর স্বজন বিয়োগ হয়, তবে তাহা তাঁহার বৈরাগ্যের কারণ হয় এবং তাহা সুখ ও শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। ॥৯৭-৯৮॥

ইহলোকে কাহারও জন্ম হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য, অর্থাৎ মৃত্যু তাহার অনুগমন করে। সুতরাং জন্ম হইলেই মৃত্যু সদা অনিবার্য। ॥৯৯॥

স্ব স্ব কর্মবশেই সর্বপ্রাণিগণের জন্মমরণ হইয়া থাকে, ইহা জানিয়াও মূঢ় লোকেরা আপন বন্ধুবান্ধবদের জন্য কেন (অর্থাৎ বৃথাই) শোক করিয়া থাকে? ॥১০০॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, বহু সৃষ্টি অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, সম্পূর্ণ সমুদ্রও একদিন শুষ্ক হইয়া যাইবে, সুতরাং এই ক্ষণিক জীবনের কি নিশ্চয়তা? ॥১০১॥

বৃক্ষপত্রের অন্তভাগে লগ্ন পতনোন্মুখ জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যের আয়ু কোন কালের অপেক্ষা না রাখিয়াই বিগত হয়। উহার উপর তুমি আস্থা স্থাপন করিতেছ কেন? ॥১০২॥

প্রাক্তন দেহকৃত কর্মবশে জীবের বর্তমান শরীর ধারণ হইয়া থাকে, ও বর্তমান দেহকৃত কর্মের অধীন হইয়া জীবাত্মা ভাবীদেহ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে আত্মার পুনঃ পুনঃ দেহপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। ॥১০৩॥

মনুষ্য যে প্রকার পুরাতন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ নবীন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, দেহধারী জীবও সেইপ্রকার পুরাতন জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করতঃ নবীন শরীর ধারণ করিয়া থাকে। অতএব ইহাতে শোক করিবার কি আছে? কারণ আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না, জন্মও হয় না এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্তিও হয় না। ॥১০৪-১০৫॥

আত্মা ষড়্ভাব বিকার রহিত, অনন্ত, সচ্চিৎস্বরূপ, আনন্দরূপ, বুদ্ধি আদির সাক্ষী এবং অবিনাশী। এই পরমাত্মা এক, অদ্বিতীয় এবং সমভাবে বিদ্যমান। এইরূপ আত্মা বিষয়ক দৃঢ়জ্ঞান সহায়ে শোকরহিত হইয়া তুমি সর্বকর্ম সম্পাদন কর। ॥১০৬-১০৭॥

হে কুলনন্দন ভরত! তুমি তৈলপূর্ণ নৌকা হইতে আপন পিতার শরীর নিষ্কাশণ করতঃ মন্ত্রিগণ এবং আমাদের (ঋষিগণের) সাহায্যে তাঁহার বিধিপূর্বক অন্ত্যেষ্টি সংস্কার সুসম্পন্ন কর।” ॥১০৮॥

গুরু বশিষ্ঠ কর্তৃক সম্বোধিত হইয়া ভরত অজ্ঞানজন্য শোক পরিত্যাগ করতঃ রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ॥১০৯॥

গুরু বশিষ্ঠের উপদেশ অনুযায়ী অগ্নিহোত্রিগণের অন্তিম সংস্কার যেরূপে সম্পাদিত হয় সেইরূপ বিধিপূর্বকই ভরত স্বর্গীয় পিতার দেহের শাস্ত্রানুকূল সংস্কার করিলেন। ॥১১০॥

পুনরায় একাদশ দিবসে ভরত সহস্র সহস্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে বিধিবৎ ভোজন করাইলেন। ॥১১১॥

পিতার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন, সহস্র সহস্র গাভী, বহু গ্রাম, রত্ন এবং বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। ॥১১২॥

অতঃপর ভরত অনুক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণে মগ্ন হইয়া গুরু বশিষ্ঠ, ভ্রাতা শত্রুঘ্ন এবং মন্ত্রিগণ সহ স্বগৃহে বাস করিলেন। ॥১১৩॥

গৃহে অবস্থান কালে ভরত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—'জনকনন্দিনী সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামচন্দ্র ঘোর বনে চলিয়া যাওয়াতে মাতা কৈকেয়ীকে দর্শনমাত্রই আমার নিকট রাক্ষসীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, এবং আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। অতএব আমি নিঃসন্দেহে শীঘ্রই রাজ্য আদি সর্ব বিভব দূরে পরিত্যাগ করতঃ আজই বনে গমন করিব এবং সুমধুর মৃদুহাস্য শোভিত শ্রীরামচন্দ্রের মুখকমল দর্শন করিব এবং তাঁহার ও সীতার নিত্য সেবা করিব।' ॥১১৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অযোধ্যা কাণ্ডে সপ্তম সর্গ

অষ্টম সর্গ

ভরতের বন গমন, মার্গমধ্যে গুহক ও ভরদ্বাজসহ মিলন ও চিত্রকূট দর্শন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

একদিন মুনীশ্বরগণসহ এবং মন্ত্রিগণ পরিবৃত ভগবান বশিষ্ঠ দেবসভাতুল্য শোভায়মান রাজসভায় আগমন করিলেন। তথায় দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় আসনে উপবেশন করিয়া শ্রীবশিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নসহ ভরতকে আহ্বান করিয়া আপন পার্শ্বে আসনে বসাইলেন। ॥১-২॥

অতঃপর তিনি দেশ-কালোচিত বাক্য সহকারে শত্রুদমন ভরতকে এই প্রকার বলিলেন—"বৎস! তোমার পিতার আজ্ঞানুসারে আজ তোমাকে আমি রাজপদে অভিষিক্ত করিব। ॥৩॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার জন্য কৈকেয়ী রাজা দশরথের নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজা সত্যপরায়ণ ছিলেন, এজন্য প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ তিনি তাহা প্রদান করেন। ॥৪॥

অতএব মুনিগণদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আজ তোমার রাজ্যাভিষেক হওয়া কর্তব্য।" ইহা শুনিয়া ভরত বলিলেন—"হে মুনিবর! রাজ্যের আমার কি প্রয়োজন? ॥৫॥

রামই রাজাধিরাজ, আমরা সকলে তাঁহার দাস। কাল শীঘ্রই অর্থাৎ প্রাতঃকালেই রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি বন যাত্রা করিব। ॥৬॥

আমি, আপনারা সকলে এবং রাক্ষসী কৈকেয়ী বিনা অন্য সব মাতাগণসহ বনে যাইব। নামমাত্র মাতা কৈকেয়ীকে আমি এখনই হত্যা করিতাম, কিন্তু তাহা হইলে শ্রীরঘুনাথ স্ত্রীহত্যাকারী আমাকে ক্ষমা করিবেন না। অতএব যাহাই হউক আপনারা চলুন বা না চলুন কাল প্রাতঃকাল হইলেই নগ্নপদে আমি শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। হে মুনে! শ্রীরাম যে প্রকারে বনগমন করিয়াছেন, সেই প্রকারে ভ্রাতা শত্রুঘ্ন সহিত আমি শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বল্কল বস্ত্র ও জটাজুট ধারণ করিয়া কন্দমূল ফলাদি ভোজন করিব এবং ভূমিতে শয়ন করিব।" ॥৭-১০॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভরত মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন সভাস্থ সর্বজন অতি প্রসন্নচিত্তে 'সাধু-সাধু' এইরূপ বলিয়া ভরতকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ॥১১॥

অতঃপর প্রভাতে ভরতের বনগমন কালে সুমন্ত্রের প্রেরণায় হস্তি, অশ্ব আদি সহিত সমস্ত সৈনিকগণও তাঁহার অনুগমন করিল। ॥১২॥

কৌশল্যা আদি মহারানিগণ ও বশিষ্ঠ আদি দ্বিজগণ (এবং বিপুল সৈন্য-সামন্তগণ) ভরতের সম্মুখে বা পশ্চাতে অথবা পার্শ্বে যথাযোগ্য রীতিতে যেন পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া চলিতে লাগিলেন। ॥১৩॥

এই প্রকারে শৃঙ্গবেরপুর পৌঁছিয়া সেনা সহিত সেই বিরাট জনসমূহ শত্রুঘ্নের প্রেরণায় গঙ্গাতটে যত্র তত্র আপন বিশ্রামস্থান করিয়া লইল। ॥১৪॥

ভরতের আগমন বার্তা শুনিয়া গুহকের মনে এই শঙ্কা হইল যে ভরত বিরাট সৈন্য সহকারে আসিয়াছে, অতএব সে রামের অজ্ঞাতসারে তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে যাইতেছে না তো? নিকটে গমন করিয়া তাঁহার হৃদ্‌গত অভিপ্রায় অবগত হওয়া কর্তব্য। যদি তাঁহার মনোগত ভাব শুদ্ধ হয় তবে তাঁহাদের পরপারে লইয়া যাইব। ॥১৫-১৬॥

নতুবা (ইহার বিপরীত কোন উপায় করিতে হইবে) আমার জ্ঞাতিগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অতি সাবধানতা পূর্বক চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সতর্ক থাকুক, এবং সমস্ত নৌকাগুলি মধ্যগঙ্গায় একত্রিত করিয়া রাখুক। ॥১৭॥

সকলকে এইপ্রকার আদেশ প্রদান করতঃ গুহক সংগৃহীত নানাপ্রকার উপহার সামগ্রী লইয়া বিবিধ আয়ুধধারী জ্ঞাতিগণ সহ ভরতের নিকট গমন করিল এবং তাঁহার সম্মুখে নৈবেদ্য ও উপহার সামগ্রীসমূহ স্থাপন করতঃ চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপানন্তর দেখিতে পাইল যে সম্মুখে চীরবস্ত্র ও জটাজুটধারী মেঘশ্যাম ভরত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও মন্ত্রিগণ সহ উপবিষ্ট। ॥১৮-২০॥

গুহক দেখিল ভরত সর্বদা রামকে স্মরণ করিয়া 'রাম-রাম' এইরূপ জপ করিতেছেন। উহা দেখিয়া সে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করতঃ ভরতকে প্রণাম করিয়া বলিল 'আমি গুহক'। ॥২১॥

ভরত শীঘ্রই তাহাকে উঠাইয়া অতি প্রেমের সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং অতি প্রীতিপূর্বক কুশল আদি জিজ্ঞাসা করিয়া সখাভাবে বলিলেন— ॥২২॥

"ভাই! তুমি এস্থানে শ্রীরামচন্দ্র সহিত মিলিত হইয়াছিলে এবং নির্মল চিত্ত শ্রীরাম অশ্রুপূর্ণ নয়নে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ॥২৩॥

"সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত কমলনয়ন শ্রীরাম তোমার সহিত এইস্থানে বার্তালাপ করিয়াছিলেন। অহো! তুমি ধন্য, তোমার জীবন সফল। ॥২৪॥

হে উত্তম ব্রতধারী! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে যে নির্দিষ্ট স্থানে দেখিয়াছিলে সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল, সীতা সহিত শ্রীরামচন্দ্র যেখানে নিদ্রা গিয়াছিলেন সেই স্থানটি আমাকে দেখাও। ॥২৫॥

তুমি শ্রীরামের প্রিয়তম সখা ও তাঁহার ভক্ত এবং অতি ভাগ্যবান।" এইপ্রকারে পুনঃ পুনঃ শ্রীরামের স্মরণ হওয়াতে ভরতের নেত্র অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ॥২৬॥

তৎপর শ্রীরামচন্দ্র যে স্থানে রাত্রিকালে শয়ন করিয়াছিলেন গুহকের সহিত ভরত তথায় পৌঁছিলেন এবং কুশ বিস্তৃত সেই স্থল দর্শন করিলেন। ॥২৭॥

সেই স্থান সীতার আভূষণ ও বস্ত্রাদি হইতে স্খলিত স্বর্ণবিন্দু সমূহ দ্বারা সুশোভিত ছিল। উহা দর্শন করিয়া ভরতের হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হইল এবং তিনি এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন— ॥২৮॥

"অহো! অতি সুকুমারী জনকনন্দিনী যে সীতা রাজপ্রাসাদে অতি সুন্দর স্বর্ণ পালঙ্কোপরি কোমল শয্যায় শ্রীরঘুনাথের সহিত শয়ন করিতেন, তিনিই আমার ভাগ্যদোষে কি প্রকারে এই কুশ শয্যোপরি শ্রীরামচন্দ্রসহ অতি ক্লেশ সহন করতঃ শয়ন করিলেন। ॥২৯-৩০॥

"আমাকে ধিক্কার! আমি মূর্তিমান পাপ স্বরূপ কৈকেয়ীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছি। হায়! আমার জন্যই পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে এত ক্লেশ সহন করিতে হইতেছে। ॥৩১॥

অহো! মহাত্মা লক্ষ্মণের জন্ম অত্যন্ত সফল, কারণ ভগবান রামচন্দ্রের বনবাস কালেও তিনি প্রসন্ন মনে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। ॥৩২॥

যাহারা শ্রীরামের দাস তাহাদের দাসের দাসও যদি আমি হইতে পারি, তাহা হইলে আমার জন্ম সফল হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৩৩॥

ভাই! যদি তুমি জান যে শ্রীরাম কোথায় নিবাস করিতেছেন, তবে তাহা আমাকে সব বল। তিনি যেখানেই থাকুন আমি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে সেখানেই যাইব।" ॥৩৪॥

ভরতের শুদ্ধ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া অতি স্নেহপূর্বক গুহক বলিলেন,—"হে দেব। কমলনয়ন রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রতি আপনার বিশুদ্ধাভক্তি বিদ্যমান, অতএব আপনি ধন্য। কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বত পার্শ্বে মন্দাকিনী নদীর তটে মুনিগণের আশ্রমে নিবাস করিতেছেন। সেই স্থানেই জানকী সহিত ভগবান রাম পরমানন্দে ও সুখে বিরাজমান। ॥৩৫-৩৭॥

চলুন, আমরা শীঘ্রই সেখানে যাইব। প্রথমতঃ আপনাদিগকে গঙ্গাপার হইতে হইবে।" এইরূপ বলিয়া গুহক সেনাবাহিনী সহিত ভরত ও অন্যান্য সকলকে গঙ্গার অপর তীরে লইয়া

যাইবার জন্য পাঁচশত নৌকা আনয়ন করাইলেন এবং স্বয়ং একটি রাজ-নৌকা লইয়া আসিলেন। ॥৩৮-৩৯॥

সেই নৌকায় ভরত শত্রুঘ্ন ও রাম মাতা কৌশল্যা এবং গুরু বশিষ্ঠকে আরোহণ করাইলেন। অন্য একটি নৌকায় কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রানিগণকে বসাইলেন। ॥৪০॥

তাহারা অতি শীঘ্র গঙ্গার অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া ভরদ্বাজ আশ্রমের দিকে চলিলেন। আশ্রম হইতে অতি দূরে সেনাবাহিনীকে রাখিয়া শত্রুঘ্ন সহিত ভরত সেই আশ্রমে গমন করিলেন। ॥৪১॥

এবং সেখানে জলন্ত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী মুনিবর ভরদ্বাজকে আসনোপরি উপবিষ্ট দর্শন করিয়া তাঁহাকে অতি ভক্তির সহিত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ॥৪২॥

মুনীশ্বর যখন জানিতে পারিলেন যে ইনি দশরথনন্দন ভরত, তখন তিনি তাঁহাকে অতি প্রীতির সহিত পূজা সৎকারাদি করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে জটাবল্কলাদি ধারণ করিতে দেখিয়া কুশল প্রশ্নাদির অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৪৩॥

"হে ভরত! রাজ্য শাসন করিতে করিতে তুমি আজ এই বল্কল বস্ত্রাদি কেন ধারণ করিয়াছ? এবং মুনিজন সেবিত এই তপোবনেই বা কেন আগমন করিয়াছ?" ॥৪৪॥

ভরদ্বাজের বচন শুনিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ভরত বলিলেন—"ভগবন্! আপনি সর্বজ্ঞ, কারণ আপনি সর্বান্তর্যামী। ॥৪৫॥

তথাপি আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমার উপর আপনার কৃপা ভিন্ন আর কিছু নহে। কৈকেয়ী শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক বিষয়ক বিঘ্ন ও রাম বনবাসাদি বিষয়ে যাহা কিছু কর্ম করিয়াছেন, হে মুনিশ্রষ্ঠ! আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে (অর্থাৎ আপনার শ্রীচরণই আমার এ বিষয়ে সাক্ষী) এ বিষয়ে আমি কিছু জানিতাম না।" ॥৪৬-৪৭॥

এইরূপ বলিয়া ভরত অতি দুঃখিত চিত্তে মুনির চরণযুগল স্পর্শ করতঃ বলিলেন—"ভগবন্! আমি দোষী বা নির্দোষ অর্থাৎ কপট বা নিষ্কপট ইহা আপনি জানিতে সমর্থ। ॥৪৮॥

হে স্বামিন্! মহারাজ রাম বিদ্যমান থাকিতে আমার রাজ্যের কি প্রয়োজন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তো শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যদাস। ॥৪৯॥

হে মুনিবর! আমি শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইব এবং রাজ্য ও সম্ভার সামগ্রী সমূহ তাঁহাকে এখানেই সমর্পণ করিব। ॥৫০॥

এবং বশিষ্ঠ আদি পুরজন ও জনপদবাসিগণ সহ মিলিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষেক করতঃ অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইব এবং অতি তুচ্ছ দাসের ন্যায় লক্ষ্মীপতি শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিব। ॥৫১॥

মুনীশ্বর ভরতের বচন শুনিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করতঃ অতি বিস্ময়ের সহিত তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ॥৫২॥

তিনি বলিলেন—"বৎস! আমি জ্ঞানচক্ষুসহায়ে এইসব ভবিষ্যৎ ব্যাপার পূর্ব হইতে অবগত আছি। তুমি শোক করিও না। তুমি লক্ষ্মণ হইতেও শ্রীরামের পরম ভক্ত। ॥৫৩॥

হে নিষ্পাপ ভরত! সেনা সহিত তোমাদের সকলের আতিথ্য সংকার করিতে আমি ইচ্ছুক। আজ সেনা সহিত সকলে এই আশ্রমে ভোজন ও বিশ্রাম কর। আগামীকল্য শ্রীরামের সান্নিধ্যে গমন করিও।" ॥৫৪॥

ভরত বলিলেন—"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, তাহাই হইবে।" তখন মুনিবর ভরদ্বাজ আচমন করতঃ মৌনাবলম্বন পূর্বক যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট হইলেন। ॥৫৫॥

সেখানে বসিয়া সর্বমনোরথ-পূরণকারী মুনীশ্বর সর্বাভীষ্টপ্রদানকারিণী কামধেনুকে স্মরণ করিলেন। তখন কামধেনু সেই স্থানে আবির্ভূতা হইয়া ইচ্ছানুকূল অলৌকিক সর্বভোগ্য বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিল। ॥৫৬॥

তখন তিনি সেনাসহিত ভরতাদি সকলকে যথেষ্ট ভোগ্য দ্রব্যসমূহ প্রদান করিলেন, তাহাতে সকল সৈনিকগণও পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। ॥৫৭॥

যোগিরাজ ভরদ্বাজ শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্বপ্রথম মুনিবর বশিষ্ঠের পূজা করতঃ তদনন্তর সেনাসহিত ভরতকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ॥৫৮॥

এই প্রকারে সেই স্বর্গসদৃশ আশ্রমে একদিন নিবাস করতঃ প্রাতঃকালে মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞানুক্রমে অনুজ শত্রুঘ্নসহ ভরত শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যে গমন করিলেন। ॥৫৯॥

চিত্রকূটের নিকট পৌঁছিয়া তিনি সৈনিকগণকে দূরে অবস্থান করিতে বলিলেন এবং শ্রীরামদর্শন লালসায় ভরত স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। ॥৬০॥

পরন্তপ ভরত শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র ও গুহককে সঙ্গে লইয়া সমস্ত তপস্বিগণের আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রকে সন্ধান করিতে করিতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ॥৬১॥

কোথায়ও শ্রীরামচন্দ্রের কুটিরের সন্ধান না পাইয়া ভরত ঋষিমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র কোথায় নিবাস করিতেছেন?" ॥৬২॥

তাঁহারা বলিলেন—"সম্মুখস্থিত পর্বতের পশ্চাতভাগে মন্দাকিনী গঙ্গার উত্তর তটে বনরাজি সুশোভিত নির্জন স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের পরম রমণীয় কুটির বিরাজমান। ॥৬৩॥

সেই স্থল আম্র, পনস এবং কদলী বৃক্ষদ্বারা সমাবৃত ও বহু চম্পক, কাঞ্চন এবং নাগকেশর আদি পুষ্পবৃক্ষদ্বারা সুশোভিত।" ॥৬৪॥

মুনিগণ কর্তৃক এইপ্রকার স্থান নির্দেশের অনন্তর ভরত অতি প্রসন্নতাপূর্বক মন্ত্রিগণ সহ সর্বাগ্রে শ্রীরঘুনাথের নিবাস স্থানের অভিমুখে চলিলেন। ॥৬৫॥

ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দূর হইতেই মুনিগণ সেবিত অতি সুন্দর প্রকাশমান শ্রীরামচন্দ্রের কুটির ভ্রাতাসহ ভরতের দৃষ্টিগোচর হইল। সেইস্থানে বৃক্ষশাখোপরি লম্বমান বল্কলবস্ত্র ও

মৃগচর্ম শোভা পাইতেছিল এবং শ্রীরামচন্দ্রের নিবাস হেতু উহা অতি রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অযোধ্যা কাণ্ডে অষ্টম সর্গ

নবম সর্গ

ভগবান রাম ও ভরতের মিলন, ভরতের অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাবর্তন এবং শ্রীরামচন্দ্রের অত্রিমুনির আশ্রমে গমন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

তদনন্তর ভরত অতি আনন্দের সহিত আশ্রমের সমীপে সীতা ও শ্রীরামচন্দ্রের চরণচিহ্ন সুশোভিত অতি সুন্দর পবিত্র স্থানে পৌঁছিলেন। ॥১॥

সেখানে তাঁহারা সর্বত্র ভগবান রামচন্দ্রের বজ্র অঙ্কুশ কমল আদি চিহ্ন সুশোভিত এবং পৃথিবীর পক্ষে অতি মঙ্গলময় চরণচিহ্ন সকল দেখিতে পাইয়া সেই চরণ রজোপরি পুনঃ পুনঃ ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ॥২॥

মনে মনে ভরত বলিতে লাগিলেন—"অহো! আমি পরম ধন্য। যাঁহার চরণরজ লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সমগ্র শ্রুতিসমূহ সদা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন সেই চরণারবিন্দ-চিহ্ন-সুশোভিত ভূমিপৃষ্ঠ আজ আমি দর্শন করিতেছি।" ॥৩॥

এই প্রকারে অদ্ভুত প্রেমরস-সিঞ্চিত-হৃদয়, শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তনে মগ্ন মন. আনন্দাশ্রুতে সিক্ত বক্ষস্থল ভরত ধীরে ধীরে শ্রীহরির আশ্রমের নিকটে পৌঁছিলেন। ॥৪॥

সেখানে তিনি দুর্বাদলসম শ্যামবর্ণ শরীর ও বিশাল নয়ন, জটামুকুটধারী, নবীন বল্কল বস্ত্র পরিহিত, প্রসন্নবদন, বালসূর্য-ন্যায় প্রকাশমান শ্রীরঘুনাথকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। ॥৫॥

শ্রীরামচন্দ্র তখন জনকনন্দিনী সীতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলেন এবং সুমিত্রানন্দন শ্রীলক্ষ্মণ তাঁহার চরণকমল সেবা করিতেছিলেন। ভগবানকে দেখিতে পাইয়াই ভরত যুগপৎ শোক ও হর্ষমগ্ন চিত্তে দ্রুতবেগে যাইয়া তাঁহার চরণ যুগল ধারণ করিলেন। ॥৬॥

সুদীর্ঘবাহু শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার দুই বাহু দ্বারা ভরতকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করতঃ স্বীয় ক্রোড়ে বসাইলেন ও অশ্রুবারি সিঞ্চন করিতে করিতে তাহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ॥৭॥

জল-তৃষ্ণার্ত গো-সকল যেরূপ জলের দিকে ধাবিত হয়, সেই প্রকার কৌশল্যাদি সর্বমাতাগণও শ্রীরঘুনাথকে দর্শন করিবার জন্য অতি ত্বরান্বিত হইয়া তথায় পৌঁছিলেন। ॥৮॥

স্বীয় মাতা কৌশল্যাকে দেখিয়াই শ্রীরাম সত্বর উঠিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, এবং মাতাও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ॥৯॥

শ্রীরঘুনাথ অন্যান্য মাতাগণকেও ঐ প্রকার প্রণাম করিলেন। অতঃপর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'আমি ধন্য! আমি ধন্য'। পুনঃ শ্রীরঘুনাথ সকলকে যথাযোগ্য উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥১০-১১॥

"বলুন, আমার পূজ্য পিতৃদেব কুশলে আছেন তো? আমার বিয়োগে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি আমাকে কিছু আদেশ করিয়াছেন কি?" তখন বশিষ্ঠ মুনি বলিলেন—"হে রঘুনন্দন। তোমার বিয়োগে অতি সন্তপ্ত হইয়া তোমার পিতা 'হে রাম! হে রাম!' 'হে সীতে!' 'হে লক্ষ্মণ'! এইরূপ বিলাপ করতঃ তোমাকে চিন্তা করিতে করিতেই স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।" ॥১২-১৩॥

কর্ণে শূলাঘাততুল্য এই বচন গুরুমুখে শুনিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ 'হা হতোঽস্মি!' এই প্রকার বলিয়া রোদন করিতে করিতে সহসা ভূপতিত হইলেন। ॥১৪॥

তখন সমস্ত মাতাগণ এবং উপস্থিত সকলেও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বারম্বার বলিতে লাগিলেন—"হে তাত! হে দয়াময়! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় চলিয়া গেলেন? ॥১৫॥

হে মহাবাহো! এখন আমি অনাথ হইয়া গেলাম। আপনি বিনা এখন কে আর আমাকে স্নেহ বা আদর করিবেন।" সীতা এবং লক্ষ্মণও এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ॥১৬॥

তখন মুনিবর বশিষ্ঠ শান্তিময় বচন সহায়ে সকলের এই শোক শান্ত করিলেন। তৎপরে সকলে একত্রিত হইয়া মন্দাকিনী গঙ্গায় গমন করিলেন এবং সেখানে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইলেন। ॥১৭॥

সকলে সেখানে জলাকাঙ্ক্ষী মহারাজ দশরথকে জলাঞ্জলি দিলেন এবং লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র পিণ্ড প্রদান করিলেন। ॥১৮॥

"আমাদের যাহা অন্ন আমাদের পিতৃগণেরও তাহাই অন্ন, ইহাই স্মৃতির আদেশ," এইরূপ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র 'ইঙ্গুদী' ফলের পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করিলেন। ॥১৯॥*

অতঃপর শ্রীরাম শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে পুনরায় স্নান করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অন্য সকলেও এই প্রকার সুদীর্ঘকাল শোক ও ক্রন্দনাদি করিয়া তৎপর স্নান করতঃ আশ্রমে আগমন করিলেন। ॥২০॥

ঐ দিবস সকলেই উপবাস করিলেন। পরদিবস মন্দাকিনীর নির্মল জলে স্নান সমাপনান্তে ভরত আশ্রমে উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—"হে রাম! হে রাম! হে মহাভাগ! এখন আপনার রাজ্যাভিষেক হউক। ॥২১-২২॥

---

* (ইঙ্গুদী - তৈলপ্রদ তাপসতরু। 'শব্দসার', গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।)

এই পৈতৃক রাজ্য আপনারই, আপনি ইহা পালন করুন। আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব আপনি আমাদের পিতৃতুল্য। মহারাজ! ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধর্ম প্রজাপালন। ॥২৩॥

অতএব বহুবিধ অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত ও দেব যজনাদি স্মার্ত কর্ম সমাপন ও বংশ বিস্তারার্থ পুত্র উৎপন্ন করতঃ আপনি যথাসময়ে যোগ্যপুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তৎপর বনে গমন করিবেন। ॥২৪॥

হে প্রভো! এখন আপনার বনবাস করিবার সময় নহে। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। আমার মাতা যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছেন তাহা মনে না রাখিয়া আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" ॥২৫॥

এইরূপ বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল স্বীয় মস্তকোপরি ভক্তিসহকারে ধারণপূর্বক ভরত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন। ॥২৬॥

শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে শীঘ্রই উঠাইয়া অতি প্রেমের সহিত আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন এবং স্নেহার্দ্রনয়নে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন— ॥২৭॥

"ভাই! আমি যাহা বলিতেছি তাহা শোন। তুমি যাহা কিছু বলিলে তাহা সবই ঠিক। কিন্তু শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব আমাকে চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে সম্পূর্ণ রাজ্য আমি এখন ভরতকে দিতেছি। ॥২৮-২৯॥

অতএব পিতা স্পষ্টতঃ এই রাজ্য তোমাকেই দিয়াছেন এবং তদ্রূপ দণ্ডকারণ্যের রাজ্য আমাকে দিয়াছেন। ॥৩০॥

অতএব আমাদের উভয়েরই অতি যত্নের সহিত পিতা যাহা বলিয়াছেন তাহাই করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি আপন পিতার বচন উল্লঙ্ঘন করতঃ স্বেচ্ছাচারী হয় সে জীবদ্দশাতেই মৃতক-তুল্য এবং দেহান্তে নরকে গমন করে। অতএব তুমি রাজ্য শাসন কর এবং আমি দণ্ডকারণ্য পালন করিব।" ॥৩১-৩২॥

তখন ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—"পিতা কামুক, মূঢ়বুদ্ধি, স্ত্রী বশীভূত, ভ্রান্তচিত্ত ও উন্মত্ত হইয়া এইরূপ যদি বলিয়া থাকেন তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণীয় নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ভ্রান্তপুরুষের বাক্য সমাদর করেন না।" ॥৩৩॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"পিতা স্ত্রীবশ, কামবশ অথবা মূঢ়বুদ্ধি হইয়া এরূপ করেন নাই। তিনি সত্যবাদী, পূর্বপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন বলিয়া সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে তিনি এই বর দিয়াছেন। ॥৩৪॥

মহান্ পুরুষগণ অসত্যকে নরকাপেক্ষাও অধিক ভয় করিয়া থাকেন। আমি 'এইরূপই করিব' ইহা বলিয়া পিতার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ॥৩৫॥

আরও দেখ, রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি আপন প্রতিজ্ঞা কি করিয়া উল্লঙ্ঘন করিব?" রামের বচন শুনিয়া ভরত তাঁহাকে বলিলেন— ॥৩৬॥

"হে উত্তম ব্রতধারী ভ্রাতঃ! পিতার বচনানুসারে আমি চতুর্দশ বর্ষ আপনার ন্যায় বল্কল বস্ত্র ধারণ করতঃ বনে বাস করিব, আপনি সুখপূর্বক রাজ্য পালন করুন।" ॥৩৭॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"পিতা তোমাকেই এই রাজ্য এবং আমাকে বনবাস দিয়াছেন। এখন আমি যদি তাহার বিপরীত আচরণ করি তাহা হইলে পূর্ববৎ অসত্যাচরণই হইবে।" ॥৩৮॥

ভরত বলিলেন—"(যদি আপনি বন হইতে প্রত্যাবর্তন না করেন তাহা হইলে) আমিও লক্ষ্মণের ন্যায় বনে যাইয়া আপনার সেবা করিব নতুবা আমি অন্ন-জল পরিত্যাগ পূর্বক প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিব।" ॥৩৯॥

এইরূপে আপনার দৃঢ় সংকল্প প্রকট করতঃ মনে মনেও তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ ভরত রৌদ্রতপ্ত ভূমিতে বিস্তৃত কুশোপরি পূর্বাস্য হইয়া উপবেশন করিলেন। ॥৪০॥

ভরতের এইরূপ দৃঢ় আগ্রহ দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং গুরু বশিষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে ইশারা করিলেন। ॥৪১॥

তখন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ভরতকে অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিলেন "বৎস! আমি তোমাকে অতি গুহ্য সুনিশ্চিত রহস্যবার্তা বলিতেছি, তাহা শোন। ॥৪২॥

ভগবান রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ! পূর্বকালে ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে তিনি রাবণ বধার্থ মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ॥৪৩॥

ভগবচ্ছক্তি যোগমায়াও জনকনন্দিনী সীতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শেষনাগও লক্ষ্মণরূপে উৎপন্ন হইয়া সর্বদা শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করিতেছেন। ॥৪৪॥

রাবণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহারা বনে অবশ্যই যাইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৈকেয়ীর বরদান ও নিষ্ঠুর ভাষণাদি যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সকলই দেবতাগণের প্রেরণা বশতঃ হইয়াছে, নতুবা তিনি ঐরূপ বলিবেন কেন? অতএব হে তাত! তুমি রামকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আগ্রহ পরিত্যাগ কর। ॥৪৫-৪৬॥

মাতাগণ ও এই বিশাল সেনাগণ সহ তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া চল ; শ্রীরাম শীঘ্রই সবংশ রাবণ বধ করতঃ ফিরিয়া আসিবেন।" ॥৪৭॥

গুরুর এইরূপ বচন শুনিয়া ভরত অতি বিস্মিত হইলেন এবং বিস্ময়-উৎফুল্ল-নয়নে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে গমন করতঃ বলিলেন— ॥৪৮॥

"হে রাজেন্দ্র! রাজ্য শাসনার্থ আপনি স্বকীয় জগৎপূজ্য-চরণ-পাদুকা আমাকে প্রদান করুন। আপনার প্রত্যাগমন কাল পর্যন্ত আমি তাহার সেবা করিব।" ॥৪৯॥

ইহা বলিয়া ভরত তাঁহার যুগল চরণে দুইটি দিব্যপাদুকা যোজনা করিলেন, শ্রীরামচন্দ্রও ভরতের ভক্তিভাব দেখিয়া সেই পাদুকাদ্বয় তাহাকে প্রদান করিলেন। ॥৫০॥

রত্ন জড়িত সেই দিব্য পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে পরিক্রমা করতঃ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। ॥৫১॥

ভক্তিবশে গদ্‌গদকণ্ঠে ভরত পুনরায় বলিলেন—"হে রাম! চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তৎপর প্রথম দিবসেই যদি আপনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন না করেন, তাহা হইলে আমি অগ্নি প্রবেশপূর্বক প্রাণত্যাগ করিব।" তখন শ্রীরামচন্দ্র 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া ভরতকে বিদায় দিলেন। ৷৷৫২-৫৩৷৷

তদনন্তর বুদ্ধিমান ভরত সম্পূর্ণ সেনা, মুনিবর বশিষ্ঠ, শত্রুঘ্ন, সর্বমাতাগণ এবং মন্ত্রিগণ সহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ৷৷৫৪৷৷

ইত্যবসরে একটু নির্জন স্থানে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে ব্যাকুল হইয়া করজোড়ে কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—'হে রাম! মায়া মুগ্ধচিত্ত হইয়াছিলাম বলিয়া দুষ্টবুদ্ধিসহায়ে আমি তোমার রাজ্যাভিষেকের সময় যাহা কিছু বিঘ্ন সম্পাদন করিয়াছি আমার সেই সব দুরাচার তুমি ক্ষমা করিও, কারণ সৎপুরুষগণ সদা ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন। ৷৷৫৫-৫৬৷৷

তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভগবান, অব্যক্ত পরমাত্মা ও সনাতন পুরুষ। মায়িক মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া তুমি সমস্ত সংসারকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। তোমারই প্রেরণায় সর্বলোক শুভ বা অশুভ কর্ম করে। ৷৷৫৭৷৷

এই সম্পূর্ণ বিশ্ব তোমারই অধীন বলিয়া কেহ স্বয়ং স্বাধীনরূপে কিছু করিতে পারে না, কৃত্রিম নর্তকী (কাষ্ঠ পুত্তলিকা) যেরূপ সূত্রধরের (বাজীকরের বা কুহকের) ইচ্ছানুসারে নৃত্য করিয়া থাকে সেইরূপ। ৷৷৫৮৷৷

বহুরূপিণী, মায়ারূপিণী নর্তকী তোমারই অধীন। হে শত্রুদমন! দেবগণের কার্যসিদ্ধি করিতে ইচ্ছুক তোমারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাপিনী আমি দুষ্টবুদ্ধিপূর্বক এই পাপ কর্ম করিয়াছিলাম। আজ আমি তোমার স্বরূপ অবগত হইয়াছি। তুমি দেবগণেরও মনবাণীর অগোচর। ৷৷৫৯-৬০৷৷

হে বিশ্বেশ্বর! হে অনন্ত! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে জগন্নাথ! তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! আমি তোমার শরণাগত। তুমি জ্ঞানাগ্নিরূপ খড়্গ দ্বারা পুত্র ও ধনাদি বিষয়ক আমার স্নেহ বন্ধন ছেদন কর!" কৈকেয়ীর বচন শুনিয়া মৃদুহাস্য সহকারে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন— ৷৷৬১-৬২৷৷

"হে মহাভাগে! (মহাভাগ্য শালিনী) তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ তাহা সত্যই বলিয়াছ, মিথ্যা নহে। দেবগণের কার্যসিদ্ধি করিবার জন্যই আমারই প্রেরণা বশতঃ তোমার মুখ হইতে অনর্থকারিণী যাবতীয় বাণী নির্গত হইয়াছে। ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। এখন তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ অহর্নিশি নিরন্তর আমাকেই হৃদয়ে চিন্তা করিও। সেই চিন্তার প্রভাবে সর্বত্র পুত্র বিত্তাদি বিষয়ক স্নেহরহিত হইয়া মদ্‌ভক্তি সহায়ে অচিরে মোক্ষলাভ করিবে। আমি সর্বত্র সমদর্শী। আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। ৷৷৬৩-৬৫৷৷

মায়াবী পুরুষ (যাদুকর) যেমন আপন মায়া রচিত পদার্থের প্রতি কোন রাগ বা দ্বেষ করে না, আমারও সেইপ্রকার কাহারও প্রতি রাগ বা দ্বেষ নাই। যে ব্যক্তি যে প্রকারে আমার আরাধনা করিয়া থাকে আমিও তদ্রূপ ফল প্রদান দ্বারা তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে মাতঃ! আমার মায়াদ্বারা মোহিত হইয়াই সর্বলোক আমাকে সুখ-দুঃখ-ভোগী সাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া থাকে। তাহারা আমার যথার্থ স্বরূপ জানে না। হে মাতঃ! তোমার মহাভাগ্য যে সংসার-ভয় দূর করিতে সমর্থ মদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান তোমার উৎপন্ন হইয়াছে। ॥৬৬-৬৭॥

তুমি গৃহে থাকিও এবং সর্বদা আমাকে স্মরণ করিও, তাহা হইলে আর তুমি কর্ম বন্ধনে বদ্ধ হইবে না।" শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকাব বলিবার পর কৈকেয়ী অতিশয় আনন্দ ও বিস্ময়পূর্বক শ্রীরামচন্দ্রকে পরিক্রমা করিলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য প্রণামপূর্বক প্রসন্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভরত ও তদ্রূপ মন্ত্রিগণ, মাতাগণ এবং গুরু বশিষ্ঠসহ শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে অযোধ্যাভিমুখে শীঘ্রই যাত্রা করিলেন। উদারবুদ্ধি ভরত সমস্ত পুরবাসী ও দেশবাসিগণের অযোধ্যাপুরীতে যথাযোগ্য নিবাসের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। সেই স্থানে এক সিংহাসনোপরি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় স্থাপন করিয়া, যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রকেই পূজা করিতেছেন এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই পাদুকাদ্বয়ের গন্ধপুষ্প ও অক্ষতাদি এবং সম্পূর্ণ রাজোচিত সামগ্রীসহ নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন সহিত ভরত নিত্য ফল-মূল আহার, ইন্দ্রিয়দমন, জটা বল্কলধারণ, ভূমিশয়ন এবং ব্রহ্মচর্য পালনে ব্রতী হইলেন। ॥৬৮-৭৩॥

পৃথিবীতে রাজকার্য যাহা কিছু হইত তাহা সবই ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা সম্মুখে নিবেদন করতঃ সম্পাদন করিতেন। ॥৭৪॥

এই প্রকারে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় নিত্য দিন গণনা করতঃ রামার্পিত মন শ্রীভরত সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। ॥৭৫॥

এদিকে মুনিগণ পরিবৃত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বতে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। ॥৭৬॥

সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বতে বিরাজ করিতেছেন শুনিয়া শ্রীরামদর্শন লালসায় নগরবাসিগণ সর্বদা তথায় আসিতে লাগিলেন। ॥৭৭॥

শ্রীরামচন্দ্র এই রূপ জনসংঘাত দেখিয়া (উহাতে আশ্রম পীড়া হইবে ভাবিয়া) এবং দণ্ডকারণ্যে গমনানন্তর তাঁহার ভাবী কার্যক্রম বিষয়ে বিচার করতঃ চিত্রকূট পর্বত পরিত্যাগ করিলেন। ॥৭৮॥

অতঃপর সে স্থান হইতে প্রস্থান করতঃ সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামচন্দ্র 'অত্রি মুনির জনসমূহ বর্জিত পরম সুখপূর্বক নিবাসযোগ্য অতি উত্তম আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ॥৭৯॥

সেখানে পৌঁছিয়া সম্পূর্ণ তপোবনের প্রকাশকারী, আশ্রমে বিরাজমান মুনীশ্বর (অত্রি) সমীপে যাইয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ বলিলেন—"আমি রাম, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ॥৮০॥

আমি পিতার আজ্ঞায় দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছি। বনবাসের ছলে আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।" ॥৮১॥

শ্রীরামচন্দ্রের এই বচন শুনিয়া মুনীশ্বর তাঁহাকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম জ্ঞানে অতিশয় ভক্তিপূর্বক বিধিবৎ পূজা করিলেন। অতঃপর বনজাত ফলমূলাদি সহায়ে আতিথ্য সৎকার করতঃ অত্রিমুনি, আসনোপরি বিরাজমান রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণকে অতি প্রসন্নতা পূর্বক এই প্রকার বলিলেন— ॥৮২-৮৩॥

'অনসূয়া' নামে বিখ্যাত আমার পত্নী অতিবৃদ্ধা দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা করিতেছেন, ধর্মজ্ঞা ও ধর্মে প্রীতিমতী। ॥৮৪॥

এই সময়ে তিনি কুটিরের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন। হে শত্রুদমন রাম! সীতা তাঁহাকে দর্শন করুন।" তখন কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র 'অতি উত্তম' বলিয়া জানকীকে বলিলেন— ॥৮৫॥

"হে শুভে! যাও, শীঘ্রই দেবী অনসূয়াকে প্রণাম করিয়া আইস"। সীতাও 'অতি উত্তম' বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা পালন করিলেন। ॥৮৬॥

আপন সম্মুখে সীতাকে দণ্ডবৎ প্রণতা দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে অনসূয়া 'হে বৎসে সীতে!' এইরূপ বলিয়া সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভক্তিসহিত তাঁহাকে বিশ্বকর্মা নির্মিত দুইটি দিব্য কুণ্ডল এবং দুইটি শুভ্র ক্ষৌম (রেশমী) বস্ত্র প্রদান করিলেন। ॥৮৭-৮৮॥

শুভাননা অনসূয়া সীতাকে দিব্য অঙ্গরাগ প্রদান করতঃ বলিলেন—'হে কমলমুখি!' এই অঙ্গরাগ প্রয়োগ করিলে তোমার শারীরিক শোভা কখনও ম্লানপ্রাপ্ত হইবে না। ॥৮৯॥

হে জানকি! তুমি পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করতঃ সর্বদা শ্রীরামের অনুগামিনী হইয়া থাকিবে। (আমি আশীর্বাদ করিতেছি) শ্রীরঘুনাথ রামচন্দ্র তোমার সহিত নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করুন।"

অতঃপর অত্রিমুনি লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে বিধিপূর্বক ভোজন করাইলেন। তদনন্তর তিনি করজোড়ে শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় বলিলেন— ॥৯১॥

"হে রাম! সম্পূর্ণ ভুবন রচনা করতঃ আপনিই ইহার রক্ষণার্থ দেবতা, মনুষ্য এবং তির্যক্ আদি যোনিতে শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তথাপি দেহগুণ সহ আপনি লিপ্ত নহেন। অখিল-সংসার-মোহিনী মায়াও আপনার ভয়ে সন্ত্রস্তা।" ॥৯২॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে অযোধ্যা কাণ্ডে নবম সর্গ

অরণ্য কাণ্ড

অরণ্য কাণ্ড

প্রথম সর্গ

বিরাধ বধ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

সেইদিন অত্রিমুনির আশ্রমে নিবাস করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে স্নানাদির অনন্তর শ্রীরঘুনাথ মুনিবরের সম্মতি সহ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ॥১॥

শ্রীরাম বলিলেন—"হে মুনে! আমরা মুনিমণ্ডল সুশোভিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিব, সুতরাং আপনি আমাদের আজ্ঞাপ্রদান করুন। ॥২॥

আমাদের মার্গ প্রদর্শনার্থ আপনার কতিপয় শিষ্যদের আমাদের সহিত কিছুদূর পর্যন্ত যাইবার জন্য আদেশ করুন।" শ্রীরামচন্দ্রের উক্ত বচন শুনিয়া মহাযশস্বী অত্রিমুনি সহাস্যে শ্রীরঘুনাথকে বলিলেন—"হে রাম! হে রাম! হে দেবতাগণের আশ্রয় স্বরূপ! আপনি তো সকলের মার্গপ্রদর্শক, আপনার মার্গ প্রদর্শক কে হইবে? তথাপি বর্তমান সময়ে আপনি লোক ব্যবহারের অনুসরণ করিতেছেন। অতএব আমার শিষ্যগণ আপনাকে মার্গ প্রদর্শন করিবার জন্য অবশ্য যাইবে।" ॥৩-৪॥

অতঃপর শিষ্যগণকে আজ্ঞাপ্রদান করিয়া অত্রিমুনিও স্বয়ং কিছুদূর পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে চলিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে অধিক অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলে, অত্রিমুনি স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ॥৫॥

এক ক্রোশ পথ চলিবার পর শ্রীরামচন্দ্র সম্মুখে এক বিশাল নদী দেখিতে পাইলেন। তখন কমলনয়ন শ্রীরঘুনাথ অত্রিমুনির শিষ্যগণকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৬॥

"হে ব্রহ্মচারিগণ! এই নদী উত্তরণ করিবার কোন উপায় আছে বা নাই?" তখন শিষ্যগণ বলিলেন—"হে রঘুনন্দন! এখানে একটি সুদৃঢ় নৌকা আছে। ॥৭॥

উহাতে আপনাদিগকে আরোহণ করাইয়া একক্ষণের মধ্যেই নদীর অপর তীরে পৌঁছাইয়া দিব।" তখন মুনিকুমারগণ সীতা সহিত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে নদীর অপর তীরে পৌঁছাইয়া দিল। শ্রীরাম তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিলে তাহারা অত্রিমুনির আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিল। ॥৮-৯॥

তখন তাঁহারা ঝিল্লীরবে (ঝিঁ ঝিঁ পোকার রবে) গুঞ্জায়মান, বিবিধ বন্যপশু পরিপূর্ণ ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সঙ্কুল, এক ভয়ানক ঘোর বনে পৌঁছিলেন। ॥১০॥

ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষসগণ সেবিত সেই রোমাঞ্চকারী ঘোর বনে প্রবেশ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥১১॥

"ভাই! এখন হইতে আমাদের উভয়কে খুব সাবধানে চলিতে হইবে। আমি ধনুকে গুণ চড়াইয়া এবং হাতে বাণ লইয়া আগে আগে চলিব আর তুমি ধনুক ধারণ করতঃ পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চলিবে এবং জীব ও পরমাত্মার মধ্যস্থানে বিদ্যমান মায়ার ন্যায় শোভমানা সীতা আমাদের মধ্যস্থলে থাকিয়া চলিবেন। ॥১২-১৩॥

হে অরিন্দম (শত্রুদমন)! সাবধানতার সহিত চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখিবে। আমি পূর্বে যেরূপ শুনিয়াছিলাম তদনুসার এই দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসগণের মহাভয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ॥১৪॥

পরস্পর এই প্রকার কথা-বার্তা করিতে করিতে তাঁহারা দেড় যোজন (ছয় ক্রোশ = বার মাইল) পথ অতিক্রম করিলেন। সেখানে কুমুদ, কহ্লার ও কমল সুশোভিত এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। ॥১৫॥

কমল-বন ও শীতল জলপূর্ণ ঐ সরোবর অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহারা সরোবরের নিকটে যাইয়া উহার শীতল জল পান করিলেন। ॥১৬॥

কিছুক্ষণ সেই জলের ধারে একবৃক্ষের ছায়ায় তাঁহারা উপবেশন করিলেন। এই সময়ে এক মহাবলবান ও ভয়ানক রাক্ষসকে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন। ॥১৭॥

সুতীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রা (বৃহৎ-দন্ত)-বিকশিত-বদন ঐ রাক্ষসের উচ্চ গর্জন চতুর্দিকে অত্যন্ত ভীতি সঞ্চার করিতেছিল এবং উহার বাম স্কন্ধে একটি বৃহৎ ত্রিশূল ও তাহাতে বহু মনুষ্য গ্রথিত ছিল।

তাহাকে বহু বন্য হস্তি, ব্যাঘ্র ও মহিষ ভক্ষণ করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধনুকে জ্যা রোপণ করতঃ তাহা হস্তে ধারণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥১৯॥

"ভাই! দেখ, আমাদের সম্মুখে বীরুপুরুষগণের ভয় উৎপাদনকারী এক মহাকায় রাক্ষস আসিতেছে। ॥২০॥

তুমি ধনুকে বাণ আরোপ করতঃ সাবধান হও। জানকি! তুমি ভীত হইও না"। এইরূপ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রও ধনুকে বাণ আরোপ করতঃ পর্বতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ॥২১॥

তদনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীকে দেখিয়া সেই রাক্ষস উচ্চ অট্টহাস্যে সকলকে ভয়ভীত করতঃ এইরূপ বলিল— ॥২২॥

"হে বালকদ্বয়! বাণ তূণীর ও জটা বল্কল মুনিবেশধারী তোমরা কে? তোমাদের সঙ্গে একটি স্ত্রীও দেখিতেছি। মনে হইতেছে তোমরা মদোন্মত্ত হইয়াছ। তোমরা সুন্দর সুদর্শন ও আমার মুখে প্রবিষ্ট গ্রাস তুল্য। হায়! হিংস্র জন্তুসঙ্কুল এই গহন বনে তোমরা কেন আসিয়াছ?" ॥২৩-২৪॥

রাক্ষসের এই বচন শুনিয়া মৃদুহাস্য সহকারে শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন—"আমার নাম রাম, ইনি আমার প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। ॥২৫॥

আর এই রমণী আমার প্রাণপ্রিয়া সীতা। আমরা পিতার আদেশে তোমাদের ন্যায় দুর্বৃত্তদের দমন করিবার জন্য বনে আসিয়াছি।" ॥২৬॥

শ্রীরামচন্দ্রের এই বচন শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস অট্টহাস্য করিল এবং মুখ বিস্তৃত করিয়া অতিশীঘ্র হাতে শূল উঠাইল এবং বলিল— ॥২৭॥

"রাম! তুমি কি আমাকে জান না? আমি জগৎ প্রসিদ্ধ বিরাধ (নামক রাক্ষস)। আমার ভয়ে সমস্ত মুনিগণ এই বন পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে। ॥২৮॥

যদি তোমার বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে অস্ত্রশস্ত্র সমূহ এবং সীতাকে এখানে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুত পলায়ন কর, নতুবা আমি এইক্ষণেই তোমাদের উভয়কে ভক্ষণ করিব।" ॥২৯॥

এইরূপ বলিয়া রাক্ষস সীতাকে ধরিবার জন্য তাঁহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। তখন শ্রীরামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে শর নিক্ষেপ করতঃ তাহার দুইটি বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ॥৩০॥

ইহাতে অত্যন্ত ক্রোধসন্তপ্ত হইয়া স্বীয় বিকরাল মুখব্যাদন করতঃ সেই রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্রের অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইল। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার অভিমুখে ধাবমান বিরাধের পদদ্বয়ও বাণ সহায়ে ছেদন করিলেন। ইহা বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড হইল। ॥৩১-৩২॥

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্রকে সর্পের ন্যায় মুখব্যাদন করতঃ গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইলে তিনি (রামচন্দ্র) একটি অর্দ্ধ চন্দ্রাকার বাণ দ্বারা বিরাধের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রুধিরাপ্লুত হইয়া সেই রাক্ষস ভূপতিত হইল। এই প্রকারে রাক্ষসের মৃত্যুদর্শন করিয়া সীতা রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করতঃ তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিলেন। ॥৩৩-৩৪॥

ঐ সময় আকাশে দেবগণ দুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন, অপ্সরাগণ হৃষ্টচিত্তে নৃত্যপরায়ণ হইলেন এং গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ॥৩৫॥

এই সময় বিরাধের মৃত শরীর হইতে নির্গত, আকাশস্থ সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান, সুন্দর বস্ত্র সুশোভিত এবং তপ্ত সুবর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত অতি সুন্দর এক পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইল। ॥৩৬॥

এই পুরুষ শরণাগত জনগণের দুঃখহারী, সংসার সাগর হইতে উদ্ধারকারী, কৃপাময় শ্রীরামচন্দ্রজীকে প্রসন্নচিত্তে প্রণাম করিল। পুনরায় ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া শরণাগতবৎসল ভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। ॥৩৭॥

বিরাধ বলিল—"হে কমললোচন শ্রীরাম! আমি পূর্বজন্মে নির্মল প্রকাশমান বিদ্যাধর (দেবযোনি বিশেষ) ছিলাম। পূর্বে বিনা কারণে ক্রোধমূর্তি দুর্বাসা আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। আজ আমাকে আপনি সেই অভিশাপ মুক্ত করিলেন। ॥৩৮॥

এখন আপনি আমাকে এইরূপ কৃপা করুন, যাহাতে ভবিষ্যতে আমি সর্বদা সংসার বন্ধন মোচনকারী আপনার চরণারবিন্দ স্মরণ করিতে পারি, আমার বাণী যেন সর্বদা আপনার নাম সঙ্কীর্তন করিতে পারে, আমার কর্ণদ্বয় যেন সর্বদা আপনার কথামৃত পানে মগ্ন থাকে, আমার হস্তদ্বয় যেন আপনার চরণকমলের পূজাতে সর্বদা রত থাকে এবং আমার মস্তক যেন আপনার চরণকমলে সর্বদা প্রণাম করিতে ব্যাপৃত থাকে। ॥৩৯-৪০॥

হে বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্তি ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। হে সৎস্বরূপে সদা বিহারকারী শ্রীরাম। হে মায়াসহ সদা বিরাজমান শ্রীসীতারাম, সংসার রচনাকারী আপনাকে নমস্কার। ॥৪১॥

হে রাম! আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনার আজ্ঞা লইয়া আমি এখন দেবলোকে গমন করিতেছি। আপনি কৃপা করুন, যাহাতে আমি আর আপনার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।" ॥৪২॥

বিরাধের এই প্রকার প্রার্থনা শুনিয়া মহামতি শ্রীরঘুনাথ প্রসন্নচিত্তে তাহাকে এই বর দিলেন— ॥৪৩॥

"হে বিদ্যাধর! তুমি এখন প্রস্থান কর। তুমি মায়ার সম্পূর্ণ গুণ ও দোষ সমূহকে জয় করিয়াছ। তুমি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, আমার দর্শন প্রভাবে তুমি সদ্য মুক্ত হইলে। ॥৪৪॥

সংসারে আমার ভক্তি (রামভক্তি) অত্যন্ত দুর্লভ,কারণ এই ভক্তি একবার উৎপন্ন হইলেই অবশ্যই মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাকে। তুমি আমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন। অতএব আমার আজ্ঞায় তুমি পরমধাম প্রাপ্ত হইবে।" ॥৪৫॥

এই প্রকার শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক ভয়ঙ্কর রাক্ষসবধ, তাহার শাপবিমুক্তি, বরপ্রদান এবং পুনরায় বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্তি (অনুষ্ঠিত হইল)। যে ব্যক্তি এই লীলাসমূহ কীর্তন সহায়ে শ্রীরামচন্দ্রজীকে স্তুতি করিয়া থাকেন তিনি অবশ্য সম্পূর্ণ বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্ত হন। ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অরণ্য কাণ্ডে প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ আদি মুনীশ্বরগণের সহিত মিলন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

বিরাধ স্বর্গ গমন করিবার পর শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শরভঙ্গ মুনির সর্বসুখদায়ক তপোবনে গমন করিলেন। ॥১॥

শ্রীরামচন্দ্রজী সীতা ও লক্ষ্মণ সহ আসিতেছেন দেখিয়া বুদ্ধিমান শরভঙ্গ অতি সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ॥২॥

অতঃপর তিনি অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের উত্তমরূপে পূজা করতঃ আসনে উপবেশন করাইলেন এবং কন্দমূল ফলাদি সহায়ে তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করাইলেন। ॥৩॥

তদনন্তর মুনিবর শরভঙ্গ ভক্তবৎসল ভগবান রামচন্দ্রকে অতি প্রীতির সহিত বলিলেন—"বহুকাল যাবৎ আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তপস্যায় নিশ্চয় করতঃ আমি এখানে নিবাস করিতেছি। হে রাম! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আমি তপস্যার দ্বারা বহু পুণ্য যাহা লাভ করিয়াছি তাহা আজ আপনাকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করতঃ আমি মোক্ষপদ লাভ করিব।" ॥৪-৫॥

এইরূপ বলিয়া মহাবৈরাগ্যবান যোগীশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ আপনার মহান পুণ্যফল শ্রীরামচন্দ্রজীকে সমর্পণ করিয়া সীতা সহিত অপ্রমেয় শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করতঃ চিতার উপর আরোহণ করিলেন। ॥৬॥

তখন মুনিবর সর্বান্তর্যামী, দূর্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কমলনয়ন, চীরাম্বরধারী, স্নিগ্ধ জটাজুটধারী শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধ্যান করিতে লাগিলেন। ॥৭॥

(তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন) "অহো! শ্রীরঘুনাথ বিনা, স্মরণমাত্র কামনাপূরণকারী, আর কে দয়ালু এই সংসারে আছেন? আমি অনন্যচিত্তে নিত্য তাঁহার স্মরণ করিতাম। আমার সেই স্মরণ জ্ঞাত হইয়া তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ॥৮॥

দেবেশ, দশরথ নন্দন, ভগবান রাম আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকুন, আমি আমার শরীর অগ্নিতে ভস্মীভূত করতঃ নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতেছি। ॥৯॥

যাঁহার বামাঙ্কে মেঘে বিদ্যুল্লতার ন্যায় সীতা বিরাজমান সেই অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র আমার হৃদয়ে সর্বদা বিরাজিত থাকুন।" ॥১০॥

এই প্রকারে দীর্ঘকাল শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিতে করিতে এবং সম্মুখে বিরাজমান তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে মুনিবর শরভঙ্গ সহসা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্বীয় পাঞ্চভৌতিক শরীর ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং দিব্য দেহ ধারণ করতঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তদনন্তর দণ্ডকারণ্যবাসী সকল মুনিগণ শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমবেত হইলেন। ॥১১-১২॥

মুনি সঙ্ঘকে দর্শন করিয়া মায়া মনুষ্যরূপী শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে সহসা ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিলেন। ॥১৩॥

মুনীশ্বরগণ আশীর্বাদ দ্বারা সর্বান্তর্যামী শ্রীরামচন্দ্রকে অভিনন্দন করিলেন এবং ধনুর্বাণধারী শ্রীহরিকে (রামচন্দ্রকে) করজোড়ে বলিতে লাগিলেন— ॥১৪॥

"ব্রহ্মার প্রার্থনাবশে আপনি পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা ইহাও জানি যে আপনি সাক্ষাৎ শ্রীহরি, জানকী লক্ষ্মী, লক্ষ্মণ শেষনাগের অংশ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন ভগবানের শঙ্খ ও চক্রস্বরূপ। অতএব সর্বপ্রথমে আপনি এখানে ঋষিগণের দুঃখ দূর করুন। ॥১৫-১৬॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আসুন, সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত আপনি আমাদের সঙ্গে ক্রমশঃ মুনীশ্বরগণের আশ্রম সমূহ দর্শন করিবেন। এইরূপ করিলে আমাদের প্রতি আপনার করুণা বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইবে।" ॥১৭॥

মুনীশ্বরগণ এই প্রকারে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবার পর ভগবান রামচন্দ্র মুনিগণ সহ তাঁহাদের তপোবন দর্শনার্থ গমন করিলেন। ॥১৮॥

সেখানে তিনি চতুর্দিকে সর্বত্রপতিত বহু অস্থিভূত নৃকরোটি (মাথার খুলি) দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥১৯॥

"এই অস্থিসমূহ কাহাদের? এবং কেনই বা এই তপোভূমিতে নৃকঙ্কাল সমূহ ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে?" তখন মুনীশ্বরগণ বলিলেন—"হে রাম! এই সকল ঋষিগণের মস্তকের অস্থি। ॥২০॥

এই সমস্ত ঋষিগণকে রাক্ষসগণ ভক্ষণ করিয়াছে। সমাধি মগ্নতা বশতঃ পলায়নে অসমর্থ মুনীশ্বরগণকে ভক্ষণ করিবার অবকাশ অন্বেষণ করতঃ রাক্ষসগণ যত্রতত্র বিচরণ করিয়া থাকে।" ॥২১॥

মুনিগণের এইরূপ ভয় ও দৈন্যপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রজী সমস্ত রাক্ষসকুলের বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। ॥২২॥

এইরূপে ক্রমশঃ মুনীশ্বরগণের আশ্রম দর্শন করিতে করিতে ও বনবাসী মুনিগণ দ্বারা নিত্য পূজিত হইয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথ সীতা ও লক্ষ্মণ সহ এখানে কতিপয় বৎসর নিবাস করিলেন। ॥২৩-২৪॥

তদনন্তর তাঁহারা ঋষিসঙ্ঘ সমাকুল, সর্বঋতুগুণ সম্পন্ন, সর্বকালে সুখদায়ক, সুবিখ্যাত, সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। ॥২৫॥

শ্রীরামচন্দ্রের আগমন বার্তা শুনিয়া অগস্ত্যের শিষ্য রামমন্ত্রের উপাসক সুতীক্ষ্ণ (তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য) স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে বিধিবৎ পূজা করিলেন। ঐ সময়ে ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য সুতীক্ষ্ণের নেত্র ভক্তিবশে উদ্বেল হইয়াছিল। সুতীক্ষ্ণ বলিলেন— ॥২৬॥

"হে অনন্তগুণ, অপ্রমেয় সীতাপতি! আমি আপনারই মন্ত্র জপ করিয়া থাকি। হে অভিরাম রাম! শিব ও ব্রহ্মা আপনারই চরণে আশ্রিত, আপনার চরণ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার পোত স্বরূপ। হে নাথ! আমি সর্বদা আপনার দাসানুদাস। ॥২৭॥

আপনি সর্বজগতের অগোচর (অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অবিষয়) তথাপি মলমূত্রের পিণ্ড এই শরীরের মোহপাশে বদ্ধহৃদয়, অতি দীন, আপনারই মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র এবং গৃহাদিরূপ অন্ধকূপে মগ্ন আমাকে দেখিয়া আপনি স্বয়ং (স্বীয় পুণ্য দর্শন সহায়ে আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য) আগমন করিয়াছেন। ॥২৮॥

আপনি সর্বপ্রাণী হৃদয়ে বিরাজমান, তথাপি আপনার মন্ত্রজপে বিমুখ ব্যক্তিগণকে স্বীয় মায়া প্রভাবে মোহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা ঐ মন্ত্রজপে তৎপর তাহাদের মায়া বিদূরিত হয়। এই প্রকারে রাজার ন্যায় আপনি সকলকে সেবানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ॥২৯॥

হে ঈশ! বস্তুত একমাত্র আপনিই এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। তথাপি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সহায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে প্রতিভাত হন। বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই সূর্য যে প্রকার বহুরূপে প্রতিভাত হয় সেই প্রকার অবিদ্যা মুগ্ধচিত্ত জনগণের নিকট আপনিও মনুষ্য, পশু আদি বিভিন্ন প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। ॥৩০॥

হে রাম! আপনি অজ্ঞানের পরপারে অবস্থিত। তথাপি আজ আমি আপনার চরণ কমল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। (ইহাতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে) আপনি সকলের সাক্ষীস্বরূপ হইলেও

এবং অসৎ পুরুষগণের অগোচর হইয়াও আপনার মন্ত্রজপে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের উপর আপনি সদা প্রসন্ন। ॥৩১॥

হে রাম! আপনি রূপরহিত, তথাপি মায়াবিলাসবশতঃ আপনার মনোহর মনুষ্যবেশধারী স্বরূপ আজ আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। কমনীয় ধনুর্বাণধারী আপনার এই রূপ কোটি কামদেবের তুল্য সুন্দর। আপনার হৃদয় দয়ার্দ্র এবং মৃদুহাস্য শোভিত মুখমণ্ডল অতীব মনোহর। ॥৩২॥

সীতা সহিত বিদ্যমান, মৃগচর্মধারী, সর্বথা অজেয়, যাঁহার চরণ কমল সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সর্বদা সেবা করিয়া থাকেন, এবং নীলকমলের ন্যায় যাঁহার গাত্রবর্ণ, সেই অনন্তগুণ সম্পন্ন, অত্যন্ত শান্ত, আমার মূর্তিমান সৌভাগ্য স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে আমি অহর্নিশি প্রণাম করিয়া থাকি। ॥৩৩॥

হে রাম! যাহারা আপনার স্বরূপ দেশকালাদি সর্বোপাধিরহিত এবং চৈতন্যঘন প্রকাশ স্বরূপ বলিয়া জানেন, তাহারা তদ্রূপেই আপনাকে জানুন ; কিন্তু আমার হৃদয়ে আপনার যে রূপ আমি আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই রূপই আমার নিকট সদা প্রকাশিত থাকুক। ইহার অতিরিক্ত আর কোন রূপ দর্শনের আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।" ॥৩৪॥

সুতীক্ষ্ণ এইপ্রকার স্তুতি করিবার পর শ্রীরামচন্দ্র মৃদু হাস্যসহকারে এই প্রকার বলিলেন—"হে মুনে! আমি ইহা জানি যে আমার উপাসনা বলে তোমার চিত্ত নির্মল হইয়াছে। ॥৩৫॥

মদতিরিক্ত অন্য কোন সাধন তোমার নাই। এই জন্যই আমি তোমাকে দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছি। ইহলোকে যাঁহারা আমার মন্ত্রের উপাসনা করেন এবং আমার শরণাগত, নিত্য নিরপেক্ষ এবং যাঁহারা আমাকে অনন্যগতি বলিয়া জানেন, তাঁহাদের আমি নিত্য দর্শন প্রদান করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি তোমার রচিত এবং আমার প্রিয় এই স্তোত্র সদা পাঠ করিয়া থাকে তাহার আমার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নির্মল জ্ঞান অবশ্য লাভ হয়। তুমি কেবল আমার উপাসনা বলেই (অজ্ঞান বন্ধন হইতে) জীবিতাবস্থাতেই সর্বথা মুক্ত হইয়াছ। ॥৩৬-৩৮॥

ইহা নিঃসন্দেহ যে দেহান্তকালে তুমি আমার সাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হইবে। এখন আমি তোমার গুরু মুনি-নায়ক অগস্ত্যজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার নিকট কিছুকাল বাস করিবার জন্য আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।" ॥৩৯॥

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন—"হে রাঘব! ইহা অতি উত্তম কথা। সেখানে আপনি আগামীকল্য যাইবেন। বহুদিন অতীত হইল আমি মুনীশ্বরকে দর্শন করিয়াছি। (অতএব তাঁহাকে পুনঃ দর্শনার্থ) আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।" ॥৪০॥

পরদিবস প্রাতঃকালে সীতা লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্য মুনির সহিত বার্তালাপ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুতীক্ষ্ণ মুনিকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে অগস্ত্যজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্নিজিহ্ব মুনির আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অরণ্য কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

মুনিবর অগস্ত্য সহ মিলন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

সেদিন মধ্যাহ্নকালে শ্রীরামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ অগস্ত্যমুনির অনুজ ভ্রাতা অগ্নিজিহ্ব মুনির আশ্রমে পৌঁছিলেন। ॥১॥

মুনি শ্রীরামচন্দ্রের সম্যক্ পূজাদি করিলেন এবং তৎপর শ্রীরামচন্দ্র তৎপ্রদত্ত কন্দমূল ফল আদি ভোজন এবং পরদিবস প্রাতঃকালেই অগস্ত্য মুনির আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। ॥২॥

সর্বঋতুর উপযোগী ফল পুষ্প পরিপূর্ণ, বিবিধ বন্যপশুসেবিত ও নানাপ্রকার পক্ষিগণের কাকলিতে গুঞ্জায়মান সেই অগস্ত্য আশ্রম নন্দন কাননের ন্যায় প্রতীত হইল।

ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি সেবিত, চতুর্দিকে ঋষিগণের আশ্রম সুশোভিত, সেই আশ্রম দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ॥৪॥

আশ্রমের বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ মুনিকে বলিলেন—"হে সুতীক্ষ্ণ! তুমি সত্বর মুনিবর অগস্ত্যজীর সমীপে গমন করতঃ তাঁহাকে সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত আমার এই স্থানে আগমন বার্তা নিবেদন কর।" তখন সুতীক্ষ্ণ 'ইহা বড় আনন্দের কথা' এইরূপ বলিয়া শীঘ্র গুরুর আশ্রমে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া সুতীক্ষ্ণ দেখিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য মুনিমণ্ডল—বিশেষতঃ রামভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া আসনে উপবিষ্ট এবং তিনি অতি ভক্তিপূর্বক আপন শিষ্যগণকে রামমন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন। ইহা দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ মুনিশ্রেষ্ঠ গুরু অগস্ত্যজীর নিকট গমন করতঃ বিনয়াবনত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং বুদ্ধিমান সুতীক্ষ্ণ বলিলেন—"ব্রহ্মণ্! দশরথনন্দন শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ আপনার দর্শনার্থ আসিয়াছেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে আশ্রমের বহির্দেশে দণ্ডায়মান।" ॥৫-৯॥

অগস্ত্যজী বলিলেন—"বৎস! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি শীঘ্র আমার হৃদয়বিহারী শ্রীরামচন্দ্রকে এইস্থানে আনয়ন কর। আমি নিত্য তাঁহার ধ্যান করিতেছি এবং তাঁহার দর্শনেচ্ছায় এইস্থানে অবস্থান করিতেছি। ॥১০॥

এইরূপ বলিয়া তিনি অতি ব্যগ্রতার সহিত মুনিগণ সহ আসন হইতে উত্থিত হইয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক বলিলেন— ॥১১॥

"হে রাম! শুভাগমন করুন, আপনার কল্যাণ হউক। আজ আমাদের বড় সৌভাগ্যবশে এখানে আপনার সমাগম হইয়াছে। আজ আমাদের দিন সফল। আজ আমরা আমাদের প্রিয় অতিথিকে প্রাপ্ত হইয়াছি।" ॥১২॥

মুনীশ্বরকে আসিতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সহ দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন। তখন মুনিরাজ অতি ব্যস্ততার সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে উঠাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের গাত্র স্পর্শ অনুভব করিয়া মুনিবরের নয়নযুগল আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। ॥১৩-১৪॥

অতঃপর মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য স্বীয় হস্তে শ্রীরঘুনাথজীর হস্তধারণ করিয়া অতি প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া আসিলেন। ॥১৫॥

অতঃপর সুখাসনে উপবেশন করাইয়া বিধান অনুযায়ী নানা উপচারে তাঁহার পূজা করিলেন এবং বহুবিধ বন্যফল ভোজন করাইলেন। ॥১৬॥

এই প্রকারে একান্তে সুখোপবিষ্ট চন্দ্রবদন শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান অগস্ত্যমুনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন— ॥১৭॥

"হে রাম! পূর্বকালে ক্ষীরসমুদ্রতটে ব্রহ্মাজী ভূ-ভার হরণার্থ আপনাকে দুরাত্মা রাবণবধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদবধি আপনার দর্শনের ইচ্ছায় আমি এখানে তপস্যা করিতেছি, আপনারই ধ্যান করিতেছি এবং আপনার আগমন প্রতীক্ষায় এইস্থানে মুনিগণ সহ নিবাস করিতেছি। ॥১৮-১৯॥

সৃষ্টির পূর্বে সর্বোপাধি ও বিকল্পরহিত এক আপনি বিদ্যমান ছিলেন। আপনারই আশ্রিতা ও আপনাকেই বিষয়কারিণী মায়া আপনার শক্তি বলিয়া কথিতা। ॥২০॥

যখন মায়া-শক্তি আপনার নির্গুণ স্বরূপ আবরণ করে তখন বেদান্তনিষ্ঠ পুরুষগণ তাহাকে 'অব্যাকৃত' বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাহাকে মূল প্রকৃতি বলিয়া থাকেন এবং কেহ বা মায়া বলেন এবং অপর কেহ কেহ অবিদ্যা, সংসৃতি ও বন্ধন ইত্যাদি অনেক নামে বলিয়া থাকেন। ॥২১-২২॥

আপনার দ্বারা ক্ষুভিত হইয়া এই শক্তি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং আপনার প্রেরণায় মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার প্রকটিত হয়। ॥২৩॥

মহত্তত্ত্ব দ্বারা ওতপ্রোত সেই অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস ভেদে তিন প্রকার কথিত হয়। ॥২৪॥

হে রাম! তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্রা উৎপন্ন হয় এবং এই সূক্ষ্ম তন্মাত্রা সকল হইতে তাহাদের গুণানুসারে ক্রমশ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চ স্থূল ভূত উৎপন্ন হয়। ॥২৫॥

রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ঐ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মন উৎপন্ন হয়। এই সব একত্র মিলিত হইয়া সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীররূপ হিরণ্যগর্ভ হইয়া থাকে, তাঁহারই অপর নাম সূত্রাত্মা। ॥২৬॥

অতঃপর স্থূল ভূত সমূহ হইতে বিরাট উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বিরাট পুরুষ হইতেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সংসার প্রকট হইয়া থাকে। ॥২৭॥

(হে রাম!) কাল ও কর্মবশে আপনিই দেব, তির্যক ও মনুষ্যাদি রূপে প্রকট হইয়া থাকেন। আপনার মায়ার গুণভেদে আপনিই স্বয়ং রজোগুণসহায়ে জগৎকর্তা ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ সহায়ে জগৎরক্ষক বিষ্ণু এবং তমোগুণ সহায়ে জগতের লয়কারী ভগবান রুদ্র হইয়াছেন—বিদ্বান পুরুষগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। ॥২৮-২৯॥

হে রাম! বুদ্ধিগত তিনগুণ বশতঃই প্রাণিগণের ক্রমশঃ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি এই তিন অবস্থা হইতে পৃথক, ইহাদের সাক্ষী, চিৎ-স্বরূপ এবং অবিকারী। ॥৩০॥

হে রঘুনন্দন! আপনি যখন সৃষ্টিরূপ লীলা করিতে ইচ্ছুক হন তখন মায়া অঙ্গীকার করিয়া গুণবানের ন্যায় প্রতিভাত হন। ॥৩১॥

হে রাম! আপনার এই মায়া সর্বদা বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইরূপে প্রতিভাত হয়। যাহারা প্রবৃত্তি মার্গে নিরত তাহারা অবিদ্যা মায়ার বশীভূত। আর যাহারা নিবৃত্তিপরায়ণ বেদান্তার্থ বিচারকারী এবং আপনার ভক্তিতে নিরত, তাহারা 'বিদ্যা' ময় রূপে কথিত হন। পুনরায় যাহারা অবিদ্যামায়ার বশীভূত তাহারা সদা জন্ম-মরণরূপ সংসারে বদ্ধ এবং যাহারা বিদ্যাভ্যাসী তাহারাই নিত্য মুক্ত হইয়া থাকেন। ॥৩২-৩৩॥

এই সংসারে যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিপরায়ণ, এবং আপনার মন্ত্রের উপাসক, তাহাদের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই প্রাদুর্ভূত হয়। অপর কাহারও নহে। ॥৩৪॥

অতএব যাহারা আপনার প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন তাহারা মুক্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আপনার ভক্তিরূপ অমৃত পান বিনা স্বপ্নেও কাহারও মোক্ষ হইতে পারে না। ॥৩৫॥

হে রাম! অধিক আর কি বলিব, এই বিষয়ে যাহা সার তত্ত্ব তাহাই আমি আপনাকে বলিতেছি—'সংসারে মোক্ষলাভের মুখ্য কারণ সাধুসঙ্গ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ॥৩৬॥

যাহারা সম্পদে বিপদে সমান চিত্ত, বিষয়-স্পৃহা রহিত, পুত্র বিত্তাদি এষণা অর্থাৎ কামনা রহিত, ইন্দ্রিয়দমনকারী, প্রশান্তচিত্ত, আপনার ভক্ত, সম্পূর্ণ কামনা রহিত, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সমভাব সম্পন্ন, সঙ্গহীন, সর্বকর্মত্যাগী, সদাব্রহ্মপরায়ণ, যম-নিয়মাদি গুণসম্পন্ন, এবং যদৃচ্ছা-লাভে সন্তুষ্ট, তাঁহারই সাধু। যখন এইরূপ সাধুপুরুষের সঙ্গলাভ হয়, তখন সাধকের হৃদয়ে ভগবৎ লীলাকথা শ্রবণে প্রীতি উৎপন্ন হয়। ॥৩৭-৩৯॥

হে রাম! তদনন্তর সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ আপনার প্রতি ভক্তি উদিত হয় এবং ভক্তিলাভ হইলে আপনার স্বরূপবিষয়ক যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হয়। ইহাই তত্ত্ববিদ্ মহাত্মাগণসেবিত মুক্তিলাভের আদ্য মার্গ। অতএব হে রাঘব! আপনার প্রতি আমার সর্বদাই যেন প্রেম লক্ষণা উত্তম ভক্তি বিদ্যমান থাকে। আর হে হরে! আপনার ভক্তজন-সঙ্গই যেন আমার অধিকতর লাভ হয়। হে নাথ! আজ আপনার দর্শনে আমার জন্ম সফল হইয়াছে। ॥৪০-৪২॥

হে প্রভো! আজ আমার সম্পূর্ণ যজ্ঞ সফল হইল। আমি সুদীর্ঘকাল অনন্যমনে তপস্যা করিয়াছি। হে রাম! আজ প্রত্যক্ষ আপনার যে পূজা আমি করিয়াছি উহা আমার সেই তপস্যারই ফল। ॥৪৩॥

হে রাঘব! সীতা সহিত আপনি আমার হৃদয়ে সর্বদা বাস করুন। শরীর দ্বারা বাহ্যকর্মে ব্যাপৃতি কালেও অর্থাৎ গমনাগমন বা উপবেশন আদি কালেও যেন আপনার স্মরণ আমার চিত্তে সর্বদা জাগ্রত থাকে।" ॥৪৪॥

লক্ষ্মীপতি শ্রীরঘুনাথজীর এইপ্রকার স্তুতি করিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যজী তাঁহাকে প্রদান করিবার জন্যই পূর্বকালে ইন্দ্র কর্তৃক গচ্ছিত ধনুক ও অক্ষয় বাণ এবং দুইটি তূণীর (অর্থাৎ যে তূণীর কখনই বাণ শূন্য হয় না, সর্বদাই বাণ পূর্ণ থাকে) এবং একটি রত্নমণ্ডিত খড়্গ প্রদান করিয়া বলিলেন—"হে রাঘব! আপনি পৃথিবীর ভারস্বরূপ রাক্ষসগণের নিধন করুন। ॥৪৫-৪৬॥

আপনি এই কাজ করিবার জন্যই মায়া-মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই স্থান হইতে দুই যোজন দূরবর্তী গৌতমী নদীতটে পুণ্যবন-সুশোভিত পঞ্চবটী নামক একটি আশ্রম আছে। হে রামচন্দ্র! আপনার বনবাসের শেষকাল সেইস্থানেই অতিবাহিত করুন। হে সর্ব সজ্জনগণের অধিপতি! আপনি সেখানে নিবাস করিয়া দেবগণের বাঞ্ছিত সর্বকর্ম সম্পাদন করুন।" ॥৪৭-৪৯॥

তদনন্তর সর্বজ্ঞ ভগবান রামচন্দ্র অগস্ত্যজীর মনোহর ভাষণ এবং তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত স্তোত্র শ্রবণ করতঃ এবং তাঁহার সহিত বার্তালাপে প্রসন্ন হইয়া তৎপ্রদর্শিত মার্গে পঞ্চবটীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অরণ্য কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

পঞ্চবটীতে নিবাস ও লক্ষ্মণের প্রতি উপদেশ

শ্রীমহাদেবজী বলিলেন—হে পার্বতি!

পথে যাইতে যাইতে শ্রীরামচন্দ্র পর্বতশিখরের ন্যায় দৃঢ় উপবিষ্ট, বৃদ্ধ জটায়ুকে দর্শন করিলেন এবং 'ইহা কি দেখিতেছি' ভাবিয়া অতি বিস্মিত হইলেন। ॥১॥

তখন তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন—"হে লক্ষ্মণ! আমার ধনুক আনয়ন কর। দেখ, আমাদের সম্মুখে এক রাক্ষস উপবিষ্ট। আমি ঋষিগণকে ভক্ষণকারী এই দুষ্টকে এখনই বধ করিব।" ॥২॥

শ্রীরামের কথা শুনিয়া গৃধ্ররাজ ভয়ব্যাকুলচিত্তে বলিল—"হে রাম! আমি তোমা কর্তৃক বধযোগ্য নহি। আমি তোমার পিতার সখা জটায়ু নামক গৃধ্র। তোমার কল্যাণ হউক, আমি তোমার হিতকারী। ॥৩-৪॥

তোমার হিতকামনা করিয়া আমি পঞ্চবটীতে নিবাস করিব। কোন সময় লক্ষ্মণজী মৃগয়া নিমিত্ত বনান্তরে গমন করিলে আমি জনকনন্দিনী সীতাকে প্রযত্নপূর্বক রক্ষা করিব।" গৃধ্ররাজের বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র সস্নেহে বলিলেন— ॥৫-৬॥

"হে গৃধ্র মহারাজ। অতি উত্তম (প্রস্তাব)! এই অদূরবর্তী বনে অবস্থান করিয়া প্রয়োজন কালে সমীপস্থ হইয়া আপনি আমার প্রিয় সাধন করুন।" ॥৭॥

এই প্রকারে আপন সম্মতি প্রদান করতঃ শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহিত পঞ্চবটীতে গমন করিলেন। ॥৮॥

গৌতমী নদী (গোদাবরী) তটে পৌঁছিয়া তিনি বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ দ্বারা পঞ্চবটীতে একটি বিশাল কুটির নির্মাণ করাইলেন। ॥৯॥

সেখানে তাঁহারা সকলে গোদাবরীর উত্তর তটে নিবাস করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ণকুটিরের চতুর্দিকে কদম্ব, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি সফল বৃক্ষসমূহ বিদ্যমান ছিল। সেই রোগরহিত (স্বাস্থ্যকর) জনশূন্য একান্ত স্থানে শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধিমান লক্ষ্মণের সহিত জনকাত্মজা সীতার মনোরঞ্জনে তৎপর হইয়া, দেবলোকতুল্য সুরম্যস্থানে, দ্বিতীয় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অতি সুখে নিবাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরামের সেবায় লগ্নচিত্ত লক্ষ্মণজী প্রতিদিন তাঁহাদের উভয়কে নিত্য কন্দমূল, ফল সংগ্রহ করতঃ আনিয়া প্রদান করিতেন এবং নিত্য রাত্রিকালে ধনুর্বাণ হস্তে জাগ্রত থাকিয়া চতুর্দিকে প্রহরীর কার্য করিতেন। ॥১০-১৩॥

তাঁহারা তিনজনই নিত্য গোদাবরীতে স্নান করিতেন। সেই সময় সীতা তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে থাকিয়া গমনাগমন করিতেন। ॥১৪॥

লক্ষ্মণ অতি প্রসন্নচিত্তে নিত্য জল আনয়ন পূর্বক অতি প্রীতির সহিত অহরহ তাঁহাদের সেবা করিতেন। এই প্রকারে তাঁহারা তিনজন অতি সুখে পঞ্চবটীতে নিবাস করিতে লাগিলেন। ॥১৫॥

একদিন লক্ষ্মণ একান্তে উপবিষ্ট পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে গমন করতঃ বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥১৬॥

"হে ভগবন্। আমি আপনার মুখারবিন্দ হইতে মোক্ষলাভের অব্যভিচারী নিশ্চিত সাধন শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব হে কমলনয়ন! আপনি কৃপাপূর্বক উহা সংক্ষেপে আমার নিকট বর্ণন করুন। ॥১৭॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে ভক্তি বৈরাগ্যপুষ্ট আত্মবিষয়ক দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান ও তৎসহ পরোক্ষ জ্ঞান বিষয়েও উপদেশ করুন। কারণ সংসারে আপনি ব্যতীত এই বিষয়ে উপদেশ করিতে পারেন এমন আর কেহই নাই।" ॥১৮॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"বৎস! শোন, তোমাকে আমি গুহ্যাতিগুহ্য পরম গোপনীয় তত্ত্ব বলিতেছি। ঐ তত্ত্বের জ্ঞান হইলে মনুষ্য অবিলম্বে বিকল্পজনিত (অর্থাৎ কল্পিত সংসাররূপ) ভ্রম হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ॥১৯॥

প্রথমতঃ আমি তোমাকে মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিব। তৎপশ্চাৎ জ্ঞানের সাধন ও বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানের বিষয়ও বর্ণন করিব। ॥২০॥

যে জ্ঞানলাভে মনুষ্য সংসার সাগর হইতে মুক্ত হয় সেই জ্ঞেয় পরমাত্মার স্বরূপও তোমাকে বলিব। শরীরাদি অনাত্ম পদার্থে যে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে তাহাই মায়া। সেই মায়া দ্বারাই সংসার কল্পনা হয়। হে রঘুকুলনন্দন! প্রথমতঃ মায়ার দুইটি রূপ নিশ্চিত হয়। ॥২১-২২॥

একটি বিক্ষেপ, অপরটি আবরণ। ইহার মধ্যে বিক্ষেপ শক্তিই মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে সর্ব সংসার কল্পনা করিয়া থাকে। ॥২৩॥

মায়ার অপর আবরণ শক্তি জ্ঞানস্বরূপকে আবরণ করে। রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম হইয়া থাকে, সম্পূর্ণ বিশ্বও তদ্রূপ শুদ্ধ পরমাত্মাতে মায়ার দ্বারা কল্পিত ; বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে এইসব কিছুই বস্তুতঃ নাই। মনুষ্য সর্বদা যাহা কিছু শুনিয়া থাকে, দেখিয়া থাকে, অথবা স্মরণ করিয়া থাকে, সে সকলই স্বপ্ন ও মনোরথ তুল্য অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা। এই শরীরই সংসাররূপ বৃক্ষের দৃঢ় মূল। ॥২৪-২৬॥

পুত্র কলত্রাদি যে বন্ধন তাহারও মূল এই শরীর। নতুবা আত্মার সহিত ইহাদের কি সম্বন্ধ? অর্থাৎ কোন সম্বন্ধই নাই। ॥২৭॥

পঞ্চস্থূলভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, অহংকার, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয়, চিদাভাস, মন ও মূল প্রকৃতি— ইহাদের সমষ্টিকেই ক্ষেত্র বলিয়া জানিও এবং ইহাই শরীর নামে কথিত হয়। ॥২৮-২৯॥

নির্বিকার পরমাত্মস্বরূপ জীব ঐ সব হইতে পৃথক। সেই জীবের স্বরূপ জ্ঞানের বিষয়ে কিছু সাধন এখন বর্ণন করিতেছি। (সাবধান হইয়া) তাহা শোন। ॥৩০॥

জীব ও পরমাত্মা এ দুইটি শব্দ পর্যায়, অর্থাৎ একার্থ বোধক দুইটি শব্দ। দুইটি শব্দেরই অভিপ্রায় এক। ইহাতে ভেদবুদ্ধি অকর্তব্য। অভিমান পরিত্যাগ, দম্ভ ও হিংসাদি বর্জন। ॥৩১॥

পরাক্ষেপাদি (কঠোর বচন) সহন, সর্বত্র সরলভাবে আচরণ, অর্থাৎ কুটিলতা বর্জন, মন বাণী এবং শরীর দ্বারা আন্তরিক ভক্তিসহ সদ্‌গুরুর সেবা। ॥৩২॥

বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি, সৎকর্মে তৎপরতা, মন বাণী ও শরীরের সংযম, বিষয়প্রাপ্তির জন্য অনিচ্ছা। ॥৩৩॥

অহংকার শূন্যতা, জন্ম, মৃত্যু, রোগ ও বার্ধক্য আদির কষ্ট বিচার, পুত্র, স্ত্রী ও ধনাদিতে আসক্তি ও স্নেহশূন্যতা। ॥৩৪॥

ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সদা চিত্তের সমতা, সর্বাত্মক রাম-আমাতে অনন্যচিত্ততা। ॥৩৫॥

জনসমূহ বর্জিত নির্জন পবিত্র দেশে বাস, প্রাকৃত অর্থাৎ সংসারী জনগণের প্রতি অরতি অর্থাৎ উদাসীন হওয়া। ॥৩৬॥

আত্মজ্ঞান লাভার্থ সদা উদ্যোগ এবং বেদান্তার্থ বিচার। হে লক্ষ্মণ! এই সকল সাধন সহায়েই জ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং ইহার বিপরীত আচরণ করিলেই বিপরীত ফল অর্থাৎ সংসার বন্ধন দৃঢ় হয়। ॥৩৭॥

হে লক্ষ্মণ! বুদ্ধি, প্রাণ, মন আদি ও দেহ হইতে বিলক্ষণ আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-চেতন আত্মা, এইরূপ নিশ্চয় যে জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে তাহাকে (পরোক্ষ) জ্ঞান বলে। ইহাই আমার নিশ্চয় (নিশ্চিত বাণী)। যখন এই তত্ত্ব সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপে অনুভব হয় তখন তাহাকে বিজ্ঞান (অর্থাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার) বলে। ॥৩৮-৩৯॥

আত্মা সর্বত্র পূর্ণ, চিদানন্দস্বরূপ, অবিনাশী, বুদ্ধি আদি উপাধি শূন্য এবং পরিণামাদি রহিত। ॥৪০॥

স্বয়ং আবরণ শূন্য আত্মা স্বপ্রকাশ ও দেহাদির প্রকাশক, এক, অদ্বিতীয়, সৎ-চিৎ-ঘন-স্বরূপ, অসঙ্গ ও সকলের সাক্ষী—বিজ্ঞান সহায়েই এইরূপ অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ প্রভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব জ্ঞান হইলে তৎক্ষণেই মূল অবিদ্যা কার্যকরণ (অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি) সহ পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়। ॥৪১-৪৩॥

অবিদ্যার এই লয় অবস্থাকেই মোক্ষ বলা হয়। আত্মাতে মোক্ষ শব্দ কেবল উপচার মাত্র অর্থাৎ মুক্তাবস্থা আত্মার আগন্তুক নহে কারণ আত্মা নিত্য মুক্ত)। হে রঘুনন্দন লক্ষ্মণ! তোমাকে আমি এই জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যসহিত পরমাত্মারূপ আমার স্বকীয় মোক্ষস্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আমার প্রতি ভক্তিবিমুখ জনগণের এই জ্ঞানলাভ অত্যন্ত দুর্লভ। ॥৪৪-৪৫॥

চক্ষুষ্মান পুরুষেরও যে প্রকার অন্ধকার রাত্রিতে কোন পদার্থ সম্যক দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু দীপক সহায়ে উহা প্রতীত হয়, সেই প্রকার আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত পুরুষেরই আত্মার সম্যক সাক্ষাৎকার অর্থাৎ আত্মবিষয়ক সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর উক্ত ভক্তিলাভের কিছু উপায় তোমাকে বলিতেছি, (সাবধান চিত্তে) তাহা শোন। ॥৪৬-৪৭॥

আমার ভক্তগণের সঙ্গ, নিরন্তর আমার ও আমার ভক্তগণের সেবা, একাদশী আদি তিথিতে উপবাসাদি ব্রতপালন, আমার পর্ব দিবসে উৎসবাদি পালন। ॥৪৮॥

আমার লীলাকথা শ্রবণ, পাঠ ও ব্যাখ্যানে সদা প্রীতি, আমার পূজাতে তৎপরতা, আমার নাম সংকীর্তন। ॥৪৯॥

এই প্রকারে যাহার চিত্ত সতত আমাতেই লগ্ন হইয়া থাকে, তাহারই আমার প্রতি অব্যভিচারিণী অর্থাৎ অবিচল ভক্তি অবশ্য উৎপন্ন হয়। অতঃপর আর লাভ করিবার কি অবশেষ থাকিতে পারে? ॥৫০॥

অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণের অতি শীঘ্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে এবং তাহারা মোক্ষলাভে কৃতার্থ হন। ॥৫১॥

হে লক্ষ্মণ! তোমার প্রশ্নানুযায়ী আমি সম্পূর্ণ তত্ত্বরহস্য তোমাকে বলিলাম। এই তত্ত্বে যিনি মনঃসমাধানপূর্বক কালাতিপাত করেন তিনি অবশ্যই মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ॥৫২॥

হে লক্ষ্মণ! মদ্ভক্তি বিমুখ জনগণকে ইহা কখনই বলিবে না। কিন্তু আমার ভক্তগণকে অতি যত্নের সহিত আহ্বান করিয়া এই রহস্য তত্ত্ব শ্রবণ করাইবে। ॥৫৩॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ নিত্য ইহা পাঠ করিবে, পুঞ্জীভূত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করতঃ সে মুক্ত হইয়া যাইবে। ॥৫৪॥

যে আমার সেবায় সদা অনুরক্ত চিত্ত, নির্মল হৃদয়, প্রশান্ত আত্মা, বিমল জ্ঞানসম্পন্ন, ও আমার পরম ভক্ত যোগিজনের সঙ্গ, অনন্য বুদ্ধিসহ তাহাদের সেবায় তৎপর হইয়া করিয়া থাকে, মুক্তি তাহার করতলগত এবং আমিও সর্বদা তাহার দর্শনগোচর হইয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আর কোন উপায়েই মোক্ষ বা আমার দর্শন হইতে পারে না। ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অরণ্য কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

শূর্পনখার দণ্ড, খর আদি রাক্ষসগণের বধ এবং শূর্পনখার রাবণের নিকট গমন

শ্রী মহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

ঐ সময় এই ঘোর বনে জনস্থান নিবাসিনী মহা বলবতী কামরূপিণী অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ এক রাক্ষসী বিচরণ করিত। ॥১॥

একদিন পঞ্চবটীর নিকট গৌতমী অর্থাৎ গোদাবরী নদীর তীরে জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্রের পদ্ম, বজ্র ও অঙ্কুশ রেখাযুক্ত চরণ চিহ্ন দর্শন করতঃ তাহার সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া সেই রাক্ষসী কামাসক্ত চিত্তে উহা দর্শন ও অনুসরণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। ॥২-৩॥

সেখানে আসিয়া সীতা সহ উপবিষ্ট লক্ষ্মীপতি কামদেব তুল্য সুন্দর শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কামাতুরা রাক্ষসী তাঁহাকে বলিল—"তুমি কাহার পুত্র? তোমার নাম কি? এই আশ্রমে জটা বল্কল আদি ধারণ করিয়া কেন নিবাস করিতেছ? এখানে তোমার কি প্রয়োজন, তাহা বল। ॥৪-৫॥

আমি রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণের ভগিনী কামরূপিণী রাক্ষসী শূর্পনখা ॥৬॥

আমি আপন ভ্রাতা খরের সহিত এই বনে বাস করি। রাজা এই রাজ্যের সম্পূর্ণ অধিকার আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অতএব আমি এইস্থানে মুনিগণকে ভক্ষণ করি ও সানন্দে বিহার করি। ॥৭॥

হে বক্তৃগণ শ্রেষ্ঠ! আমি তোমার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমাকে তাহা অর্থাৎ আপন নাম ধাম ইত্যাদি সব বল।" তখন ভগবান তাহাকে বলিলেন—"আমি অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র রাম। ॥৮॥

এই সুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা আমার ভার্যা, আর অতি সুন্দর ঐ কুমার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। ॥৯॥

হে লোকসুন্দরি! আমি তোমার কি কার্য সম্পাদন করিব বল।" শ্রীরামচন্দ্রের এই বচন শুনিয়া কামাতুরা শূর্পনখা বলিল— ॥১০॥

"রাম! চল, কোন গিরিগুহায় গমন করতঃ আমার সহিত কাম সম্ভোগ কর। আমি এখন অত্যন্ত কামাতুরা সুতরাং কমলনেত্র তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।" ॥১১॥

তখন রামচন্দ্র সীতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন—"হে সুন্দরি! আমার তো এই শুভলক্ষণা নিত্যসঙ্গিনী ভার্যা বিদ্যমান। ॥১২॥

তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে সপত্নী-বিদ্বেষে জর্জরিত হইয়া কিরূপে থাকিবে? বাহিরে অত্যন্ত সুদর্শন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ রহিয়াছে। ॥১৩॥

তিনি তোমার যোগ্য পতি হইবেন। তুমি তাহার সহিত বিহার কর।" রামচন্দ্র এই প্রকার বলিলে, কামমোহিতা ভয়ঙ্করী রাক্ষসী শূর্পনখা লক্ষ্মণের নিকট যাইয়া বলিল—

"হে সুন্দর! আপন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার আদেশ মান্য করিয়া তুমি আমার পতি হও। আজ আমরা উভয়ে পরস্পর কামসম্ভোগ করিব, অতএব বিলম্ব করিও না।" ॥১৪-১৫॥

তখন লক্ষ্মণ তাহাকে বলিলেন,—"হে সাধ্বী! আমি তো ঐ বুদ্ধিমান রামচন্দ্রের দাস। আমাকে পতি রূপে বরণ করিলে, তোমাকেও তাঁহার দাসী হইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় তোমার পক্ষে আর কি হইতে পারে? ॥১৬॥

তোমার কল্যাণ হউক! তুমি তাঁহারই নিকট গমন কর. তিনি মহারাজ ও সকলের স্বামী।" ইহা শুনিয়া সেই দুষ্টচিত্তা রাক্ষসী পুনরায় রঘুনাথের নিকট গমন করিল। ॥১৭॥

অত্যন্ত ক্রোধবশে রাক্ষসী রামচন্দ্রকে বলিল—"হে রাম! তুমি অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত, আমাকে কেন এইভাবে ভ্রমণ করাইতেছ? আমি এক্ষণেই তোমার সম্মুখে এই সীতাকে ভক্ষণ করিব।" ॥১৮॥

এইরূপ কথনানন্তর বিকট আকার ধারণ করিয়া সেই রাক্ষসী জানকীর অভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ অনায়াসে তাহাকে ধরিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন করিলেন। তদনন্তর ঘোর গর্জন ও ক্রন্দন করিতে করিতে রুধিরাক্ত কলেবরে অতি শীঘ্র যাইয়া শূর্পনখা ভ্রাতা খরের সম্মুখে ভূপতিত হইল এবং তাহাকে কঠোর বচনে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহার ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া খর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল—"এ কি? ॥১৯-২১॥

মৃত্যুমুখে যাইবার জন্য কোন্ দুষ্ট ব্যক্তি তোমার এইরূপ দুরবস্থা করিল? তুমি শীঘ্র বল, যমরাজতুল্য বলবান হইলেও তাহাকে আমি এইক্ষণে বধ করিব।" ॥২২॥

তখন রাক্ষসী শূর্পনখা তাহাকে বলিল—"এখানে সমগ্র দণ্ডকারণ্যবাসীগণকে নির্ভয়তার আশ্বাস প্রদান পূর্বক রাম স্বীয় পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ গোদাবরী তটে নিবাস করিতেছে। ॥২৩॥

তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার এই দুর্দশা করিয়াছে। যদি তোমার উত্তমকুলের ও স্বীয় বীরত্বের গর্ব থাকে তবে তুমি ঐ দুই শত্রুকে বধ কর। ॥২৪॥

তুমি মদোন্মত্ত ঐ উভয় ভ্রাতাকে ভক্ষণ কর। নতুবা আমি এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যমলোকে গমন করিব।" ॥২৫॥

শূর্পনখার কথা শুনিয়া ক্রোধপরিপূর্ণচিত্তে খর শীঘ্রই যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিল এবং রামকে বধ করিবার জন্য বহুপরাক্রমী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস রামের সম্মুখে প্রেরণ করিল। খর, দূষণ ও ত্রিশিরা—ইহারা সকলেও নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শীঘ্রই রামের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের কোলাহল শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥২৬-২৮॥

"লক্ষ্মণ! বড় কোলাহল শুনিতে পাইতেছি। মনে হইতেছে, নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ আসিতেছে; অবশ্যই আজ আমার তাহাদের সহিত ঘোর যুদ্ধ হইবে। ॥২৯॥

অতএব হে মহাবল! তুমি সীতাকে লইয়া পর্বতের কোন গুহায় গমন করিয়া সে স্থানে অবস্থান কর। কারণ এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণকে আমি একেলাই বধ করিতে ইচ্ছা করি। ॥৩০॥

আমার শপথ, তুমি এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিও না।" তখন লক্ষ্মণ—'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া সীতা সহ এক গিরিগুহাতে প্রস্থান করিলেন। ॥৩১॥

তখন রামচন্দ্র দৃঢ়কটিবন্ধ হইয়া তাঁহার কঠোর ধনুক ধারণ ও স্কন্ধে অক্ষয়বাণযুক্ত তূণীরদ্বয় বন্ধন করতঃ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ॥৩২॥

তদনন্তর রাক্ষসগণ সেখানে আসিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র, প্রস্তরখণ্ড এবং বৃক্ষাদি বর্ষণ করিতে লাগিল। ॥৩৩॥

শ্রীরামচন্দ্রও অবলীলাক্রমে একক্ষণমাত্র সময়ের মধ্যে সেই অস্ত্র-শস্ত্র সমূহ তিল তিল করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পুনঃ সহস্র বাণ সহায়ে রাক্ষসসমূহ নিধন করতঃ খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকেও বধ করিলেন। এই প্রকারে রঘুকুল শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রজী অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে (দেড়ঘণ্টার মধ্যে) সমস্ত রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। ॥৩৪-৩৫॥

তখন লক্ষ্মণ গুহার মধ্য হইতে সীতাকে আনয়ন করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং সর্বত্র বিক্ষিপ্ত রাক্ষসগণের মৃতদেহ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। ॥৩৬॥

প্রসন্নমুখকমল জনকনন্দিনী সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাঁহার শরীরের শস্ত্রাঘাত চিহ্ন সকলের উপর হস্তমার্জন করিতে লাগিলেন। ॥৩৭॥

সম্পূর্ণ রাক্ষস বাহিনী ধ্বংস হইতে দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী শূর্পনখা অতি দ্রুতগতিতে লঙ্কায় পৌঁছিল ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে রাজসভায় রাবণের চরণসমীপে ভূপতিত হইল। স্বীয় ভগ্নীকে এইপ্রকার ভয়বিহ্বলা দেখিয়া রাবণ বলিল— ॥৩৮-৩৯॥

"বৎসে! ওঠ, দাঁড়াও, বল কে তোমাকে এরূপ বিরূপ করিয়াছে? হে কল্যাণি! এরূপ কার্য ইন্দ্র, যম, বরুণ, বা কুবের কে করিয়াছে? আমি ক্ষণকাল মধ্যে তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিব।" তখন রাক্ষসী শূর্পনখা তাহাকে বলিল—"তুমি বড় প্রমাদী ও মূঢ় বুদ্ধি। ॥৪০-৪১॥

তুমি মদ্যপানাসক্ত, স্ত্রী বশীভূত, এবং সর্ববিষয়ে নপুংসকের ন্যায় অকর্মণ্য। তুমি গুপ্তচর রূপ নেত্রবিহীন। তুমি কিরূপে রাজকার্য পরিচালনা করিবে? ॥৪২॥

খর যুদ্ধে মারা গিয়াছে এবং দূষণ ও ত্রিশিরা আদি চতুর্দশ সহস্র মুখ্য মুখ্য রাক্ষসগণকে অসুরশত্রু রাম ক্ষণকাল মধ্যেই নিহত করিয়াছে এবং জনস্থান নিবাসী মুনীশ্বরগণকে নির্ভয় করিয়াছে। কিন্তু তুমি ইহার কিছুই জান না। এই জন্যই আমি বলিতেছি—'তুমি মূঢ়'। ॥৪৩-৪৪।

রাবণ বলিল—"এই রাম কে? সে কেন এবং কি প্রকারে রাক্ষসগণকে বধ করিল? তুমি বিস্তার পূর্বক তাহা আমাকে বল। আমি তাহার মূলোচ্ছেদ করিব।"' ॥৪৫॥

শূর্পনখা বলিল—"জনস্থান হইতে আমি একদিন গোদাবরী তটে যাইতেছিলাম। সেখানে পূর্বকাল হইতেই মুনিজন সেবিত পঞ্চবটী নামক একটি আশ্রম আছে। ॥৪৬॥

সেই আশ্রমে জটা বল্কলাদি শোভিত ধনুর্বাণধারী কমলনয়ন পরমশ্রী সম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম। ॥৪৭॥

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও তাহার ন্যায় সুন্দর বিশালাক্ষী, রামের ভার্যা পরম রূপবতী এবং সাক্ষাৎ দিব্য লক্ষ্মীও সেখানে বিদ্যমান ছিল। ॥৪৮॥

হে রাজন! দেব, গন্ধর্ব, নাগ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে এরূপ কোন রূপবতী স্ত্রী আমি দেখি নাই এবং কাহারও কথা শুনিও নাই। সেই শুভলক্ষণা স্ত্রী স্বীয় দেহকান্তিদ্বারা সমস্ত বনভূমি প্রকাশ করিতেছিল। ॥৪৯॥

হে নিষ্পাপ রাজন্! এই কন্যাকে পত্নীরূপে তোমাকে প্রদান করিবার জন্য আনয়নের চেষ্টা করিলে, রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার নাক ছেদন করিয়াছে। ॥৫০॥

রামের প্রেরণায় মহাবলী লক্ষ্মণ আমার কর্ণদ্বয়ও ছেদন করিয়াছে। তখন আমি অতি দুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে খরের নিকট গমন করিলাম। ॥৫১॥

খর আপন রাক্ষস সেনাপতিগণসহ শীঘ্রই যাইয়া রামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই বলশালী রাম ক্ষণকাল মধ্যেই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। হে প্রভো! আমার এইরূপ প্রতীত হইতেছে যে যদি রাম মনে করে তবে সে অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যেই সমস্ত ত্রিলোক ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে, ইহা নিঃসন্দেহ। যদি তাহার স্ত্রী সুন্দরী সীতা তোমার ভার্যা হয় তাহা হইলে তোমার জীবন সফল হইবে। ॥৫২-৫৪॥

অতএব হে রাজেন্দ্র! সর্বলোকের মধ্যে একমাত্র সুন্দরী কমলনয়নী সীতা যাহাতে তোমার পত্নী হয়, তুমি সেইরূপ প্রযত্ন কর। ॥৫৫॥

হে প্রভো! তুমি শৌর্যে রামের সম্মুখে তাহার সমকক্ষ হইতে সমর্থ হইবে না। অতএব সেই রঘুশ্রেষ্ঠকে কোন প্রকারে মায়ামুগ্ধ করিয়া তুমি সীতাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কর।" ॥৫৬॥

ইহা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ সুমধুর বাক্য এবং দান-মান আদি সহায়ে ভগিনী শূর্পনখাকে আশ্বাস প্রদান করতঃ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নানা চিন্তাবশতঃ রাবণের সে রাত্রিতে সুনিদ্রা হইল না। ॥৫৭॥

(সে ভাবিতে লাগিল 'ইহা বড়ই আশ্চর্য'।) একক মনুষ্যমাত্র রঘুবংশী রাম বল বীর্য ও সাহস সম্পন্ন আমার ভাই খরকে সেনাসহিত কিরূপে বধ করিল। ॥৫৮॥

অথবা ইহাও হইতে পারে যে রাম মনুষ্যমাত্র নহেন, অর্থাৎ পরমাত্মাই পূর্বকালে ব্রহ্মার প্রার্থনা বশতঃ বানর সেনা সহায়ে আমাকে সসৈন্যে বধ করিবার জন্য এই সময়ে রঘুবংশে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ॥৫৯॥

যদি আমি পরমাত্মা দ্বারা নিহত হই তবে বৈকুণ্ঠ-রাজ্য ভোগ করিব, নতুবা দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাক্ষসরাজ্য ভোগ তো করিবই। অতএব আমি অবশ্য রামের নিকট গমন করিব। ॥৬০॥

সম্পূর্ণ রাক্ষসগণের স্বামী রাবণ এই প্রকার বিচার করতঃ ভগবান রামকে সাক্ষাৎ পরমাত্মা হরিরূপে অবগত হইয়া (এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিল যে) আমি বিরোধ বুদ্ধি পূর্বকই (অর্থাৎ শত্রুভাবে) ভগবানের নিকট যাইব, (কারণ) ভক্তির দ্বারা ভগবান শীঘ্র প্রসন্ন হন না। ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অরণ্য কাণ্ডে পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ

মারীচের নিকট রাবণের গমন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি।

রাত্রিকালে এইরূপ বিচার করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালেই বুদ্ধিমান রাবণ আপন মনে ভাবী কর্তব্য নিশ্চয় করতঃ রথারূঢ় হইয়া সমুদ্রের অপর তটে মারীচের গৃহে গমন করিল। মারীচ সেখানে মুনিগণসদৃশ জটাবল্কলাদি ধারণ করতঃ সর্বগুণের প্রকাশক নির্গুণ পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন ছিল। সমাধি ভঙ্গে সম্মুখে আগত রাবণকে দেখিয়া অতি শীঘ্র গাত্রোত্থান পূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ বিধিপূর্বক পূজা করিল। আতিথ্য সৎকারের অনন্তর রাবণ স্বস্থ হইয়া উপবেশন করিলে মারীচ তাহাকে বলিল— ॥১-৪॥

"হে রাবণ! তুমি এ সময় একাকী রথসহ আগমন করিয়াছ এবং তোমার চিত্তও কোন কার্য বিষয়ে কিংকর্তব্য বিচারে চিন্তামগ্ন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ॥৫॥

যদি গোপনীয় কিছু না হয় তবে তুমি তাহা আমাকে বল। হে রাজেন্দ্র! যদি সেই কার্য করিলে কোন পাপ না হয় এবং তাহা ন্যায়ানুকূল হয় তবে বল, আমি তোমার প্রিয় কার্য অবশ্যই করিব।" ॥৬॥

রাবণ বলিল—"রাজা দশরথ অযোধ্যার অধিপতি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম এবং সে বড় পরাক্রমী। ॥৭॥

রাজা দশরথ তাহার মুনিজনপ্রিয় পুত্র রামকে তাহার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহিত বনবাস দিয়াছে। এই সময় সে ঘোর দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটী নামক শুভ আশ্রমে নিবাস করিতেছে। (শুনিয়াছি) রামের ভার্যা বিশালনয়না সীতা ত্রিলোকমোহকারিণী অপূর্বা সুন্দরী। ॥৮-৯॥

এই রাম আমার বহু পরাক্রমী নিরপরাধ রাক্ষসগণকে এবং আমার ভাই খরকে বধকরতঃ উক্ত তপোবনে নির্ভয় হইয়া আনন্দে নিবাস করিতেছে। ॥১০॥

আমার ভগ্নী শূর্পনখা তাহাদের কিছু অনিষ্ট করে নাই কিন্তু সেই দুষ্ট আমার নির্দোষ ভগ্নীর নাক কান ছেদন করিয়াছে এবং নির্ভয় হইয়া সেই বনে বাস করিতেছে। ॥১১॥

এই জন্য এখন আমি তোমার সাহায্যে তপোবনে রামের অনুপস্থিতি কালে তাহার প্রাণ-প্রিয়া পত্নীকে অপহরণ করিব সংকল্প করিয়াছি। ॥১২॥

তুমি মায়ামৃগরূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে দূরবর্তী দেশে লইয়া যাইবে। সেই অবসরে আমি সীতাকে হরণ করিব। ॥১৩॥

এই প্রকারে আমাকে সাহায্য করিয়া তুমি ফিরিয়া আসিয়া পূর্ববৎ নিজের আশ্রমে বাস করিবে।" রাবণকে এইপ্রকার বলিতে শুনিয়া অতি বিস্মিত চিত্ত হইয়া মারীচ বলিল— ॥১৪॥

—"রাবণ! এই সর্বনাশা যুক্তি তোমাকে কে উপদেশ করিয়াছে? তোমার সর্বনাশাকাঙ্ক্ষী সেই ব্যক্তি নিশ্চয় তোমার শত্রু এবং সে বধের যোগ্য। ॥১৫॥

হে রাবণ! যখন বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার্থ বালক রামচন্দ্র আসিয়াছিলেন ও একটি বাণের সাহায্যে আমাকে একশত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যকালের সেই পৌরুষ স্মরণ করতঃ আমি তখন হইতেই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া যাই। বারম্বার উহা আমার স্মৃতিপথে আসিবার দরুন আমি সর্বত্র ভয়ে রামকে দেখিতে পাই। ॥১৬-১৮॥

একদিন আমি পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করতঃ দণ্ডকারণ্যে মত্তুল্য মৃগবৃন্দসহ মিলিত হইয়া স্বয়ং তীক্ষ্ণশৃঙ্গযুক্ত মৃগরূপ ধারণ করতঃ তৎসমীপে গিয়াছিলাম। ॥১৯॥

যখন আমি অতি উৎসাহের সহিত সীতা ও লক্ষ্মণ সহ শ্রীরঘুনাথজীকে বধ করিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইলাম, তখন তিনি আমাকে দেখিয়া কেবল একটি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ॥২০॥

হে রাক্ষসেন্দ্র! সেই বাণ আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে আমি আকাশে ঘূর্ণিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হইয়াছিলাম। তখন হইতে ভয়ভীত চিত্তে আমি এই নির্ভয় স্থানে বাস করিতেছি। ॥২১॥

রাজা, রত্ন, রমণী, রথ ইত্যাদি শব্দ (যাহার আদ্যাক্ষর 'র') আমার কর্ণে পতিত হইলেই (রামের স্মৃতি জাগরণ হয় বলিয়া) আমার ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য আমি সর্ব ভোগ্য পদার্থ হইতে ভয়ভীত হইয়া সদা রামচন্দ্রেরই ধ্যান করিয়া থাকি। ॥২২॥

রামের আগমন শঙ্কায় আমি সর্ব বাহ্যকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। নিদ্রাকালেও আমি মনে মনে রামকেই স্মরণ করিয়া থাকি। ॥২৩॥

স্বপ্নে রামচন্দ্র দর্শন হইলেও নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত কালেও (ভয়ভীত হইয়া) রামকে ভুলিতে পারি না। অতএব হে রাবণ! তুমিও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি এইরূপ শত্রুভাব পরিত্যাগ করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কর। ॥২৪॥

বহুকাল পরম্পরা সমাগত রাক্ষস বংশকে রক্ষা কর। শ্রীরামচন্দ্রকে (শত্রুভাবে) স্মরণ করিলেও সর্বস্ব নষ্ট হইয়া যায়। আমি তোমার কল্যাণের জন্যই এসব কথা বলিতেছি। তুমি ইহা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ কর। তুমি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিরোধবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ ভক্তিভাবে তাঁহার ভজন কর ; কারণ তিনি পরম দয়ালু। আমি মুনীশ্বরগণের নিকট শুনিয়াছি যে সত্যযুগে ব্রহ্মার প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া পরমাত্মা শ্রীহরি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে 'তুমি স্বীয় মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত কর আমি তাহা পূর্ণ করিব।' তখন ব্রহ্মা ভগবানকে বলিয়াছিলেন—'হে কমললোচন

হরে! আপনি মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দশরথ নন্দন শ্রীরামচন্দ্ররূপে দেবশত্রু দশানন রাবণকে শীঘ্র বধ করুন।' ॥২৫-২৭॥

অতএব তুমি নিশ্চয় জানিও রাম মনুষ্য নহেন। তিনি সাক্ষাৎ অব্যয় পুরুষ শ্রীনারায়ণ মায়া মনুষ্যরূপে তিনি পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্য নির্ভয়ে বনে আগমন করিয়াছেন। অতএব হে তাত! তুমি সুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।" মারীচের বচন শুনিয়া রাবণ বলিল— ॥২৮-২৯॥

"যদি ব্রহ্মার প্রার্থনাবশতঃ পরমাত্মাই রামরূপে মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া আমাকে বধ করিবার জন্য প্রযত্ন পূর্বক এখানে সমাগত হইয়া থাকেন তবে তিনি তাহা অবশ্য শীঘ্রই করিবেন, কারণ ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প। এইজন্য আমি অবশ্যই অতি প্রযত্নে রামচন্দ্রের নিকট হইতে সীতাকে (অপহরণপূর্বক) লাভ করিব। ॥৩০-৩১॥

হে বীর! আমি যদি যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হই তাহা হইলে পরমপদ প্রাপ্ত হইব। আর যদি আমি রণক্ষেত্রে রামকে বধ করিতে পারি তবে নির্ভয়ে সীতাকে প্রাপ্ত হইব। ॥৩২॥

অতএব হে মহাভাগ! উঠো এবং শীঘ্রই বিচিত্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে অতি দূরস্থানে লইয়া যাও। তৎপর তুমি পূর্ববৎ আপন আশ্রমে সুখে প্রত্যাবর্তন কর। যদি আমাকে ভয়ভীত করিবার জন্য পুনরায় কিছু বল তবে নিশ্চয় জানিও আমি এখনই এই খড়্গ সহায়ে তোমাকে বধ করিব।" রাবণের বচন শুনিয়া মারীচ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল— ॥৩৩-৩৫॥

'যদি শ্রীরামচন্দ্রের হাতে আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যাইব, আর যদি এই দুষ্ট রাবণের হাতে আমি নিহত হই তাহা হইলে নিশ্চয় আমাকে নরকে যাইতে হইবে।' ॥৩৬॥

এইরূপে শ্রীরামের হস্তে আপন মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া মারীচ শীঘ্রই উত্থিত হইয়া রাবণকে বলিল—"হে রাজন্! হে প্রভো! আমি আপনার আদেশ পালন করিব।" ॥৩৭॥

অতঃপর মারীচ (রাবণের সহিত) রথে আরূঢ় হইয়া রামের আশ্রমের নিকট গমন করিল এবং রৌপ্যবিন্দু শোভিত শুদ্ধ সুবর্ণ বর্ণ বিচিত্র মৃগরূপ ধারণ করিল। ॥৩৮॥

সেই মৃগের শৃঙ্গ রত্নময়, পদক্ষুর মণিময়, এবং নেত্র নীল রত্নময় ছিল। উহার শরীর যেন বিজলীর প্রভাতুল্য ও অত্যন্ত সুন্দর মুখবিশিষ্ট সেই মৃগ রামচন্দ্রের আশ্রমের সমীপে সীতার দৃষ্টিপথে বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ॥৩৯-৪০॥

সেই মৃগ কখন দৌড়াইতে লাগিল, পরক্ষণে নিকটে আসিয়া স্থির হইয়া পুনরায় যেন ভয়াকুল হইয়া কিয়দ্দূর ধাবিত হইল। এই প্রকারে সেই প্রবঞ্চক মারীচ মায়ামৃগরূপ ধারণ করতঃ সীতাকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টায় সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অরণ্য কাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তম সর্গ

তাড়কা রাক্ষসীরপুত্র মারীচ বধ এবং সীতাহরণ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

তদনন্তর (সর্বজ্ঞ) শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সর্ব কার্যকলাপ জানিয়া একান্ত স্থানে জানকীকে বলিলেন—"হে সীতে! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ॥১॥

হে কল্যাণি! রাবণ ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া তোমার নিকটে আসিবে, অতএব তুমি তোমার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্টা একটি মায়া-সীতা কুটিরের বাহিরে রক্ষণ করতঃ স্বয়ং কুটিরাভ্যন্তরে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ কর এবং আমার আদেশে সেখানে অদৃশ্যরূপে এক বৎসর কাল অবস্থান কর। তদনন্তর রাবণ বধ হইবার পর তুমি আমাকে পূর্ববৎ প্রাপ্ত হইবে?।" ॥২-৩॥

শ্রীরামচন্দ্রের বচন শুনিয়া সীতা ঐ রূপই করিলেন। তিনি মায়া সীতাকে কুটিরের বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং অগ্নিমধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। ॥৪॥

তখন ঐ মায়া সীতা মায়াময় মৃগ দর্শন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সমীপে আগমন করতঃ সহাস্যবদনে অতি নম্রতার সহিত বলিলেন— ॥৫॥

"হে রাম! এই রত্ন বিভূষিত বিচিত্র সুবর্ণমৃগ দর্শন করুন। ইহার শরীরে কি অদ্ভুত রৌপ্যবিন্দু রহিয়াছে ও উহা কিরূপ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে! হে প্রভো! আপনি উহাকে বন্ধন করতঃ আমাকে প্রদান করুন, ঐ সুন্দর হরিণ আমার ক্রীড়ামৃগ হইবে।" ॥৬॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র 'অতি উত্তম কথা', ইহা বলিয়া স্বীয় ধনুক ধারণ করিলেন ও প্রয়াণকালে লক্ষ্মণকে বলিলেন— "লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে সযত্নে রক্ষা করিও। ॥৭॥

এই বনে বহু মায়াবী ভয়ঙ্কর বিকটাকৃতি রাক্ষসগণ বিচরণ করিয়া থাকে। অতএব তুমি অনিন্দিতা সাধ্বী সীতাকে অতি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিও।" ॥৮॥

তখন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—"হে দেব! ইহা নিঃসন্দেহ যে মায়াবী মারীচ এই মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে, কারণ মৃগ কি কখনও এই প্রকার হইতে পারে।" ॥৯॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"যদি এই মৃগ মারীচ হয় তবে আমি নিঃসন্দেহে ইহাকে বধ করিব। আর যদি মৃগ হয় তবে সীতার মনোরঞ্জনার্থ উহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিব। ॥১০॥

আমি এইক্ষণে যাইয়া অতি শীঘ্রই এই মৃগকে বন্ধন করতঃ লইয়া আসিব, ততক্ষণ তুমি অতি সাবধান চিত্তে সীতা রক্ষণার্থ তৎপর হও। ॥১১॥

এই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপিণী জগন্মোহিনী মায়া যাঁহার আশ্রিত সেই রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া ঐ মায়ামৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। ॥১২॥

শ্রীরামচন্দ্র, পরম নির্বিকার, চিদাত্মা এবং সর্বব্যাপক হইয়াও সেই মায়া মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, ইহার দ্বারা 'ভগবান হরি বড় ভক্তবৎসল' এই বাক্যই সর্বথা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ॥১৩॥

ভগবান সব কিছু জানিতেন, তথাপি সীতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ঐ মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, নতুবা পূর্ণকাম, আত্মজ্ঞ, ভগবান রামচন্দ্রের মৃগ বা স্ত্রীর কি প্রয়োজন? ঐ মৃগ কখনও নিকটে দৃষ্টিপথগোচর হইতেছিল, কখনও বা ক্ষণমধ্যেই ধাবন করতঃ দূরে লুক্কায়িত হইতেছিল। ॥১৪-১৫॥

পুনরায় বহুদূরে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এই প্রকারে সে রামচন্দ্রকে বহুদূর লইয়া গেল। তখন রামচন্দ্র এই মৃগ রাক্ষস ইহা নিশ্চয় রূপে জানিয়া একটি বাণের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। বাণবিদ্ধ হইয়াই মারীচ আপন পূর্বরূপ ধারণ করতঃ রুধিরাপ্লুত মুখে ভূপতিত হইল এবং সেই রক্তপায়ী রাক্ষস রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ পূর্বক 'হে মহাবাহু লক্ষ্মণ! হায়! আমি মরিলাম, শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর'—এইরূপ আর্তনাদ করতঃ সে ধরাশায়ী হইল। ॥১৬-১৮॥

মৃত্যুকালে যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিও তৎসাজুয্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, (সেই হরি) রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে করিতে এবং তাঁহারই হাতে মৃত্যু প্রাপ্ত রাক্ষস মারীচের বিষয়ে—সে যে রামসাজুয্য প্রাপ্ত হইল, ইহাতে আর আশ্চর্য কি আছে! ॥১৯॥

মারীচের শরীর হইতে নির্গত তেজ, সকলে দেখিতে দেখিতেই, রামের শরীরে মিশিয়া গেল। ইহা দেখিয়া দেবগণ অতি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ॥২০॥

দেবগণ বলিতে লাগিলেন—"অহো! এই মুনিজন-হিংসক পাপী নিশাচর কত কুকর্ম করিয়াছে, তথাপি এইরূপ শুভগতি প্রাপ্ত হইল! ইহা রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রেরই মহিমা, নিঃসন্দেহ। ॥২১॥

রামের বাণে বিদ্ধ হইয়া এই রাক্ষস ভয়ে পূর্বেই আপনার গৃহ বিত্ত আদির আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণেই প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ॥২২॥

নিরন্তর রামের ধ্যানে তাহার সর্বপাপ নষ্ট হইয়া যাওয়া বশতঃ এবং অন্তকালে রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহারই হস্তে নিহত হইল। এই জন্যই সে রাম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইল। ॥২৩॥

শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সে ব্রাহ্মণ বা রাক্ষস, পাপী বা ধার্মিক, যেই হইক না কেন—পরমপদ অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" ॥২৪॥

পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দেবগণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এদিকে শ্রীরামচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন যে 'এই অধম রাক্ষস মৃত্যুকালে আমার কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া 'হা লক্ষ্মণ' উচ্চারণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ কেন করিল? এই আমার উচ্চারিত বাক্যসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতার না জানি কি দশা হইবে?' ॥২৫-২৬॥

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাম সেই দূরবর্তী স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে দুরাত্মা মারীচের উচ্চারিত শব্দ শুনিয়া অত্যন্ত ভয় ও দুঃখ ব্যাকুলচিত্তে সীতা লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলেন—"লক্ষ্মণ! তুমি অতি শীঘ্র যাও। তোমার ভাইকে কোন রাক্ষস কষ্ট দিতেছে। ॥২৭-২৮॥

তোমার ভাইয়ের উচ্চারিত 'হা লক্ষ্মণ' এই বাক্য কি তুমি শোন নাই?' লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন—"দেবি! এই উচ্চারিত বাক্য রামচন্দ্রের নহে। কোন রাক্ষসই মৃত্যুকালে এইরূপ বাক্য বলিয়াছে। ক্রুদ্ধ হইলে রাম ক্ষণকাল মধ্যেই ত্রৈলোক বিনাশে সমর্থ। ॥২৯-৩০॥

সেই দেবগণ-বন্দিত প্রভু এ প্রকার দীনবচন কেন বলিবেন?" তখন সীতা অশ্রুপূর্ণলোচনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন—"রে লক্ষ্মণ! তোমার ভাই বিপদগ্রস্ত হউন ইহাই কি তুমি দেখিতে চাও? অরে দুর্বুদ্ধে! মনে হইতেছে রামকে বধ করিবার ইচ্ছায় ভরতই তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। ॥৩১-৩২॥

রাম নিহত হইলে তুমি আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছ, কিন্তু তুমি আমাকে কিছুতেই পাইবে না। দেখ, আজ আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিতেছি। ॥৩৩॥

তুমি তাঁহার পত্নী হরণে উদ্যত, তাহা রাম জানিতেন না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে রাম ভিন্ন আমি ভরত বা তোমাকে কাহাকেও স্পর্শও করিব না।!" ॥৩৪॥

এইরূপ বলিয়া সীতা আপন বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার এইরূপ কঠোর শব্দ শুনিয়া অতি দুঃখিত চিত্তে লক্ষ্মণ উভয় কর্ণ আচ্ছাদন পূর্বক বলিলেন –"হে চণ্ডি! তোমাকে ধিক্কার! তুমি আমাকে এইরূপ দুর্ভাষণ করিতেছ! তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ অশেষ দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।" এইরূপ বলিয়া লক্ষ্মণ সীতাকে বনদেবিগণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতঃ অতি দুঃখে ক্ষীণ চিত্তে ধীরে ধীরে রামের নিকট চলিলেন। এই সময় অবসর বুঝিয়া ভিক্ষুবেশ ও দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করতঃ রাবণ সীতার সমীপে আগমন করিল। সীতা তাহাকে দেখিয় প্রণাম করিলেন এবং অতি ভক্তির সহিত তাহার পূজন করতঃ কন্দমূল ফলাদি প্রদান পূর্বক স্বাগত করিলেন এবং বলিলেন—"হে মুনে। ফলমূলাদি ভোজন করিয়া বিশ্রাম করুন। অতি অল্পকাল মধ্যেই আমার পতিদেব আসিবেন, যদি আপনার ইচ্ছা হয় এইখানে অবস্থান করুন। তিনি আপনার বিশেষ সৎকার করিবেন।" ॥৩৫-৪০॥

ভিক্ষু—হে পদ্ম-পলাশ-লোচনা! তুমি কে? তোমার পতিই বা কে? হে অনঘে! এই রাক্ষস অধ্যুযিত বনে তুমি কেন বাস করিতেছ? হে কল্যাণি! তুমি এইসব কথা আমাকে বল। তখন আমি তোমাকে আমার নিজের বিষয় সব শুনাইব। ॥৪১॥

সীতা বলিলেন—"(হে ভিক্ষু!) শ্রীমান মহারাজ দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন, তাঁহার সর্বসুলক্ষণ সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। ॥৪২॥

জনকনন্দিনী সীতা আমি তাঁহার ধর্মপত্নী এবং লক্ষ্মণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি লক্ষ্মণ অত্যন্ত অনুরক্ত। ॥৪৩॥

আমাদের উভয়কে সঙ্গে করিয়া শ্রীরামচন্দ্রজী পিতার আদেশে চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে নিবাস করিবার জন্য আসিয়াছেন। এখন আমি আপনার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি স্বীয় পরিচয় প্রদান করুন।" ॥৪৩॥

ভিক্ষু—"আমি পুলস্ত্যের নন্দন বিশ্রবার পুত্র রাক্ষসরাজ রাবণ। আমি তোমাকে লাভ করিবার জন্য কামপীড়িত, অতএব তোমাকে আপন নগরীতে লইয়া যাইবার জন্য আমি আসিয়াছি। ॥৪৫॥

এই মুনি বেশধারী রামকে লইয়া তুমি কি করিবে? তুমি আমাকে ভজনা কর এবং এই বনবাস দুঃখ পরিত্যাগ করতঃ আমার সহিত নানাপ্রকার ভোগ্যপদার্থ উপভোগ কর।" ॥৪৬॥

ভিক্ষুর এই বচন শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভয়ভীতা হইয়া সীতা তাহাকে বলিলেন—"যদি তুমি আমাকে এইরূপ বল তবে তুমি রামচন্দ্রের হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ॥৪৭॥

ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। ভ্রাতা সহ রামচন্দ্র এইক্ষণেই আসিবেন। আমাকে কে অবমাননা করিতে সমর্থ? সিংহ-পত্নীকে কি সামান্য শশক বলাৎকার করিতে পারে? ॥৪৮॥

রামের বাণে ছিন্নভিন্ন হইয়া তুমি অবিলম্বে ভূপতিত হইবে।" সীতার কথা শুনিয়া ক্রোধাকুলচিত্তে রাবণ আপন মহাপর্বতাকার স্বরূপ দেখাইল। ঐ রূপ দশ মুখ, বিংশতি হস্ত ও কালমেঘ তুল্য দ্যুতিসম্পন্ন ছিল। ॥৪৯-৫০॥

সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া বনদেবিগণ এবং অন্যান্য জীবগণ ভয়ভীত হইয়া পড়িল। তখন রাবণ সীতার পদদ্বয়-নিম্নস্থ মৃত্তিকা নখ সহায়ে খনন করতঃ আপন হস্তে সীতাকে ঐ মৃত্তিকা সহ উঠাইয়া* রথে স্থাপন করতঃ আকাশমার্গে শীঘ্র প্রস্থান করিল। ঐ সময়ে ভয়ত্রস্তা হইয়া অসহায়া সীতা নিম্নে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার এই আর্ত ক্রন্দন শুনিয়া শীঘ্রই তীক্ষ্ণ চঞ্চুবিশিষ্ট পক্ষীশ্রেষ্ঠ জটায়ু পর্বত শিখর হইতে উত্থিত হইয়া বলিল, "ওহে! দাঁড়াও দাঁড়াও! যজ্ঞের মন্ত্রপূত পুরডাশ অপহরণকারী কুকুরের ন্যায় আমার সম্মুখেই জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্রের পত্নীকে শূন্য তপোবন হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ, তুমি কে?" ॥৫১-৫৫॥

এইরূপ বলিয়া জটায়ু তীক্ষ্ণ চঞ্চু সহায়ে রাবণের রথ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিল ও আপন পদাঘাতে রথের অশ্ব বধ করিল এবং রাবণের ধনুক টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। ॥৫৬॥

তখন রাবণ সীতাকে ছাড়িয়া সক্রোধে আপন খড়্গ নিষ্কাসিত করতঃ তদ্দ্বারা মতিমান জটায়ুর পক্ষদ্বয় ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পক্ষদ্বয় ছিন্ন হইলে জটায়ু অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ভূমিতলে পতিত হইল। তখন রাবণ অতি শীঘ্রতা সহকারে সীতাকে অন্য রথে উঠাইয়া প্রস্থান করিল। সীতা তাঁহার রক্ষক কাহাকেও না দেখিয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে রামকে আহ্বান করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন—"হা রাম! হা জগন্নাথ! আপনি দুঃখিনী আমাকে কেন দেখিতেছেন না? ॥৫৭-৫৯॥

হে রাঘব! আপনার ভার্যাকে রাক্ষস অপহরণ করিতেছে, আপনি তাহাকে মুক্ত করুন। হে মহাভাগ লক্ষ্মণ! অপরাধিনী আমি, আমাকে রক্ষা কর। ॥৬০॥

---

* রাবণের প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ ছিল যে যদি সে কোন স্ত্রীলোককে জোর করিয়া ধর্ষণ করে তবে তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। সেই ভয়ে রাবণ সীতার গাত্র স্পর্শ করিল না।

হে দেবর! আমি তোমাকে বাকবাণে বিদ্ধ করিয়াছিলাম (দুর্ভাষণ করিয়াছিলাম)। তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।" সীতাকে এইপ্রকার রোদন করিতে দেখিয়া রামের আগমন আশঙ্কায় রাবণ সীতাকে লইয়া অতি শীঘ্র বায়ুবেগে যাইতে লাগিল। এই প্রকার আকাশ মার্গে যাইতে যাইতে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ কমললোচনা সীতা এক পর্বত শিখরে উপবিষ্ট পাঁচটি বানরকে দেখিতে পাইলেন। ইহাদের দেখিয়া তিনি আপন অঙ্গ হইতে ভূষণ সমূহ মোচন করিয়া উত্তরীয়ের অর্ধখণ্ডে তাহা বন্ধন করতঃ 'ইহারা রামকে আমার বার্তা শুনাইবে' এই অভিপ্রায়ে তাহা পর্বতোপরি নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাবণ লঙ্কায় পৌঁছিল এবং আপন অন্তঃপুরের নিভৃত প্রদেশে অশোকবনে রাক্ষসীপরিবৃতা করিয়া মাতৃবুদ্ধিতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। ॥৬১-৬৫॥

সেইস্থানে অতিকৃশা, কাতরা, অঙ্গপ্রসাধন বর্জিতা, দুঃখবশতঃ শুষ্ক বদনা সীতা অতি বিহ্বল হইয়া "হা রাম! হা রাম!" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাক্ষসীগণ মধ্যে নিবাস করিতে লাগিলেন। ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
অরণ্য কাণ্ডে সপ্তম সর্গ

অষ্টম সর্গ

সীতার বিয়োগে ভগবান রামের বিলাপ এবং জটায়ু সহ মিলন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র যখন কামরূপধারী মায়াবী রাক্ষসকে বধ করিয়া আপন আশ্রমের অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন তখন তিনি দূর হইতে দুঃখী ও শুষ্কবদন লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিলেন। মহামতি শ্রীরঘুনাথ তখন মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন— ॥১-২॥

'লক্ষ্মণ ইহা জানে না যে আমি মায়া সীতা নির্মাণ করিয়াছি, ইহা আমিই জানি। তথাপি লক্ষ্মণের নিকট ইহা গোপন রাখিব এবং সাধারণ (প্রাকৃত) মনুষ্যের ন্যায় শোক করিব। ॥৩॥

যদি আমি সবকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া আপন কুটিরে নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করি, তাহা হইলে এই কোটি কোটি রাক্ষসগণের নিধনের উপায় কিরূপে হইবে? ॥৪॥

যদি আমি সীতার জন্য দুঃখাতুর হইয়া কামী পুরুষের ন্যায় শোকাতুর হই তাহা হইলে ক্রমশঃ সীতাকে খোঁজ করিতে করিতে রাক্ষসরাজ রাবণের পুরী পৌঁছাইব এবং তাহাকে সবংশে নিধন করতঃ আমা কর্তৃক অগ্নিতে স্থাপিত সীতাকে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া তৎসহ অতি শীঘ্র অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করিব। ব্রহ্মার প্রার্থনা বশে আমি মনুষ্য অবতার ধারণ করিয়াছি। অতএব আমি কিছুকাল পৃথিবীতে মনুষ্যভাবেই থাকিব। ইহাতে মায়া মনুষ্যরূপধারী আমার বিচিত্র চরিত্রকথা শ্রবণ করতঃ ভক্তিমার্গের অনুবর্তী ব্যক্তিগণের অনায়াসে মুক্তিলাভ হইবে।' শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার নিশ্চয় করতঃ লক্ষ্মণকে দেখিয়া বলিলেন— ॥৫-৮॥

"লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করতঃ কেন চলিয়া আসিয়াছ? এই অবসরে রাক্ষসগণ বোধ হয় তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে অথবা ভক্ষণ করিয়াছে।" ॥৯॥

তখন লক্ষ্মণ করজোড়ে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার প্রতি সীতার দুর্ব্যবহার (দুর্ভাষণের) কথা বলিলেন—"আপনার কণ্ঠস্বরের অনুরূপ 'হা লক্ষ্মণ!' এই শব্দ শুনিয়া সীতা আমাকে বলিলেন, (রামের কোন বিপদ হইয়াছে), হে লক্ষ্মণ, তুমি শীঘ্র যাও। তখন আমি রোরুদ্যমানা তাঁহাকে বলিলাম—'হে দেবি! ইহা রঘুনাথের বাক্য নহে. ইহা রাক্ষসের উচ্চারিত শব্দ। হে শুচিস্মিতে! তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ॥১০-১১॥

আমি এই প্রকার সান্ত্বনা প্রদান করা সত্ত্বেও সাধ্বী সীতা আমাকে যে দুর্বচন বলিয়াছেন, হে রঘুনাথ! তাহা আপনার সম্মুখে উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহে। ॥১২॥

অতঃপর আমি উভয় কর্ণ আচ্ছাদন করতঃ আপনাকে দেখিবার জন্য সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছি।" তখন শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"লক্ষ্মণ! তথাপি তুমি অনুচিৎ কর্ম করিয়াছ। ॥১৩॥

তুমি স্ত্রীলোকের বাক্য যথার্থভাবে গ্রহণ করিয়া শুভাননা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে? ইহা নিঃসন্দেহ যে রাক্ষসগণ এই অবসরে তাহাকে হয়তো অপহরণ করিয়াছে অথবা ভক্ষণ করিয়াছে"। ॥১৪॥

এইপ্রকার চিন্তান্বিত হইয়া রাম দ্রুতবেগে আশ্রমে আগমন করিলেন কিন্তু সেখানে জনকনন্দিনীকে না দেখিতে পাইয়া অতি দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ॥১৫॥

"হা প্রিয়ে! তোমাকে পূর্বের ন্যায় আশ্রমে কেন দেখিতে পাইতেছি না? তুমি কোথায় গিয়াছ? অথবা আমাকে মোহিত করিবার জন্য কোথাও লুক্কায়িত থাকিয়া আমার সহিত বিনোদ বা লীলা করিতেছ?" ॥১৬॥

এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে তিনি সমগ্র বন খুঁজিয়া বেড়াইলেন কিন্তু জানকীর দর্শন মিলিল না। তখন তিনি "ওহে বনদেবিগণ! আমার প্রিয়া সীতা কোথায় বল। ওহে মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষসকল! তোমরা আমার প্রিয়াকে দেখাও।" এই প্রকার বিলাপ করিতে থাকিলেও সর্বজ্ঞ শ্রীরঘুনাথ সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ॥১৭-১৮॥

অহো! ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও সীতার জন্য শোক করিতেছেন, নিশ্চল কূটস্থস্বরূপ হইয়াও দিক্‌বিদিক্ শীঘ্র ধাবিত হইতেছেন এবং নির্মম নিরহঙ্কার ও অখণ্ড আনন্দস্বরূপ হইলেও 'আমার স্ত্রী' 'আমার সীতা' এই প্রকার কথন করিয়া অতি দুঃখের সহিত বিলাপ করিতেছেন! ॥১৯-২০॥

এই প্রকার স্বয়ং অনাসক্ত হইয়াও শ্রীরামচন্দ্র মায়া অনুসরণ করতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট বিষয়াসক্তরূপে প্রতীত হন। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণের এরূপ ভ্রম হয় না (অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ রামচন্দ্রকে কখনও বিষয়াসক্ত মনে করেন না।) ॥২১॥

এই প্রকারে লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র বনে সীতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে একস্থানে ভগ্নরথ, ছত্র, ধনুক ও কূবর (রথের কাষ্ঠ খণ্ড) পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন। উহা দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—"লক্ষ্মণ! দেখ, এইস্থানে সীতাকে অপরহণ করিয়া যাইবার সময় সেই ব্যক্তিকে অন্য কোন পুরুষ তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সীতাকে অপহরণ করিয়াছে।" ॥২২-২৩॥

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একটি রুধিরাপ্লুত পর্বত সদৃশ শরীর ভূমিতে পড়িয়া আছে দেখিয়া রাম বলিলেন— ॥২৪॥

"দেখ, ইহা নিঃসন্দেহ যে এই রাক্ষসই শুভদর্শনা সীতাকে ভক্ষণ ককিতঃ অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া এই একান্ত স্থানে নিদ্রা যাইতেছে। আমি এই নিশাচরকে এখনই বধ করিব। ॥২৫॥

হে রঘুনন্দন লক্ষ্মণ, তুমি শীঘ্র আমার ধনুক বাণ লইয়া আইস।" রামের এই বচন কর্ণগোচর হইলে জটায়ু ভয়ভীত হইয়া বলিল— ॥২৬॥

"আমি স্বকীয় কর্মবশতঃ নিজেই মরিতেছি। আপনি আমাকে মারিবেন না, আপনার কল্যাণ হউক। আমি জটায়ু। আপনার ভার্যাকে অপহরণকারী রাবণকে যথাশক্তি বাধা দিয়াছিলাম। হে শত্রুদমন! তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হইয়াছিল এবং আমি তাহার রথ, অশ্ব এবং ধনুক ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছি। এখন তৎকর্তৃক মর্মান্তিক আহত হইয়া আমি এখানে পড়িয়া আছি। হে জগন্নাথ! আপনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।" ॥২৭-২৯॥

ইহা শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ জটায়ুর নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত এবং অবস্থা অতি শোচনীয়। তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে জটায়ুর শরীরোপরি কোমল হস্ত সঞ্চালন পূর্বক তিনি বলিলেন— ॥৩০॥

"হে জটায়ু! বল, আমার সুমুখী ভার্যা সীতাকে কে লইয়া গিয়াছে। অহো! তুমি আমারই কাজ করিতে গিয়া নিহত হইলে। অতএব অবশ্যই তুমি আমার প্রিয় বান্ধব।" ॥৩১॥

জটায়ু রক্তবমন করিতে করিতে স্খলিত বাণী সহায়ে বলিল—"হে রাম! ভীমবিক্রম রাক্ষসরাজ রাবণ মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে দক্ষিণ দিকে লইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক বলিবার শক্তি এখন আর আমার নাই। আপনার সম্মুখেই আমি এইক্ষণেই প্রাণত্যাগ করিতেছি। ॥৩২-৩৩॥

হে রাম! আজ আমার মহাভাগ্য যে মৃত্যুকালে আপনার দর্শন পাইলাম। হে অনঘ! মায়ামনুষ্যরূপধারী আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু। ॥৩৪॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! অন্তঃকালে আপনার দর্শন পাইয়া আমি মুক্ত হইয়া গিয়াছি, তথাপি আপনি আপনার করকমলদ্বারা আমাকে স্পর্শ করুন, তাহা হইলে আমি আপনার পরমপদ প্রাপ্ত হইব।" ॥৩৫॥

তখন মৃদুহাস্য সহকারে 'অতি উত্তম কথা' এইরূপ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় করকমল দ্বারা জটায়ুর শরীর স্পর্শ করিলেন। তৎপর জটায়ু প্রাণত্যাগ করতঃ ভূপতিত হইল। ॥৩৬॥

তখন রামচন্দ্র অশ্রুভারাক্রান্তলোচনে জটায়ুর জন্য স্বজন বিয়োগতুল্য শোকপ্রকাশ করিতে করিতে লক্ষ্মণের দ্বারা কাষ্ঠখণ্ডসমূহ আনয়ন করতঃ জটায়ুর দাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ॥৩৭॥

লক্ষ্মণের সহিত অতি দুঃখে স্নান সমাপন করতঃ বনে একটি মৃগ বধ পূর্বক তাহার মাংস খণ্ডসকল হরিতবর্ণ তৃণোপরি চতুর্দিকে পৃথক পৃথকভাবে নিক্ষিপ্ত করিলেন এবং বলিলেন জটায়ুর স্বজাতিবৃন্দ ইহা ভক্ষণ করুক এবং পক্ষিরাজ ইহাতে তৃপ্তি লাভ করুন। ॥৩৮-৩৯॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রজী জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হে জটায়ু! তুমি আমার পরমপদ প্রাপ্ত হও। এবং আজ সকলের দৃষ্টির সম্মুখে তুমি আমার সারূপ্য লাভ কর।" ॥৪০॥

তদনন্তর জটায়ু শীঘ্রই সুন্দর দিব্যরূপ ধারণ করতঃ এক সূর্যসদৃশ প্রকাশমান অতি উত্তম বিমানে আরূঢ় হইলেন। সেই সময়ে জটায়ু সুন্দর পীতাম্বর ধারণ করতঃ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কিরীট আদি শ্রেষ্ঠ ভূষণ সহিত স্বকীয় দীপ্তি সহায়ে চতুর্দিক প্রকাশিত করিতেছিলেন। ॥৪১-৪২॥

অনুরূপ বেশ ও ভূষণ শোভিত চারিজন বিষ্ণু পার্ষদ তাঁহার পূজা করিতেছিলেন এবং যোগিগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন। অতঃপর জটায়ু অতি ত্বরান্বিত হইয়া করজোড়ে শ্রীরঘুনাথজীকে সম্বোধন করতঃ তাঁহার স্তুতিরূপ অর্ঘ্য প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ॥৪৩॥

জটায়ু বলিলেন—"অগণিত গুণশালী, অপ্রমেয়, জগতের আদি কারণ ও তাহার স্থিতি লয়াদির হেতু, সেই পরম শান্তস্বরূপ, পরমাত্মা, শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম করি। ॥৪৪॥

যিনি অসীম, অনন্ত, আনন্দময়, যিনি কমলাদেবীর কটাক্ষের আশ্রয় এবং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সর্বদুঃখহারী, সেই ধনুকবাণধারী, বরদায়ক, নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে আমি অহর্নিশ প্রণাম করি। ॥৪৫॥

যিনি ত্রিভুবনে সর্বাপেক্ষা অধিক রূপশালী, সকলের পূজ্য, শত শত সূর্যতুল্য তেজস্বী, সর্ববাঞ্ছিত ফলদাতা, ভক্তগণের শরণদাতা এবং তদনুরাগীবৃন্দের হৃদয়বিহারী, সেই রঘুনাথের আমি অহর্নিশ শরণ লইয়া থাকি। ॥৪৬॥

যাঁহার নাম সংসাররূপ বনের দাবানল সদৃশ, যিনি মহাদেব আদি দেবগণেরও পূজ্য দেবতা এবং শতকোটি দানবেন্দ্রদলনকারী এবং সূর্যতনয়া যমুনার ন্যায় শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট, সেই দয়ালু শ্রীহরির আমি শরণ লইতেছি। ॥৪৭॥

সংসারে নিরন্তর বাসনাবিষ্ট পুরুষগণের নিকট যিনি অত্যন্ত দূরে কিন্তু সংসার হইতে উপরত মুনিগণের সর্বদা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, যাঁহার চরণপোত সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র সহায়, সেই রঘুনাথজীর আমি শরণ লইতেছি। ॥৪৮॥

যিনি শ্রীমহাদেব ও পার্বতীর মনোমন্দিরে নিবাস করিয়া থাকেন, যাঁহার চরিত্র (লীলা) অতি মনোহর, দেবতা ও অসুরপতিগণ যাঁহার চরণ কমলের সেবা করিয়া থাকেন সেই (কৃষ্ণরূপে) গোবর্ধনধারী, দেবগণেরও বরদায়ক, রঘুনায়ক, শ্রীরামচন্দ্রের আমি শরণ লইতেছি। ॥৪৯॥

পরধন ও পরস্ত্রীর প্রতি যাহারা কখনও দৃষ্টিপাত করেন না, তদ্রূপ পরগুণ ও পরবিভূতি দর্শনে যাহারা প্রসন্ন হন, সেই নিরন্তর পরোপকার-পরায়ণ মহাত্মাগণ কর্তৃক সুসেবিত কমলনয়ন শ্রীরঘুনাথজীর আমি শরণাগত হইতেছি। ॥৫০॥

যাঁহার মুখকমল সদা মনোহর হাস্য সুশোভিত, ভক্তগণের নিকট যিনি অতি সুলভ, যাঁহার দেহকান্তি ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় সুন্দর নীলবর্ণ, শ্বেতকমলের শোভা বিশিষ্ট যাঁহার মনোহর নেত্র, দেবগণেরও পরমগুরু সেই শ্রীরঘুনাথজীর আমি শরণ লইতেছি। ॥৫১॥

হে প্রভো! জলপূর্ণ পাত্র-সকলে যেমন একই সূর্য প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে সেইরূপ সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণসহ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া এক আপনিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহাদেব রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্রেরও স্তুতিপাত্র পরমেশ্বর স্বরূপ, আপনাকে আমি স্তুতি করিতেছি। ॥৫২॥

আপনার দিব্যরূপ কোটি কোটি কামদেব অপেক্ষা সুন্দর। শত বিষয়মার্গে বদ্ধচিত্ত জনগণের নিকট আপনি অত্যন্ত দূরে, কিন্তু যতিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয়ে আপনি সদা প্রতিভাত হইয়া থাকেন।* এইরূপ আর্তিহারী প্রভু শ্রীরঘুপতির আমি শরণ লইতেছি।" ॥৫৩॥

জটায়ু এইপ্রকার স্তুতি করিবার পর শ্রীরঘুনাথজী তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"হে জটায়ু! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার পরমধাম বিষ্ণুলোকে গমন কর।" ॥৫৪॥

যে ব্যক্তি একান্তচিত্তে এই স্তোত্র শ্রবণ করে, পাঠ করে বা প্রতিলিপি করে, সে আমার সারূপ্যপদ প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুকালে সে আমাকে স্মরণ করে।" ॥৫৫॥

পক্ষিরাজ জটায়ু অতি আনন্দের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাণী শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহারই সমানরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মারও অত্যন্তপূজিত পরমধামে গমন করিলেন। ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে অরণ্য কাণ্ডে অষ্টম সর্গ

নবম সর্গ

কবন্ধ উদ্ধার

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ অন্য বনে গমন করিলেন এবং দুঃখে বিকল হইয়া সীতাকে অনুসন্ধান করিতে তৎপর হইলেন। ॥১॥

সেখানে তাঁহার এক মহাকায় অদ্ভুত আকার রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হইল। সেই রাক্ষসের বক্ষস্থলে এক বিরাট মুখগহ্বর ছিল কিন্তু চক্ষু আদি কিছুই ছিল না। ॥২॥

---

* অথবা 'অবিদূরম্' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে—'শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত ব্রহ্মভাবনাসহায়ে আপনি অতি নিকটে উপলভ্য'—এইরূপ অর্থ হইবে।

তাহার বাহুদ্বয় একযোজন (চারি ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। সর্বপ্রাণী হিংসক 'কবন্ধ' নামক দৈত্য-রাজের বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ উক্ত বাহুদ্বয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই মহাবলবান রাক্ষসকে দেখিলেন। ॥৩-৪॥

শ্রীরাম তখন হাস্য সহকারে লক্ষ্মণকে বলিলেন—"লক্ষ্মণ! দেখ, এই রাক্ষস মস্তক ও পদবিহীন এবং ইহার বক্ষস্থলে একটি বিরাট মুখ, বিস্তৃত বাহুদ্বয় সহায়ে যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় তাহাই ভক্ষণ করিয়া সে জীবন ধারণ করে। আমরা উভয়ে তাহার বাহুদ্বয় মধ্যে নিশ্চয় বন্দী হইয়াছি। ॥৫-৬॥

হে রঘুনন্দন! অন্যত্র গমন করিবার কোন মার্গও দেখিতে পাইতেছি না। এখন আমাদের কি কর্তব্য, (শীঘ্র বিচার করিয়া বল, নতুবা) এই রাক্ষস এইক্ষণেই আমাদের ভক্ষণ করিবে।" ॥৭॥

লক্ষ্মণ বলিলেন—"হে রাঘব! ইহাতে অধিক বিচারের কি প্রয়োজন? আমরা উভয়ে সাবধান হইয়া ইহার এক একটি বাহু কাটিয়া ফেলিব।" ॥৮॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, 'ঠিক কথা'। ইহা বলিয়া তিনি খড়্গ সহায়ে ঐ রাক্ষসের দক্ষিণ বাহু ছেদন করিলেন। লক্ষ্মণও তদ্রূপ তাহার বামবাহু শীঘ্রই অবলীলাক্রমে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ॥৯॥

তখন ঐ দানব অতি বিস্মিত হইয়া বলিল—"আমার ভুজদ্বয় ছেদনকারী দেবশ্রেষ্ঠ তোমরা কে? ইহলোকে কেহ অথবা স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যেও কেহ এইরূপ করিতে পারে. তাহা সম্ভব নহে।" ॥১০॥

অতঃপর হাস্য সহকারে কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"শ্রীমান মহারাজ দশরথ অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। আমি তাঁহারই পুত্র 'রাম' আর এই বুদ্ধিমান যুবক আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'লক্ষ্মণ' এবং ত্রৈলোক্যসুন্দরী সীতা আমার ভার্যা। ॥১১-১২॥

আমরা উভয়ে মৃগয়ার্থ (শিকার) বাহিরে গমন করিলে কোন রাক্ষস সীতাকে অপহরণ করিয়াছে। তাহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা এই ঘোর বনে আসিয়া পড়িয়াছি এবং তোমার বিস্তৃত বাহুদ্বয় মধ্যে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছি। তখন প্রাণরক্ষার জন্য আমরা তোমার ভুজদ্বয় ছেদন করিয়াছি। এখন বল এই বিকট রূপধারী তুমি কে?" ॥১৩-১৪॥

কবন্ধ বলিল—"যদি আপনি রাম স্বয়ং আমার নিকট আগমন করিয়াছেন তবে আমি ধন্য! পূর্বকালে আমি রূপ যৌবন মদে দর্পিত এক গন্ধর্ব-রাজ ছিলাম। ॥১৫॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার নিকট হইতে 'অবধ্য' এই বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং স্বীয় অপূর্বরূপ-যৌবন সহায়ে সুন্দরী স্ত্রীগণের মনোহরণ করতঃ সর্বলোকে বিচরণ করিতাম। ॥১৬॥

একদা অষ্টাবক্র মুনিকে দর্শন করিয়া উপহাস করিয়াছিলাম। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"ওহে দুষ্ট দুর্মতি, তুই রাক্ষস হইয়া যা"। ॥১৭॥

তাঁহার অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া আমি তাঁহার স্তুতি করিলে সেই তপোবনে পরমতেজস্বী দয়ালু মুনীশ্বর আমার শাপের অন্ত কিরূপে হইবে তদ্বিষয়ে এরূপ বলিয়াছিলেন— ॥১৮॥

"ত্রেতাযুগে স্বয়ং নারায়ণ দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমার নিকটে আগমন করিবেন এবং তোমার এক এক যোজন পরিমিত বাহুদ্বয় ছেদন করিবেন। ॥১৯॥

তখন তুমি মদুক্ত অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনঃ পূর্বরূপ ধারণ করিবে।" সেই অভিশাপের প্রভাবেই আমি নিজেকে রাক্ষসরূপে দর্শন করিলাম (অর্থাৎ অভিশপ্ত হইয়া আমি তৎকালেই রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হইলাম)। ॥২০॥

হে রাম! একবার আমি সক্রোধে ইন্দ্রের পশ্চাতে ধাবন করিলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমার শিরোপরি বজ্রাঘাত করিয়াছিলেন। ॥২১॥

হে রঘুনন্দন! সেই বজ্রাঘাতে আমার মস্তক ও পদদ্বয় কুক্ষিগত হইয়াছে (উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে)। কিন্তু ব্রহ্মার বর প্রভাবে বজ্রাঘাতেও আমার মৃত্যু হয় নাই। ॥২২॥

আমাকে মুখহীন দেখিয়া দেবতাগণ দয়াবশে ইন্দ্রকে বলিলেন—"মুখ বিনা এই রাক্ষস বাঁচিবে কি প্রকারে?" ॥২৩॥

তখন ইন্দ্র আমাকে বলিলেন—"তোমার পেটেই একটি মুখ হইবে এবং তোমার বাহুদ্বয় এক এক যোজন লম্বা হইবে। তুমি এখন এ স্থান পরিত্যাগ কর।" ॥২৪॥

ইন্দ্র এই প্রকার বলিবার পর আমি এইস্থানে নিবাস করিতেছি এবং নিত্য দীর্ঘ বাহু বেষ্টনে বনের জীবগণকে আকর্ষণ করতঃ ভোজন করিয়া থাকি। হে অনঘ! আপনি এখন আমার বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন। ॥২৫॥

হে রঘুকুল শ্রেষ্ঠ! আপনি অতঃপর আমাকে অগ্নি ও ইন্ধন সমাযুক্ত একটি বিশাল ভূগহ্বরে নিক্ষেপ করুন। আপনার দ্বারা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পর আমি স্বীয় পূর্বরূপ ধারণ করিয়া আপনার ভার্যা সীতার সন্ধান আপনাকে বলিব।" কবন্ধ এইপ্রকার বলিবার পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের দ্বারা একটি বিশাল গর্ত শীঘ্রই খনন করাইলেন, এবং উহাতে কবন্ধকে নিক্ষেপ করিয়া উহা কাষ্ঠখণ্ড সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করতঃ তাহাতে অগ্নিসংযোগ পূর্বক তাহাকে দগ্ধীভূত করিলেন। তখন কবন্ধের শরীর হইতে সর্বাভরণভূষিত কামদেব তুল্য সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট এক পুরুষ প্রকটিত হইল। ॥২৬-২৮॥

সেই পুরুষ (গন্ধর্ব) শ্রীরামচন্দ্রজীকে পরিক্রমা করতঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বলিতে লাগিলেন— ॥২৯॥

"হে রাম! আপনি অনন্ত, আদি অন্ত রহিত, মনবাণীর অবিষয়, তথাপি আপনাকে স্তুতি করিবার জন্য আজ আমার মন বড়ই ব্যগ্র হইয়াছে। ॥৩০॥

হে প্রভো! আপনার বাস্তব জ্ঞানময় স্বরূপ, আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর (বিরাট ও হিরণ্যগর্ভ) হইতেও সূক্ষ্ম, উহা অব্যক্ত অর্থাৎ যোগিগণেরও দুর্জ্ঞেয়। তদতিরিক্ত সব কিছুই জড়, দৃশ্য ও অনাত্মা। অতএব আপনা হইতে ভিন্ন জড় মন আপনাকে কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইবে? বুদ্ধি এবং তাহাতে আত্মার প্রতিবিম্ব এই উভয়ের অন্যোন্যাধ্যাস রূপ যে একতা তাহাই জীব নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধি আদি সকলের সাক্ষী ব্রহ্মাই হইয়া থাকেন। সেই নির্বিষয়

নির্বিকার, সর্বাত্মাতে, অজ্ঞানবশতঃ সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ আরোপিত হইয়াছে। হে রাম! আপনার সূক্ষ্ম দেহই হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূল দেহ বিরাট নামে প্রসিদ্ধ। হৃদয় কমলে ধ্যানযোগ্য অর্থাৎ ভাবনাময় আপনার যে সূক্ষ্মরূপ, যাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই সম্পূর্ণ জগৎ প্রাতিভাসিত হয়, তাহা নিদিধ্যাসনকারীগণের পরম মঙ্গলদায়ক। ॥৩১-৩৪॥

আপন আপন উত্তরবর্তী তত্ত্বসমূহ হইতে প্রত্যেক দশগুণ অধিক মহত্তত্ত্ব আদি সপ্ত আবরণ দ্বারা আবৃত আপনার স্থূল ব্রহ্মাণ্ড শরীরেই ধারণার আশ্রয়রূপ বিরাট শরীর স্থিত।* ॥৩৫॥

আপনিই একমাত্র সর্বমোক্ষস্বরূপ। সম্পূর্ণলোক সকল আপনারই অবয়ব সদৃশ। পাতাল আপনার চরণতল, মহাতল আপনার গোড়ালি (পার্ষ্ণি অর্থাৎ গুল্ফের অধোভাগ)। ॥৩৬॥

হে রাম! রসাতল ও তলাতল আপনার গুল্‌ফদ্বয়। আপনার জানুদ্বয় সুতল ও উরুদ্বয় বিতল। ॥৩৭॥

অতল ও পৃথিবী আপনার জঘন (কটিদেশ), ভূর্লোক নাভি, স্বর্লোক বক্ষস্থল এবং মহর্লোক আপনার গ্রীবাদেশ। ॥৩৮॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! জনলোক আপনার মুখ, তপলোক আপনার ললাট, তথা হে প্রভো! সত্যলোক আপনার মস্তক। ॥৩৯॥

হে রাম! ইন্দ্রাদি লোকপালগণ আপনার বাহুদ্বয়, দিক্‌সকল আপনার কর্ণদ্বয়, অশ্বিনী কুমারদ্বয় আপনার নাসিকা এবং অগ্নি আপনার মুখ বলা হইয়া থাকে। ॥৪০॥

হে রাম! সূর্য আপনার নেত্র, চন্দ্রমা মন, কাল ভ্রূভঙ্গি এবং বৃহস্পতি আপনার বুদ্ধি। ॥৪১॥

হে অবিনাশি! রুদ্র আপনার অহঙ্কার, বেদ আপনার বাণী, যম আপনার দংষ্ট্রা (দাঢ়া), এবং নক্ষত্রগণ আপনার দন্তাবলী। ॥৪২॥

মোহকরী মায়া আপনার হাস্য, সৃষ্টি আপনার কটাক্ষ, ধর্ম আপনার অগ্রভাগ ও অধর্ম পশ্চাদ্‌ভাগ। ॥৪৩॥

হে রঘূত্তম! রাত্রি ও দিন আপনার নিমেষ ও উন্মেষ। হে প্রভো! সপ্ত সমুদ্র আপনার কুক্ষি এবং নদীসমূহ আপনার নাড়ী। ॥৪৪॥

---

* ৩৫নং শ্লোকে সাংখ্য ও পুরাণসম্মত প্রক্রিয়া এইরূপ ঃ—

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সংকল্প দ্বারা চতুর্দশ ভুবন (ভূর্ভুবঃ আদি) উৎপন্ন হইয়াছে। উহাই স্বয়ম্ভুর স্থূল শরীর। উহার বাহিরে চতুর্দিকে পৃথিবী ও তেজ হইতে উৎপন্ন অণ্ড রহিয়াছে। ঐ অণ্ড চতুর্দশ ভুবনের দশ গুণ অধিক পরিমাণ বিশিষ্ট। পুনঃ ঐ অণ্ডের আবরণ **পৃথিবী**(১) অণ্ড হইতে দশগুণ অধিক পরিমাণবিশিষ্ট। পৃথিবীর আবরণ **জল**ও(২) পৃথিবী হইতে দশগুণ অধিক পরিমাণবিশিষ্ট। জলের আবরণ **তেজ**(৩), তেজের আবরণ **বায়ু**(৪) বায়ুর আবরণ **আকাশ**(৫), আকাশের আবরণ **অহংকার**(৬), এবং অহংকারের আবরণ **মহত্তত্ত্ব**(৭)। এই সকল সাতটি আবরণের মধ্যে প্রত্যেক আবরণটিই স্বীয় স্বীয় আবরণীয় পৃথিবী আদি হইতে দশগুণ অধিক বড়।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই সকল আবরণ সূক্ষ্ম পৃথিবী আদি বুঝিতে হইবে, স্থূল নহে।

এই শ্লোকে বিরাটরূপকেই 'ধারণা'র আশ্রয় অর্থাৎ বিষয় বলা হইয়াছে।

হে প্রভো! বৃক্ষ ও ওষধি সমূহ আপনার রোমাবলী, বৃষ্টি আপনার বীর্য, এবং জ্ঞানশক্তি আপনার মহিমা। সম্মিলিত এই সকলকে আপনার স্থূল শরীর বলা হয় (ইহাই আপনার স্থূল শরীর)। ॥৪৫॥

যদি কেহ আপনার এই শরীরে মনঃস্থির (ধারণা) করে তবে সে অনায়াসে মুক্ত হইয়া যায়। হে রাম! আপনার এই স্থূল শরীর হইতে পৃথক অন্য কোন পদার্থই নাই। ॥৪৬॥

অতএব হে রাম! আমি আপনার এই স্থূলরূপটি সর্বদা চিন্তা করিয়া থাকি। ইহার ধ্যান মাত্রই শরীর রোমাঞ্চিত হয় ও হৃদয়ে প্রেমরসের সঞ্চার হইয়া থাকে। ॥৪৭॥

হে রাম! জীব যখন আপনার এই বিরাট রূপের ধ্যান করে সে তৎকালেই মুক্ত হইয়া যায়, তথাপি আমার উহার কোন প্রয়োজন নাই। আমি আপনার এই রামরূপই সদা চিন্তন করিব। ॥৪৮॥

হে রঘুনন্দন! লক্ষ্মণ সহিত সীতার অনুসন্ধানে তৎপর আপনার এই জটাবল্কল বিভূষিত ধনুর্বাণধারী তরুণবয়স্ক শ্যামরূপ যেন আমার মনে সদা বিরাজমান থাকে—(ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা)। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! পার্বতী সহিত সর্বজ্ঞ শ্রীশঙ্কর ভগবান্ আপনার এই দিব্যরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন এবং পুণ্যক্ষেত্র শ্রীকাশীধামে মুমূর্ষুগণকে ব্রহ্মবাচক 'রাম'-'রাম' এই তারকমন্ত্রের উপদেশ করতঃ সদা অতি আনন্দে মগ্নচিত্ত হইয়া থাকেন। অতএব হে জানকীনাথ! আপনি নিশ্চয়ই পরমাত্মা। ॥৪৯-৫২॥

আপনার মায়ায় মোহিত হইয়াই সর্বলোক আপনার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। হে সৃষ্টিকর্তা! হে পরমাত্মা! হে রামভদ্র! আপনাকে নমস্কার। ॥৫৩॥

হে লক্ষ্মণ-সেবিত অযোধ্যানাথ! আপনাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমি যেন মোহিত না হই।" ॥৫৪॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"হে দেব গন্ধর্ব! আমি তোমার ভক্তি এবং স্তুতিতে সন্তোষ লাভ করিয়াছি। হে অনঘ! তুমি যোগিগণগম্য আমার সনাতন পরমধাম গমন কর। ॥৫৫॥

যাহারা তোমার আগমোক্ত এই স্তোস্ত্র অনন্যবুদ্ধি সহায়ে নিত্য ভক্তিপূর্বক জপ করিবে তাহারা অন্তকালে অজ্ঞানজন্য সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমার নিত্য অনুভবস্বরূপ পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইবে।" ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে অরণ্য কাণ্ডে নবম সর্গ

দশম সর্গ

শবরীর সহিত মিলন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পরমধামে যাইবার কালে সেই দেব গন্ধর্ব বলিলেন—"হে রঘুনন্দন! অদূরে সম্মুখে বিদ্যমান আশ্রমে শবরী বাস করেন। তিনি

আপনার চরণকমলে অত্যন্ত অনুরাগসম্পন্না এবং ভক্তিমার্গ-কুশলা। হে মহাভাগ! আপনি তাহার নিকট গমন করুন। তিনি আপনাকে সীতার বিষয়ে সর্ব সমাচার বলিবেন। ॥১-২॥

এইরূপ বলিয়া সূর্যতুল্য তেজস্বী এক বিমানে আরোহণ করতঃ সেই গন্ধর্ব বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করিলেন। (ইহা অতি সত্য যে) রাম নাম স্মরণের ফল এইরূপই হইয়া থাকে। ॥৩॥

অতঃপর সিংহ ব্যাঘ্রাদি দূষিত সেই ঘোর বন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঘুনাথজী ধীরে ধীরে শবরীর আশ্রমে পৌঁছিলেন। ॥৪॥

লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া শবরী অতি হর্ষাপ্লুত চিত্তে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার নেত্রদ্বয় আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইল ও তিনি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ কমলের সম্মুখে ভূপতিত হইলেন। অতঃপর স্বাগত কুশল প্রশ্নাদি করিয়া তাঁহাকে সুন্দর আসনে বসাইলেন। ॥৫-৬॥

তদনন্তর অতি ভক্তির সহিত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের চরণ উত্তমরূপে ধৌত করিলেন। অতঃপর সেই চরণোদক আপন শরীর উপরি সিঞ্চন করতঃ ও অতি শ্রদ্ধার সহিত অর্ঘ্যাদি বিবিধ সামগ্রী দ্বারা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের বিধিবৎ পূজন করতঃ অমৃত তুল্য যে সব দিব্যফল রামের জন্য সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছিলেন শবরী তাহা অতি হর্ষের সহিত ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহার চরণকমল সচন্দন সুগন্ধী পুষ্প সহায়ে পূজন করিলেন। ॥৭-৯॥

এই প্রকার আতিথ্য সৎকারানন্তর লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র যখন আসনোপরি উপবিষ্ট ছিলেন তখন ভক্তিসম্পন্না শবরী কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন— ॥১০॥

"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! পূর্বে এই আশ্রমে আমার গুরু মহর্ষি মতঙ্গ বাস করিতেন। আমি এই স্থানে থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতাম। বহু সহস্র বৎসর আমার এইখানে ব্যতীত হইল। সেই মহর্ষিশ্রেষ্ঠ মতঙ্গও ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। প্রস্থানকালে তিনি আমাকে একাগ্রচিত্ত হইয়া এই স্থানে নিবাস করিতে বলিয়াছিলেন। ॥১১-১২॥

(ইহাও বলিয়াছিলেন যে) সনাতন পরমাত্মা রাক্ষসবধ ও ঋষিগণের রক্ষা নিমিত্ত রাজা দশরথের পুত্র রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ॥১৩॥

তিনি শীঘ্রই এই আশ্রমে আগমন করিবেন। তুমি এইস্থানে অবস্থান করিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান কর। বর্তমান সময়ে প্রভু রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বতে এক আশ্রমে বিরাজ করিতেছেন। ॥১৪॥

তাঁহার আগমনকাল পর্যন্ত তুমি এইস্থানে আপন শরীর রক্ষা কর। রঘুনাথজী এইস্থানে আগমন করিলে তুমি তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে স্বীয় শরীর অগ্নিতে দগ্ধীভূত করিয়া তাঁহার পরমপদ পরমধামে গমন করিবে। ॥১৫॥

হে রাম! তদবধি শ্রীগুরুর বাক্যানুসারে আপনার ধ্যানপরায়ণা হইয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষায় আমি কাল কাটাইতেছি। আজ আমার গুরুবাক্য সফল হইল। ॥১৬॥

হে রাম! আপনার দর্শন আমার গুরুদেবও লাভ করেন নাই। কিন্তু হে সর্বেন্দ্রিয়াগোচর পরমাত্মা! আমি অতি নীচজাতিতে উৎপন্না এক মূঢ়া নারী মাত্র! (আমি যে আপনার দর্শন লাভ করিলাম, ইহা আমার মহাভাগ্য)। ॥১৭॥

আপনার যে দাসের দাস, তাহার যে দাস, এই প্রকারে শতসংখ্যা অন্তে যে দাস, আমি তো তাহারও দাসী হইবার অধিকারী নহি। সাক্ষাৎ আপনার দাসী আমি ইহা কি প্রকারে সম্ভব? ॥১৮॥

হে রাম! আপনি মনবাণীর অবিষয়, জানি না কি প্রকারে আমার আপনার দর্শন হইল। হে দেবেশ্বর! আমি আপনার স্তুতি কি প্রকারে করিতে হয় জানি না। আমি এখন কি করিব? হে প্রভো! আপনি দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" ॥১৯॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"পুরুষ শরীর ও স্ত্রী শরীরের ভেদ অথবা কোন বিশেষ জাতি, নাম বা আশ্রম—ইহার কোনটিই আমার ভজনের বিশেষ কারণ নহে। বিশেষ কারণ তো একমাত্র ভক্তি। ॥২০॥

যাহারা ভক্তিবিমুখ তাহারা যজ্ঞ, দান, তপ অথবা বেদাধ্যয়ন আদি কোন কর্মের দ্বারাই আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। ॥২১॥

অতএব হে মাননীয়া শবরী! আমি তোমার নিকট ভক্তিসাধন সমূহ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। ভক্তির প্রথম সাধন সৎসঙ্গ। ॥২২॥

আমার দিব্য জন্ম, কর্ম ও লীলা বিষয়ক কীর্তন দ্বিতীয় সাধন ; আমার গুণচর্চা তৃতীয় সাধন। আর গীতা উপনিষদ আদি মৎস্বরূপ প্রতিপাদক বাক্যসমূহের ব্যাখ্যান করা চতুর্থ সাধন। ॥২৩॥

হে কল্যাণি! নিষ্কপট হইয়া ভগবদ্বুদ্ধিপূর্বক সদা গুরুদেবের সেবা পঞ্চম সাধন। পবিত্র স্বভাব, যম নিয়মাদি পালন এবং নিত্য আমার পূজাতে নিষ্ঠা ষষ্ঠ সাধন ; এবং অঙ্গসহিত আমার মন্ত্র জপ সপ্তম সাধন কথিত হইয়া থাকে। ॥২৪-২৫॥

আমা হইতেও আমার ভক্তগণকে অধিকপূজা, সমস্ত প্রাণী আমারই রূপ—ইহা চিন্তন, বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্যভাবনা এবং শম-দম আদি সম্পন্ন হওয়া—ইহাই আমার প্রতি ভক্তিলাভের অষ্টম সাধন এবং জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়ক তত্ত্ব বিচার নবম সাধন। হে ভামিনি! ইহাই নববিধা ভক্তির সাধন। এই প্রকার সাধন যাহারই হউক, সে স্ত্রী, পুরুষ অথবা পশুপক্ষী আদি যে কেহ হউক না কেন, হে শুভ লক্ষণা! ইহা নিশ্চিত জানিও যে তাহাতে প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব অবশ্যই হয়। ॥২৬-২৮॥

ভক্তি উৎপন্ন হইলেই আমার স্বরূপের অনুভব হয়। আমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলেই তাহার সেই জন্মেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব ইহাই নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইল যে ভক্তিই মোক্ষের কারণ। পূর্বোক্ত নয় প্রকার সাধনের মধ্যে যাহার প্রথম সাধনটি

(সৎসঙ্গ) লাভ হয় তাহার ক্রমশ অন্য সাধনসমূহও অধিগত হয়। অতএব (প্রেমলক্ষণা) ভক্তি লাভে মুক্তি অবশ্যই হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত। তুমি আমার প্রতি ভক্তিযুক্তা, এইজন্যই আমি স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়াছি। ॥২৯-৩১॥

অতএব অতঃপর আমার দর্শন বশতঃই এখন তোমার মুক্তি অবশ্যই হইবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন, যদি তুমি জান,, তাহা হইলে আমাকে বল, কমললোচনা সীতা কোথায়? আমার প্রিয়দর্শনা প্রিয়াকে কে অপহরণ করিয়াছে?" ॥৩২-৩৩॥

শবরী বলিলেন—"হে দেব! হে সর্বজ্ঞ! হে বিশ্বভাবন (বিশ্ব নির্মাণকর্তা)! আপনি সব কিছু জানেন, তথাপি হে প্রভো! লোকাচার অনুসরণ করতঃ সাধারণ লোকের ন্যায় আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সেইজন্য আমি সীতা এখন কোথায় আছেন তাহা আপনাকে বলিতেছি। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়াছে এবং এখন সীতা লঙ্কায় আছেন। ॥৩৪-৩৫॥

হে রাম! এখানে নিকটেই পম্পা নামক একটি সরোবর রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে ঋষ্যমূক নামক একটি মহান পর্বত বিদ্যমান। ॥৩৬॥

সেই পর্বতে অতুলবিক্রম বানররাজ সুগ্রীব আপন ভ্রাতা বালীর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত চিত্তে স্বীয় চারিটি মন্ত্রী সহ বাস করিতেছেন। ঋষির শাপ ভয়ে ঐ স্থান বালীর অগম্য। হে প্রভো! আপনি সেস্থানে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করুন। সুগ্রীব আপনার সর্ব কর্ম সম্পাদন করিবেন। হে রঘুনন্দন! এখন আমি আপনার সম্মুখেই অগ্নিতে প্রবেশ করিব। ॥৩৭-৩৯॥

হে রাজেশ্বর! হে ভগবান! হে রাম! আমি যতক্ষণ স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া বিষ্ণু-ভবন আপনার পরমধাম প্রাপ্ত না হইব ততক্ষণ আপনি এক মুহূর্তকাল এইস্থানে অবস্থান করুন।" ॥৪০॥

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত এই প্রকার সম্ভাষণ করতঃ শবরী অগ্নিপ্রবেশ করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই অবিদ্যাজন্য সর্ববন্ধন, ভগবান রামের কৃপায়, নিবৃত্তিপূর্বক দুর্লভ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন। ॥৪১॥

ভক্তবৎসল জগন্নাথ শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হইলে জগতে কোন্ বস্তু দুর্লভ? (দেখ, তাঁহার কৃপায় নীচ জাতিতে জন্মলাভ করিয়াও শবরী মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন।) ॥৪২॥

শ্রীরামকে সতত চিন্তনকারী পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ আদি যদি মুক্তিলাভ করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? ইহা নিঃসন্দেহ যে রামের প্রতি ভক্তিই মুক্তি। ॥৪৩॥

হে জনগণ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তিই মোক্ষদায়িনী, অতএব কামধেনুতুল্য সর্ব কামনা পূরণকারী তাঁহার চরণকমলযুগল অতি প্রীতির সহিত সেবা কর। হে বুদ্ধিমান! বিবিধ বিজ্ঞান-বার্তা ও মন্ত্র-তন্ত্র সমূহ দূরে পরিত্যাগ করতঃ শ্রীশঙ্কর ভগবানের হৃদপদ্মে বিরাজিত শ্যামসুন্দর ভগবান রামচন্দ্রের ভজন কর। ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে অরণ্য কাণ্ডে দশম সর্গ
অরণ্য কাণ্ড সমাপ্ত

কিষ্কিন্ধা কাণ্ড

কিষ্কিন্ধা কাণ্ড

প্রথম সর্গ

সুগ্রীব সহ মিলন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রজী লক্ষ্মণের সহিত ধীরে ধীরে পম্পা সরোবর তটে আগমন করিলেন। সেই শ্রেষ্ঠ সরোবরের অতুলনীয় সৌন্দর্য দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ॥১॥

এক ক্রোশ পরিমিত সুবিস্তৃত সেই সরোবর অগাধ নির্মল জলপূর্ণ ছিল এবং বিকশিত কমল, কহ্লার, কুমুদ, উৎপলাদি পুষ্পসমূহ শোভা পাইতেছিল। ॥২॥

সেই সরোবরে হংস, কারণ্ডব আদি পক্ষী বিহার করিতেছিল। চক্রবাকাদি শোভিত সেই সরোবর জল কুক্কুট, কোয়েল ও ক্রৌঞ্চ আদি পক্ষিগণের কলরবে গুঞ্জায়মান হইতেছিল। ॥৩॥

বিচিত্র পুষ্পলতা পরিপূর্ণ এবং নানাপ্রকার ফলশালী বৃক্ষ পরিবৃত সেই সরোবরের কমলকেশর দ্বারা সুবাসিত জল সজ্জনগণের শুদ্ধচিত্তের ন্যায় অতি স্বচ্ছ ছিল। ॥৪॥

সেইস্থানে পৌঁছিয়া লক্ষ্মণসহ প্রভু রাম আচমনকরতঃ সেই সরোবরের শ্রমহারী শীতল জল পান করিলেন এবং তাহার কিনারে কিনারে শীতল ছায়াযুক্ত মার্গে অগ্রসর হইলেন। ॥৫॥

এই প্রকারে জটাবল্কলধারী, জিতেন্দ্রিয়, মহাপরাক্রমী, রাম ও লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হস্তে ধারণ করতঃ বিবিধ বৃক্ষ ও পর্বতের শোভা দর্শন করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্বতের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। ॥৬॥

ঐ সময় স্বীয় চারিটি মন্ত্রিসহ পর্বতশিখরে উপবিষ্ট সুগ্রীব তাঁহাদের উভয়কে যাইতে দেখিয়া ভয়ভীতচিত্তে সেই পর্বতের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেন ও হনুমানকে বলিলেন—"মিত্র! দেখ, ঐ দুই বীর-শ্রেষ্ঠ কাহারা? তোমার কল্যাণ হউক, তুমি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকট যাও এবং তাঁহাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য আদি সর্ব সংবাদ সংগ্রহ কর। ॥৭-৮॥

তুমি বাক্যালাপ করিয়া তাঁহাদের হৃদগত অভিপ্রায় অবগত হও। আমাকে বধ করিবার জন্য বালী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহারা আসে নাই তো? ॥৯॥

যদি তুমি বোঝ যে তাহাদের হৃদগত অভিপ্রায় মন্দ তাহা হইলে অঙ্গুলী সহায়ে সংকেত করতঃ আমাকে জানাইবে। আর দেখ, খুব বিনয়ের সহিত সর্ববিষয় নিশ্চিতরূপে জানিবার চেষ্টা করিবে।" ॥১০॥

তখন হনুমান 'অতি উত্তম কথা'—সুগ্রীবকে এইরূপ বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করতঃ রামের নিকট আগমন করিলেন এবং বিনয়াবনত হইয়া প্রণাম পূর্বক রামকে এইরূপ বলিলেন— ॥১১॥

"হে পুরুষ ব্যাঘ্রদ্বয়! আপনারা উভয়ে কাহারা? আপনাদের যুবাবস্থা এবং মনে হইতেছে আপনারা মহাবীর। অহো! শরীরের কান্তি সহায়ে আপনারা সমস্ত দিক্‌সমূহ যেন সূর্যের ন্যায় প্রকাশ করিতেছেন। ॥১২॥

আমার মনে হইতেছে আপনারা উভয়ে লোকত্রয়ের সৃষ্টিকর্তা সংসারের কারণভূত জগন্ময় প্রধান ও পুরুষ। ॥১৩॥

মনে হইতেছে পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্য এবং ভক্তগণের রক্ষা করিবার জন্যই লীলাচ্ছলে মায়িক মনুষ্যরূপ ধারণ করতঃ আপনারা ভূমিতলে বিচরণ করিতেছেন। ॥১৪॥

আপনারা সাক্ষাৎ পরমাত্মা, ক্ষত্রিয়কুমার রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছেন এবং লীলাবশতঃই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও দুষ্টগণের নাশ করিতে তৎপর। ॥১৫॥

আমার তো ইহাই স্থির নিশ্চয় যে আপনারা সর্বজনের হৃদয়বিহারী, সকলের প্রেরক, পরম স্বতন্ত্র ভগবান্, নর-নারায়ণই ইহলোকে বিচরণ করিতেছেন।" ॥১৬॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—"লক্ষ্মণ! এই ব্রহ্মচারীকে দেখ। অবশ্যই এই ব্রহ্মচারী শব্দ-শাস্ত্র অর্থাৎ ব্যাকরণ অতি উত্তমরূপে বহুবার শ্রবণ (অধ্যয়ন) করিয়াছে। ॥১৭॥

দেখ সে এত কথা বলিল কিন্তু তাহার মুখে একটিও অশুদ্ধি বা অপশব্দ উচ্চারিত হয় নাই।" অতঃপর জ্ঞানবিগ্রহ শ্রীরঘুনাথ হনুমানকে বলিলেন— ॥১৮॥

"হে দ্বিজ! আমি দশরথের পুত্র রাম আর ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। আমি পিতার আজ্ঞা মান্য করিয়া স্বীয় পত্নী সীতার সহিত বনে আসিয়াছিলাম এবং এই দণ্ডকারণ্যে নিবাস করিতেছিলাম। কোন রাক্ষস আমার পত্নী সীতাকে অপহরণ করিয়াছে। তাহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এখন বল তুমি কে ও কাহার পুত্র।" ॥১৯-২০॥

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"বানরগণের রাজা মহাবুদ্ধিমান সুগ্রীব তাঁহার চারিজন মন্ত্রিসহ এই পর্বতশিখরে বাস করিতেছেন। ॥২১॥

তিনি দুষ্টচিত্ত (পাপমতি) বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বালী সুগ্রীবের পত্নীকে হরণ করতঃ সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ॥২২॥

অতএব তিনি বালীর ভয়ে এই ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করিতেছেন। হে মহামতে! আমি সেই সুগ্রীবের একজন মন্ত্রী এবং বায়ুর পুত্র। ॥২৩॥

মাতা অঞ্জনীর গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে এবং আমি হনুমান নামে বিখ্যাত। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! মহারাজ সুগ্রীব সহ আপনার মিত্রতা করা যুক্তিযুক্ত। ॥২৪॥

আপনার ভার্যা অপহরণকারীকে বধ করিতে তিনি আপনার সহায় হইবেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে চলুন, আমরা এখনই তাহার নিকট যাইব।" ॥২৫॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"হে কপীশ্বর! আমিও তাহার সহিত মিত্রতা করিবার জন্যই আসিয়াছি। সেই মিত্রবরের যদি কোন কার্য আমার দ্বারা হয় তবে আমি নিঃসন্দেহে তাহাই করিব।" ॥২৬॥

তখন হনুমান স্বীয় রূপ ধারণ করতঃ রামকে বলিলেন, "আসুন। আপনারা উভয়ে আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন। এখন আমরা পর্বতের উপরে যাইব। সেখনে বালীর ভয়ে মন্ত্রিচতুষ্টয় সহ সুগ্রীব অবস্থান করিতেছেন।" তখন 'অতি উত্তম কথা' বলিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তাহার দুই স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। ॥২৭-২৮॥

বানর শ্রেষ্ঠ হনুমান লম্ফপ্রদান পূর্বক একক্ষণের মধ্যেই পর্বতশিখরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাম ও লক্ষ্মণ একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। ॥২৯॥

এদিকে হনুমানজী সুগ্রীবের নিকট গমন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—"হে রাজন্! আপনি শঙ্কা ও ভয় দূর করুন। কারণ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ আপনার সহিত মিলিত হইবার জন্যই এইস্থানে আগমন করিয়াছেন। ॥৩০॥

শীঘ্র উত্থান করুন। রামের সহিত আপনার মিত্রতার ব্যবস্থা আমি করিয়াছি। শীঘ্রই অগ্নিদেবকে সাক্ষী করিয়া আপনি তাঁহার সহিত মিত্রতা করুন।" ॥৩১॥

তখন সুগ্রীব অতি হৃষ্টচিত্তে শ্রীরামের নিকট আগমন করিলেন ও অতি প্রসন্নমনে আপন হস্তে একটি বৃক্ষশাখা ভগ্নকরতঃ তাহাকে বসিবার জন্য আসনরূপে প্রদান করিলেন। ॥৩২॥

এইপ্রকার হনুমানজীও লক্ষ্মণকে এবং লক্ষ্মণও সুগ্রীবকে আসন প্রদান করিবার পর সকলে অতি আনন্দপূর্বক স্ব স্ব আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ॥৩৩॥

তদনন্তর লক্ষ্মণ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের বনে আগমন ও সীতার অপহরণ পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ॥৩৪॥

লক্ষ্মণ মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—"হে রাজরাজেশ্বর! আমি সীতার অনুসন্ধান করিব। ॥৩৫॥

শত্রুবধ-কালেও আমি আপনার সহায়তা করিব। হে রাম! এই বিষয়ে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ॥৩৬॥

একদিন আমি আপন মন্ত্রিগণ সহ পর্বতশিখরে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন আমি দেখিলাম কোন রাক্ষস এক অতি সুন্দরী স্ত্রীকে আকাশমার্গে লইয়া যাইতেছে। ॥৩৭॥

সে স্ত্রী 'রাম' 'রাম' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতেছিলেন। পর্বত শিখরে আমাদিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি শীঘ্রই আপন গাত্র হইতে আভূষণ সকল মোচন ও তাহা স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে বন্ধন করতঃ নীচের দিকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত সহকারে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। হে প্রভো! তিনি নিরন্তর বিলাপ করিতেছিলেন এবং সেই অবলাকে লইয়া রাক্ষস প্রস্থান করিল। হে প্রভো! আমি তখন অতি শীঘ্র সেই আভূষণসমূহ এক গুহার অভ্যন্তরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। ॥৩৮-৩৯॥

এখন উহা আপনি দর্শন করুন এবং বলুন উহা আপনার কিনা। এই বলিয়া সুগ্রীব সেই আভূষণ সমূহ আনয়ন করতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাইলেন। ॥৪০॥

শ্রীরামচন্দ্র (আভূষণের পুঁটলির বস্ত্রবন্ধন খুলিয়া) তাহা দেখিলেন, এবং উহা সীতারই ভূষণ জানিয়া তাহা বক্ষে ধারণ করতঃ সাধারণ পুরুষের ন্যায় 'হা সীতা, হা সীতা' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।* ॥৪১॥

তখন ভাই লক্ষ্মণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন—"হে রাম! বানররাজ সুগ্রীবের সহায়তায় আপনি রাবণকে বধ করতঃ শীঘ্রই শুভলক্ষণা জনকনন্দিনীকে প্রাপ্ত হইবেন।" ॥৪২॥

সুগ্রীবও বলিলেন—"হে রাম! আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিতেছি যে যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে আপনার হস্তে প্রদান করিব।" ॥৪৩॥

তদনন্তর হনুমান উভয়ের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। তখন নিষ্পাপ রাম ও সুগ্রীব উভয়ে অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া বাহুপ্রসারণ করতঃ পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন। সুগ্রীবও শ্রীরামচন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। এবং ॥৪৪-৪৫॥

অতি প্রেমের সহিত তাঁহাকে আপন কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"হে সখা! পূর্বকালে বালী আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা শোন। ॥৪৬॥

একবার অত্যন্ত মদোন্মত্ত ময় দানবের মায়াবী নামক পুত্র কিষ্কিন্ধাপুরীতে আগমন করতঃ বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ॥৪৭॥

তাহার সেই উচ্চ সিংহনাদসূচক দর্প বালী সহন করিতে না পারিয়া ক্রোধে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং সে বাহিরে আসিয়া সেই দৈত্যকে তাহার দৃঢ়মুষ্টি সহায়ে প্রচণ্ড আঘাত করিল। ॥৪৮॥

সেই প্রচণ্ড আঘাতে ব্যাকুল হইয়া মায়াবী নিজের গুহার দিকে পলায়ন করিল। তখন বালী ও আমি উভয়ে সেই মায়াবী দৈত্যের পশ্চাৎ ধাবন করিলাম। ॥৪৯॥

মায়াবী গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া বালীর ক্রোধ অধিকতর হইল এবং সে আমাকে বলিল, 'হে সুগ্রীব! তুমি গুহার বাহিরে অপেক্ষা কর, আমি গুহাতে প্রবেশ করিতেছি।' ইহা বলিয়া সে গুহাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং একমাস পর্যন্ত তাহা হইতে নির্গত হইল না। ॥৫০॥

একমাস অতিক্রান্ত হইবার পর গুহার দ্বার হইতে বহু রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম বালী মারা গিয়াছে। তাহাতে আমি অতি দুঃখ সন্তপ্ত হইলাম। ॥৫১॥

---

* এই প্রসঙ্গে বাল্মিকী রামায়ণ তুলনীয়। সীতার ভূষণ দর্শনে শ্রীরাম ঃ পশ্য লক্ষ্মণ সংত্যক্তং বৈদেহ্যা হ্রিয়মানয়া। উত্তরীয়মিদং ভূমৌ শরীরাদ্ ভূষণানিচ।।' তদুত্তরে শ্রীলক্ষ্মণ বলিলেন — 'এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ— 'নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে। নূপুরেত্বভি জানামি নিত্যং পাদাভি বন্দনাৎ।।" কিষ্কিন্ধা কাঃ ৬/২০, ২২, ২৩। লক্ষ্মণ নিত্য সীতার পাদবন্দনাকালে তাঁহার শ্রীপাদসংলগ্ন নূপুরদ্বয় দর্শন করিয়াছেন বলিয়া সীতার নূপুর চিনিতে পারিলেন, কিন্তু সীতার অন্য অঙ্গে কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই বলিয়া শিরঃ, কণ্ঠ বা বাহুভূষণাদি চিনিতে পারিলেন না।

(বালী-বধকারী দৈত্য বাহিরে আসিয়া আমাকেও মারিয়া ফেলিবে এই ভয়ে) তখন আমি গুহাদ্বার একটি শিলাদ্বারা বন্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম এবং সকলকে বলিলাম, বালী গুহাভ্যন্তরে রাক্ষসের হস্তে নিহত হইয়াছে। ॥৫২॥

ইহা শুনিয়া সকলে বড় দুঃখিত হইল এবং আমার ইচ্ছা না থাকিলেও সমস্ত বানর-মন্ত্রি-মণ্ডল কিষ্কিন্ধার রাজপদে আমাকে অভিষিক্ত করিল। ॥৫৩॥

হে অরিসূদন! অতি অল্পদিনই আমি রাজ্যপালন করিলাম। ইত্যবসরে বালী প্রত্যাবর্তন করতঃ অতি ক্রোধ সহকারে আমাকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। ॥৫৪॥

এইরূপে সে আমাকে বহু ভর্ৎসনা করিয়া তৎপর মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত করিয়া ফেলিল। তখন আমি অত্যন্ত ভয়ভীত হইয়া নগর পরিত্যাগ করতঃ পলায়ন করিলাম। ॥৫৫॥

হে প্রভো! সর্বলোক পরিভ্রমণ করিয়া আমি অবশেষে ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় লইয়াছি, কারণ কোন ঋষির শাপের ভয়ে বালী এই পর্বতে আগমন করে না।* ॥৫৬॥

তখন হইতে এই দুর্মতি বালী স্বয়ং আমার ভার্যাকে ভোগ করিয়া থাকে এবং আমিও পত্নী-হারা ও গৃহবিহীন হইয়া অতি দুঃখ-সন্তপ্তচিত্তে এইস্থানে নিবাস করিতেছি। আজ আপনার চরণকমল স্পর্শে আমার চিত্তে শান্তি অনুভব করিলাম।" তখন কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্রজী সখা সুগ্রীবের দুঃখে কাতর হইয়া তাহার সম্মুখেই প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আমি খুব শীঘ্রই তোমার পত্নী অপহরণকারী শত্রুকে বিনাশ করিব।" ॥৫৭-৫৯॥

সুগ্রীব বলিলেন—"হে রাজেন্দ্র! বালী সর্ব বলবান যোদ্ধাদিগের অগ্রণী। তাহাকে পরাজিত করা দেবগণের পক্ষেও সুকঠিন। আপনি তাহাকে কি প্রকারে বধ করিবেন? ॥৬০॥

হে বীরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে তাহার অপরিমিত শক্তির এক বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। একবার দুন্দুভি নামক বিশালকায় মহাবল এক ভীষণ দৈত্য মহিষের রূপ ধারণ করিয়া কিষ্কিন্ধানগরীতে আগমন করতঃ রাত্রিকালে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ॥৬১-৬২॥

বালী তাহার গর্জন সহন করিতে না পারিয়া অতি ক্রোধের সহিত তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করতঃ তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়াছিল। ॥৬৩॥

অতঃপর সেই মহিষকে এক পাদদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া তাহার বিরাট মস্তক আপন হস্তদ্বয় সহায়ে মোচড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল ও তাহা উঠাইয়া ভূতলে দূরস্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ॥৬৪॥

হে রাম! সেই ছিন্নমস্তক এক যোজন দূরবর্তী মুনিগণের আশ্রমমণ্ডলান্তর্ভূত মহর্ষি মাতঙ্গের আশ্রমের নিকট পতিত হইয়াছিল। ॥৬৫॥

তাহাতে যত্রতত্র বহু রক্ত বর্ষা হইয়াছিল। তখন ক্রোধান্বিত হইয়া মহর্ষি মাতঙ্গ বালীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—"যদি আজ হইতে কখনও তুমি এই পর্বতোপরি আগমন কর তাহা

---

* মাতঙ্গ ঋষির অভিশাপ ছিল যে বালী এই পর্বতে আসিলে তাহার মৃত্যু হইবে।

হইলে তোমার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ও তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।' হে রাম! মুনি এই প্রকার অভিশাপ প্রদানের পর ভয়ে বালী আর এই ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন করে না। ॥৬৬-৬৭॥

ইহা জানিয়াই আমি এখানে নির্ভয়ে বাস করিতেছি। হে রাম! বালী যাহাকে মারিয়াছিল সেই দুন্দুভি দৈত্যের পর্বতাকার মস্তক দর্শন করুন (কারণ ইহার দ্বারা বালীর বল অনুমিত হইবে)। ॥৬৮॥

যদি আপনি এই মস্তক উঠাইয়া নিক্ষেপ করিতে পারেন তবে আপনি অবশ্যই বালী বধ করিতে সমর্থ হইবেন।" এইরূপ বলিয়া সুগ্রীব দুন্দুভি দৈত্যের পর্বতসদৃশ সেই বিশাল মস্তক রামকে দেখাইলেন। ॥৬৯॥

উহা দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র মৃদুহাস্য সহকারে আপন চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই মস্তক দশযোজন দূরবর্তী দেশে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার হইল। ॥৭০॥

তখন মন্ত্রিগণ সহ সুগ্রীব বলিতে লাগিলেন, 'বাহবা' 'বাহবা'। অতঃপর সুগ্রীব ভক্তগণের পরম আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥৭১॥

"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এই সাতটি সুদৃঢ় তালবৃক্ষ দেখিতে পাইতেছেন, বালী ইহাদের প্রত্যেকটিকে হস্তদ্বারা সবেগে ঝাঁকুনি দিয়া অনায়াসে নিষ্পত্র করিয়া ফেলিতে পারে। ॥৭২॥

যদি আপনি একটি বাণের দ্বারা এই সাতটি বৃক্ষকে বিদ্ধ করতঃ ছিদ্র করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস হইবে যে আপনি বালীকে বধ করিতে সমর্থ।" তখন মহাবলী শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইয়া আপন ধনুক হস্তে ধারণ করতঃ তাহাতে বাণ সন্ধান করিলেন এবং সেই একটি বাণ দ্বারা সপ্ততালবৃক্ষ এককালে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ঐ বাণ সপ্ততাল, পর্বত এবং পৃথিবীকে বিদ্ধকরতঃ পূর্বের ন্যায় পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের তূণীরের মধ্যে অবস্থান করিল। তখন সুগ্রীব আশ্চর্য চকিত হইয়া অতি বিস্ময় ও আনন্দ সহকারে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥৭৩-৭৫॥

"হে দেব! আপনি সর্ব জগতের স্বামী, সাক্ষাৎ পরমাত্মা, ইহা নিঃসন্দেহ। আমার পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম পরিপক্ক হওয়াতেই আজ আমার সহিত আপনার সংযোগ হইয়াছে। ॥৭৬॥

সংসার বন্ধন নিবৃত্তির জন্য মহাত্মাগণ আপনার ভজন করিয়া থাকেন। সেই মোক্ষদায়ক প্রভু আপনাকে সম্মুখে পাইয়া আমি ভোগ্য বিষয় কামনা কি প্রকারে করিতে পারি? ॥৭৭॥

হে দেবদেবেশ্বর! এই স্ত্রী, পুত্র, ধন, রাজ্য আদি সবই আপনার মায়ার সৃষ্টি। অতএব আপনাকে ভিন্ন আমার আর অন্য কোন বিষয় কামনাই নাই ; আপনি আমাকে কৃপা করুন। ॥৭৮॥

হে সৎপতি! আপনি আনন্দস্বরূপ। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে যেরূপ কাহারও ভাগ্যবশে বহুমূল্য গুপ্তধন লাভ হয়, তদ্রূপ আমারও আজ ভাগ্যগৌরবে আপনার দর্শন লাভ হইয়াছে। ॥৭৯॥

আজ আমার অনাদি অবিদ্যাজনিত সর্ব বন্ধন ছিন্ন হইল। হে প্রভো! যজ্ঞ, দান, তপ ও ইষ্টাপূর্ত আদি কর্মানুষ্ঠান দ্বারাও এই সংসার বন্ধন ছিন্ন হয় না ; বরং আরও দৃঢ় হয়। কিন্তু

আপনার চরণকমল দর্শন করিবামাত্রই এই সংসার বন্ধন সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়—ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৮০-৮১॥

আপনার স্বরূপ চিন্তনে ক্ষণার্দ্ধের জন্যও যাহার চিত্ত সংলগ্ন হয়, সম্পূর্ণ অনর্থের মূল-কারণ অজ্ঞান তাহার তৎকালেই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব হে রাম! আমার মন যেন সর্বদা আপনার চিন্তনেই সংলগ্ন হইয়া থাকে। অন্য কোন বিষয়ের প্রতি ধাবিত না হয়। ॥৮২-৮৩॥

যাহার বাণী একক্ষণের জন্যও 'রাম'! 'রাম' এই সুমধুর শব্দ উচ্চারণ করে সে ব্রহ্মহত্যাকারী বা মদ্যপায়ী হইলেও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ॥৮৪॥

হে রাম! আমার এখন যুদ্ধবিজয় অথবা স্ত্রী আদির সুখপ্রাপ্তি, কোন কিছুই ইচ্ছা নাই। আমি সংসার বন্ধন ছেদনকারী আপনার প্রতি একমাত্র ভক্তিরই অভিলাষী। ॥৮৫॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এই সংসার আপনারই মায়ার বিলাস এবং আমিও আপনারই একটি অংশ। অতএব আপনার চরণকমলের প্রতি ভক্তি প্রদান করতঃ আপনি আমাকে সংসার-সঙ্কট হইতে রক্ষা করুন। ॥৮৬॥

পূর্বে যখন আমার চিত্ত মায়া দ্বারা আবৃত ছিল তখন শত্রু, মিত্র, উদাসীন এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সর্ব জীব আমার নিকট প্রতীত হইত। কিন্তু হে রঘুনাথ! আপনার শ্রীচরমকমল দর্শনানন্তর সব কিছু আমার ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই সংসারে কে আমার মিত্র, কেই বা আমার শত্রু! যে পর্যন্ত জীব আপনার মায়ার দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে সে পর্যন্তই সত্ত্বাদি গুণত্রয় তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ॥৮৭-৮৮॥

মায়ার প্রভাব যে পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে সে পর্যন্তই শত্রুমিত্রাদি ভেদবুদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী, মায়া দূর হইলেই সমস্ত ভেদভাবও বিলুপ্ত হয়। অজ্ঞানজন্য ভেদভাব থাকিলেই মৃত্যুভয়ও তাহার সহচারী হইয়া থাকে। ॥৮৯॥

এইজন্য যে ব্যক্তি অবিদ্যার উপাসনা করে (অর্থাৎ মায়িক পদার্থের কামনা করে) সে সংসাররূপী ঘোর অন্ধতম নরকে পতিত হয়। স্ত্রী পুত্র আদি সর্ব বন্ধন বিচিত্র মায়ারই কার্য। অতএব হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনার দাসী-রূপ মায়া হইতে আমাকে মুক্ত করুন। ॥৯০॥

আমার চিত্তবৃত্তি যেন আপনার শ্রীচরণকমলেই সংলগ্ন হইয়া থাকে, আমার হস্তদ্বয় যেন আপনার ভক্তসেবাতে ব্যাপৃত থাকে, আমার বাণী যেন আপনার নাম সংকীর্তন এবং কথা-চর্চাদিতে মগ্ন থাকে, আমার শরীরও যেন (পাদস্পর্শ সেবাদিছলে) সর্বদা আপনার অঙ্গসঙ্গ লাভে বঞ্চিত না হয়। ॥৯১॥

আমার নেত্রদ্বয় যেন সর্বদা আপনার মূর্তি, আপনার ভক্ত এবং আমার গুরুকেই দর্শন করিতে পারে। আমার কর্ণদ্বয় যেন নিরন্তর আপনার বিভিন্ন অবতার লীলার কথা অর্থাৎ আপনার দিব্যজন্ম ও অলৌকিক কর্মসমূহের বিষয় শ্রবণ করে এবং আমার পদদ্বয় যেন আপনার মন্দিরাদি দর্শনার্থ ও তীর্থ যাত্রাদিতে সদা ব্যাপৃত থাকে। ॥৯২॥

হে গরুড়ধ্বজ! আমার অঙ্গসকল আপনার চরণ রজমিশ্রিত গঙ্গাদি তীর্থোদক যেন ধারণ করে। আর হে রাম! শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ সেবিত আপনার শ্রীচরণকমলে আমার মস্তক যেন নিরন্তর প্রণত হইয়া থাকে।" ॥৯৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

বালীবধ ও শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বালীর সম্ভাষণ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

এই প্রকারে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গগুণেই যাহার সর্ব পাপ দূর হইয়া গিয়াছে সেই সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আপন কার্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহার উপর মোহ উৎপন্নকারিণী আপন মায়া বিস্তার করতঃ ঈষৎ হাস্য সহকারে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"হে মিত্র! তুমি আমাকে যাহা কিছু বলিয়াছ তাহা সবই সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ॥১-২॥

(যদি তুমি এখন বৈরাগ্যাবলম্বনে রাজ্যাদি বিষয় হইতে উপরত হও) তাহা হইলে সকল লোকে বলিবে যে শ্রীরামচন্দ্র অগ্নি সাক্ষী করতঃ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন কিন্তু তিনি সুগ্রীবের জন্য কি করিলেন? (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাত বালীবধাদি কিছুই ত' করিলেন না)! ॥৩॥

এইপ্রকারে আমার লোকনিন্দা হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব তোমার কল্যাণ হউক। তুমি এইক্ষণে যাইয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান কর। ॥৪॥

আমি তাহাকে একই বাণে বধ করিয়া তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিব।" তখন সুগ্রীব 'তাহাই হউক' বলিয়া কিষ্কিন্ধানগরের উপবনে দ্রুত গমন করিয়া অতি ঘোর গর্জনের সহিত বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সুগ্রীবের গর্জন শুনিতে পাইয়া বালীর নেত্র ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সুগ্রীবের সমীপে আগমন করিলেন। বালী আসিবামাত্রই সুগ্রীব তাহার বক্ষস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ॥৫-৭॥

তখন বালী ক্রোধাকুল হইয়া উভয় হস্তে সুগ্রীবকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে উভয়ে সক্রোধে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয় ভ্রাতারই দৈহিকরূপ একই প্রকার দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং এই উভয়ের মধ্যে কে বালী এবং কে সুগ্রীব ইহা স্থির করিতে পারিলেন না। অতঃপর মিত্র সুগ্রীব বধের আশঙ্কায় বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। ॥৮-৯॥

তখন সুগ্রীব ভয়াতুর হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে পলায়ন করিলেন এবং বালীও স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন সুগ্রীব আসিয়া রামকে বলিলেন— ॥১০॥

"হে রাম! আপনি কি আমাকে ভ্রাতারূপী মহাশত্রু বালীর হস্তে বধ করাইতে ইচ্ছা করেন? হে প্রভো! যদি আমাকে বধ করাইবার ইচ্ছা আপনার হয়, তাহা হইলে আপনি স্বয়ংই আমাকে বধ করুন। ॥১১॥

হে সত্যবাদী শরণাগত বৎসল রঘুনাথ! (বালীবধের) আশ্বাস দিয়া পুনরায় আমাকে কেন উপেক্ষা করিতেছেন? ॥১২॥

সুগ্রীবের এই বচন শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাম তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—"ভাই! তুমি ভয় পাইও না। তোমাদের দুই ভ্রাতার একই প্রকার রূপ দেখিয়া মিত্র-বধাশঙ্কায় আমি বাণ নিক্ষেপ করি নাই। এখন এই ভ্রম নিবৃত্তির জন্য আমি তোমার শরীরে বিশেষ কোন চিহ্ন করিয়া দিব (যাহাতে আর ভ্রম না হয়)। ॥১৩-১৪॥

তুমি পুনরায় যাইয়া তোমার শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান কর। এবার তুমি বালীকে অবশ্য মৃত দেখিবে। ভাই! আমি রাম! তোমাকে শপথ করিয়া বলিতেছি যে এইবার তোমার শত্রুকে একক্ষণেই বধ করিব। ॥১৫॥

এই প্রকারে সুগ্রীবকে আশ্বাস প্রদান করতঃ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—"হে লক্ষ্মণ! তুমি সুগ্রীবের গলদেশে একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পের মালা অর্পণ কর। ॥১৩॥

এবং হে মহাভাগ! বালীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে প্রেরণ কর।" তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের গলদেশে ঐরূপ পুষ্পমালা অর্পণ করতঃ তাহাকে আদর পূর্বক 'ভাই যাও, যাও'—এইরূপ বলিয়া তাহাকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। সুগ্রীবও সেখানে পৌঁছিয়া পূর্বের ন্যায় অদ্ভুত গর্জন সহকারে বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন। ॥১৭-১৮॥

সুগ্রীবের ঐ গর্জন শুনিয়া বালীর বড়ই বিস্ময় ও ক্রোধ হইল এবং সে কটিবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইবার উপক্রম করিল। ॥১৯॥

যুদ্ধে যাইবার কালে পত্নী তারা তাহার হস্ত ধারণ করতঃ তাহাকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিল এবং বলিল "হে দেব! আপনি এইবার যুদ্ধে যাইবেন না, কারণ আমার হৃদয়ে শঙ্কা হইতেছে। ॥২০॥

অল্পকাল পূর্বেই সুগ্রীব আপনার দ্বারা নির্যাতিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু সে শীঘ্রই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। মনে হইতেছে তাহার কোন বলবান সহায়ক মিলিয়াছে।" ॥২১॥

বালী বলিল, "হে সুভ্রু! সুন্দরি! তুমি এ বিষয়ে কোন শঙ্কা করিও না। হে প্রিয়ে! আমার হাত ছাড়িয়া দাও ও তুমি গৃহে গমন কর। আমি এখনই যাইয়া শত্রুবধ করতঃ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি। ঐ অভাগা সুগ্রীবের আবার সহায়ক কে হইবে? যদি কোন সহায়ক থাকে তবে আমি উভয়কে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিব। হে সুন্দরি! তুমি কোন চিন্তা করিও না। যুদ্ধার্থ গর্জনকারী শত্রু বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিলে কোন্ শূরবীর গৃহমধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে পারে? অতএব আমি উহাকে বধ করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিব।" ॥২২-২৪॥

তারা বলিল—"হে রাজেন্দ্র! আপনি আমার নিকট আরও কিছু বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, উহা শ্রবণ করিয়া তৎপর যাহা উচিৎ মনে হইবে তাহাই করিবেন। আপনার পুত্র অঙ্গদ মৃগয়াকালে শ্রুত বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়াছে। ॥২৫॥

(অঙ্গদ শুনিয়াছে যে) অযোধ্যাধিপতি দশরথনন্দন শ্রীমান রামচন্দ্র তাঁহার ভার্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে সীতাকে রাবণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন ভ্রাতা সহিত শ্রীরাম জানকীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্বতোপরি আগমন করতঃ সুগ্রীব সহ মিলিত হইয়াছেন এবং সেখানে সুগ্রীব অগ্নি সাক্ষীপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রসহ সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। ॥২৬-২৮॥

লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যুদ্ধে বালীকে বধ করতঃ তিনি তাহাকে কিষ্কিন্ধা রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। ॥২৯॥

এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াই তাঁহারা উভয়ে সুগ্রীব সহ এবার আগমন করিয়াছেন। আমার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করুন, কারণ এই অতি অল্পকাল পূর্বেই আপনার হস্তে নির্যাতিত হইয়া যে পলায়ন করিয়াছিল, সে পুনরায় কিরূপে সাহসী হইয়া যুদ্ধার্থ প্রত্যাগমন করিতে পারে? ॥৩০॥

এইজন্য আপনি সুগ্রীবের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করতঃ তাহাকে লইয়া আসুন এবং শীঘ্রই তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করুন। ॥৩১॥

হে কপিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে, অঙ্গদকে, এই রাজ্য এবং এই বংশের রক্ষা করুন"— এইরূপ বলিয়া তারা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বালীর চরণে পতিত হইল। ॥৩২॥

ভয়ে বিহুল হইয়া তারা উভয় হস্তে বালীর পদদ্বয় ধারণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বালী তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ সস্নেহে এইপ্রকার বলিল— ॥৩৩॥

"প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীস্বভাব বশতঃই বৃথা ভয় পাইতেছ। কিন্তু আমি কোন ভয়ের কারণ দেখিতে পাই না। যদি লক্ষ্মণসহ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া থাকেন তবে তাঁহার সহিত আমার প্রেম-সম্বন্ধ হইবে। হে অনঘে! রাম সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণ, তিনি পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন — এই কথা আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। সর্বাত্মা তাঁহার আপন বা পর বলিয়া কোন পক্ষপাত নাই। ॥৩৪-৩৬॥

হে সাধ্বী! আমি তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া আসিব। তিনি দেবেশ্বর, ভক্তিবশে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যাহারা তাঁহার ভজন করে তাহাদের প্রতি তিনি সদা অনুকূল হইয়া থাকেন। ॥৩৭॥

আর যদি সুগ্রীব একক আসিয়া থাকে তবে তাহাকে আমি একক্ষণের মধ্যেই বধ করিব। আর তুমি যে সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কথা বলিয়াছ, হে শুভলক্ষ্মণা প্রিয়ে! সে বিষয়ে শোন, আমি সর্বজনমান্য শূরবীর বলিয়া বিখ্যাত, শত্রুদ্বারা যুদ্ধে আহূত হইবার পর তাহার সহিত এই প্রকার অত্যন্ত ভয়পূর্ণ প্রস্তাব বালী কিভাবে করিতে পারে? অতএব হে সুন্দরি! তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থান কর।" ॥৩৮-৪০॥

এইপ্রকারে শোকতুরা অশ্রুপূর্ণলোচনা তারাকে আশ্বাসদান করতঃ বালী সুগ্রীবকে বধ করিবার জন্য সমুদ্যত হইয়া গমন করিলেন। ॥৪১॥

বালীকে আসিতে দেখিয়া গলদেশে পুষ্পমালা শোভিত মহাপরাক্রমী সুগ্রীব মত্ত গজরাজের ন্যায় তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ॥৪২॥

সুগ্রীব বালীকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল এবং বালীও সুগ্রীবের উপর প্রহার করিল। এই প্রকার পরস্পর বারম্বার বালী সুগ্রীবকে এবং সুগ্রীব বালীকে মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত করিল। ॥৪৩॥

যুদ্ধ করিবার কালে সুগ্রীবের দৃষ্টি রামের উপরই নিবদ্ধ ছিল। প্রতাপশালী শ্রীরামচন্দ্র উভয়কে এই প্রকার যুদ্ধ করিতে দেখিয়া আপন তূণীর হইতে একটি বজ্রসম কঠোর, মহাবেগশালী বাণ লইয়া তাহা আপন ঐন্দ্রধনুকে সন্ধান করতঃ বৃক্ষের আড়াল হইতে কর্ণপর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া বালীর হৃদয়-দেশ সম্যক লক্ষ্য করতঃ নিক্ষেপ করিলেন। ॥৪৪-৪৬॥

সেই বাণ বালীর বক্ষস্থল বিদ্ধ করিবামাত্রই বালী উৎক্ষিপ্ত হইয়া মহাঘোর শব্দ করতঃ সবেগে ভূমিতলে পতিত হইল, সেই সময় পৃথিবীও কম্পিত হইয়া উঠিল। ॥৪৭॥

এক মুহূর্ত কাল বালী সজ্ঞাশূন্য থাকিবার পর তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং সে দেখিতে পাইল তাহার সম্মুখে কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডায়মান। তিনি বামহস্তে ধনুক দক্ষিণহস্তে একটি বাণ ধারণ করিয়াছিলেন। পরিধানে ছিল তাঁহার চীরবস্ত্র এবং শিরোপরি ছিল জটা মুকুট। তাঁহার বিশাল বক্ষস্থলও মনোহর বনমালা বিভূষিত ছিল। ॥৪৮-৪৯॥

স্থূল, সুন্দর ও দীর্ঘ ভুজদ্বয় ও নবদূর্বাদলতুল্য শ্যামবর্ণবিশিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার উভয়দিকে দণ্ডায়মান সেবাপর সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণও বালীর দৃষ্টিগোচর হইল। ॥৫০॥

শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তিরস্কার পূর্বক মন্দস্বরে বালী বলিল—"হে রাম! আমি আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছি, আপনি আমাকে বধ করিলেন কেন? ॥৫১॥

রাজধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃই আপনি এইপ্রকার নিন্দনীয় কর্ম করিয়াছেন। এই প্রকার বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতঃ চোরের ন্যায় যুদ্ধসহায়ে আপনার কি যশঃ মিলিবে? যদি আপনি ক্ষত্রিয় কুমার এবং আপনার জন্ম পবিত্র মনুবংশে হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধ করিতেন এবং তাহাতে কিছু (যশঃ বা স্বর্গরূপ) ফলও মিলিত। হে রাম। সুগ্রীব আপনার কি উপকার করিয়াছে এবং আমিই বা আপনার কি উপকার করিতে পারিতাম না? ॥৫২-৫৪॥

আমি তো এইরূপ শুনিয়াছি যে দণ্ডকারণ্যে আপনার ভার্যাকে রাবণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাকে পুনরায় লাভার্থ সহায়তার জন্য আপনি সুগ্রীবের শরণ লইয়াছেন। ॥৫৫॥

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে আপনি আমার বিশ্ববিখ্যাত পরাক্রমের বিষয় অবগত নহেন। হে রাঘব! যদি আমি ইচ্ছা করি তাহা হইলে অর্দ্ধমুহূর্ত সময় মধ্যেই সবংশ রাবণকে বন্ধন করতঃ এবং সীতা ও লঙ্কাকে আমি এখানে আনয়ন করিতে পারি। হে রঘুনন্দন! আপনি সংসারে অতি ধর্মাত্মা বলিয়া কথিত। ॥৫৬-৫৭॥

ব্যাধের মত একটি বানরকে বধ করিয়া আপনার কি ধর্মলাভ হইবে? বানরের মাংস ভক্ষণযোগ্যও নহে, অতএব আপনি আমাকে বধ করিয়া কি লাভ করিবেন?" ॥৫৮॥

বালী এই প্রকার বহু তিরস্কার করিবার পর শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"ধর্মরক্ষা করিবার জন্যই আমি ধনুর্বাণ ধারণ করতঃ ধরাবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকি। ॥৫৯॥

এবং অধর্মাচারীগণকে বধ করিয়া সদ্ধর্ম পালন করিয়া থাকি। কন্যা, ভগ্নী, কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূ ও পুত্রবধূ এই চারিজন সমান। যে মূঢ় ইহাদের কাহারও সহিত সম্ভোগ করে সে মহাপাপী বলিয়া বোদ্ধব্য ; তাহাকে অবশ্য বধ করা রাজার সদা কর্তব্য। ॥৬০-৬১॥

হে বনচর! তুমি বলপূর্বক আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধুর সহিত বিহার করিয়া থাক, এই জন্যই ধর্মজ্ঞ আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। ॥৬২॥

তুমি বানর, তুমি জান না মহাপুরুষগণ আপন আচরণ দ্বারা সর্বলোক পবিত্র করতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের সহিত এই প্রকার ঔদ্ধত্যপূর্ণ তিরস্কারাদি করা অনুচিৎ।" ॥৬৩॥

শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ বচন শুনিয়া বালী অত্যন্ত ভয়-সন্ত্রস্তচিত্তে তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণজ্ঞানে শীঘ্রই প্রণাম করতঃ বলিল— ॥৬৪॥

"হে রাম! হে রাম! হে মহাভাগ! আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। অজ্ঞান বশতঃ আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তজ্জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ॥৬৫॥

হে প্রভো! আপনার দর্শনলাভ মহাযোগিগণেরও অতি দুর্লভ। আমার মহাভাগ্য যে আপনার শরাঘাতে বিদ্ধ হইয়া এবং আপনারই সম্মুখে আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি। ॥৬৬॥

মুমূর্ষু ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ-বলে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই আপনি আজ অন্তিম সময়ে আমার সম্মুখে বিরাজমান। ॥৬৭॥

হে দেব! আমি জানি যে আপনি সাক্ষাৎ পরমপুরুষ নারায়ণ এবং জানকী লক্ষ্মী, ব্রহ্মার প্রার্থনাবশেই রাবণ বধার্থ আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ॥৬৮॥

হে রাম! আমি এখন আপনার পরম-ধাম প্রাপ্ত হইব, আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন। আমার পুত্র বালক অঙ্গদ আমারই তুল্য বলশালী, তাহার উপর আপনি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। ॥৬৯॥

হে রাম! আমার হৃদয়দেশে আপনার করকমল দ্বারা স্পর্শকরতঃ এই বাণ উৎপাটিত করুন।" তখন শ্রীরামচন্দ্র ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করতঃ বাণ নিষ্কাসিত করিলেন। বাণ উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র বালী বানর শরীর পরিত্যাগ করতঃ ইন্দ্ররূপ প্রাপ্ত হইলেন (ইন্দ্রের অংশে বালীর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি মৃত্যুর পর ইন্দ্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন)। ॥৭০॥

হে পার্বতি! বালী শ্রীরামচন্দ্রের বাণে অভিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সুখময় কর-কমলের শীতল স্পর্শও তাহার ভাগ্যে মিলিয়াছিল। অতএব বালী শীঘ্রই কপিদেহ পরিত্যাগ করতঃ সেই পরম-শ্রেষ্ঠ, বহুজনদুর্লভ, পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐরূপ পদপ্রাপ্তি পরমহংসগণের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন। ॥৭১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

তারার বিলাপ ও শ্রীরামচন্দ্রের তাহাকে আশ্বাস প্রদান এবং সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পাবর্তি!

পরমাত্মা রাম কর্তৃক বালী যুদ্ধে নিহত হইবার পর সমস্ত বানরবৃন্দ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কিষ্কিন্ধানগরীতে পলায়ন করিল। ॥১॥

সেথায় যাইয়া তাহারা রানী তারাকে বলিল—"হে মহাভাগে! বানররাজ বালী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন। এখন আপনি মন্ত্রিগণকে প্রেরণ করতঃ রাজকুমার অঙ্গদকে রক্ষা করুন। ॥২॥

হে মাননীয়া! আমরা নগরীর চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের দরজার কপাটাদি বন্ধ করিয়া নগরী রক্ষা করিতেছি। আপনি অঙ্গদকে বানরগণের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করুন।" ॥৩॥

বালীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তারা শোকে মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং আপনার মস্তক ও বক্ষস্থলে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং তিনি বলিলেন—"অঙ্গদ, নগর, রাজ্য এবং ধনাদি আমার কি প্রয়োজন? আমি এখনই আপন পতিদেবের সহিত প্রাণত্যাগ করিব।" ॥৪-৫॥

এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মুক্তকেশী তারা অতি শোকাকূলা হইয়া শীঘ্রই তাহার পতির মৃতদেহ যেস্থানে পড়িয়াছিল সেই স্থানেই উপস্থিত হইলেন। এবং রক্ত ও ধুলি বিলিপ্ত ভূমিশায়ী বালীর মৃতদেহ দর্শন করিয়া 'হা নাথ! হা নাথ!' বলিয়া রোদন করিতে করিতে পতির চরণোপরি পতিত হইলেন। ॥৬-৭॥

এই প্রকার করুণ বিলাপ করিতে করিতে তারা শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"হে রাম! যে বাণের দ্বারা আপনি বালীকে বধ করিয়াছেন উহার দ্বারা আমাকেও বধ করুন। ॥৮॥

কারণ তাহাতে আমি শীঘ্রই পতিলোকে চলিয়া যাইব। তিনি আমার জন্য নিশ্চয়ই প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! আমাকে বিনা, স্বর্গেও তাঁহার শান্তি মিলিবে না। ॥৯॥

হে অনঘ! পত্নী বিয়োগ (বিরহ) জনিত দুঃখের তীব্রতা আপনি উত্তমরূপে অবগত আছেন। অতএব আপনি আমাকে বালীর নিকটে প্রেরণ করুন, ইহাতে আপনি পত্নীদানের ফল পাইবেন। ॥১০॥

(অতঃপর সুগ্রীবের উপর দৃষ্টিপাত করতঃ তারা বলিলেন) হে সুগ্রীব! বালী-ঘাতক শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, এখন তুমি সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য তোমার পত্নী রুমার সহিত সুখে ভোগ কর।" ॥১১॥

তারা এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন তখন মহামনা শ্রীরামচন্দ্র কৃপা প্রদর্শন পূর্বক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন — ॥১২॥

"হে ভীরু (ভীতস্বভাবা)! তোমার পতি শোকের যোগ্য নহেন। তুমি কেন ব্যর্থ শোক করিতেছ? তুমি বিচার করিয়া ইহা বল, বস্তুতঃ তোমার পতি কি বালীর এই দেহমাত্র? অথবা এই দেহেতে অবস্থানকারী জীব? (যদি বল এ দেহই আমার পতি, তবে) এই দেহ তো জড় পঞ্চভূতময় ও ত্বক্, মাংস, রুধির, অস্থি সমূহ দ্বারা নির্মিত এবং কাল কর্ম ও গুণ সমূহ দ্বারা উৎপন্ন। সে দেহ তো তোমার সম্মুখে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে (তবে কেন আর তাহার জন্য শোক করিতেছ?)। ॥১৩-১৪॥

আর যদি জীবকে আপন পতি মনে কর, তাহা হইলেও তোমার শোক করা উচিৎ নহে। কেন না বস্তুতঃ জীবাত্মা সর্ববিকার রহিত। তাহার জন্ম, মৃত্যু, গমন বা আগমন আদি কিছুই নাই। ॥১৫॥

জীবাত্মা সর্বব্যাপক, অব্যয়, উহা স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক কোনটিই নহে। জীবাত্মা এক, অদ্বিতীয়, আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, নিত্য, জ্ঞানময় ও শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ—উহা কি প্রকারে শোকের যোগ্য হইতে পারে?" ॥১৬॥

তারা বলিলেন—"হে রাম! দেহ তো কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জড় আর জীব নিত্য ও চৈতন্য স্বরূপ। তাহা হইলে সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ কাহার সহিত হয়, তাহা আমাকে বলুন।" ॥১৭॥

শ্রীরামচন্দ্রজী বলিলেন—"দেহ ও ইন্দ্রিয়গণসহ যতদিন অহঙ্কারাদি অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ সম্বন্ধ হয় ততদিন পর্যন্ত আত্মা ও অনাত্মার বিবেক রহিত জীবের সুখ-দুঃখাদি ভোগরূপ সংসার সম্বন্ধ হইয়া থাকে। ॥১৮॥

সংসার আত্মাতে আরোপিত, মিথ্যা, তথাপি ইহা তত্ত্বজ্ঞান বিনা স্বয়ং নিবৃত্ত হয় না। নিরন্তর বিষয়ধ্যানকারী পুরুষ স্বপ্নকালে যেমন বহু কল্পিত মিথ্যা পদার্থ দর্শন করিয়া থাকে, এ সংসারও তদ্রূপ। ॥১৯॥

অনাদি অবিদ্যা ও তাহার কার্য অহঙ্কারের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ এই সংসার মিথ্যা হইলেও রাগদ্বেষাদি পূর্ণ। ॥২০॥

হে শুভে! মনই সংসার এবং মনই বন্ধন। আত্মা মনসহ (অন্যোন্যাধ্যাস বশতঃ) একত্বপ্রাপ্ত হইয়া তদ্গত সুখ দুঃখাদি বন্ধন-ভাগী হইয়া থাকেন। ॥২১॥

স্ফটিক মণি স্বভাবত স্বচ্ছ বর্ণ হইয়াও লাক্ষা আদির সামীপ্যবশতঃ তদ্‌গুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুত তাহার সেই রং নাই। ॥২২॥

তদ্রূপ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সান্নিধ্য বশতঃ আত্মা যেন অবশ হইয়া সংসারীরূপে প্রতীত হন। আত্মা আপন লিঙ্গ (জ্ঞানের সাধন) মনকে স্বীকার করিয়া তাহার কল্পিত বিষয় সেবন করতঃ সেই বিষয়ের প্রতি রাগ দ্বেষাদি গুণসমূহ দ্বারা বদ্ধ হইয়া সংসার-চক্রের বশীভূত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ রাগ দ্বেষাদি মনের গুণসমূহ কল্পিত হয় তৎপর তাহার সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার কর্মে প্রবৃত্তি হয়। কর্ম শুক্ল (জপ ধ্যানাদি), লোহিত (হিংসাময় যাগ যজ্ঞাদি) ও কৃষ্ণ (মদ্যপানাদি) এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। এই সকল কর্ম অনুসারেই জীবের নানাবিধ গতি লাভ হয়। জীব এইরূপ কর্মের বশীভূত হইয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত সংসার চক্রে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। ॥২৩-২৫॥

প্রলয়কালে সর্বভূতসমূহ লয় হইয়া গেলেও জীব আপন কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিষয়ে অভিনিবেশ বশতঃ স্বীয় বাসনা ও কর্মসহ অনাদি অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া বিদ্যমান থাকে। ॥২৬॥

পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে এই জীব বিবশ হইয়া স্বীয় পূর্ব বাসনাযুক্ত মনের সহিত উৎপন্ন হয় এবং ঘটীযন্ত্রের ন্যায় সংসারচক্রে নিয়ত ভ্রমণ করিতে থাকে। ॥২৭॥

কোন বিশেষ পুণ্য উদয় হইলেই এই জীবের আমার ভক্ত এবং শান্তচিত্ত মহাত্মাদের সঙ্গ লাভ হয় এবং তখন তাহার চিত্ত আমার প্রতি সংলগ্ন হয়। ॥২৮॥

তখন ভগবদ্‌কথা শ্রবণের প্রতি অতি দুর্লভ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ভগবদ্‌কথা শ্রবণের ফলে অনায়াসে তাহার ভগবদ্-স্বরূপ-বিজ্ঞান উপস্থিত হয়। ॥২৯॥

অতঃপর গুরুকৃপায় শ্রুত তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্যের অর্থজ্ঞান সহ আপন অনুভব বলে অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আপন আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও অহঙ্কারাদি হইতে পৃথক জানিয়া জীব অতি শীঘ্র ক্ষণকালমধ্যেই মুক্ত হইয়া যায়। হে তারা! আমি তোমাকে (সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত) পারমার্থিক সত্য তত্ত্ব বর্ণন করিলাম। ॥৩০-৩১॥

মদুক্ত এইপরমার্থ তত্ত্ব অহর্নিশি যে ব্যক্তি মনন করিয়া থাকে সাংসারিক দুঃখ তাহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। তুমিও শুদ্ধচিত্ত হইয়া আমার এই উপদেশ মনন কর। এইরূপ করিলে সাংসারিক দুঃখসমূহ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবং তুমি কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ॥৩২-৩৩॥

হে সুভ্রু! পূর্বজন্মে তুমি আমার প্রতি উত্তম ভক্তি অভ্যাস করিয়াছিলে, সে জন্যই হে শুভ লক্ষণা! তোমাকে মুক্ত করিবার জন্য আমি তোমাকে দর্শন দিয়াছি (অর্থাৎ তুমি আমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছ)। ॥৩৪॥

তুমি দিবারাত্র আমার রূপ ধ্যানসহ মদুক্ত এই উপদেশ মনন কর, তাহা হইলে প্রবাহ পতিত অর্থাৎ প্রারব্ধ বশে প্রাপ্ত কর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও তুমি আর তাহাতে লিপ্ত হইবে না।” ॥৩৫॥

শ্রীরামচন্দ্র কথিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া তারা অতি বিস্মিত হইলেন এবং দেহাভিমান জনিত শোক পরিত্যাগ করতঃ শ্রীরঘুনাথজীকে প্রণাম করিলেন এবং আত্মানুভবে পরিতৃপ্ত হইয়া জীবনমুক্ত পদবীতে আরূঢ়া হইলেন। পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষণমাত্র সৎসঙ্গের ফলে তারা অনাদি অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন করতঃ নিষ্পাপ ও মুক্ত হইয়া গেলেন। শ্রীভগবানের মুখ নিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবেরও অজ্ঞান দূরীভূত হইল এবং তিনি স্বস্থচিত্ত হইলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বানর-শ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলেন— ॥৩৬-৩৯॥

“হে সুগ্রীব! আমার আজ্ঞায় তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুস্পুত্র অঙ্গদের দ্বারা জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর শাস্ত্রোক্ত ঔর্দ্ধদৈহিক যাহাকিছু সংস্কারাদি করণীয় কর্ম আছে তাহা সব বিধিপূর্বক কর। ॥৪০॥

তখন শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করিয়া সুগ্রীব মুখ্য মুখ্য বলবান বানরগণের সহায়তায় বালীর শবদেহ পুষ্পাকীর্ণ বিমানোপরি স্থাপন করিলেন এবং সমস্ত রাজোচিত উপচার সহিত ভেরী দুন্দুভি আদি বাদ্যসহকারে ব্রাহ্মণ, মন্ত্রিবর্গ, যূথপতি বানরগণ, পুরবাসী, তারা এবং অঙ্গদসহ সেই বিমান লইয়া গিয়া বহু প্রযত্নে বালীর শাস্ত্রানুকূল সর্ব সংস্কার করিলেন ও তৎপর স্নানাদি সম্পাদন করতঃ মন্ত্রিগণ সহ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। ॥৪১-৪৩॥

সুগ্রীব অতি প্রসন্ন চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“হে রাজেন্দ্র! বানরগণের এই সমৃদ্ধ রাজ্য আপনি শাসন করুন। ॥৪৪॥

আমি আপনার দাস, লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও সদা আপনার চরণ কমলের সেবা করিব।” ইহা শুনিয়া মৃদু হাস্য সহকারে শ্রীরঘুনাথজী সুগ্রীবকে বলিলেন— ॥৪৫॥

"হে সুগ্রীব! আমি আর তুমি অভিন্ন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার আজ্ঞায় তুমি শীঘ্র যাইয়া কিষ্কিন্ধার রাজপদে আপনাকে অভিষিক্ত করাও। ॥৪৬॥

হে সখে! আমি চতুর্দশ বর্ষ কোন নগরে প্রবেশ করিব না, সেইজন্য ভাই লক্ষ্মণ তোমার রাজ্যাভিষেকের সময় কিষ্কিন্ধা নগরে গমন করিবে। ॥৪৭॥

অঙ্গদকে তুমি সাদরে যৌবরাজ্যপদে অভিষিক্ত করিও। আমি এখন এই বর্ষাকাল ভাই লক্ষ্মণের সহিত সমীপবর্তী পর্বতশিখরে বাস করিব। তুমিও কিছুদিন নগরে বাস করিয়া তৎপর সীতার অনুসন্ধানে প্রযত্ন করিও।" ॥৪৮-৪৯॥

তখন সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ বলিলেন—"হে দেব! আপনার যেরূপ আজ্ঞা হইবে আমি তাহাই করিব।" ॥৫০॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সুগ্রীব লক্ষ্মণসহ কিষ্কিন্ধাপুরীতে গমন করিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ বলিয়াছিলেন তদ্রূপই সর্বকার্য সম্পাদন করিলেন। ॥৫১॥

তদনন্তর সুগ্রীব কর্তৃক যথাবিধি আদর ও সৎকারাদি প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করতঃ তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার সেবায় তৎপর হইলেন। ॥৫২॥

শ্রীরামচন্দ্রও লক্ষ্মণ সহ শীঘ্রই প্রবর্ষণ পর্বতোপরি এক বিস্তীর্ণ শিখর দেশে গমন করিলেন। ॥৫৩॥

সেখানে তাঁহারা স্ফটিক নির্মিত স্বচ্ছ ও প্রকাশমান এক গুহা দেখিতে পাইলেন। ঐ গুহা বর্ষা বায়ু ও রৌদ্র-সহ অর্থাৎ বর্ষাদি হইতে সুরক্ষিত ছিল এবং নিকটেই কন্দ, মূল ও ফলাদি প্রচুর ও সহজলভ্য ছিল। উহা দেখিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ঐ স্থানটি বাস করিবার জন্য পছন্দ করিলেন। ॥৫৪॥

অতঃপর রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রজী দিব্য মূল, ফল ও পুষ্প সম্পন্ন, মুক্তাতুল্য স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবরযুক্ত এবং চিত্রবিচিত্র বর্ণের মৃগ ও পক্ষিকুল সুশোভিত সেই প্রবর্ষণ পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ক্রিয়াযোগ (পূজা পদ্ধতি) বর্ণন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

লক্ষ্মণ সহ লীলাময় শ্রীরামচন্দ্র সেই মণিময় গুহাতে বিচরণ এবং পরিপক্ক ফল, মূল ভোজন দ্বারা জীবন নির্বাহ করতঃ বর্ষাঋতুর দিন সমূহ আনন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ॥১॥

'তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ'। ॥১॥ পা.যো.সূ — সা.পাদ.

বায়ু-প্রেরিত সজলমেঘ দর্শন করিয়া শ্রীরাম বড়ই বিস্মিত হইতেন, কারণ সেই মেঘগর্ভে বিদ্যুতের ঝলক হইলে তাঁহার নিকট ঐ মেঘরাশি যেন সুবর্ণ শৃংখলশোভিত হস্তিযূথের ন্যায় প্রতীত হইত। ॥২॥

নবীন তৃণ ভোজনে হৃষ্টপুষ্ট মৃগ ও পক্ষিকুল যখন কখনও কখনও ইতস্ততঃ ধাবিত হইত তখন শ্রীরামচন্দ্রের উপর দৃষ্টিপাত হইলে তাহারা তাঁহার দিকে বিস্ফারিত নয়নে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। ॥৩॥

এবং ধ্যাননিষ্ঠ মুনীশ্বরগণের ন্যায় এদিক ওদিক সঞ্চরণ বিস্মৃত হইয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিত। এই সময়ে পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র মায়া মনুষ্যরূপে পর্বত ও বনে বিচরণ করিতেছেন জানিয়া বহু সিদ্ধগণ পৃথিবীতে মৃগ ও পক্ষীরূপ ধারণ করতঃ তাঁহার সেবায় রত হইলেন। ॥৪-৫॥

একদিন ধ্যানপরায়ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সমাধিভঙ্গ হইলে সুমিত্রানন্দন শ্রীলক্ষ্মণ অতিপ্রেম ও ভক্তিযুক্ত নম্রতা সহকারে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—"ভগবন্! আপনি পূর্বে আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার দ্বারা আমার হৃদগত অনাদি-অবিদ্যা-জন্য সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে। ॥৬-৭॥

কিন্তু হে রাঘব! সংসারে যোগিগণ ক্রিয়ামার্গ (পূজাপদ্ধতি) সহায়ে যে প্রকার আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন তাহা আমি এইক্ষণে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ॥৮॥

সমস্ত যোগিগণ, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাস, এবং কমলজ শ্রীব্রহ্মাও এই ক্রিয়াযোগই (ক্রিয়ামার্গ) মুক্তি সাধন বলিয়াছেন। ॥৯॥

হে রাজরাজেশ্বর! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য আদি আশ্রমধারিগণেরও মোক্ষের সাধন এই ক্রিয়াযোগ এবং স্ত্রী শূদ্রগণেরও মুক্তির সাধন এই ক্রিয়াযোগ অতি সুলভ। হে প্রভো! আমি আপনার ভক্ত এবং ভ্রাতা সুতরাং আপনি আমাকে সর্বজনের উপকারী এই সাধনতত্ত্ব (ক্রিয়াযোগ) বর্ণন করুন।" ॥১০॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"হে রঘুকুলনন্দন লক্ষ্মণ! আমার পূজাবিধির কোন অন্ত নাই, তথাপি আমি উহা তোমার নিকট সংক্ষেপে যথাবৎ বর্ণন করিতেছি। ॥১১॥

আমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন মনুষ্য স্বীয় শাখার গৃহ্য-সূত্র দ্বারা কথিত প্রকারে উপনয়ন সংস্কারানন্তর দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ॥১২॥

তৎপর বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই গুরুদেবের কথিত বিধি অনুসারে স্বীয় হৃদয়, অগ্নি, প্রতিমা আদি অথবা সূর্যে আমার সেবাপূজা করিবে। ॥১৩॥

অথবা সাবধান হইয়া শালগ্রামশিলাতেই আমার উপাসনা করিবে। বুদ্ধিমান উপাসকের ইহাই কর্তব্য যে সর্বপ্রথম দেহশুদ্ধির জন্য প্রাতঃকালেই বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ ও শরীরে বিধিবৎ মৃত্তিকাদি লেপন করতঃ স্নান করিবে ও তৎপর নিয়মানুসারে সন্ধ্যা আদি নিত্যকর্ম করিবে। ॥১৪-১৫॥

বুদ্ধিমান পূজক কর্মের সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রথমে সংকল্প করিয়া আপন গুরুদেবকে আমারই একটি রূপ চিন্তা করিয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহার পূজা করিবে। ॥১৬॥

আমার মূর্তি শিলারূপ হইলে তাঁহাকে স্নান করাইবে আর প্রতিমাকার হইলে কেবল মার্জন করিবে। অতঃপর প্রসিদ্ধ গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা আমার পূজা করিবে। এইরূপ পূজা শীঘ্র ফল প্রদান করিয়া থাকে। ॥১৭॥

সর্বপ্রকার ছলনা পরিত্যাগ করতঃ শ্রীগুরুকথিত বিধি নিয়ম বদ্ধ হইয়া আমার পূজা করা কর্তব্য। হে রঘুকুল নন্দন লক্ষ্মণ! প্রতিমা আদি পুষ্প ও অলঙ্কার আদি দ্বারা সুসজ্জিত করিলে তাহা আমার অতি প্রীতিকর হইয়া থাকে। ॥১৮॥

অগ্নিতে পূজা করিতে হইলে তাহা ঘৃতাহুতি দ্বারা করিবে। পুনঃ সূর্যে পূজা করিতে হইলে বেদীতে সূর্যের আকার অঙ্কন করিয়া তাহাতে পূজা করিবে। শ্রদ্ধাপূর্বক নিবেদিত ভক্ত প্রদত্ত সামান্য জলও আমার প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। ॥১৯॥

সুতরাং ভক্ষ্য, ভোজ্য আদি পদার্থ এবং গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত আদি পূজা সামগ্রী আমাকে ভক্তিসহ সমর্পণ করিলে যে আমার পরম প্রীতি উৎপন্ন হয় ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব সর্বপ্রথম পূজার সর্ব সামগ্রী একত্রিত করিয়া তৎপর আমার পূজা আরম্ভ করিবে। ॥২০॥

(পূজা আরম্ভ প্রকার বর্ণিত হইতেছে)—প্রথমতঃ ভূমির উপর কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি মৃগচর্ম এবং তদুপরি বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া আসন প্রস্তুত করিবে এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া ইষ্টদেবের সম্মুখে সেই আসনোপরি উপবেশন করিবে। ॥২১॥

তদনন্তর বহির্মাতৃকা ও অন্তর্মাতৃকা ন্যাস এবং কেশব, নারায়ণ আদি চতুর্বিংশতি নামের ন্যাস এবং তত্ত্বন্যাস করা কর্তব্য। তৎপশ্চাৎ বিষ্ণু-পঞ্জরোক্ত বিধি অনুসারে আমার মূর্তিতে পঞ্জর ন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করিবে। আমার প্রতিমা আদিতেও নিরলস হইয়া ঐ প্রকার ন্যাস করিতে হইবে। ॥২২-২৩॥

পূজক সম্মুখে বামদিকে জলপূর্ণ কলস ও দক্ষিণদিকে পুষ্প আদি সামগ্রী রাখিবে। অর্ঘ্য, পাদ্য, মধুপর্ক প্রদানার্থ ও আচমনের জন্য চারটি পৃথক পাত্র রাখিবে। তদনন্তর সূর্যসদৃশ তেজস্বী আপন হৃদয় কমলে, জীব নামক আমার যে কলা বিদ্যমান, তাহার ধ্যান করিবে এবং হে শত্রুদমন! আপন সম্পূর্ণ শরীর তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এরূপ চিন্তা করিবে। প্রতিমা আদি পূজা করিবার সময়ও সেই প্রতিমাদিতে জীবকলার নিত্য আবাহন করিবে। ॥২৪-২৬॥

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্র, আভূষণ আদি অথবা স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী উপচার সহ নিষ্কপট চিত্তে আমার পূজা করিবে। ॥২৭॥

পূজক ধনবান হইলে নিত্য কর্পূর, কুমকুম, অগুরু, চন্দন এবং অতি উত্তম সুগন্ধি পুষ্প সহায়ে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আমার পূজা করিবে। ॥২৮॥

তৎপর নীরাজন (পঞ্চপ্রদীপ) ধূপ দীপ ও নানাপ্রকার নৈবেদ্য দ্বারা বেদোক্ত দশাবরণ পূজাবিধি সহায়ে আমার অর্চনা করিবে। ॥২৯॥

প্রতিদিন অতি শ্রদ্ধার সহিত সর্বপদার্থ নিবেদন করা কর্তব্য, কারণ আমি পরমাত্মা শ্রদ্ধাভুক্ অর্থাৎ ভক্তের শ্রদ্ধাই আমার পরম কাম্য।* মন্ত্রবিধিজ্ঞ উপাসক পূজার শেষে বিধি পূর্বক হবন করিবে। ॥৩০॥

শাস্ত্রবিধিজ্ঞ বুদ্ধিমান পূজকের, অগস্ত্যমুনি কথিত বিধি অনুযায়ী কুণ্ডনির্মাণ করিয়া তাহাতে গুরুপ্রদত্ত মূলমন্ত্র দ্বারা অথবা পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা আহুতি প্রদান করা কর্তব্য। ॥৩১॥

অথবা অগ্নিহোত্রের অগ্নিতে চরু ও ঘৃতদ্বারা হবন করিবে। হবন করিবার সময় বুদ্ধিমান যাজক হোমাগ্নিতে তপ্ত সুবর্ণসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট ও দিব্য অলঙ্কার বিভূষিত যজ্ঞপুরুষের রূপে পরমাত্মার ধ্যান করিবে, এবং আমার পার্ষদগণকে বলি (উপহার) প্রদান করতঃ হোম সমাপ্ত করিবে। ॥৩২-৩৩॥

তদনন্তর মৌনাবলম্বন পূর্বক আমাকে ধ্যান ও স্মরণ করিতে করিতে জপ করিবে এবং পরম প্রীতির সহিত তাম্বুল ও মুখবাস প্রদান করতঃ আমার প্রীত্যর্থ নৃত্য, গান ও স্তুতি পাঠ করাইবে এবং হৃদয়ে আমার মনোহর মূর্তি ধারণ করতঃ ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। ॥৩৪-৩৫॥

অতঃপর আমার প্রদত্ত ভাবনাময় প্রসাদ 'ইহা ভগবৎ প্রসাদ' এইরূপ ভাবনা সহকারে স্বীয় মস্তকোপরি ধারণ করতঃ এবং ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া আমার চরণ শিরোপরি স্থাপন করিয়া 'হে প্রভো! আমাকে এই ঘোর সংসার হইতে রক্ষা করুন' এইরূপ বলিয়া আমাকে প্রণাম করিবে। তদনন্তর বুদ্ধিমান উপাসক বহির্দেশে প্রতিমাতে আবাহন করা জীবকলাকে 'পুনরায় স্বীয় হৃদয়েই প্রবিষ্ট হইল', এইরূপ ভাবনা করতঃ প্রতিমা বিসর্জন করিবে। ॥৩৬-৩৭॥

যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে বিধিপূর্বক আমার পূজা করিয়া থাকে, আমার কৃপায় সে ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই সম্যক সিদ্ধি লাভ করে। ॥৩৮॥

যে ভক্ত নিত্য এইরূপে আমার পূজা করে সে আমার সারূপ্য (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৩৯॥

এই পূজাবিধি অতি গোপনীয়, পরম পবিত্র এবং সনাতন। ইহা আমি সাক্ষাৎ স্বীয় মুখে বর্ণন করিলাম। যে পুরুষ ইহা নিরন্তর পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ইহাতে সম্পূর্ণ পূজার ফল প্রাপ্ত হয়, ইহা নিঃসন্দেহ।" ॥৪০॥

এই প্রকারে আপন অনন্য ভক্ত শেষাবতার মহাত্মা লক্ষ্মণজী কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে এই অতি উত্তম ক্রিয়াযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন। ॥৪১॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় মায়া অবলম্বন পূর্বক প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ পুরুষের ন্যায় দুঃখিত হইয়া 'হা সীতা, হা সীতা' বলিয়া বিলাপ করতঃ বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। ॥৪২॥

---

* এরূপ কথিত হয় যে ভগবান ভক্তি, প্রেম ও শ্রদ্ধার ভিখারী।

এই সময়ে কিষ্কিন্ধাপুরীতে পরম বুদ্ধিমান হনুমান বানররাজ সুগ্রীবকে একান্তে বলিলেন— ॥৪৩॥

"হে রাজন্! শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে অতি হিতকারী বাক্য বলিতেছি। দেখুন পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র আপনার পরম উপকার করিয়াছেন। ॥৪৪॥

কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে আপনি কৃতঘ্ন ব্যক্তির ন্যায় সব বিস্মৃত হইয়াছেন। আপনার জন্যই তিনি ত্রিলোক মান্য বীরশ্রেষ্ঠ বালীকে বধ করিয়াছেন, আপনাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং (যাঁহার কৃপায়) পরম দুর্লভ তারাকে আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন,—সেই বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতাসহ পর্বত শিখরে বাস করিতেছেন এবং স্বীয় গুরুতর কার্যসিদ্ধির সহায়তার জন্য একাগ্রচিত্তে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আপনি বানর স্বভাব বশতঃ স্ত্রী-লম্পট হইয়া তাহা সব বিস্মৃত হইয়াছেন। ॥৪৫-৪৭॥

'সীতার অনুসন্ধান আমি অবশ্য করিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনি এ পর্যন্ত কিছুই করেন নাই। আপনি বড়ই কৃতঘ্ন। মনে হইতেছে বালীর ন্যায় আপনিও শীঘ্রই কাল কবলিত অর্থাৎ হত হইবেন।" ॥৪৮॥

হনুমানের বাক্যশ্রবণ করিয়া সুগ্রীব ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—"হনুমান! তুমি ঠিক বলিয়াছ। ॥৪৯॥

এখনই তুমি আমার আজ্ঞায় অতি শীঘ্রই শীঘ্রগামী দশ সহস্র বানর দশদিকে প্রেরণ কর। তাহারা সপ্তদ্বীপবাসী যাবতীয় বানরগণকে এইখানে আনয়ন করিবে এবং মুখ্য মুখ্য বানরগণকে এইস্থানে এক পক্ষকাল মধ্যেই আসিতে হইবে। পক্ষকাল মধ্যে যাহারা না আসিবে তাহারা আমার হস্তে নিহত হইবে।" হনুমানজীকে এই প্রকার আদেশ করতঃ সুগ্রীব আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ॥৫০-৫২॥

সুগ্রীবের আদেশ পাইয়া পরম বুদ্ধিমান মন্ত্রিবর শ্রীহনুমানজী তৎক্ষণাৎ বহু বানরগণকে দশ দিকে প্রেরণ করিলেন। ॥৫৩॥

দান-মানাদিসহায়ে সন্তুষ্ট করতঃ অগণিত গুণসম্পন্ন, পরাক্রমশালী বায়ুতুল্য বেগবান এবং পর্বতসদৃশ স্থূলকায় মুখ্য মুখ্য বানর দূতগণকে রামকার্যের নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পবননন্দন শ্রীহনুমানজী সর্ব দিকে পাঠাইলেন। ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

ভগবান রামের শোক এবং লক্ষ্মণের কিষ্কিন্ধাপুরী গমন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

একদিন রাত্রির প্রথমভাগে প্রবর্ষণ গিরির মণিময় শিখরোপরি উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র সীতার বিরহজনিত সন্তাপ সহন করিতে না পারিয়া এই প্রকার বলিলেন— ॥১॥

"হে লক্ষ্মণ! দেখ আমার সীতাকে রাক্ষস বলপূর্বক হরণ করিয়াছে। সেই সুন্দরী অদ্যাবধি জীবিত আছেন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য এ পর্যন্ত কোন সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ॥২॥

যদি কেহ আমাকে এই সংবাদ দিতে পারে যে সীতা জীবিত আছেন তাহা হইলে উহা আমার মহা উপকার হইবে। যদি সেই সাধ্বী জীবিত আছেন ইহা আমি জানিতে পারি তবে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সমুদ্র মন্থন পূর্বক অমৃত লাভের ন্যায়, যে প্রকারেই হউক অবশ্যই আমি শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আসিব। ভাই! আমার প্রতিজ্ঞা শোন—'যে দুষ্ট আমার জানকীকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে পুত্র, সেনা বাহনসহ ভস্ম করিয়া ফেলিব। হে চন্দ্রবদনী সীতা! আমার অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখাতুর হইয়া রাক্ষসগৃহে অবস্থান করতঃ তুমি কি প্রকারে প্রাণধারণ করিবে? হায়! চন্দ্রমুখী সীতা বিনা আমার নিকট চন্দ্রমাও প্রখর সূর্য সদৃশ তাপদায়ী রূপে প্রতীত হইতেছে। ॥৩-৬॥

হে চন্দ্র! তুমি স্বীয় কিরণসমূহ দ্বারা জানকীকে স্পর্শ কর! পুনঃ সেই স্পর্শগুণে শীতল হইয়া তোমার শীতল কিরণ সহায়ে আমাকে স্পর্শ কর। হায়! সুগ্রীবও বড় নির্দয় হইয়াছে, সে দুঃখী আমার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। ॥৭॥

নিষ্কন্টক রাজ্য প্রাপ্তির পর সে এখন মদ্যপানে আসক্ত এবং কামকিঙ্কর হইয়া সর্বদা স্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত থাকিয়া একান্ত স্থানে পড়িয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে সে অত্যন্ত কৃতঘ্ন। ॥৮॥

শরৎকাল সমাগত দেখিয়াও সে আমার প্রাণপ্রিয়া সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত আসিল না। আমি পূর্বে তাহার উপকার করিয়াছি, তথাপি সেই দুষ্ট কৃতঘ্ন আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। (সীতাহরণকারীকে আমি যেমন বিনাশ করিব) সেই প্রকার সুগ্রীবকে তাহার নগর ও বন্ধুগণসহ বধ করিব। বালী যে প্রকার আমার হস্তে নিহত হইয়াছে আজ সুগ্রীবও সেই প্রকার নিহত হইবে।" ॥৯-১০॥

রঘুনাথজীকে এই প্রকার কোপাবিষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন—"হে রাম! আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি এখনই যাইয়া দুষ্টচিত্ত সুগ্রীবকে নিধন করতঃ আপনার নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।" এইরূপ বলিয়া হস্তে ধনুক ও তূণীর ধারণ করতঃ লক্ষ্মণকে স্বয়ং যাইতে সমুদ্যত দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"বৎস! সুগ্রীব আমার প্রিয় মিত্র, তুমি তাহাকে বধ করিও না। ॥১১-১৩॥

কেবল 'তুমি বালীর ন্যায় নিহত হইবে' এইরূপ বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইবে। এবং পুনরায় শীঘ্রই সুগ্রীবের প্রত্যুত্তর লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবে। তৎপর যাহাকিছু কর্তব্য তাহা আমি নিঃসন্দেহে করিব।" তখন মহাপরাক্রমী লক্ষ্মণ 'অতি উত্তম' বলিয়া শীঘ্রই কিষ্কিন্ধা-পুরীতে আগমন করিলেন। ঐ সময় ক্রোধে তিনি এইরূপ উগ্ররূপ ধারণ করিলেন যে, যেন তিনি সমস্ত বানর বংশকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। শ্রীরঘুনাথজী সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানস্বরূপ, শ্রীলক্ষ্মী তাঁহার সহিত নিত্যযুক্তা। তথাপি সাধারণ স্ত্রীবিয়োগে শোকার্ত প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় সীতার শোকে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সেই প্রভু বুদ্ধি আদির সাক্ষী, মায়ার যাবতীয় কার্যের

অতীত এবং রাগ, দ্বেষাদি বিকার রহিত হইয়াও এই বিকারের কার্যরূপ শোক তাঁহার কি প্রকারে হইতে পারে? তিনি তো ব্রহ্মাজীর বাণীর সত্যতা প্রদর্শন এবং মহারাজ দশরথের তপস্যার ফল প্রদান করিবার জন্যই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'সর্বজীব মায়া-মোহিত হইয়া অজ্ঞান-বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে, কি প্রকারে ইহাদের মুক্তি হইবে'— এই প্রকার চিন্তা করিয়া ভগবান বিষ্ণু স্বীয় সকল-লোক-মলাপহারিণী রামায়ণ নামক কথা জগতে বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে রামরূপ ধারণ করতঃ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন এবং ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত সময়ানুকূল ক্রোধ, মোহ ও কামাদি বিকার সমূহ স্বীকার করতঃ সেই বিকারের বশীভূত হইয়া জীবগণকে স্বীয় লীলার দ্বারা মোহিত করিয়া থাকেন। সর্বগুণে অনুরক্তরূপে দৃশ্যমান হইলেও তিনি বস্তুতঃ সর্বগুণ-রহিত। ॥১৪-২২॥

তিনি বিজ্ঞান স্বরূপ, বিজ্ঞানই তাঁহার শক্তি এবং তিনি একমাত্র সাক্ষী ও সর্বগুণাতীত। এজন্যই তিনি কামাদি সর্বমানব-বিকার হইতে আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত। ॥২৩॥

কোন কোন মুনিগণ, জনকাদি রাজর্ষিগণ এবং তাঁহার বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই সর্বদা তাঁহার বাস্তব স্বরূপ যথার্থরূপে অবগত, সেই জন্মরহিত ভগবান ভক্তের ভাবনা অনুসারেই অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ॥২৪॥

এদিকে লক্ষ্মণজী কিষ্কিন্ধাপুরীর নিকটে পৌঁছিয়া সর্ব বানরগণের ভয় ও ভীতি উৎপাদন করতঃ আপন ধনুকে জ্যা আরোপণ সহায়ে ভয়ঙ্কর টঙ্কার করিলেন। ॥২৫॥

ঐ সময় লক্ষ্মণকে দেখিয়া নগরপ্রাচীরোপরি বিদ্যমান কিছু সাধারণ বানর হস্তে প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষাদি ধারণ করতঃ 'কিল কিলা' শব্দ করিতেছিল। সেই বানরগণকে দেখিয়া বীরবর লক্ষ্মণের নেত্র ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি ধনুক উঠাইয়া তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ॥২৬-২৭॥

লক্ষ্মণ আগমন করিয়াছেন জানিয়া মন্ত্রিবর অঙ্গদ অবিলম্বে উল্লম্ফনে সেখানে আগমন করিয়া সব বানরগণকে সংযত করিল এবং লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। ॥২৮-২৯॥

অতঃপর প্রিয়বর্দ্ধন লক্ষ্মণজী অঙ্গদকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—"বৎস! তুমি এখনই যাইয়া তোমার পিতৃব্য সুগ্রীবকে ইহা নিবেদন কর যে শ্রীরামচন্দ্র তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া অঙ্গদ 'আচ্ছা, আমি যাইতেছি' বলিয়া শীঘ্রই সর্বসমাচার সুগ্রীবকে নিবেদন করিল। ॥৩০-৩১॥

এবং বলিল, 'ক্রোধে রক্তবর্ণনেত্র হইয়া লক্ষ্মণ নগরের বাহিরে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।' ইহা শুনিয়া বানররাজ সুগ্রীব বড়ই ভয়ভীত হইয়া পড়িলেন। ॥৩২॥

তিনি মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ হনুমানজীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"তুমি অঙ্গদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনীতভাবে লক্ষ্মণের নিকট শীঘ্রই গমন কর এবং ক্রুদ্ধ বীরবরকে ধীরে ধীরে শান্ত করিয়া অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে এইস্থানে লইয়া আইস।" এই প্রকারে হনুমানজীকে প্রেরণ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীব তারাকে বলিলেন— ॥৩৩-৩৪॥

"হে অনঘে! তুমি আগে যাইয়া মৃদুমধুর বাণী সহায়ে বীরবর লক্ষ্মণকে শান্ত কর। এবং তিনি শান্ত হইলে তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনয়ন করতঃ তৎপশ্চাৎ আমাকে দর্শন করাও।" ॥৩৫॥

ইহা শুনিয়া তারা 'আচ্ছা তাহাই হউক' এইরূপ বলিয়া মধ্য কক্ষে আগমন করিলেন। হনুমানও অঙ্গদের সহিত লক্ষ্মণের নিকট গমন করতঃ নতশিরে ভক্তিপূর্বক স্বাগত করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন—"হে মহাভাগ! বীরবর! আপনি নিঃশঙ্ক হইয়া আগমন করুন, ইহা আপনারই গৃহ। ॥৩৬-৩৭॥

কৃপা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করুন এবং রাজমহিষিগণ ও মহারাজ সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া তৎপর আপনার যেরূপ আদেশ হইবে আমরা তাহাই করিব।" ॥৩৮॥

এই প্রকার বলিয়া পবননন্দন শ্রীহনুমান ভক্তিপূর্বক লক্ষ্মণকে হস্তধারণকরতঃ নগরমধ্য মার্গ দ্বারা রাজমন্দিরের দিকে আনয়ন করিলেন। ॥৩৯॥

মার্গপার্শে ইতস্ততঃ যূথপতি বানরগণের বিশাল মহল দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ ইন্দ্রভবন তুল্য অতিশয় শোভাসম্পন্ন রাজভবনে পৌঁছিলেন। ভবনের মধ্য কক্ষে চন্দ্রবদনা সর্বাভরণ-ভূষিতা তারা উপবিষ্টা ছিলেন। মদপ্রভাবে তাহার নেত্রান্তভাগ অরুণ বর্ণ হইয়াছিল। ॥৪০-৪১॥

তখন মধুরভাষিণী তারা লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন—"আসুন দেবর! আপনার কল্যাণ হউক। আপনি বড়ই সাধুস্বভাব এবং ভক্তবৎসল। আপনার ভক্ত ও অনুগত বানররাজ সুগ্রীবের উপর কি কারণে আপনি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? তিনি তো দীর্ঘকাল সর্বসহায় বিহীন হইয়া অনবরত দুঃখই ভোগ করিয়াছেন। ॥৪২-৪৩॥

এখন আপনারাই তাহাকে মহা দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনাদের কৃপাবলেই মহামতি সুগ্রীব এই সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ॥৪৪॥

(জাতিতে বানর অতএব) কামাসক্ত হইয়া সুগ্রীব এতদিন রঘুনাথজীর সেবায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। হে প্রভো! শীঘ্রই নানাদেশ হইতে বানরগণ এইস্থানে আগমন করিবে। ॥৪৫॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! বিভিন্ন দিক সমূহে মহাপর্বতসদৃশ বিশালকায় অসংখ্য বানরগণকে আনয়ন করিবার জন্য দশ সহস্র বানর পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছে। ॥৪৬॥

সুগ্রীব নিজে যাইয়া বানর যূথপতিগণের দ্বারা দৈত্যগণকে বিনাশ করাইবেন এবং তিনি স্বয়ং রাবণকে বধ করিবেন। ॥৪৭॥

কপিরাজ সুগ্রীব আজই আপনার সহিত শ্রীরঘুনাথজীর নিকট উপস্থিত হইবেন। চলুন, অন্তঃপুর দর্শন করুন। সেখানে সুগ্রীব স্বীয় পুত্র, স্ত্রী ও সুহৃদগণ পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। তাহার সহিত মিলিত হইয়া ও অভয় প্রদান করতঃ তাহাকে আপনার সঙ্গেই শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া চলুন।" তারার বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণের ক্রোধ উপশান্ত হইল। এবং

তিনি অন্তঃপুরে বানররাজ সুগ্রীব যে স্থানে ছিলেন সেখানে গমন করিলেন। সুগ্রীব আপন ভার্যা রুমার সহিত আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া পর্যঙ্কোপরি শায়িত ছিলেন। ॥৪৮-৫০॥

লক্ষ্মণকে দর্শন করিবামাত্রই সুগ্রীব অত্যন্ত ভয়ভীত হইয়া উল্লম্ফন পূর্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মদবিহ্বলনেত্র সুগ্রীবের এই অবস্থা দেখিয়া লক্ষ্মণ অতিক্রোধের সহিত বলিলেন—"ওহে দুর্বৃত্ত! তুমি রঘুনাথজীকে ভুলিয়া গিয়াছ? (তুমি কি জান না যে—) যে বাণের দ্বারা বীরবর বালী নিহত হইয়াছে উহা আজ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ॥৫১-৫২॥

মনে হইতেছে আমার হাতে হত হইয়াই তুমি বালীর মার্গানুসরণ করিবে।" লক্ষ্মণকে এইরূপ অত্যন্ত কঠোর ভাষণ করিতে দেখিয়া বীরবর হনুমান বলিলেন—"মহারাজ! এইরূপ ভাষণ কেন করিতেছেন? এই বানররাজ সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আপনাপেক্ষাও অধিক ভক্তিসম্পন্ন। ॥৫৩-৫৪॥

ভগবান রামের কার্যের জন্য ইনি দিবানিশি সদা জাগ্রত। সেই কার্য তিনি বিস্মৃত হন নাই। প্রভো! এই দেখুন, কোটি কোটি বানর এই কার্যের জন্যই সর্বদিক হইতে সমাগত হইতেছে। ॥৫৫॥

ইহারা সকলে শীঘ্রই সীতার অনুসন্ধানে গমন করিবে এবং মহারাজ সুগ্রীব ও শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব কার্য সুসম্পন্ন করিবেন।" ॥৫৬॥

হনুমানের এই বচন শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জিত হইলেন। অতঃপর সুগ্রীব পাদ্য অর্ঘ্যাদি সহায়ে উত্তমরূপে লক্ষ্মণকে পূজা করিলেন। ॥৫৭॥

তিনি লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন,— "হে শ্রীমান! আমি তো রামের দাস, তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আপন তেজ সহায়ে (বলবীর্যের দ্বারা) তিনি অর্দ্ধক্ষণকালের মধ্যেই সমগ্র লোকসমূহ জয় করিবেন। ॥৫৮॥

হে প্রভো! আমি তো আপন বানরসেনা সহ কেবল তাঁহার সহায়ক মাত্র থাকিব (অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র সর্বসমর্থ)।" তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বলিলেন—"হে মহাভাগ! প্রণয়কোপবশে আমি যাহা কিছু অনুচিত বাক্য আপনাকে বলিয়াছি তাহা ক্ষমা করুন। ভগবান রাম বনে একাকী রহিয়াছেন এবং তিনি জানকীর বিরহে অতীব দুঃখার্ত। অতএব আমরা আজ-ই সেখানে যাইব।" তখন বানররাজ সুগ্রীব 'ইহা অতি উত্তম কথা' এইরূপ বলিয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং বানরগণ সহ শ্রীরাম দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। ॥৫৯-৬২॥

(ঐ সময় সেই যাত্রার অপূর্ব শোভা হইয়াছিল)—ভেরি, মৃদঙ্গ আদি নানাবিধ বাদ্য বাজিতেছিল এবং বহু ভল্লুক ও বানর হস্তে শ্বেতছত্র ও চামর লইয়া এই যাত্রার শোভাবর্ধন করিতেছিল। এই প্রকারে বানররাজ সুগ্রীব অতি জাঁকজমক সহকারে নীল, অঙ্গদ এবং হনুমান আদি প্রধান প্রধান বানরগণ সহিত শ্রীরঘুনাথকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ

সীতার অনুসন্ধান, বানরগণের গুহাপ্রবেশ ও স্বয়ম্প্রভা চরিত্র

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

মৃগচর্ম ও জটামুকুট সুশোভিত, বিশালনয়ন, সস্মিত মনোহর মুখকমল, শান্তমূর্তি, শ্যাম শরীর, সীতাবিরহ বেদনায় সন্তপ্ত, মৃগ ও পক্ষিগণ নিরীক্ষণকারী শ্রীরামচন্দ্রকে দূর হইতে গুহার দ্বারদেশে একখণ্ড শিলোপরি উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ অতি ব্যস্ততার সহিত রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং অতি ভক্তিসহকারে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণে পতিত হইলেন। ॥১-৩॥

ধর্মজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করতঃ তাহার কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আপন পার্শ্বে বসাইয়া তাহাকে যথোচিৎ সৎকার করিলেন। ॥৪॥

তখন সুগ্রীব ভক্তিবিনম্রচিত্তে শ্রীরঘুনাথকে বলিলেন—"ভগবন্! দেখুন, বানরগণের বিরাট সেনা আসিতেছে। ॥৫॥

প্রভো! হিমালয় আদি কুল-পর্বতে উৎপন্ন, সুমেরু ও মন্দরাচল সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট, ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ, নদীতট ও পর্বত নিবাসী ও পর্বত সদৃশ বিশালকায় বানরগণ আসিতেছে। ইহারা সকলে দেবগণের অংশে উৎপন্ন এবং ইচ্ছানুসার রূপ ধারণে সমর্থ এবং সকলে যুদ্ধে অতি নিপুণ। ॥৬-৭॥

হে প্রভো! ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এক, কেহ কেহ দশ এবং কেহ কেহ দশ সহস্র হস্তির বল ধারণ করে। এবং কেহ কেহ বা অমিত বলশালী অর্থাৎ তাহাদের বলের কোন পরিমাণই নাই। ঐ দেখুন কোন বানর কজ্জ্বল গিরিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ, কেহ বা মনোহর সুবর্ণ বর্ণ বিশিষ্ট, কাহারও মুখ রক্তবর্ণ এবং কাহারো শরীরে দীর্ঘ দীর্ঘ রোম। কেহ বা শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় এবং কেহ বা রাক্ষসের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এ সকল বানরগণ যুদ্ধের জন্য অতি ব্যগ্র, এবং এই জন্যই তাহারা গর্জন করতঃ এদিক ওদিক দৌড়াইতেছে। ॥৮-১০॥

হে প্রভো! ইহারা সকলেই আপনার আজ্ঞা পালনকারী এবং ফলমূলাহারী। (অতএব ইহাদের নির্বাহের জন্য আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে না)। এই যে ভল্লুকগণের অধিপতি জাম্ববান, ইনি বড় বীর ও বুদ্ধিমান। তিনি এক কোটি ভল্লুক যূথপতি এবং আমার মন্ত্রিগণের অগ্রগণ্য। শারীরিক বল ও পরাক্রমের জন্য সর্বত্র বিখ্যাত, এই পরম তেজস্বী পবননন্দন হনুমানকে দেখুন। ইনি বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আমার মন্ত্রী। হে রামচন্দ্র! আরও দেখুন! নল, নীল, গবয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, মৈন্দব, গজ, পনস, বলীমুখ, দধিমুখ, সুষেণ, তার, হনুমানের পিতা মহাবলী ও পরমবীর কেসরী—এই সব প্রধান প্রধান যূথপতিগণের কথা আপনাকে বলিলাম। ॥১১-১৫॥

ইহারা সকলেই মহাত্মা, মহাবীর এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী, ইহারা প্রত্যেকেই কোটি কোটি বানরযূথের অধিপতি। ইহারা সকলেই আপনার আজ্ঞাপালনকারী এবং দেবতার অংশে

উৎপন্ন। এই যে বালীর পুত্র পরমবিখ্যাত শ্রীমান অঙ্গদ, ইনি বালীর তুল্য বলবান, মহাবীর এবং রাক্ষস দলনকারী। ইহারা ও আরও সকল বহু বানর বীর আপনার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে দৃঢ়সংকল্প। ॥১৬-১৮॥

ইহারা সকলে পর্বতশিখর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিতে এবং শত্রু বিনাশ করিতে বড়ই কুশল। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! ইহারা সকলেই আপনার বশবর্তী, আপনি ইহাদিগকে যেরূপ ইচ্ছা আদেশ করুন। ॥১৯॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—"সুগ্রীব! আমার কার্যটি যে কত কঠিন তাহা তুমি সবই জান। ॥২০॥

যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ইহাদিগকে যথাযোগ্য সীতানুসন্ধানে নিয়োগ কর।" রামের বচন শুনিয়া বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অতি প্রসন্নতার সহিত বহুবলশালী বানরগণকে সীতার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে অতি শীঘ্রই সর্বদিকে বানরগণকে প্রেরণের অনন্তর দক্ষিণ দিকে অধিক প্রযত্নের সহিত মহাবলী যুবরাজ অঙ্গদ, জাম্ববান, হনুমান, নল, সুষেণ, শরভ, মৈন্দ, ও দ্বিবিদ আদি বানরগণকে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে এইপ্রকার বলিলেন— ॥২১-২৪॥

"আমার আদেশে তোমরা সকলে বহু প্রযত্নের সহিত শুভলক্ষণা জানকীর অনুসন্ধান করিয়া এক মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিও। ॥২৫॥

যদি সীতাকে দর্শন না করিয়া এক মাসের অধিক একটি দিনও উত্তীর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে হে বানরগণ, আমার হস্তে তোমাদের প্রাণান্তক দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, ইহা স্মরণ রাখিও।" ॥২৬॥

মহাবলশালী বানরগণকে এইপ্রকারে প্রেরণ করিয়া সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করতঃ তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ॥২৭॥

তখন পবন নন্দন হনুমানকে যাইতে দেখিয়া ঐ সময়ে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, (হে কপিশ্রেষ্ঠ!) তুমি আমার নাম উৎকীর্ণ এই উত্তম অঙ্গুরীয়ক লইয়া যাও। আপন পরিচয় প্রদানার্থ তুমি ইহা সীতাকে একান্তে দিও। হে কপিশ্রেষ্ঠ! এ কাজে তুমি সমর্থ। আমি তোমার বুদ্ধি, বল সবই উত্তমরূপে অবগত আছি। আচ্ছা, তুমি যাও, তোমার যাত্রা মঙ্গলময় হউক।" ॥২৮-২৯॥

এই প্রকারে বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অঙ্গদ আদি বানরগণ (দক্ষিণ ভূখণ্ডে) যত্রতত্র বিচরণ করিতে লাগিল। ॥৩০॥

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা বিন্ধ্যাচলের এক গহন বনে এক পর্বতাকার ভয়ঙ্কর রাক্ষস দেখিতে পাইল। সেই রাক্ষস জঙ্গলের মৃগ ও হস্তিসমূহ ধরিয়া ধরিয়া খাইতেছিল। ॥৩১॥

কোন কোন বানর শ্রেষ্ঠ 'এই তো রাবণ' ইহা মনে করিয়া, উচ্চ কিল-কিলা শব্দ সহকারে ক্ষণকাল মধ্যেই তাহাকে মুষ্ট্যাঘাতে মারিয়া ফেলিল। ॥৩২॥

অতঃপর (এত সহজে রাক্ষসের মৃত্যু দেখিয়া) তাহারা 'না, এ রাবণ নহে' এই প্রকার বলিতে বলিতে অন্য এক ঘোর বনে প্রবেশ করিল। সেখানে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া বহু অনুসন্ধানেও তাহাদের জল মিলিল না। ॥৩৩॥

সেই ভয়ঙ্কর বনে বিচরণ করিতে করিতে বানরগণের কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল, তখন তাহারা সেখানে তৃণ, গুল্ম ও লতা আদির দ্বারা আচ্ছাদিত এক বিশাল গুহা দেখিতে পাইল। ॥৩৪॥

তাহারা দেখিতে পাইল সেই গুহার অভ্যন্তর হইতে আর্দ্র-পক্ষ-বিশিষ্ট ক্রৌঞ্চ ও হংসগণ নির্গত হইতেছে। তখন তাহার বলিল, 'চল, এইগুহার মধ্যে জল অবশ্যই আছে।' এইরূপ বলিয়া সর্বাগ্রে হনুমান তাহাতে প্রবেশ করিলেন এবং তৎপশ্চাৎ অন্য বানরগণও পরস্পর হস্তধারণ করতঃ অতি উৎসুকতার সহিত সেই গুহায় প্রবেশ করিল। ॥৩৫-৩৬॥

বহুদূর অন্ধকারের মধ্যে যাইয়া সেই বানরগণ দেখিতে পাইল একটি স্ফটিক মণি সদৃশ স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবর ; তাহার পার্শ্বেই পরিপক্ক ফলভারনত কল্পতরু তুল্য সুন্দর বৃক্ষসমূহ বিদ্যমান এবং তাহাতে মধুচক্রসমূহ লম্বমান। নিকটেই মণিময় বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত এবং দিব্য ভক্ষ্য অন্নাদি সামগ্রী পরিপূর্ণ জনবর্জিত সর্বগুণসম্পন্ন এক মনোহর ভবন। সেই দিব্যভবনে তাহারা অতি বিস্মিত হইয়া সুবর্ণ সিংহাসনোপরি বিরাজমানা একাকিনী এক রমণীকে দেখিতে পাইল। সেই সুন্দরী যোগাভ্যাসে তৎপর এক যোগিনী ছিলেন, তাহার তেজে চতুর্দিক প্রকাশিত হইতেছিল। চীরবস্ত্র ধারণ করতঃ তিনি ঐ সময় ধ্যান করিতেছিলেন। ॥৩৭-৪০॥

সেই মহাভাগা যুবতীকে দেখিয়া বানরগণ ভয় ও প্রীতি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহাদের দেখিয়া দেবী বলিলেন—"তোমরা সকলে কোথা হইতে এবং কেন আসিয়াছ? তোমরা কাহার দূত? আমার স্থান কেন ভ্রষ্ট করিতেছ?" ইহা শুনিয়া হনুমান বলিলেন—"দেবি! আমি আপনাকে আমাদের সর্ববৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন— ॥৪১-৪২॥

অতুলনীয় শ্রীসম্পন্ন মহারাজ দশরথ অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন, মহাভাগ্যশালী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র 'রাম' নামে বিখ্যাত। ॥৪৩॥

তিনি পিতার আজ্ঞা পালন করতঃ আপন ভার্যা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বনে আগমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার পরম সাধ্বী পত্নীকে দুরাত্মা রাবণ অপহরণ করিয়াছে। তখন তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহ বানররাজ সুগ্রীবের নিকট আগমন করতঃ তাহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তজ্জন্য সুগ্রীব আমাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া পত্নীর অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই আমরা এখানে আসিয়াছি। এই বনে জানকীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা তৃষ্ণার্ত হইয়া জলাকাঙ্ক্ষায় এই ভয়ঙ্কর গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ দৈব যোগে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। হে শুভে! আপনি কে এবং এখানে কেন বাস করিতেছেন, তাহা আমাদিগকে বলুন। ॥৪৪-৪৭॥

বানরগণকে দেখিয়া সেই যোগিনী হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা প্রথমে ইচ্ছানুসারে ফলমূলাদি ভক্ষণ করতঃ সরোবরের অমৃততুল্য জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হও।

তৎপর আমার নিকট আগমন করিও, তখন আমি আমার বৃত্তান্ত আদি হইতে সব তোমাদের শুনাইব।" তখন সেই বানরগণ তাহাতে সম্মত হইয়া যথেষ্ট ফলমূল ভক্ষণ ও জলপান করতঃ প্রসন্নচিত্তে দেবীর নিকটে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। অতঃপর দিব্যদর্শনা যোগিনী হনুমানকে এইপ্রকার বলিতে লাগিলেন— ॥৪৮-৫০॥

"পূর্বকালে বিশ্বকর্মার 'হেমা' নাম্নী দিব্যরূপিণী এক কন্যা ছিলেন। সেই সুন্দরী আপন নৃত্যকলা প্রদর্শন পূর্বক শ্রীমহাদেবের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। ॥৫১॥

সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীমহাদেব তাহাকে এই বিশাল দিব্যনগর নিবাসার্থ প্রদান করেন। এইস্থানে সেই সুদশনা (সুন্দর দন্ত বিশিষ্টা) কন্যা বহু সহস্র বৎসর বাস করিয়াছেন। ॥৫২॥

দিব্য নামক গন্ধর্বের কন্যা আমি তাঁহারই সখি। আমার নাম স্বয়ংপ্রভা এবং আমি মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণী। অতএব আমি সর্বদা বিষ্ণুর ধ্যান তৎপর হইয়া কালাতিপাত করিয়া থাকি। পূর্বকালে ব্রহ্মলোকে গমনোদ্যতা হইয়া তিনি (হেমা) আমাকে বলিয়াছিলেন, 'সর্বপ্রকার প্রাণী বিবর্জিত এইস্থানেই নিবাস পূর্বক তুমি তপস্যা কর। ॥৫৩-৫৪॥

ত্রেতাযুগে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্য বনে বনে বিচরণ করিবেন। ॥৫৫॥

তাঁহার ভার্যাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বানরগণ তোমার এই গুহায় আগমন করিবে। তাহাদের উত্তমরূপে সৎকার করিও। তৎপর তুমি রামের নিকট গমন করতঃ প্রযত্নপূর্বক তাঁহার বন্দনা, স্তুতি ও প্রণাম করিয়া যোগিগম্য ভগবান বিষ্ণুর নিত্যধামে গমন করিবে।' অতঃপর আমি শীঘ্রই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইতে ইচ্ছা করি। ॥৫৬-৫৭॥

তোমরা সকলে অক্ষি নিমীলন কর। তাহা হইলে এইক্ষণেই গুহার বাইরে পৌঁছিয়া যাইবে।" বানরগণ তাহাই করিল এবং ক্ষণকালমধ্যেই পূর্ব পরিচিত বনে উপস্থিত হইল। ॥৫৮॥

এদিকে সেই যোগিনী (স্বয়ংপ্রভা) সেই গুহা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই শ্রীরঘুনাথের নিকট আগমন করতঃ সেখানে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ সহিত তাঁহাকে দর্শন করিলেন। ॥৫৯॥

সেই বুদ্ধিমতী যোগিনী শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতঃ তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করিলেন এবং পুলকিত তনু হইয়া গদ্‌গদ বাণী সহায়ে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন— ॥৬০॥

"হে রাজাধিরাজ! আমি আপনার দাসী। আপনার দর্শনার্থ আমি এখানে আসিয়াছি। আপনার দর্শন লাভ করিবার জন্যই আমি বহু সহস্র বর্ষ গুহাবাসিনী হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছি। আজ আমার সেই তপস্যা সফল হইল। (আজ আমার কী শুভ দিন!) আজ আমি সাক্ষাৎ মায়াতীত ও অলক্ষিতভাবে সর্ব প্রাণীর অন্তর্বাহিরে বিরাজমান, পরমেশ্বর আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি যোগমায়া-যবনিকা দ্বারা স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ আবৃত করতঃ মনুষ্যশরীরে প্রকট হইয়াছেন। সেইজন্য মায়িক রূপধারী মায়াবীকে সাধারণ পুরুষ যেমন দেখিতে সমর্থ হয় না সেই প্রকার অজ্ঞানী জনগণও আপনার শুদ্ধ স্বরূপ জানিতে সমর্থ নহে। হে ভগবন্! আপনি ভগবদ্ভক্তগণের জন্য ভক্তিযোগ বিধানার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তমোগুণী বুদ্ধি সম্পন্না

আমি আপনাকে কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইব? হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এ সংসারে যাহারা আপনার মায়াতীত পরমতত্ত্ব জানিতে সমর্থ তাহারা তাহাই জানুন। কিন্তু আমার হৃদয়ভবনে আপনার এই রূপটি যেন সর্বদা বিরাজমান থাকে। হে রাম! মোক্ষদায়ক আপনার চরণকমলের দর্শন আজ আমার হইয়াছে, যাহা সন্মার্গ-জ্ঞান প্রদান করতঃ সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। হে আদিপুরুষ! যে মনুষ্য ধন, পুত্র, কলত্র ও বিভূতি আদির গর্বে উন্মত্তপ্রায়, তাহারা আপনার স্তুতি করিতে সমর্থ হয় না। কারণ আপনি অকিঞ্চন জনগণের সর্বস্ব ধন। ॥৬১-৬৭॥

যিনি সর্বগুণের অতীত, নিষ্কিঞ্চনগণের ধন, যিনি আপন আত্মস্বরূপেই সদা বিহারকারী, যিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ ও মায়াবশে সগুণ, সেই আপনাকে আমি বারম্বার প্রণাম করিতেছি। কালরূপে সকলের নিয়ন্তা, আদি মধ্য ও অন্ত রহিত, সমভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং পরাৎপর পুরুষ রূপেই আমি আপনাকে জানি। হে দেব! মানব চরিত্রের অনুসরণ করতঃ আপনি যে সব লীলা করিয়া থাকেন, তাহার মর্ম কেহই জানিতে সমর্থ নহে। ॥৬৮-৭০॥

প্রভো! আপনার প্রিয় অপ্রিয়, বা উদাসীন কেহ নাই। আপনার মায়ার দ্বারা আবৃত চিত্ত পুরুষগণই স্ব স্ব ভাবনানুযায়ী আপনাকে তদ্রূপ দর্শন করিয়া থাকে। ॥৭১॥

আপনি জন্মরহিত, অকর্তা এবং ঈশ্বর, দেব, তির্যক্, ও মনুষ্যাদি যোনিতে আপনার যে জন্ম ও কর্ম দৃষ্টিগোচর হয়, উহা একটি বিড়ম্বনা মাত্র (চাতুরী মাত্র), অর্থাৎ উহা আপনার একটি বিচিত্র লীলাবিলাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। ॥৭২॥

লোকে বলে, কথা-শ্রবণ সিদ্ধির জন্যই অবিনাশী ঈশ্বর অবতার শরীর ধারণ করিয়া আপন লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এরূপও বলে, যে কোসলরাজ দশরথের তপস্যার ফল প্রদান করিবার জন্যই আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ॥৭৩॥

পুনঃ কেহ কেহ বলেন যে কৌশল্যার প্রার্থনা বশে আপনি প্রকট হইয়াছেন। আবার কাহারও কাহারও এরূপ মত যে ব্রহ্মাজীর প্রার্থনা বশে ভূমিভারভূত রাক্ষসগণের বিনাশের জন্যই সর্বব্যাপক হইয়াও আপনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে রঘুনন্দন! যাহারা আপনার লীলাকথা শ্রবণ বা বর্ণন করিবে তাহারা অবশ্যই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ আপনার চরণকমল দর্শন করিবে। হে দেব! আমি আপনার মায়াগুণে বদ্ধ। সুতরাং সর্বগুণ হইতে অত্যন্ত পৃথক এবং তাহার আশ্রয়রূপ আপনাকে আমি কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইব? এবং কি প্রকারেই বা মনবাণীর অবিষয়, বিভু আপনাকে স্তুতি করিতে সমর্থ হইব? (অর্থাৎ ইহা আমার সাধ্যাতীত)। অতএব ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব আদি পার্ষদগণ সহিত ধনুর্বাণধারী আপনাকে আমি কেবল প্রণাম করিতেছি।" ॥৭৪-৭৭॥

প্রণত পাপাপহারী রঘুকুলনাথ শ্রীরামচন্দ্রজী, অনন্যভক্তা সেই যোগিনীর এইরূপ স্তুতি শুনিয়া, প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—"তোমার মনোগত আকাঙ্ক্ষা কি তাহা বল।" ॥৭৮॥

তখন যোগিনী অতি ভক্তির সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—"হে ভক্তবৎসল প্রভু! যে কোন যোনিতে আমার জন্ম হউক না কেন, আপনার প্রতি নিশ্চলা ভক্তি আমাকে প্রদান করুন। ॥৭৯॥

আপনার ভক্তগণের সঙ্গলাভই যেন আমার সর্বদা হয় ; বিষয়ী প্রাকৃত জনগণের সঙ্গ আমার যেন না হয়। আমার জিহ্বা সদা অতি ভক্তির সহিত 'রাম' 'রাম' যেন এই নাম উচ্চারণে রত থাকে। ॥৮০॥

আর হে রাম! ধনুকবাণধারী, পীতাম্বরধারী, উজ্জ্বল মুকুটভূষিত এবং বাজু, নূপুর, মোতির মালা, কৌস্তুভমণি ও কুণ্ডল সুশোভিত আপনার শ্যামলমূর্তি সীতা ও লক্ষ্মণসহ আমার মন যেন সদা ধ্যান করিতে সমর্থ হয়। হে প্রভো! ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন বর আমি প্রার্থনা করি না।" ॥৮১-৮২॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "হে মহাভাগ্যবতী! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। এখন তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর। সেখানে আমার ধ্যানপরায়ণ হইয়া তুমি শীঘ্রই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরমাত্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" ॥৮৩॥

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অমৃততুল্য মধুর বচন শ্রবণ করিয়া (যোগিনী) স্বয়ংপ্রভা তৎক্ষণাৎ বহু বদরি বৃক্ষ সুশোভিত পুণ্যক্ষেত্র শ্রীবদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। সেই তীর্থে শ্রীরঘুনাথের ধ্যানপরায়ণ হইয়া অন্তকালে দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। ॥৮৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তম সর্গ

বানরগণের প্রায়োপবেশন ও সম্পাতি সহ মিলন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

এদিকে সীতান্বেষণে পরিশ্রান্ত বানরগণ সেই গুহার সমীপে সঘন বৃক্ষ সমাকুল স্থানে উপবেশন করতঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিত্তে পরস্পর এইরূপ চিন্তা (আলোচনা) করিতে লাগিল। ॥১॥

বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ তাহার সমীপস্থ বানরগণকে বলিতে লাগিল—"মনে হইতেছে এই গুহাভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের অবশ্যই একমাস সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ॥২॥

কিন্তু এ পর্যন্ত সীতার সন্ধান মিলিল না। বানররাজ সুগ্রীবের আদেশ আমরা পালন করিতে পারিলাম না। এখন যদি আমরা কিষ্কিন্ধাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করি তাহা হইলে সুগ্রীব আমাদের সকলকে হত্যা করিবে। বিশেষতঃ তাহার শত্রু বালীর পুত্র আমি, আজ্ঞালঙ্ঘনচ্ছলে সে আমাকে অবশ্যই হত্যা করিবে। আমার প্রতি তাহার স্নেহ বা প্রেম কি প্রকারে হইতে পারে? আমাকে তো শ্রীরামচন্দ্রই রক্ষা করিয়াছেন। ॥৩-৪॥

এখন শ্রীরামচন্দ্রের কার্য আমি সম্পাদন করিতে পারি নাই, সুতরাং আমাকে বধ করিতে দুরাত্মা সুগ্রীবের নিশ্চয়ই উত্তম ছল মিলিবে। ॥৫॥

সেই পাপাত্মা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, 'যিনি তাহার মাতৃতুল্যা' তাহাকে সম্ভোগ করিয়া থাকে, অতএব হে বানর পুঙ্গবগণ! আমি আর তাহার নিকট ফিরিয়া যাইব না। ॥৬॥

আমি কোন না কোন উপায়ে এই স্থানেই দেহ পরিত্যাগ করিব।" অশ্রুভারাক্রান্তনয়ন অঙ্গদকে এইপ্রকার বলিতে শুনিয়া বানর প্রধানগণের মনে বড় দুঃখ হইল এবং তাহারাও অশ্রুভারে আর্দ্রনয়নে যুবরাজকে বলিল— ॥৭-৮॥

"তুমি এত শোক করিতেছ কেন? আমরা তোমার প্রাণ রক্ষা করিব এবং নির্ভয়ে এই গুহাতেই নিবাস করিব। এই গুহাভ্যন্তরে যে নগর রহিয়াছে তাহা অমরাবতী-পুরী-তুল্য সর্বসুখ সামগ্রী সম্পন্ন।" তাহাদের পরস্পর এই প্রকার কথন নীতিনিপুণ শ্রীহনুমানের কর্ণগোচর হইলে তিনি অঙ্গদকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—"অঙ্গদ! তুমি এইরূপ চিন্তা করিতেছ কেন? এইরূপ দুর্ভাবনা তোমার একান্তই অকর্তব্য। তুমি তারার অতি প্রিয় পুত্র এবং সেইজন্য মহারাজ সুগ্রীবেরও অত্যন্ত স্নেহভাজন। লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি অপেক্ষাও দিন দিন তাহার তোমার প্রতি অধিক প্রীতি বর্দ্ধিত হইতেছে (ইহা দেখিতে পাইতেছি)। ॥৯-১২॥

অতএব তুমি শ্রীরামচন্দ্র বা রাজা সুগ্রীবের প্রতি কোন শঙ্কা করিও না, আর আমিও সর্বপ্রকারে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও তোমার হিতসাধনে তৎপর। অতএব হে বৎস! তুমি কোনরূপ দুশ্চিন্তা করিও না! ॥১৩॥

আর এই অপর বানরগণ যে বলিয়াছেন 'এই গুহায় বাস নিষ্কণ্টক,' সে বিষয়ে বলিতেছি যে শ্রীরামচন্দ্রের বাণের অভেদ্য কোন বস্তু ত্রিলোকেও আছে কি? ॥১৪॥

হে বানরশ্রেষ্ঠ! যে বানরগণ তোমাকে এই প্রকার দুষ্ট পরামর্শ দিতেছে তাহারাও আপন স্ত্রী-পুত্রাদি পরিত্যাগ করতঃ তোমার সহিত এস্থানে কিরূপে থাকিবে? ॥১৫॥

ইহা ব্যতীতও হে বৎস! তোমাকে একটি অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য কথা বলিতেছি, সাবধান হইয়া শোন—"ভগবান রাম সাধারণ মনুষ্য নহেন। তিনি সাক্ষাৎ নির্বিকার নারায়ণ। ॥১৬॥

ভগবতী সীতা জগন্মোহিনী মায়ারূপিণী ও লক্ষ্মণ ত্রিভুবনের আশ্রয় সাক্ষাৎ নাগরাজ 'শেষ'। ॥১৭॥

তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার প্রার্থনাবশে রাক্ষসগণ বধ করিবার নিমিত্ত মায়ামনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকে ত্রিলোক রক্ষণে সমর্থ। ॥১৮॥

আমরা সকলেও বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদ। পরমাত্মা যখন স্বেচ্ছায় মনুষ্য রূপ ধারণ করিলেন, তখন আমরাও তাঁহারই মায়া শক্তি দ্বারা বানররূপে উৎপন্ন হইয়াছি। পূর্বে তপস্যা দ্বারা আমরা জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলাম বলিয়া তখন তাঁহারই কৃপায় তাঁহার পার্ষদপদ লাভ করিয়াছিলাম। বর্তমানেও তাঁহার মায়ার প্রেরণায় তাঁহারই সেবা করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করতঃ তাঁহারই সহিত সানন্দে বাস করিব।" এই প্রকারে অঙ্গদকে আশ্বস্ত করিয়া তাহারা সকলে বিন্ধ্যাচল পর্বতে গমন করিল। ॥১৯-২২॥

অতঃপর তাহারা ধীরে ধীরে শ্রীজানকীর অনুসন্ধান করিতে করিতে দক্ষিণ-সমুদ্রতটে মহেন্দ্র পর্বতের পবিত্র পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিল। ॥২৩॥

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল, সম্মুখে অপার, অগাধ, ভীতিবৰ্দ্ধক সমুদ্র। তখন ভয়-ভীত হইয়া অতঃপর কি কর্তব্য তাহাই পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল। ॥২৪॥

অঙ্গদ ও সর্ব মহাবলী বানরগণ চিন্তান্বিত হইয়া সমুদ্রতটে উপবেশন করতঃ পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিল— ॥২৫॥

"অহো! ঘোর বনে বিচরণ করিতে করিতে একমাস সময় তো আমাদের ঐ গুহামধ্যেই অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাবণ অথবা জনকনন্দিনী সীতা কাহারও দর্শন অদ্যাবধি আমাদের মিলিল না। ॥২৬॥

রাজা সুগ্রীব বড়ই দুর্দান্ত ও দুর্দণ্ড, সে আমাদের সকলকেই বধ করিবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুগ্রীবের হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা অন্নজল পরিত্যাগ করতঃ অর্থাৎ প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়।" ॥২৭॥

এইরূপ নির্ণয় করতঃ তাহারা সমুদ্রকূলে যত্রতত্র কুশ বিছাইয়া মরণপণ করিয়া তদুপরি উপবেশন করিল। ॥২৮॥

এই সময়ে মহেন্দ্র পর্বতের গুহাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটি পর্বতাকার গৃধ্র ধীরে ধীরে তথায় আগমন করিল। ॥২৯॥

বড় বড় বানরগণকে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট দেখিয়া মৃদুমন্দ স্বরে বলিতে লাগিল—"আজ আমি একই কালে বহু ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ॥৩০॥

এখন আমি এই সকলকে প্রতিদিন একটি একটি করিয়া ক্রমশঃ ভক্ষণ করিব।" গৃধ্র মুখে এই বচন শুনিয়া ভয়-ভীত বানরগণ বলিতে লাগিল— ॥৩১॥

"অহো! এই গৃধ্রই আমাদের সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। হে বানরেশ্বরগণ! আমরা রামের কার্যও কিছুমাত্র করিতে পারিলাম না, অথবা সুগ্রীব বা নিজেদেরও কোন হিত সাধন করিতে পারিলাম না ; বৃথাই আমরা এই গৃধ্র হস্তে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া যমলোকে গমন করিব। ॥৩২-৩৩॥

অহো! ধর্মাত্মা জটায়ুই ধন্য! কারণ সেই বুদ্ধিমান জটায়ু শ্রীরামকার্য সম্পাদন নিমিত্ত আপন প্রাণ দিয়াছেন। শত্রুসংহারী জটায়ু সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন যাহা যোগিজনেরও দুর্লভ।" ॥৩৪॥

বানরগণের এইরূপ কথা শুনিয়া সেই গৃধ্র (সম্পাতি) বলিল—"হে কপিশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা পরস্পর আমার কর্ণে অমৃততুল্য প্রিয় আমার ভ্রাতা জটায়ুর নাম উচ্চারণ করিতেছ! তোমরা কাহারা? আমা হইতে কোন প্রকার ভয়ের শঙ্কা না করিয়া তোমরা আপন বৃত্তান্ত বল।" ॥৩৫-৩৬॥

তখন শ্রীমান অঙ্গদ গাত্রোত্থান করতঃ গৃধ্র সমীপে গমন করিয়া বলিল—"দশরথ নন্দন শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা সীতার সহিত ঘোর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সেখানে তাঁহার সাধ্বী ভার্যা সীতাকে রাবণ অপহরণ করিয়াছে। ॥৩৭-৩৮॥

রাম ও লক্ষ্মণ মৃগয়ার নিমিত্ত বাহিরে নির্গত হইয়াছিলেন, সেই সময় দুরাত্মা রাবণ বলপূর্বক সীতাকে লইয়া গিয়াছে। তখন সীতা 'হা রাম, হা রাম' এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আর্তনাদ শুনিয়া মহাবলশালী পক্ষিরাজ গৃধ্রবর জটায়ু রামচন্দ্রের জন্য রাবণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে রাবণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। ॥৩৯-৪০॥

অতঃপর রামচন্দ্র স্বয়ং তাহার দাহ সংস্কার করিলেন এবং জটায়ুও তৎকাল ভগবান রামচন্দ্রের স্বরূপে বিলীন হইয়া সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব সমীপে আগমন করতঃ অগ্নি সাক্ষীপূর্বক তাহার সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ॥৪১॥

অতঃপর সুগ্রীবের প্রেরণায় মহাবলী রামচন্দ্র অতি দুর্জয় বালীকে হত্যা করতঃ বানররাজ্য সুগ্রীবকে প্রদান করিলেন। ॥৪২॥

মহাবলী সুগ্রীব আমাদের ন্যায় বহুপরাক্রমী বানরগণকে সীতার অনুসন্ধান নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে 'এক মাসের মধ্যে সকলকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে নতুবা আমি তোমাদের প্রাণহরণ করিব।' তাহার আজ্ঞায় বনে ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা এক গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। ॥৪৩-৪৪॥

সেখানে আমাদের একমাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্তও সীতা বা রাবণ কাহারও আমরা সন্ধান করিতে পারি নাই। অতএব আমরা প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিবার জন্য এই লবণ সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট হইয়া আছি। ॥৪৫॥

হে পক্ষিবর! যদি তুমি শুভলক্ষণা জানকীর কোন সন্ধান জান, তবে বল।" অঙ্গদের বচন শুনিয়া প্রসন্নচিত্তে সম্পাতি বলিল—"হে কপীশ্বরগণ! জটায়ু আমার পরম প্রিয় ভ্রাতা ছিল। বহু সহস্র বৎসরের পর আমি আজ ভ্রাতার সমাচার শুনিলাম। ॥৪৬-৪৭॥

হে কপীশ্বরগণ! আমি বচনের দ্বারা অবশ্য তোমাদের কিছু সাহায্য করিব। তোমরা সর্বপ্রথমে (আমার পরলোকগত) ভ্রাতার জলাঞ্জলি প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে জলের নিকট লইয়া চল। ॥৪৮॥

তৎপর তোমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যাহা শুভ ও কর্তব্য, তাহা বলিব।" 'ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব' এইরূপ বলিয়া বানরগণ সম্পাতিকে সমুদ্রতীরে লইয়া গেল। ॥৪৯॥

সেখানে পৌঁছিয়া সমুদ্র স্নান করতঃ তাহার ভ্রাতার উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিল। তদনন্তর বানরগণ তাহাকে তাহার পূর্বস্থানে লইয়া গেলে সম্পাতি বানরগণকে আনন্দদায়ক সংবাদ প্রদান করিল— ॥৫০॥

"ত্রিকূট পর্বত শিখরে লঙ্কা নামক একটি নগরী আছে। সেখানে অশোকবনে রাক্ষসীগণ কর্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া সীতা রহিয়াছেন। ॥৫১॥

সেই লঙ্কাপুরী এইস্থান হইতে একশত যোজন দূরে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত। আমি এইস্থান হইতেই সেই লঙ্কাপুরী ও সীতাকে দেখিতে পাইতেছি ; ইহাতে সন্দেহ নাই। ॥৫২॥

তোমরাও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। কারণ গৃধ্রজাতিভুক্ত বলিয়া আমার দৃষ্টি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় তবে সে অবশ্যই জানকীকে দর্শন করিয়া আসিতে পারে। আমার ভাইয়ের হত্যাকারী দুরাত্মা রাবণকে আমি একাই বধ করিতে সমর্থ কিন্তু (কি করিব?) আমি পক্ষবিহীন! তোমরা কোন উপায়ে এই সমুদ্র লঙ্ঘনের প্রয়াস কর। তৎপর রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিবেন। ॥৫৩-৫৫॥

তোমরা এখন ইহাই বিচার করতঃ স্থির কর যে তোমাদের মধ্যে এমন শক্তিশালী কে আছে যে শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্বক লঙ্কায় যাইতে পারে এবং জানকীর দর্শন ও তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করতঃ পুনরায় সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রত্যাবর্তনে সুমর্থ।" ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে সপ্তম সর্গ

অষ্টম সর্গ

সম্পাতির আত্মকথা

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

এইরূপ সম্পাতির কথা শ্রবণ করিয়া বানরগণ পরম কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে সম্পাতিকে জিজ্ঞাসা করিল—"হে ভগবন্! আপনি আদি হইতে আপনার সর্ব বৃত্তান্ত আমাদের বলুন।" ॥১॥

তখন সম্পাতি পূর্বকৃত স্বীয় সর্ব বৃত্তান্ত বানরগণকে শুনাইতে লাগিল—"পূর্বকালে পূর্ণযুবক আমি ও আমার ভাই জটায়ু উভয়ে বলগর্বে উন্মত্ত হইয়া স্ব স্ব বল পরীক্ষণার্থ সদর্পে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত যাইবার জন্য আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়াছিলাম। ॥২-৩॥

বহু সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে যাইবার পর জটায়ুকে প্রখর সূর্যতাপে সন্তপ্ত হইতে দেখিয়া তাহার রক্ষণার্থ মোহবশে আমি আপন পক্ষদ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া চলিতে লাগিলাম এবং তখন সূর্যকিরণে আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে আমি এই বিন্ধ্যাচল পর্বত শিখরে পতিত হইলাম এবং হে কপীশ্বরগণ! বহু উচ্চ হইতে পতিত হওয়াতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ॥৪-৫॥

তিনদিন পরে আমার চৈতন্য হইলে আমার পক্ষ দগ্ধ হওয়াতে আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং আমি কোন্ দেশে বা কোন্ গিরিশিখরে পড়িয়া আছি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ॥৬॥

তৎপর ধীরে ধীরে নেত্র উন্মীলন করিয়া সেখানে একটি সুন্দর আশ্রম দেখিতে পাইলাম। এবং শনৈঃ শনৈঃ আশ্রমের নিকট গমন করিলাম। ॥৭॥

সেখানে চন্দ্রমা নামক এক মুনীশ্বর বাস করিতেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে বলিলেন—"সম্পাতি! একি? তোমাকে আজ এইরূপ বিরূপ কে করিয়াছে? ॥৮॥

আমি তোমাকে পূর্ব হইতে জানি, তুমি অতি বলবান্, তোমার পক্ষ কিরূপে দগ্ধ হইল? যদি উচিত মনে কর তবে তোমার সব বৃত্তান্ত আমাকে বল।" ॥৯॥

তখন আমি সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে স্বীয় সর্ব বৃত্তান্ত বলিলাম এবং অতীব দুঃখিত চিত্তে তাঁহাকে ইহাও বলিলাম যে—"এখন আমি দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। ॥১০॥

কারণ হে প্রভো! পক্ষ বিনা আমি কি প্রকারে জীবনধারণ করিব?" আমার এই প্রকার বচন শুনিয়া দয়ার্দ্রলোচনে মুনিবর আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ বলিলেন— ॥১১॥

"বৎস! এখন তুমি আমার কথা শোন। উহা শুনিয়া তদনন্তর তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহা করিও। (ইহা নিশ্চয় জানিও যে) স্বীয় দেহই সর্ব দুঃখের মূল বা আশ্রয় এবং দেহ (জীবের স্বকীয়) কর্মজন্য। ॥১২॥

জীব যখন দেহে অহং বুদ্ধি করিয়া থাকে তখনই কর্মের প্রবৃত্তি হয় এবং অবিদ্যাজনিত জড় অহঙ্কার অনাদি। (অগ্নি-) তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় এই অহঙ্কার সর্বদা চিদাভাস ব্যাপ্ত। সেই চিদাভাস বিশিষ্ট অহঙ্কারসহ দেহের তাদাত্ম্য (একতা) হইলে দেহ চেতন বলিয়া মনে হয়। ॥১৩-১৪॥

অহঙ্কারের জন্যই আত্মার 'আমি দেহ' এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই এই সুখ-দুঃখপ্রদ জন্ম-মরণ রূপ সংসার প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ॥১৫॥

নির্বিকার আত্মাসহ দেহের এইপ্রকার মিথ্যা তাদাত্ম্যবশতঃই জীব 'আমি দেহ', 'আমি কর্মকর্তা', এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সর্বদা নানা প্রকার কর্ম করে এবং বিবশ হইয়া সেই কর্মফলে বদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রকার নানা পাপ পুণ্য কর্মে বশীভূত হইয়া উচ্চ নীচ নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকে। তখন জীব এইরূপ সঙ্কল্প করিতে থাকে যে আমি যজ্ঞদানাদি বহুপুণ্য কর্ম করিয়াছি। অতএব আমি স্বর্গে যাইয়া বহু সুখ নিশ্চয় ভোগ করিব। ॥১৬-১৮॥

এইরূপ অধ্যাস বশতঃ ও স্বর্গে দীর্ঘকাল মহাসুখ ভোগ করতঃ পুণ্য ক্ষয় হইলে প্রারব্ধের প্রেরণায় স্বীয় ইচ্ছা না থাকিলেও নিম্নে (মর্ত্যলোকে) পতিত হয়। ॥১৯॥

প্রথমতঃ জীব চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হয়। সেখান হইতে (চন্দ্ররশ্মিদ্বারা) নীহার অর্থাৎ কুঁয়াসা সদৃশ তুষারবিন্দুসহ পৃথিবীতে পতিত হইয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্রীহি আদি ধান্য পদার্থে নিবাস করে। ॥২০॥

তৎপর সেই ধান্যাদি পদার্থ ভক্ষ্য ভোজ্য, লেহ্য, চোষ্য ও পেয় এই চারি প্রকার অন্নরূপে পুরুষ কর্তৃক ভক্ষিত হইলে উহা বীর্যরূপে পরিণত হয়। তদনন্তর এই বীর্য পুরুষ কর্তৃক ঋতুকালে স্ত্রীযোনিতে সিঞ্চিত হয়। ॥২১॥

উহা যোনিস্থিত রজসহ মিলিত ও জরায়ু পরিবেষ্টিত হইয়া একদিনেই কলল অর্থাৎ ভ্রূণ রূপে পরিণত হইয়া কিঞ্চিৎ কঠিন আকার ধারণ করে। ॥২২॥

পঞ্চ রাত্রি ব্যতীত হইলে উহা বুদ্বুদ আকার প্রাপ্ত হয় এবং সপ্তরাত্রির পর উহা মাংসপেশী তুল্য (অণ্ডাকার) হইয়া থাকে। এক পক্ষকাল মধ্যেই সেই পেশী রুধির পূর্ণ হয় এবং পঞ্চবিংশ রাত্রির অন্তর তাহাতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে থাকে। একমাস অতিক্রান্ত হইলে উহাতে ক্রমশঃ এক এক করিয়া গ্রীবা, শির, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ-অস্থি ও উদর এই পাঁচ অঙ্গ উৎপন্ন হয়। অতঃপর দুইমাসে ক্রমশঃ হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, কোমর ও জানু উৎপন্ন হয়। এই ক্রমের কোন ব্যত্যয় হয় না। ॥২৩-২৬॥

এই ক্রমে তিন মাসে উহার অঙ্গের সন্ধিসমূহ ও চারি মাসে সমস্ত অঙ্গুলিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাঁচ মাস হইলে নাক, কান ও নেত্র উদ্গত হয় এবং এই পাঁচ মাসেই দন্তাবলী, নখ ও গুহ্যস্থানও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ॥২৭-২৮॥

ষষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে কর্ণছিদ্র স্পষ্ট হয় এবং এই সময়ে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে যোনি অথবা লিঙ্গ ও নাভি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ॥২৯॥

সাত মাসে রোম ও মস্তকস্থ কেশ প্রকট হয় এবং আট মাসে সমস্ত অঙ্গোপাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হয়। ॥৩০॥

হে পক্ষি! এইপ্রকারে স্ত্রী গর্ভাশয়ে গর্ভ বর্ধিত হইতে থাকে। পাঁচ মাস হইলেই ঐ সময় জীব চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়। ॥৩১॥

গর্ভস্থিত পিণ্ড আপন নাভীর সংলগ্ন সূত্রের (নাড়ী?) মধ্যস্থ সূক্ষ্মছিদ্র দ্বারা মাতৃভুক্ত অন্নরসে পুষ্ট হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং আপন কর্মবশে তাহার মৃত্যু হয় না। ॥৩২॥

ঐ সময় স্বীয় সম্পূর্ণ পূর্বজন্ম এবং কর্মসমূহ স্মরণ করিয়া জঠরানল-সন্তপ্ত জীব এই প্রকার বলিয়া থাকে— ॥৩৩॥

"পূর্বে বহু সহস্র যোনিতে উৎপন্ন হইয়া আমি কোটি কোটি বন্ধুবান্ধব, পশুসমূহ ও স্ত্রী পুত্রাদির সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছি। কিন্তু হতভাগ্য আমি সেই সময় স্বপ্নেও ভগবান বিষ্ণুর স্মরণ করি নাই, কেবল আপন কুটুম্ববর্গের ভরণ পোষণে আসক্ত হইয়া ন্যায় বা অন্যায় যে কোন প্রকারে ধন উপার্জন করিতে ব্যাপৃত ছিলাম। ॥৩৪-৩৫॥

এখন তাহারই ফলস্বরূপ এই মহান গর্ভ-দুঃখ ভোগ করিতেছি। এবং এই বিনাশীদেহকে সত্য মনে করিয়া তাহার তৃষ্ণার্তে বদ্ধ হইয়া আছি। ॥৩৬॥

আমি সর্বদা অকার্যই করিয়াছি, আপন হিতসাধন কর্ম কিছুই করি নাই, অতএব আপন কর্মানুসারে আমি এই প্রকার বহুদুঃখ ভোগ করিতেছি। জানি না এই নরকতুল্য গর্ভ হইতে আমি কবে নিষ্ক্রান্ত হইব। অতঃপর আমি নিত্য শ্রীবিষ্ণুভগবানের উপাসনাতেই রত থাকিব।" ॥৩৭-৩৮॥

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ঐ জীব যেমন কোন পাপী জীব নরক হইতে নির্গত হইয়া থাকে তদ্রূপ যোনি যন্ত্রদ্বারা পীড়িত (নিষ্পিষ্ট) হইয়া অতি কষ্টে জন্মগ্রহণ করে। ॥৩৯॥

ঐ সময়ে ঐ জীবের, কোন দুর্গন্ধ ব্রণ হইতে পতিত ক্রিমির ন্যায় অবস্থা হইয়া থাকে। অতঃপর জীবের বাল্যাদি অবস্থাগত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই ক্লেশ সর্ব দেহধারিগণেরই হইয়া থাকে। ॥৪০॥

হে গৃধ্র! অতঃপর যুবাবস্থা আদি সর্বদুঃখ তুমি অনুভব করিতেছ। এবং অপর সকলেও ইহা উত্তমরূপে অবগত আছে, এইজন্যই আমি উহার বর্ণন করিলাম না। ॥৪১॥

এই প্রকারে 'আমি দেহ' এই অধ্যাস উৎপন্ন মিথ্যা দেহাভিমান বশতঃ জীবের নরকাদি ও গর্ভবাসাদি বহু দুঃখ ঘটিয়া থাকে। ॥৪২॥

অতএব আত্মা প্রকৃতির অতীত (অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন) এবং স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ শরীর হইতে পৃথক, ইহা জানিয়া দেহাদির প্রতি মমত্ব পরিত্যাগ করতঃ আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হওয়াই সর্ব মনুষ্যগণের কর্তব্য। ॥৪৩॥

আত্মা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় রহিত, সচ্চিৎ স্বরূপ, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং শান্তস্বরূপ। ॥৪৪॥

চৈতন্যস্বরূপ আত্মবিষয়ক জ্ঞান হইলে অজ্ঞানজনিত মোহ বিদূরিত হয়, তখন প্রারব্ধ কর্মবেগে এই শরীর বিনষ্ট হউক অথবা জীবিত থাকুক—যোগীর অজ্ঞানজনিত কোন প্রকার সুখ দুঃখ হয় না। অতএব যতদিন পর্যন্ত তোমার প্রারব্ধ ক্ষয় না হয় ততদিন পর্যন্ত সর্পের কঞ্চুক (ত্বক্) ধারণের ন্যায় আনন্দপূর্বক দেহধারণ কর। হে পক্ষি! এতদতিরিক্ত তোমার পরম হিতকারী আর একটি কথা তোমায় বলিতেছি, তাহা শোন— ॥৪৫-৪৭॥

ত্রেতাযুগে অবিনাশী শ্রীবিষ্ণু ভগবান মহারাজ দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ বধের জন্য আপন ভার্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ দণ্ডকারণ্যে আসিবেন। উভয় ভ্রাতা মৃগয়ার্থ বহির্দেশে গমন করিলে অরক্ষিত আশ্রম হইতে শ্রীজানকীকে রাবণ চোরের ন্যায় অপহরণ করতঃ লঙ্কাতে লইয়া রাখিবে। তদনন্তর বানররাজ সুগ্রীবের আদেশে বানরগণ সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইবে এবং সেখানে কোন কারণবশতঃ তাহাদের সহিত তোমার মিলন হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৪৮-৫১॥

তখন তুমি সীতার অবস্থান বিষয়ে সঠিক বার্তা তাহাদের বলিও। ঐ সময়েই তোমার নূতন পক্ষদ্বয় উদগত হইবে।" ॥৫২॥

সম্পাতি বলিল, "হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! চন্দ্রমা নামক মুনীশ্বর আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন (তদবধি আমি শান্ত চিত্তে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি)। দেখ, আমার এখন অতি কোমল নবীন পক্ষদ্বয় উদ্গত হইতেছে। ॥৫৩॥

তোমাদের কল্যাণ হোক, এখন আমি অন্যত্র গমন করিব। ইহা নিঃসন্দেহ যে তোমরা সীতা অবশ্য দর্শন করিবে। এখন তোমরা কেবল এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিবার প্রযত্ন কর। ॥৫৪॥

হে বানরগণ! যাঁহার নাম স্মরণমাত্র দুষ্ট পাপীজনও এই অপার সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শাশ্বত পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তোমরা তো সেই ত্রিলোকপালক

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় ভক্তবৃন্দ। তোমরা কি আর এই ক্ষুদ্র সমুদ্রমাত্র উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না? (অর্থাৎ তোমরা উহা করিতে নিশ্চয় সমর্থ হইবে)। ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে অষ্টম সর্গ

নবম সর্গ

সমুদ্রোল্লঙ্ঘনের মন্ত্রণা

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

গৃধ্ররাজ সম্পাতি আকাশ মার্গে গমন করিবার পর সীতাদর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত বানরগণ (সীতার সন্ধান অন্ততঃ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া) অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইল। ॥১॥

কিন্তু যখন তাহারা কুম্ভীর ও জলের ঘূর্ণি আদি বিশিষ্ট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল এবং আকাশের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তখন তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, 'আমরা কি প্রকারে ইহা পার হইব?' তখন অঙ্গদ বলিল—"হে বানর-শ্রেষ্ঠগণ! শোন— ॥২-৩॥

তোমরা সকলে অত্যন্ত বলবান, শূরবীর ও পরাক্রমশালী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে এই সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করতঃ রাজকার্য সম্পাদন করিতে পারে? ॥৪॥

সে নিশ্চয়ই এই সমস্ত বানরগণের প্রাণদাতা হইবে। অতএব যে এইরূপ মহাবলবান বীর সে শীঘ্রই আমার সম্মুখে আগমন করুক। ॥৫॥

ইহা নিঃসন্দেহ যে সেই বানরই সম্পূর্ণ বানরগণের, সুগ্রীবের এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরও রক্ষাকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে।" ॥৬॥

যুবরাজ অঙ্গদ এই প্রকার বলিবার পর সমস্ত বানর সেনাপতি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, একটি শব্দও কাহারও মুখ হইতে নির্গত হইল না। এবং তাহারা একে অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ॥৭॥

অঙ্গদ বলিল—"এই কার্য করিবার জন্য তোমরা সকলে আপন আপন বলের পরিমাণ বর্ণন কর। তখন এই কার্য করিতে কে সমর্থ তাহা আমরা জানিতে পারিব।" ॥৮॥

অঙ্গদের কথা শুনিয়া সব বানর বীরগণ পৃথক পৃথক ভাবে আপন বল-পরিমাণ বলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক একজন দশ যোজন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দশ দশ যোজন অধিক উল্লঙ্ঘন করিবার স্বকীয় সামর্থ্য জ্ঞাপন করিল। ॥৯॥

বনচরগণের মধ্যে জাম্ববান শতযোজনের সমীপ পর্যন্ত যাইবার আপন শক্তি বর্ণন করিল। সে বলিল—"পূর্বকালে ভগবান যখন ত্রিবিক্রম অবতাররূপ ধারণ করিয়াছিলেন তখন আমি তাহার পৃথিবীতুল্য পরিমাণ বিশিষ্ট এক চরণের চতুর্দিকে একবিংশতি বার বিধান অনুযায়ী

প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি বার্ধক্যগ্রস্ত বলিয়া সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব না।" ॥১০-১১॥

অঙ্গদ বলিলেন—"আমি মহাসাগর উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ, কিন্তু পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবার সামর্থ্য আমার আছে কিনা তাহা আমি জানি না।" ॥১২॥

তখন বীরবর জাম্ববান তাহাকে বলিল—"হে অঙ্গদ! তুমি এই কার্য সম্পাদন করিতে যদ্যপি সমর্থ তথাপি তোমাকে এই কার্যে নিযুক্ত করা আমি সমীচীন মনে করি না, কারণ তুমি আমাদের যুবরাজ এবং আজ্ঞাকারী।" ॥১৩॥

অঙ্গদ বলিল—"এরূপ হইলে আমাদের সকলকেই পূর্বের ন্যায় (প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করতঃ) কুশাসনোপরি পড়িয়া থাকাই কর্তব্য ; কারণ এই কার্য কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হইল না এবং তজ্জন্য আমাদের জীবনধারণও সম্ভব হইবে না।" ॥১৪॥

তখন বীরবর জাম্ববান বলিল—"বৎস! যাহার দ্বারা অতি শীঘ্র আমাদের এই কার্য সম্পাদন হইবে সেই বীরকে আমি তোমাকে দেখাইতেছি।" ॥১৫॥

এইরূপ বলিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট হনুমানকে জাম্ববান বলিল—"হে হনুমান! এই মহান কার্য সম্পাদনের কাল সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু তুমি একান্তে অজ্ঞজনের ন্যায় নিঃশব্দে বসিয়া আছ কেন? হে মহাবীর! তুমি সাক্ষাৎ পবনদেবের পুত্র এবং তত্তুল্য পরাক্রমশালী। অতএব আজ স্বীয় সামর্থ্য প্রদর্শন কর। ॥১৬-১৭॥

রামকার্যের নিমিত্তই তুমি মহাত্মা পবনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার জন্মগ্রহণ কালে উদীয়মান সূর্য দর্শন করতঃ উহা কোন পরিপক্ক ফল বিশেষ মনে করিয়া তাহা পাইবার ইচ্ছায় বাললীলাবশতঃ পঞ্চশতযোজন ঊর্ধ্বে লম্ফপ্রদান করতঃ পুনঃ ভূপতিত হইয়াছিলে। ॥১৮-১৯॥

অতএব তোমার বলের মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে সমর্থ? হে সুব্রত! তুমি উঠিয়া দাঁড়াও ও রামের কার্য সম্পাদন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।" ॥২০॥

জাম্ববানের বচন শুনিয়া হনুমান অতি প্রসন্নচিত্তে ব্রহ্মাণ্ডকে যেন বিদীর্ণ করতঃ ঘোর সিংহনাদ করিল। ॥২১॥

দ্বিতীয়-ভগবান ত্রিবিক্রমের ন্যায় তাহার আকারও পর্বত সদৃশ হইল। তখন হনুমান বলিল—"হে বানরগণ! আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা ভস্ম করিয়া ফেলিব ও রাবণকে সবংশে বধ করিয়া জানকীকে লইয়া আসিব। অথবা যদি বল তো গলদেশে রজ্জুবন্ধন করতঃ রাবণকেও ত্রিকূটপর্বত সহিত লঙ্কারাজ্য বামহস্তে উঠাইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব, অথবা কেবল শুভলক্ষণা জানকীকে দর্শন করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিব।" ॥২২-২৪॥

হনুমানের এই বচন শুনিয়া জাম্ববান বলিল—"হে বীর! তোমার কল্যাণ হোক! তুমি কেবল শুভলক্ষণা জানকীকে জীবিতাবস্থায় দেখিয়াই প্রত্যাবর্তন করিও। ॥২৫॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সেখানে গমন করতঃ আপন শৌর্য-বীর্য দেখাইও। হে ভদ্র! আকাশ মার্গে গমনকালে তোমার কল্যাণ হউক। ॥২৬॥

"রামকার্য সাধনার্থ গমন করিবার কালে পবনদেব তোমার সহায়ক হউন।" এই প্রকার বানর যূথপতিগণ কর্তৃক আশীর্বাদে অভিনন্দিত হইয়া ও তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ হনুমান মহেন্দ্র পর্বতের শিখরোপরি আরোহণ করিয়া সেখানে অদ্ভুত রূপ ধারণ করিল। ॥২৭-২৮॥

সেই সময় সর্বপ্রাণিগণের নিকট বায়ুপুত্র মহাত্মা হনুমান মহান পর্বতরাজের ন্যায় বিশালকায়, সুবর্ণবর্ণ বালসূর্যতুল্য মনোহর মুখ ও মহান সর্পরাজ তুল্য দীর্ঘবাহু বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে নবম সর্গ
কিষ্কিন্ধা কাণ্ড সমাপ্ত

বাহুপ্রসারণ ও পুচ্ছ দীর্ঘ করতঃ
হনুমানের উল্লম্ফন। [পৃঃ ১৬২ : ৪-৭]

সুন্দর কাণ্ড

প্রথম সর্গ

হনুমানের সমুদ্র উল্লঙ্ঘন ও লঙ্কায় প্রবেশ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

আনন্দঘন হনুমান শতযোজন বিস্তৃত ও মকরাদি হিংস্র জলজন্তু সমাকুল সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়া পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করতঃ এইপ্রকার বলিল—"হে বানরগণ! তোমরা আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি হনুমান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অমোঘ মহাবাণের ন্যায় আকাশমার্গে যাইতেছি। আমি আজই রামপ্রিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিব ॥১-৩॥

আমি অবশ্যই কৃতকার্য হইয়া পুনরায় শ্রীরঘুনাথজীকে দর্শন করিব। প্রাণবিয়োগ কালে যাঁহার নাম একবার স্মরণ করিয়াই মনুষ্য অপার সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমি তাঁহারই দূত, তাঁহারই অবয়বরূপ অঙ্গুলীভূষণ অঙ্গুরীয়ক লইয়া যাইতেছি এবং আপন হৃদয়ে তাঁহার ধ্যান করিতেছি, সুতরাং আমি তুচ্ছ সমুদ্র অবশ্যই উল্লঙ্ঘন করিব।" এইরূপ বলিয়া হনুমান আপন বাহু প্রসারণ ও পুচ্ছ দীর্ঘ করতঃ শীঘ্রই গ্রীবাদেশ সরল উন্নত ও উর্ধ্ব-দৃষ্টি হইয়া ও পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া দক্ষিণ দিশাভিমুখে বায়ুবেগে উল্লম্ফন করিল। ॥৪-৭॥

ঐ সময়ে দেবতাগণ দেখিতেছিলেন যে হনুমান্ আকাশমার্গে বায়ুবেগে যাইতেছে, তখন তাহার সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা পরস্পর এইপ্রকার বলিলেন—"এই মহাশক্তিশালী বানর বায়ুর ন্যায় তীব্র বেগে যাইতেছে। ॥৮-৯॥

আমরা জানি না সে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে কিনা। অতএব ইহার সামর্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে।" পরস্পর এইরূপ বিচার করিয়া দেবতাগণ কৌতূহল বশে নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন—"সুরসে! তুমি শীঘ্রই যাইয়া এই বানরশ্রেষ্ঠের পথিমধ্যে কিছু বিঘ্ন উৎপন্ন কর এবং ইহার বল-বুদ্ধির পরিমাণ অবগত হইয়া সত্বর প্রত্যাগমন কর।" দেবতাগণ এইরূপ বলিলে সুরসা শীঘ্রই হনুমানের গমনমার্গে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য গমন করিল। ॥১০-১২॥

হনুমানের গমনমার্গ রোধ করতঃ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"হে মহামতে! এস আমার মুখমধ্যে শীঘ্র প্রবেশ কর, কারণ আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতুরা। অতএব দেবতাগণ আমার ভক্ষ্যরূপেই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" তখন হনুমান তাহাকে বলিল—"হে মাতঃ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে জানকীজীকে দর্শন করিবার জন্য যাইতেছি। সেখান হইতে শীঘ্রই প্রত্যাগত হইয়া এবং শ্রীরঘুনাথকে জানকীর কুশল সমাচার প্রদানান্তর আমি তোমার মুখে প্রবেশ করিব। হে সুরসে! আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তুমি আমার গমন পথে বিঘ্ন উৎপন্ন করিও না।" তখন সুরসা পুনরায় বলিল—"আমি বড়ই ক্ষুধার্ত। অতএব তুমি একবার আমার মুখে প্রবেশ করিয়া চলিয়া যাইও। নতুবা আমি তোমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।" তখন

হনুমান বলিল—"অতি উত্তম, তুমি শীঘ্রই তোমার মুখ ব্যাদন কর। আমি এখনই তোমার মুখে প্রবেশানন্তর শীঘ্রই লঙ্কায় গমন করিব।" এইরূপ বলিয়া হনুমান তাহার সম্মুখে আপন শরীর এক যোজন পরিমিত আকার বৃদ্ধি করিল। ॥১৩-১৮॥

হনুমানের এই রূপ দেখিয়া সুরসাও পঞ্চযোজন পরিমাণ আপন মুখ ব্যাদন করিল। তখন হনুমানও তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ রূপ ধারণ করিল। ॥১৯॥

পুনঃ সুরসা আপন মুখ বিংশতি যোজন বৃদ্ধি করিলে হনুমানও আপন শরীর ত্রিশ যোজন বিস্তার করিল। ॥২০॥

অতঃপর সুরসা আপন মুখ পঞ্চাশ যোজন পর্যন্ত বিস্তার করিলে হনুমান ঝটিতি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করিয়া সুরসার মুখে প্রবেশ করতঃ নিমেষ মধ্যেই তথা হইতে নির্গত হইয়া সুরসার সন্মুখে উপস্থিত হইল ও বলিল—"হে দেবি! আমি তোমার মুখে প্রবেশ করিয়া পুনঃ নির্গত হইয়াছি। এখন আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি।" ॥২১-২২॥

হনুমানের কথা শুনিয়া সরসা বলিল—"হে বুদ্ধিমানশ্রেষ্ঠ! যাও, শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সিদ্ধ কর। হে বানর! দেবতাগণ তোমার সামর্থ্য পরীক্ষণার্থ আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমার স্থির বিশ্বাস তুমি সীতাকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই শ্রীরামচন্দ্র সহ মিলিত হইবে ও তাঁহাকে সীতার সংবাদ প্রদান করিবে।.অতএব এখন তুমি যাইতে পার।" ॥২৩-২৪॥

তদনন্তর সুরসা দেবলোকে গমন করিলেন এবং হনুমানও আকাশমার্গে পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় তীব্র গতিতে চলিতে লাগিল। ॥২৫॥

এই সময়ে সমুদ্রও মণি ও সুবর্ণ শোভিত মৈনাক পর্বতকে বলিল—"দেখ, ঐ মহাশক্তিশালী পবনাত্মজ হনুমান রামকার্য সিদ্ধির জন্য যাইতেছে, তুমি তার সহায়তা কর। পূর্বকালে সগর পুত্রগণই আমার বৃদ্ধি অর্থাৎ বিস্তার করিয়াছিল, সেইজন্যই আমার 'সাগর' নাম হইয়াছে। ॥২৬-২৭॥

দশরথ নন্দন ভগবান রাম সেই সগরের বংশেই উৎপন্ন হইয়াছেন। আর এই কপিরাজ তাঁহারই কার্যসিদ্ধির জন্য যাইতেছে। ॥২৮॥

তুমি শীঘ্রই জলের অভ্যন্তর হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে ওঠ যাহাতে হনুমান তোমার উপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ পুনঃ অগ্রসর হইতে পারে।" 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া 'মৈনাক' শীঘ্র আপন মণিময় শিখর জলমধ্য হইতে অনেক উর্ধ্বে নির্গত করিল এবং সেই শিখরের উপর মনুষ্যাকারে স্থিত হইয়া দ্রুত গমনশীল হনুমানকে বলিল—"হে মহাকপি! আমি মৈনাক। হে মারুতি! সমুদ্র তোমাকে একটু বিশ্রামের সুযোগ দিবার জন্য আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। এস, আমার এই অমৃত তুল্য পরিপক্ক ফল ভোজন করতঃ কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করিয়া পুনঃ সানন্দে আপন গন্তব্য স্থানে গমন করিও।" মৈনাকের এই প্রকার বচন শুনিয়া পবনসুত হনুমান বলিল— ॥২৯-৩২॥

"রামকার্য সম্পাদন করিবার জন্য আমি যাইতেছি, এখন আমার ভোজন করিবার অবসর কোথায়? আর আমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে। সুতরাং বিশ্রামের সময়ও নাই।" ॥৩৩॥

এইরূপ বলিয়া কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান (মৈনাকের মান রক্ষণার্থ) তাহার শিখরদেশ স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শমাত্র করিয়া অগ্রে ধাবিত হইল। কিয়দ্দূর যাইবার পর হনুমান দেখিল যে কোন ছায়াগ্রহ জলোপরি পতিত তাহার শরীরের ছায়াকে অবরোধ করিয়াছে। ॥৩৪॥

সিংহিকা নামক এক ঘোর রাক্ষসী সদা জলমধ্যে অবস্থান করিয়া আকাশ মার্গগামী জীবগণের ছায়া হস্তে গ্রহণ করতঃ সেই জীবগণকে স্বসমীপে আকর্ষণ করতঃ ভক্ষণ করিত। ॥৩৫॥

তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মহাপরাক্রমী হনুমান চিন্তা করিতে লাগিল—'আমার গতি অবরুদ্ধ করিয়াছে এমন বিঘ্নকারী এখানে কে আছে? কাহাকেও তো দেখিতে পাইতেছি না, ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক মনে হইতেছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অধোদেশে স্বীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ হনুমান এক ভয়ঙ্কররূপ ও বিরাট শরীর বিশিষ্টা সিংহিকা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান করিয়া জলমধ্যে পতিত হইল এবং সক্রোধে পদাঘাতে তাহাকে বধ করিল। ॥৩৫-৩৮॥

অতঃপর হনুমান পুনরায় উল্লম্ফন করতঃ দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে সমুদ্রের দক্ষিণ তটে পৌঁছিল এবং দেখিল, সেখানে নানাবিধ ফলবান বৃক্ষ বিদ্যমান। ॥৩৯॥

বিভিন্ন প্রকার পক্ষী ও মৃগ আদি সমাকীর্ণ এবং বিবিধ পুষ্প-লতাদি আবৃত সেই স্থান। তথায় পৌঁছিয়া হনুমান ত্রিকুট পর্বত শিখরোপরি নির্মিত ও চতুর্দিকে বহু প্রাকার ও পরিখা পরিবেষ্টিত লঙ্কা-পুরী দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি কি প্রকারে এই নগরে প্রবেশ করিব?' ॥৪০-৪১॥

অতঃপর হনুমান স্থির করিল যে আমি রাত্রিকালে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতঃ এই রাবণ পরিপালিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিব। এইরূপ বিচার করিয়া হনুমান সেই সমুদ্রতটে অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং (রাত্রিকালে) লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইল। ॥৪২॥

মহাবলশালী হনুমান সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া নগরের দ্বারে প্রবেশ করিতেছিল, তখন সেখানে রাক্ষসীর রূপ ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ লঙ্কাপুরী দণ্ডায়মান ছিল। ॥৪৩॥

হনুমানকে নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে অত্যন্ত তর্জন গর্জন সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই রাত্রিকালে লঙ্কিনী আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া চোরের ন্যায় বানররূপে নগরে প্রবেশ করিতেছ, তুমি কে? তুমি কি করিতে চাও?" এই বলিয়া ক্রোধে রক্তবর্ণচক্ষু হইয়া সে হনুমানকে পদাঘাত করিল। ॥৪৪-৪৫॥

তখন হনুমান অবজ্ঞা সহকারে বাম হস্তে তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিলে সেই লঙ্কিনী প্রভূত রক্তবমন করিতে করিতে ভূপতিত হইল। ॥৪৬॥

অতঃপর ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া লঙ্কিনী মহাবলী হনুমানকে বলিল—"হে হনুমন্! যাও, তোমার কল্যাণ হউক্। হে অনঘ! তুমি লঙ্কাপুরী জয় করিয়াছ। ॥৪৭॥

পূর্বকালে শ্রীব্রহ্মাজী আমাকে বলিয়াছিলেন যে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে ত্রেতাযুগে অবিনাশী নারায়ণ দশরথপুত্র রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং তখন তাঁহার যোগমায়াও মহারাজ জনকের

গৃহে সীতারূপে প্রকট হইবেন। কারণ কোন সময়ে পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্য ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ॥৪৮-৪৯॥

(ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন) 'শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা সীতাসহ মহাবন দণ্ডকারণ্যে যাইবেন। সেখানে মহামায়ারূপিণী সীতাকে রাবণ অপহরণ করিবে। ॥৫০॥

তদনন্তর রামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা হইবে এবং সুগ্রীব জানকীর সন্ধানে চতুর্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিবে। ॥৫১॥

তন্মধ্যে একটি বানর রাত্রিকালে তোমার (লঙ্কিণীর) নিকট আগমন করিবে এবং তোমা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সে তোমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিবে। ॥৫২॥

হে অনঘে! যখন তাহার প্রহারে তুমি ব্যাকুল হইয়া পড়িবে তখনই রাবণের অন্তকাল নিকটবর্তী হইবে—ইহা নিঃসন্দেহ।' ॥৫৩॥

অতএব হে নিষ্পাপ হনুমান! তুমি যখন লঙ্কিনী আমাকে জয় করিয়াছ, তখন সকলকে জয় করিয়াছ। (শোন) রাবণের অন্তঃপুরে, একটি অতি উত্তম ক্রীড়া-কানন রহিয়াছে। ॥৫৪॥

তাহার মধ্যে দিব্য বৃক্ষসঙ্কুল একটি অশোক বাটিকা আছে। উহার মধ্যস্থলে এক অতি বিশাল শিংশপা (শিশু) বৃক্ষ বিদ্যমান। ॥৫৫॥

সেই স্থানে ভয়ঙ্কর রাক্ষসী পরিবৃতা ও সুরক্ষিতা হইয়া জানকী রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতি শীঘ্র রামচন্দ্রকে সীতার সমাচার জ্ঞাপন কর। ॥৫৬॥

বহুকাল অতীত হইবার পর আজ আমার স্মৃতিপথে সংসার বন্ধন মোচনকারী শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি উদয় হইতেছে এবং তাঁহার এক ভক্তের অতি দুর্লভ সঙ্গও আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আজ আমি ধন্য। আমার হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া দশরথনন্দন শ্রীরাম সদা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকুন।" ॥৫৭॥

পবননন্দন হনুমান সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিবামাত্র ধরাসুতা সীতা ও রাবণের বামহস্ত ও বামনেত্র এবং ইন্দ্রিয়াগোচর শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণ অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে সুন্দর কাণ্ডে প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

হনুমানের অশোক বাটিকা প্রবেশ এবং সীতাকে রাবণের ভয় প্রদর্শন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

অতঃপর হনুমান অতি শোভাশালী লঙ্কাপুরী মধ্যে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়া অতি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতঃ নগরের সর্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল। ॥১॥

সীতার সন্ধানে তৎপর হইয়া সে রাজগৃহে প্রবেশ করিল কিন্তু সেখানে সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও জানকীর সন্ধান মিলিল না। তখন তাহার লঙ্কিনীর বচন স্মরণ হইল এবং সে শীঘ্রই অতি মনোরম অশোক বাটিকাতে উপস্থিত হইল। ॥২-৩॥

কল্পবৃক্ষ পরিপূর্ণ সেই বাটিকার রত্নজড়িত সোপনশ্রেণী-শোভিত জলাশয় এবং সুবর্ণ নির্মিত প্রাসাদের অপূর্ব শোভা দৃষ্টিগোচর হইল। সেখানে নানাপ্রকার পক্ষী ও মৃগগণ বিচরণ করিতেছিল। ॥৪॥

ফলভারে অবনত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষগণ পরিবৃত সেই বাটিকা প্রতি বৃক্ষের নীচে জানকীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে পবননন্দন হনুমান এক গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ শিখর বিশিষ্ট অতি সুন্দর একটি দেবালয় দেখিতে পাইল। অগণিত মণিরত্ন শোভিত স্তম্ভবিশিষ্ট সেই দেবালয় দর্শন করিয়া হনুমান বড়ই বিস্মিত হইল। ॥৫-৬॥

ঐ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অনতিদূরে হনুমান অত্যন্ত সঘন পত্রবিশিষ্ট একটি শিংশপা বৃক্ষ দেখিতে পাইল। ॥৭॥

সেই বৃক্ষের নীচে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারিত না। বহু সুবর্ণবর্ণ পক্ষী সমাকুল সেই বৃক্ষতলে রাক্ষসীগণ পরিবৃতা ভূমিতলে উপবিষ্টা অর্ধশয়ানা শ্রীজানকীকে হনুমান দেখিতে পাইল। তাঁহার মস্তকস্থ সুদীর্ঘ কেশরাশি (অযত্নে) একটি বেণীর আকার ধারণ করিয়াছে। মলিন বস্ত্রধারিণী তিনি অতি দীন ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। ॥৮-৯॥

ভূমিতে শায়িতাবস্থায় 'রাম-রাম' উচ্চারণ করতঃ তিনি শোক প্রকাশ করিতেছিলেন। সেখানে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে এমন কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। এবং উপবাসের ফলস্বরূপ শুভলক্ষণা সীতা অতি কৃশা হইয়া পড়িয়াছেন। ॥১০॥

কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান বৃক্ষশাখার পত্রান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া সীতাকে দর্শন করিল ও মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে 'আজ আমি জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। অহো! পরমাত্মা রামচন্দ্রের কার্য আমার দ্বারা সাধিত হইল।' এমন সময় বাটিকার বাহিরে অন্তঃপুর হইতে কিলকিল্লা (কোলাহল) শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ॥১১-১২॥

হনুমান তখন 'ইহা কি ব্যাপার' এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃক্ষপত্রান্তরালে অলক্ষিত অবস্থায় দেখিতে পাইল যে রমণীবৃন্দ পরিবৃত হইয়া রাবণ সেদিকে আসিতেছে। ॥১৩॥

রাবণের দশমুখ, বিংশতি হস্ত ও কজ্জল সমূহতুল্য কৃষ্ণবর্ণ শরীর দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হনুমান আরও গভীর পত্রান্তরালে লুক্কায়িত হইল। ॥১৪॥

রাবণের সর্বদা এই চিন্তা ছিল যে 'শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে অতি শীঘ্রই কোন প্রকারে আমার মৃত্যু হউক, জানি না কি কারণে তিনি আজ পর্যন্তও সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য কেন আসিতেছেন না।' এই প্রকার নিরন্তর আপন হৃদয়ে সর্বদা শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ হইতেছিল বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ উক্ত দিবস রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে রামের সংবাদ লইয়া আগত কোন একটি স্বেচ্ছারূপধারী বানর সূক্ষ্ম শরীরী হইয়া বৃক্ষ শাখাপর উপবেশন পূর্বক সবকিছু পর্যবেক্ষণ করিতেছে। ॥১৫-১৭॥

এই অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়া রাবণ মনে মনে বিচার করিতে লাগিল—'স্বপ্ন কখনও কখনও সত্য হইতে দেখা যায়, অতএব আমি এক কাজ করিব—জানকীকে বাক্‌বাণে বিদ্ধ করতঃ অত্যন্ত মর্মাহত করিব, তাহা হইলে সেই বানর উহা দর্শন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সর্ববৃত্তান্ত শুনাইবে।' ॥১৮-১৯॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাবণ শীঘ্রই সীতার সম্মুখে গমন করিল। রাবণের সঙ্গিনী স্ত্রীগণের নূপুর ও কিঙ্কিনী আদির ঝঙ্কার শুনিতে পাইয়া সুমধ্যমা কল্যাণী সীতা ভয়ভীতা হইয়া স্বীয় শরীর সঙ্কুচিত করতঃ অধোমুখে ভগবান রামকে স্মরণ করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। ॥২০-২১॥

সীতাকে দেখিয়া রাবণ বলিল—"হে সুভ্রূ ও সুমধ্যমা! আমাকে দেখিয়া তুমি বৃথা এত সঙ্কুচিতা হইতেছ কেন? ॥২২॥

রাম আপন ভ্রাতার সহিত বনচরগণের মধ্যে বাস করিতেছে। সে কখনও কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয়, কখনও বা তাহা হয় না। ॥২৩॥

আমি তো তাহাকে দেখিবার জন্য কত লোক প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু বহু প্রযত্নপূর্বক চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহার দর্শন পায় নাই। ॥২৪॥

রাম তোমার প্রতি সদা উদাসীন, তুমি তাহাকে লইয়া কি করিবে? সর্বদা তোমাসহ বাস করিয়া এবং তোমা কর্তৃক সদা আলিঙ্গিত হইয়াও তাহার হৃদয়ে তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্রও স্নেহদৃষ্টি গোচর হইতেছে না। তোমা হইতে সে কত সুখ-সম্ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমার গুণ-সমূহও সে ভোগ করিয়াছে, কিন্তু সেই গুণহীন, অধম, কৃতঘ্ন তোমাকে স্মরণও করিতেছে না। আমি তোমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছি, তুমি তাহার সাধ্বী পত্নী এবং এই সময় দুঃখ ও শোকে ব্যাকুলা। তথাপি এ পর্যন্ত সে তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিল না। অতএব তোমার প্রতি তাহার কোন অনুরাগ নাই। সুতরাং সে কেন আসিবে? সে সর্বদা অসমর্থ, নির্মম, অভিমানী ও মূর্খ এবং সে নিজেকে বড়ই বুদ্ধিমান মনে করিয়া থাকে। ॥২৫-২৮॥

হে ভামিনী! তোমার প্রতি উদাসীন সেই নরাধমকে লইয়া তুমি কি করিবে? দেখ, রাক্ষসগণশ্রেষ্ঠ আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তুমি আমাকে স্বীকার কর। যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর তাহা হইলে দেব, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষ, এবং কিন্নরাদি সকল স্ত্রীগণের উপরই তুমি আধিপত্য করিতে পারিবে।" ॥২৯-৩০॥

রাবণের বচন শ্রবণ করতঃ ক্রোধাবিষ্টা সীতা উভয়ের মধ্যস্থলে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া অধোমুখ হইয়া বলিলেন—* ॥৩১॥

"ওরে নীচ! শ্রীরঘুনাথজীর ভয়েই তুই ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়াছিলি, ইহা নিঃসন্দেহ। আর সেই তুই রঘুবীরদ্বয়ের অনুপস্থিতিকালেই কুকুর শূন্য যজ্ঞশালা হইতে যেরূপ ঘৃত ভাণ্ড লইয়া পলাইয়া যায়, সেই প্রকার আমাকে অপহরণ করিয়াছিস, তাহার ফল তুই শীঘ্রই পাইবি। যখন

* পতিব্রতা স্ত্রী কোন পরপুরুষ সহ প্রত্যক্ষ বার্তালাপ করেন না। অনিবার্য প্রসঙ্গ হইলে কোন জড় পদার্থ উভয়ের মধ্যে রাখিয়া বার্তালাপ করিয়া থাকেন।

ভগবান রামচন্দ্রের বাণাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া তুই যমলোকে যাইবি, তখনি জানিতে পারিবি যে তিনি সাধারণ মনুষ্য মাত্র নহেন। ওরে রাক্ষসাধম! তুই শীঘ্রই দেখিতে পাইবি যে তোকে যুদ্ধে বধ করিবার জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহিত ভগবান রামচন্দ্র সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া অথবা বাণ সহায়ে সেতু নির্মাণ করিয়া লঙ্কায় আগমন করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ॥৩২-৩৫॥

তিনি তোকে পুত্র ও সৈন্যসহ বধ করিয়া আমাকে অযোধ্যাপুরী লইয়া যাইবেন।" জানকীর এইরূপ কঠোর বচন শুনিয়া অতি ক্রোধে রাক্ষসরাজ রাবণের নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইল এবং সে তৎক্ষণাৎ অসি নিষ্কাসিত করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ॥৩৬-৩৭॥

তখন পতিহিতরতা মহারানী মন্দোদরী পতিকে নিবারণ করতঃ বলিল—"পতিদেব! এই দীনা, ক্ষীণা, অত্যন্ত দুঃখী, ক্ষুদ্রা এবং কাতর মানবীকে পরিত্যাগ করুন। আপনার জন্য তো দেব, গন্ধর্ব এবং নাগাদি লোকের মদমত্তলোচনা মনোহারিণী কত সুন্দরী রমণী রহিয়াছে, যাহারা আপনাকে বরণ করিবার জন্য সদা উদগ্রীব। ॥৩৮-৩৯॥

তখন রাবন বহু বিকরালবদনা রাক্ষসীগণকে বলিল—"হে নিশাচরিগণ! তর্জনজনিত ভয় অথবা আদর যে প্রকারে হউক সীতা কামাতুরা হইয়া শীঘ্রই যাহাতে আমার বশীভূতা হয় তোমরা সকলে সেই প্রচেষ্টা কর। ॥৪০॥

যদি মাসদ্বয় মধ্যে সীতা আমার বশীভূতা হয় তবে সর্বসুখ-সম্পন্না হইয়া সে আমার সহিত রাজ্যসুখ ভোগ করিবে। ॥৪১॥

আর যদি মাসদ্বয় মধ্যেও সে আমার শয্যাসঙ্গিনী হইতে স্বীকৃতা না হয় তা হইলে এই মানবীকে হত্যা করিয়া (তাহার মাংস দ্বারা) আমার প্রাতঃকালীন ভোজন রন্ধন করিও।" ॥৪২॥

এইরূপ বলিয়া রাবণ আপন স্ত্রীগণ সহ অন্তঃপুরে গমন করিলে রাক্ষসীগণ সীতার নিকটে আসিয়া তাহাকে স্ব স্ব উপায়ে ভয়ভীতা করিতে লাগিল। ॥৪৩॥

তাহাদের একজন বলিল—"জানকি! তোর যৌবন বৃথাই অতিবাহিত হইল। রাবণের সহিত সহবাস করিলেই তোর জীবন সফল হইবে।" ॥৪৪॥

অপর কেহ ক্রোধ প্রদর্শন পূর্বক বলিল—"জানকি! (আমার কথা স্বীকার করিতে) তুই বিলম্ব করিতেছিস কেন?" এই প্রকার অপর কেহ খড়্গ উত্তোলন করতঃ জানকিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া বলিল—"ইহার সর্ব অঙ্গ ছেদন করতঃ পৃথক পৃথক করিয়া ফেল।" অন্য এক করালবদনা রাক্ষসী আপন মুখ ব্যাদন করতঃ সীতাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। ॥৪৫-৪৬॥

বিকৃতবদনা রাক্ষসিগণ যখন সীতাকে এইরূপ ভয় দেখাইতেছিল তখন ত্রিজটা নাম্নী এক বৃদ্ধা রাক্ষসী তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিল—॥৪৭॥

দুষ্টা রাক্ষসিগণ! আমার কথা শোন, ইহাতে তোমাদের কল্যাণ হইবে। ॥৪৮॥

তোমরা এই দুঃখক্লিষ্টা রোরুদ্যমানা জানকীকে ভয় দেখাইও না। বরং তাঁহাকে নমস্কার কর। আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি যে কমললোচন ভগবাম রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ শ্বেত ঐরাবত

হস্তির উপর আরোহণ করতঃ আসিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ও রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়া সীতাকে আপন অঙ্কোপরি স্থাপন করতঃ পর্বতশিখরে উপবিষ্ট হইয়াছেন। রাবণ গলদেশে মুণ্ডমালা পরিধান করিয়া নগ্নাবস্থায় পুত্র-পৌত্রাদিসহ গোময়পূর্ণ কুণ্ডে নিমজ্জিত হইতেছে এবং বিভীষণ প্রসন্নচিত্তে শ্রীরঘুনাথের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতি ভক্তিপূর্বক তাঁহার চরণসেবা করিতেছে। অতএব ইহাতে সন্দেহ নাই যে শ্রীরামচন্দ্র সবংশ রাবণকে অনায়াসে বধ করিয়া বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিবেন এবং শুভাননা সীতাকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া স্বীয় অযোধ্যা নগরে প্রত্যাবর্তন করিবেন।" ॥৪৯-৫৪॥

ত্রিজটার এই বচন শুনিয়া রাক্ষসিগণ ভয়ভীতা হইয়া পড়িল, তাহারা ইতস্তত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল ও অবিলম্বে নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল। ॥৫৫॥

রাক্ষসীগণের তর্জন ও ভীতি প্রদর্শনের ফলে সীতা অত্যন্ত ভয়ভীতা ও বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তিনি আপন পরিত্রাতা কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া দুঃখে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ॥৫৬॥

অতঃপর অশ্রুপূর্ণ নয়নে অতি চিন্তাকুল চিত্তে তিনি বলিতে লাগিলেন—"ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রাতঃকাল হইলেই রাক্ষসীগণ আমাকে ভক্ষণ করিবে। এমন কোন উপায় আছে কি যাহা দ্বারা আমার এখনই মৃত্যু হইতে পারে?" ॥৫৭॥

এই প্রকারে মৃত্যুর জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিলেও তাহার কোন উপায় না দেখিয়া কল্যাণী সীতা বৃক্ষশাখা ধারণ করতঃ অতি দুঃখে কাতর হইয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
সুন্দর কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

হনুমানের জানকী সহিত মিলন, অশোকবাটিকা বিধ্বংস ও ব্রহ্মপাশ বন্ধন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

এই প্রকার ক্রন্দন করিতে করিতে সীতা চিন্তা করিলেন—'আচ্ছা, আমি উদ্বন্ধনেই বা দেহত্যাগ করি না কেন? রঘুনাথ বিনা এই রাক্ষসীগণের মধ্যে আমার বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? ॥১॥

গলদেশে ফাঁসি লাগাইবার জন্য আমার দীর্ঘ বেণীই যথেষ্ট।' মৃত্যুর জন্য জানকীর এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় দেখিয়া সূক্ষ্মরূপধারী হনুমান আপন মনে কিছু বিচার করতঃ সীতার কর্ণগোচর হইতে পারে এরূপ মৃদু বাণী সহায়ে ধীরে ধীরে এইপ্রকার বলিতে লাগিল— ॥২-৩॥

"ইক্ষ্বাকু বংশোৎপন্ন অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের সর্বলোক বিখ্যাত চারিটি পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন দেবতুল্যগণ সর্বশুভ-লক্ষ্মণ-সম্পন্ন। ॥৪-৫॥

তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা সীতাসহ পিতার আদেশে দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। সেই মহামনা সেখানে গৌতমী নদীতীরে পঞ্চবটি আশ্রমে নিবাস করিতেছিলেন। সেই আশ্রম হইতে শ্রীরামচন্দ্রের অনুপস্থিতি কালে দুরাত্মা রাবণ মহাভাগা জনকনন্দিনী সীতাকে অপহরণ করিয়াছে। তখন অতি দুঃখার্ত ভগবান রাম সীতাকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে শীঘ্রই দিব্যলোকে প্রেরণ করতঃ অতঃপর ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন করিলেন। ॥৬-৯॥

সেখানে আসিয়া আত্মদর্শী ভগবান রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহার (সুগ্রীবের) স্ত্রীকে অপহরণকারী বালীকে বধ করতঃ সুগ্রীবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে রামচন্দ্র মিত্রের কার্য সিদ্ধ করিলে বানররাজ সুগ্রীব ও সমস্ত বানরগণকে স্ব সমীপে আনয়ন করতঃ তাহাদিগকে সীতার অনুসন্ধানে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। আমিও তাহাদের মধ্যেই সুগ্রীবের একটি বানর মন্ত্রী। সম্পাতির কথানুসারে আমি অতি শীঘ্র একশত যোজন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কাপুরীতে আগমন করিয়াছি এবং এখানে শুভলক্ষণা সীতাকে সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে অশোক বাটিকাতে এই শিংশপা বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল এবং এখানেই রামচন্দ্রের মহিষী অতি শোকাকুলা দুঃখিনী জানকীকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার দর্শনেই আমার আগমন সফল হইল এবং আমি কৃত-কৃত্য হইলাম।" এইরূপ বলিয়া পরম বুদ্ধিমান শ্রীহনুমানজী মৌনাবলম্বন করিল।

ক্রমশঃ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিস্মিত চিত্তে সীতা বলিতে লাগিলেন, "আকাশ পথে আমি যাহা শুনিতে পাইলাম, উহা কি বায়ু-উচ্চারিত শব্দ? ॥১৬॥

অথবা স্বপ্ন, অথবা আমার মনেরই ভ্রান্তি? বোধ হয় ইহা সত্য, কারণ দুঃখ ও শোকাবেগ বশতঃ আমার তো নিদ্রা হয়ই না সুতরাং ইহা স্বপ্ন কি প্রকারে হইতে পারে? পুনঃ আমি ইহা প্রত্যক্ষ শুনিয়াছি, অতএব কোন ভ্রম হইতে পারে না। ॥১৭॥

অতএব আমার কর্ণে অমৃত বর্ষণকারী বচনসমূহ যিনি উচ্চারণ করিয়াছেন সেই প্রিয়ভাষী মহাভাগ্যবান পুরুষ আমার সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হউন।" ॥১৮॥

জানকীর বাক্য শুনিয়া হনুমান ধীরে ধীরে পত্রান্তরাল হইতে অবতরণ করতঃ সীতার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। ॥১৯॥

এবং অরুণবদন পীতবর্ণ ও চটকপক্ষী (চড়ুই পক্ষী) তুল্য আকার বিশিষ্ট বানররূপে সীতার সম্মুখে ধীরে ধীরে সসম্ভ্রমে আগমন করতঃ তাঁহাকে যুক্ত করে প্রণাম করিল। ॥২০॥

তাহাকে দেখিয়া জানকীর ভয় হইল এবং তিনি মনে করিলেন, বোধহয় আমাকে মোহিত করিবার জন্যই রাবণ বানররূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। ॥২১॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। তখন হনুমান সীতাকে পুনরায় বলিল—"দেবি! আপনি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছেন আমি সেরূপ নহি। হে মাতঃ! আমার বিষয়ে সর্ব শঙ্কা আপনি পরিত্যাগ করুন। হে কল্যাণদায়িনী! আমি কোশলরাজ পরমাত্মা রামের দাস এবং বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী। হে শোভনে! আমি সর্বজগতের প্রাণস্বরূপ পবনদেবের পুত্র। ॥২২-২৪॥

ইহা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হনুমানকে জানকী বলিলেন—"তুমি বলিতেছ যে তুমি শ্রীরামচন্দ্রের দাস, কিন্তু বানর ও মনুষ্যগণের মিত্রতা কি প্রকারে হইতে পারে?" তখন সম্মুখে দণ্ডায়মান হনুমান প্রসন্নচিত্তে জানকীকে বলিল— ৷৷২৫-২৬৷৷

"শবরীর প্রেরণায় পরম বুদ্ধিমান ভগবান রামচন্দ্র ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন করিয়াছিলেন। সেই পর্বতোপরি উপবিষ্ট সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া ভয়ভীত চিত্তে তাঁহাদের আগমনের অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন আমি ব্রহ্মচারীবেশে শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যে আগমন করিয়াছিলাম। ৷৷২৭-২৮৷৷

অতঃপর আমি শ্রীরামচন্দ্রের বিশুদ্ধ অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই আপন স্কন্ধোপরি ধারণ করতঃ সুগ্রীবের সমীপে লইয়া গিয়া রাম ও সুগ্রীবের পরস্পর মিত্রতা সম্পাদন করিয়াছিলাম। ৷৷২৯৷৷

সুগ্রীবের পত্নীকেও বালী অপহরণ করিয়াছিল। সেই বালীকে রঘুনাথজী একটি বাণে বধ করতঃ সুগ্রীবকে বানর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তখন সুগ্রীবও আপনাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য মহাবলী ও পরাক্রমী বানরগণকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। ৷৷৩০-৩১৷৷

সেই সময় আমাকে যাইতে দেখিয়া শ্রীরঘুনাথজী আমাকে সাদরে বলিলেন—"হে পবননন্দন! আমার সর্ব কার্য তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে। তুমি সীতাকে আমার ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিও। তোমার পরিচয়ের জন্য আমি স্বীয় নামাঙ্কিত এক উত্তম অঙ্গুরীয়ক তোমাকে দিতেছি। তুমি উহা সীতাকে প্রদান করিও।' ৷৷৩২-৩৪৷৷

এইরূপ বলিয়া তিনি আপন অঙ্গুলী হইতে বিমুক্ত করিয়া আমাকে অঙ্গুরীয়কটি দিলেন। আমি উহা অতি সাবধানে লইয়া আসিয়াছি। হে দেবি! আপনি উহা দর্শন করুন।" ৷৷৩৫৷৷

এইরূপ বলিয়া হনুমান জানকীকে অঙ্গুরীয়কটি প্রদান করিল এবং নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দূরে দণ্ডায়মান রহিল। ৷৷৩৬৷৷

রাম নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দর্শনে সীতা অতীব আনন্দিত হইলেন এবং উহা মস্তকে ধারণ করতঃ নেত্রে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৷৷৩৭৷৷

অতঃপর সীতা বলিতে লাগিলেন—"হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার প্রাণদাতা, তুমি বড় বুদ্ধিমান এবং শ্রীরঘুনাথের ভক্ত ও প্রিয়কারী। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের তোমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস বিদ্যমান, ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা। ৷৷৩৮৷৷

তাহা না হইলে আমার নিকটে তিনি অন্য পরপুরুষকে কেন পাঠাইবেন? হে হনুমন্! আমার সর্বদুঃখের বৃত্তান্ত তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছ। ৷৷৩৯৷৷

শ্রীরামচন্দ্রকে আমার এই সমস্ত দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিও। তিনি যেন আমার প্রতি দয়া করেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আমার প্রাণ আর দুই মাস পর্যন্ত থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র না আসিলে এই দুষ্ট রাক্ষস (রাবণ) আমাকে ভক্ষণ করিবে। অতএব বানররাজ সুগ্রীব সহ অন্য বানর যূথপতিগণকে সঙ্গে লইয়া ভগবান রামচন্দ্র শীঘ্রই রাবণকে পুত্র ও সেনা সহ যুদ্ধে বধ করতঃ যদি আমাকে মুক্ত করেন তবে উহা তাঁহার পুরুষার্থের উপযোগী

হইবে। মৎবর্ণিত পুরুষার্থ বিষয়ক বর্ণন তুমি এইরূপেই তাঁহার নিকট করিও। হে হনুমন্! তুমিও যুক্তিপূর্বক তাঁহাকে এইরূপে সব কথা বলিও যাহাতে তিনি শীঘ্রই রাবণকে বধ করতঃ আমাকে উদ্ধার করেন। ইহাতে তোমার বড়ই ধর্ম অর্থাৎ পুণ্য লাভ হইবে।" তখন হনুমান তাঁহাকে বলিল—"দেবি! আমি স্বচক্ষে যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহাতে আমি দৃঢ়রূপে জানি যে লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামচন্দ্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেনাবাহিনী ও সুগ্রীবসহ এইস্থানে আগমন করিবেন এবং রাবণকে আপন বীর্যবলে বধ করতঃ আপনাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। হে দেবি! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" তখন জানকী বলিতে লাগিলেন—"ভগবান রাম স্বরূপতঃ সর্বব্যাপক হইলেও (অমেয়াত্মা) বানরযূথপতিগণ সহ এই সমুদ্র কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এখানে আগমন করিবেন?" হনুমান বলিলেন—"রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ আমার স্কন্ধে আরোহণ করতঃ আসিবেন। আর বানররাজ সুগ্রীব সেনাসহিত এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র একক্ষণে আকাশমার্গে পার হইয়া আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য সম্পূর্ণ রাক্ষসকুল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে দেবি! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এক্ষণেই ভ্রাতাসহ ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইতেছি এবং শীঘ্রই আপনার সমীপে তাহাদিগকে আনিবার প্রযত্ন করিব। হে দেবি! আমাকে এরূপ কোন পরিচায়ক বস্তু প্রদান করুন যাহাতে শ্রীরঘুনাথ আমাকে বিশ্বাস করিবেন (যে আমি যথার্থই সীতাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছি)। ঐ পরিচায়ক বস্তুটি সঙ্গে লইয়া আমি অতি সাবধানে পরম উৎসুকতার সহিত তাঁহার নিকট যাইব।" তখন কমললোচনা সীতা কিছুক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া আপন কেশপাশ-মধ্যস্থিত চূড়ামণিটি বাহির করিয়া হনুমানকে প্রদানপূর্বক বলিলেন—"হে কপিশ্রেষ্ঠ! এই বস্তুটি দর্শন করিলেই ভগবান রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ তোমাকে বিশ্বাস করিবেন। ॥৪০-৫২॥

হে সুব্রত! শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য তোমাকে একটি ঘটনা বলিতেছি—একদিন চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরঘুনাথ একান্তে আমার অঙ্কে মস্তক স্থাপন করতঃ নিদ্রা যাইতেছিলেন। ॥৫৩॥

ঐ সময়ে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত কাকরূপে সেখানে আসিয়া মাংস লোভে আমার রক্তবর্ণ পাদাঙ্গুষ্ঠ তাহার চঞ্চু ও নখের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিল। ॥৫৪॥

তৎপর শ্রীরামচন্দ্রজী জাগ্রত হইলে আমার পায়ের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—"হে কল্যাণি! কোন্ দুরাত্মা আমার অপ্রিয় এইরূপ কর্ম করিয়াছে?" ॥৫৫॥

ইহা বলিতে বলিতেই তিনি সেই কাককে আপন সম্মুখেই বারংবার আসিতে দেখিলেন। সেই কাকের চঞ্চু ও নখ রুধিরাপ্লুত ছিল। উহা দেখিয়া তাঁহার বড় ক্রোধ হইল।

তখন তিনি শীঘ্রই একটি তৃণ ধারণ করতঃ তাহাতে দিব্যাস্ত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই প্রজ্বলিত অস্ত্র অনায়াসে বায়সোপরি নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কাক ভয়ভীত হইয়া পলায়ন করিল ও ত্রৈলোক্যে কোথাও আশ্রয় আশায় ভ্রমণ করিতে থাকিলেও যখন ইন্দ্র, ব্রহ্মা আদি কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না তখন সে অত্যধিক ভীতত্রস্ত হইয়া দয়ানিধি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণে আসিয়া পতিত হইল। শরণাগত দেখিয়া তাহাকে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন— ॥৫৭-৫৯॥

"আমার এই অস্ত্র অমোঘ। অতএব তুমি তোমার এক অক্ষি প্রদান করতঃ এখান হইতে প্রস্থান কর। তখন কাক আপনার দক্ষিণ নেত্রটি প্রদান করতঃ চলিয়া গেল। যিনি এবংবিধ পৌরুষবান সেই রঘুনাথজী আমাকে এই সময় জানি না কেন উপেক্ষা করিতেছেন?" সীতার এইরূপ বচন শুনিয়া হনুমান বলিল—"দেবি! যখন শ্রীরঘুনাথজী আপনার এই স্থানে অবস্থানের বিষয় জানিতে পারিবেন তখনই তিনি এই রাক্ষসমণ্ডল শোভিত লঙ্কাপুরী ক্ষণমধ্যেই ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।" ॥৬০-৬২॥

জানকী বলিলেন—"বৎস! তুমি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র শরীরধারী, অতএব রাক্ষসগণ সহ তুমি কি প্রকারে যুদ্ধ করিবে? আর অন্য বানরগণেরও তো তোমার মতই ক্ষুদ্র শরীর হইবে?" ॥৬৩॥

দেবী জানকীর এইরূপ বচন শুনিয়া হনুমান তাঁহাকে মেরু ও মন্দর পর্বততুল্য অতি বিশাল এবং রাক্ষসগণের ভয় উৎপাদনকারী আপন পূর্বরূপ দেখাইলেন। হনুমানের মহাপর্বত তুল্য বিশাল শরীর দর্শন করিয়া সীতা অতীব আনন্দিত হইয়া কপিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন—"হে মহাপরাক্রমী! তুমি অতি সামর্থ্যবান। এই রাক্ষসীগণ তোমাকে দেখিতে পাইবে। অতএব তুমি শীঘ্র রাম সমীপে গমন কর। তোমার প্রত্যাগমন মার্গ শুভ ও নিষ্কণ্টক হউক।" ॥৬৪-৬৬॥

হনুমান বলিল—"দেবি! আমি ক্ষুধাতুর হইয়াছি। আপনার শুভদর্শনের পারণরূপে আপনার সম্মুখস্থ বৃক্ষরাজির সুপক্ক ফলরাশি আমি ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।" ॥৬৭॥

তখন সীতার অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া হনুমান যথেচ্ছ ফলভক্ষণ করতঃ জানকীকে প্রণাম ও তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া সে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল— ॥৬৮॥

"যে দূত আপন প্রভুর কার্য সম্পাদন করিতে আসিয়া সেই কার্যের অবিরোধী অন্য কোন কাজ সম্পাদন না করিয়া প্রত্যাবর্তন করে সে অধম। ॥৬৯॥

অতএব আমি আরও কিছু করিব এবং রাবণের সহিত মিলন ও তাহার সহিত বার্তালাপ করিয়া তৎপশ্চাৎ শ্রীরঘুনাথজীকে দর্শন করিতে যাইব। ॥৭০॥

মনে মনে এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া মহাবলী হনুমান ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করতঃ অশোক বাটিকা বৃক্ষহীন করিয়া ফেলিল। ॥৭১॥

যে বৃক্ষের নীচে সীতা বসিয়াছিলেন সে বৃক্ষটি ব্যতীত মনোহর অশোক বাটিকাটি বৃক্ষহীন করিয়া ফেলিল। রাক্ষসীগণ তাহাকে ঐরূপ বৃক্ষ উৎপাটন করিতে দেখিয়া জানকীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই বানরাকৃতি অদ্ভুত জীবটি কে?" ॥৭২-৭৩॥

জানকী বলিলেন—"এ রাক্ষসীমায়া তোমরাই জান। দুঃখ শোকাতুরা আমি কি জানি?" ॥৭৪॥

জানকী এই প্রকার বলিবার পর ভয়াকুলা রাক্ষসীগণ রাবণের নিকট গমন করতঃ তাহাকে হনুমানের সমস্ত কীর্তি বর্ণন করিল। ॥৭৫॥

তাহারা বলিল—"হে প্রভু! এক বিশাল পরাক্রমী বানরাকার প্রাণী সীতাসহ সম্ভাষণ করতঃ ক্ষণকাল মধ্যেই সমগ্র অশোকবাটিকা বৃক্ষহীন করিয়া ফেলিয়াছে এবং দেবালয়ের

বিরাট অট্টালিকাটিকেও ভগ্ন করিয়াছে। অতঃপর বাটিকা রক্ষকগণকেও বধ করতঃ সে এখনও সেইস্থানে অবস্থান করিতেছে।" বন বিধ্বংসবিষয়ক মহা অপ্রিয় সমাচার শ্রবণ করতঃ রাক্ষসরাজ রাবণ ক্ষণমধ্যেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দশ লক্ষ সেবকগণকে (তথায় যুদ্ধার্থ) প্রেরণ করিল। এদিকে পর্বতাকার হনুমান একটি লৌহ স্তম্ভ আয়ুধ (শস্ত্ররূপে) ধারণ করতঃ সেই ভগ্ন মন্দিরের সম্মুখভাগে বসিয়াছিল। অরুণ বর্ণ মুখ ও ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট তাহার লাঙ্গুলও কিঞ্চিৎ হেলিতেছিল। ॥৭৬-৭৯॥

হনুমান রাক্ষস সমূহকে আসিতে দেখিয়া ঘোর সিংহনাদ করিল। উহা শুনিয়া তাহারা সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ॥৮০॥

অতঃপর বহু রাক্ষস বধকারী ভীষণাকার হনুমানকে দেখিয়া রাক্ষসগণ তাহার উপর নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। ॥৮১॥

তখন বন্যগজদলপতি গজরাজ যে প্রকার মশককুলকে অনায়াসে ধ্বংস করিয়া থাকে সেই প্রকার হনুমানও উত্থান করতঃ স্বীয় মুদ্গর সহায়ে ক্ষণকাল মধ্যেই চতুর্দিকস্থ সর্ব রাক্ষসগণকে পিষ্ট করিয়া ফেলিল। ॥৮২॥

আপন সেবকগণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া রাবণ তাহার পাঁচটি দুর্ধর্ষ সেনাপতিগণকে (তাহাদের স্ব স্ব সেনাসহ) সেখানে প্রেরণ করিল। ॥৮৩॥

হনুমান আপন লৌহ স্তম্ভাঘাতেই শীঘ্রই তাহাদের সকলকে বধ করিল। তখন রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাতটি মন্ত্রী-পুত্রকে প্রেরণ করিলে, তাহারা সেখানে আসিবামাত্রই বানরাধীশ পবনকুমার তাহাদের সকলকেই ক্ষণমধ্যেই সেই লৌহ স্তম্ভাঘাতে যমসদনে প্রেরণ করিল। ॥৮৪-৮৫॥

অতঃপর হনুমান পূর্বস্থানে উপবেশন পূর্বক যুদ্ধার্থী অন্য রাক্ষসগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন অতি বলবান ও প্রতাপশালী রাজকুমার অক্ষ আসিল। ॥৮৬॥

অক্ষকে দেখিয়া হনুমান আপন মুদ্গর সহ আকাশে উড্ডীন হইয়া উপর হইতেই তাহার মস্তকে প্রচণ্ড মুদ্গর প্রহার দ্বারা অক্ষকে নিধন করতঃ তাহার সেনাগণকেও নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। ॥৮৭-৮৮॥

রাজকুমার অক্ষ বধ হইয়াছে শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ মহান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতকে বলিল—"বৎস! আমার পুত্রহন্তা শত্রু যেখানে রহিয়াছে আমি সেই স্থানে যাইতেছি। তাহাকে বধ অথবা বন্ধন করতঃ আমি তোমার নিকট লইয়া আসিব।" ॥৮৯-৯০॥

ইন্দ্রজিৎ পিতাকে বলিল—"হে মহামতে! আপনি শোক করিবেন না, আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনি এরূপ দুঃখময় বচন কেন বলিতেছেন? ॥৯১॥

আমি ঐ বানরকে শীঘ্রই ব্রহ্মপাশে বন্ধনকরতঃ লইয়া আসিব।" এই প্রকার বলিয়া সেই মহাপরাক্রমী বীর রথারূঢ় হইয়া বহু রাক্ষসগণ সহ হনুমানের নিকট পৌঁছিল। তখন বীর্যবান হনুমান (ইন্দ্রজিতের) ভীতিপ্রদ গর্জন শুনিয়া লৌহস্তম্ভ হস্তে আকাশমার্গে উল্লম্ফন করিল। আকাশে তাহাকে উড্ডীয়মান দেখিয়া ইন্দ্রজিত আটটি বাণ দ্বারা হনুমানের মস্তক বিদ্ধ করিল।

পুনরায় ছয়টি বাণের দ্বারা তাহার হৃদয় ও দুই চরণ এবং একটি বাণের দ্বারা তাহার পুচ্ছ বিদ্ধ করতঃ ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন মহাবলী হনুমানও অতি হর্ষসহকারে আপন হস্তস্থিত স্তম্ভ সহায়ে ইন্দ্রজিতের সারথিকে বধ করতঃ রথসহ রথের অশ্বও চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অন্য রথে আরোহণ করতঃ শীঘ্রই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্র সহায়ে বন্ধন করতঃ তাহাকে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট লইয়া গেল। ॥৯২-৯৮॥

যাহার নাম নিরন্তর জপ করিয়া ভক্তগণ ক্ষণমধ্যেই অজ্ঞানকৃত বন্ধন ছিন্নকরতঃ কোটি সূর্যতুল্য প্রকাশমান পরম কল্যাণময় পদ স্বতঃই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সেই ভগবান রামচন্দ্রের চরণকমল আপন হৃদয়ে ধারণকারী হনুমান সর্বদাই সর্ববন্ধনমুক্ত, ব্রহ্মপাশ বা অন্য কোন বন্ধন দ্বারা তাহার কি হইতে পারে? ॥৯৯-১০০॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
সুন্দর কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

হনুমান ও রাবণের সংবাদ এবং লঙ্কা দহন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

ব্রহ্মপাশে বদ্ধ হইয়া শ্রীহনুমান (কৌতূহল সহিত) যেন ভীতব্যক্তির ন্যায় নগর দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় তাহাকে দেখিবার জন্য চতুর্দিক হইতে সমবেত পুরবাসীগণ তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল ও সক্রোধে তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। ॥১॥

ব্রহ্মার বর প্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষণমাত্র হনুমানের শরীর স্পর্শ করিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইহা জানা সত্ত্বেও হনুমান বিশেষ কার্য সম্পাদনার্থ তুচ্ছ রজ্জু বন্ধন স্বীকার করতঃ রাবণের নিকট গমন করিল। ॥২॥

তখন ইন্দ্রজিৎ সভামধ্যস্থিত রাবণের সম্মুখে হনুমানকে উপস্থিত করিয়া বলিল—"আমি এই বানরকে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে বন্ধন করিয়া আনিয়াছি। এই বানর আমাদের বহু মহাবীর রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছে। ॥৩॥

হে মহারাজ! মন্ত্রিগণ সহ বিচার করতঃ আপনি যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন, এই বানরের প্রতি তাহাই বিধান করুন। এ কোন সাধারণ বানর নহে।" তখন রাক্ষসরাজ রাবণ সম্মুখে উপবিষ্ট কজ্জলগিরি তুল্য কৃষ্ণকায় প্রহস্তকে বলিল— ॥৪॥

"প্রহস্ত! এই বানরকে জিজ্ঞাসা কর—সে এখানে কেন আসিয়াছে? এখানে তাহার কি কাজ? সে কোথা হইতে আসিয়াছে? আমার সমগ্র বন কেন বিধ্বস্ত করিয়াছে? এবং আমার বীর রাক্ষসগণকে সে কেন বলপূর্বক হত্যা করিয়াছে?" ॥৫॥

তখন প্রহস্ত আদরপূর্বক হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে বানর! তোমাকে কে

পাঠাইয়াছে? তুমি ভয় পাইও না। রাজ রাজেশ্বরের সম্মুখে সব কথা সত্য সত্য বলিও। তাহা হইলে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব।" ॥৬॥

তখন ত্রিলোকের কণ্টকস্বরূপ ও শত্রু রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিয়া পবননন্দন হনুমান আপন হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রজীকে বারম্বার স্মরণ করতঃ তাঁহার মনোহর কথা বলিতে আরম্ভ করিল। ॥৭॥

হনুমান বলিল—"হে দেবগণের শত্রু রাবণ! তুমি যথার্থ বাক্য শ্রবণ কর। কুকুর যে প্রকার যজ্ঞের হবি লইয়া পলায়ন করে তদ্রূপ তুমিও নিজের বিনাশের জন্য যে অখিলেশ্বরের সাধ্বী ভার্যাকে অপহরণ করিয়াছ, আমি সেই সর্বজন-হৃদয়-বিহারী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দূত। ॥৮॥

শ্রীরঘুনাথ মতঙ্গপর্বতে আগমন করিয়া অগ্নিসাক্ষীপূর্বক সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন, এবং একটি বাণেই বালীকে বধ করতঃ সুগ্রীবকে বানর রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ॥৯॥

হে রাবণ! এ সময়ে সেই মহাবলী বানররাজ কোটি-কোটি মহা শূর-বীর বানরবাহিনী সহ রাম ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রবর্ষণ পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। ॥১০॥

তিনি জানকীকে অনুসন্ধান করিবার জন্য দশদিকে মহা বানরেশ্বরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি বানর বায়ুপুত্র আমি সীতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে ধীরে ধীরে এইস্থানে আগমন করিয়াছি। ॥১১॥

আমি পদ্মপলাশলোচনা জানকীকে দর্শন করিয়াছি, বানরগণের জাতিগত স্বভাববশে তোমার অশোকবাটিকা বিধ্বস্ত করিয়াছি, এবং ধনুর্বাণাদি ধারণ করতঃ আমাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে অতিবেগে ধাবমান রাক্ষসগণকে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে বধ করতঃ আপন শরীর রক্ষা করিয়াছি। কারণ, হে রাজন! স্ব স্ব শরীর, সকল প্রাণিগণের নিকটেই অতি প্রিয় হইয়া থাকে। অতঃপর এই মেঘনাদ নামক রাক্ষস আমাকে ব্রহ্মপাশে বন্ধন করিয়া এইস্থানে আনয়ন করিয়াছে। ॥১২-১৩॥

হে রাবণ! আমি জানিতাম যে ব্রহ্মাজীর বর প্রভাবে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র আমাকে স্পর্শ করিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি তোমার প্রতি করুণারসার্দ্রচিত্তে কিছু হিতকারী বাক্য তোমাকে বলিবার জন্যই আমি এই কৃত্রিম বন্ধনদশা স্বীকার করতঃ এই স্থানে আগমন করিয়াছি। ॥১৪॥

হে রাবণ! তুমি বিবেকসহায়ে সংসারের গতি বিচার কর, রাক্ষসী বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং প্রাণিগণের সংসার বন্ধন মোচনকারী অত্যন্ত হিতকারিণী দৈবী গতির আশ্রয় লও। ॥১৫॥

তুমি ব্রহ্মার অতি উত্তম বংশে (ব্রাহ্মণকুলে?) জন্মধারণ করিয়াছ ও পুলস্ত্যেয় নন্দন বিশ্রবার পুত্র তুমি, পুনঃ তুমি কুবেরের ভাই; অতএব দেখ, তুমি দেহাত্মবুদ্ধিতেও রাক্ষস নও, আর আত্মবুদ্ধিতেও তুমি রাক্ষস নও, ইহা তো বলাই বাহুল্য। ॥১৬॥

(তুমি বস্তুতঃ কে, তোমার যথার্থ স্বরূপ কি তাহা আমি বলিতেছি)—তুমি সদা নির্বিকার। অতএব দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির দুঃখ সমূহ—ইহারা কখনও তোমার নহে এবং তুমি নিজেও

ঐ সকল নহ। এই সকলই অজ্ঞান বশতঃ হইয়া থাকে এবং স্বপ্ন দৃশ্যতুল্য অসৎ ও মিথ্যা। ॥১৭॥

ইহা সত্য জানিও যে তোমার আত্মস্বরূপে কোন বিকার নাই। কারণ আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব বশতঃ তাহাতে বিকারের কোন কারণই থাকিতে পারে না। আকাশ যে প্রকার সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও কোন পদার্থের গুণদোষে লিপ্ত হয় না, সেই প্রকার তুমিও দেহমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও অতিসূক্ষ্মতা বশতঃ সুখদুঃখাদি বিকারসহ লিপ্ত নহ। 'আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং শরীর বিশিষ্ট'—এইরূপ বুদ্ধিই সর্ব বন্ধনের কারণ। ॥১৮॥

পুনঃ 'আমি চিন্মাত্র, জন্মরহিত, অবিনাশী ও আনন্দস্বরূপ'—এই জ্ঞানে জীব মুক্ত হইয়া যায়। পৃথিবীর বিকার হইতে উৎপন্ন এই দেহও অনাত্মা এবং বায়ুর বিকাররূপ প্রাণও আত্মা নহে। ॥১৯॥

অহঙ্কারের কার্য মন এবং প্রকৃতির বিকার হইতে জাত বুদ্ধিও আত্মা নহে। আত্মা চিদানন্দ স্বরূপ, অবিকারী ও দেহাদি সংঘাত হইতে পৃথক ও তাহার স্বামী। ॥২০॥

আত্মা নির্মল স্বভাব, সর্বদা উপাধি রহিত—এইপ্রকার জ্ঞান হইলেই সর্বপ্রাণী সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অতএব হে মহাবুদ্ধিমান রাবণ। আমি তোমাকে আত্যন্তিক মোক্ষের সাধন বলিতেছি, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ॥২১॥

ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিই চিত্তবিশুদ্ধির কারণ, উহা হইলেই অত্যন্ত নির্মল আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান প্রভাবেই শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের অনুভব হয়। ঐ অনুভব সংশয় আদি রহিত হইয়া সুদৃঢ় হইলেই পরমপদ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ॥২২॥

অতএব প্রকৃতিরও অতীত, পুরাণপুরুষ, সর্বব্যাপক, আদিনারায়ণ, লক্ষ্মীপতি হরি, ভগবান রামচন্দ্রের ভজন কর। মূর্খতা বশতঃ আপন হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শত্রুভাব ত্যাগ কর। এবং শরণাগতবৎসল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভজন কর। সীতাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া আপন পুত্র ও বন্ধুবান্ধবাদি সহিত ভগবান রামচন্দ্রের শরণ লইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম কর, তাহা হইলে তুমি সর্ব ভয় হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ॥২৩॥

যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়স্থ অদ্বিতীয় সুখ স্বরূপ পরমাত্মা রামকে ভক্তিপূর্বক ধ্যান করে না, সে দুঃখ তরঙ্গাকুল এই সংসার সমুদ্র কি প্রকারে পার হইবে? ॥২৪॥

যদি তুমি ভগবান রামচন্দ্রের ভজন না কর তবে অজ্ঞানরূপী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে এবং তোমার স্বকৃত পাপরাশি অরক্ষিত শত্রুর দুঃখপ্রাপ্তির ন্যায় তোমাকে উত্তরোত্তর নিম্নমার্গে লইয়া যাইবে। তখন আর তোমার মুক্তিলাভের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না।" ॥২৫॥

পবননন্দনের এইরূপ অমৃততুল্য মধুর ভাষণ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের তাহা সহ্য হইল না। এবং অন্তর তাপে দগ্ধ হইয়া সে অত্যন্ত ক্রোধভরে চক্ষু রক্তবর্ণ করতঃ হনুমানকে বলিল— ॥২৬॥

"ওরে দুষ্টবুদ্ধি বানর! তুই সর্ব বানরগণের অধম! আমার সম্মুখে নির্ভয় হইয়া তুই এই প্রকার প্রলাপ বাক্য কি প্রকারে উচ্চারণ করিতেছিস্? এই রামই বা কে বা এই রনচারী সুগ্রীবই বা কে? আমি সুগ্রীব সহিত এই নরাধমকে বধ করিব। ॥২৭॥

হে বানর! প্রথমতঃ আজ তোকেই বধ করিব। তৎপর জানকী ও তদনন্তর লক্ষ্মণ সহিত রামকে বধ করিব। তৎপর সর্বাগ্রে সেই বলবান বানররাজ সুগ্রীবকে তাহার বানর সেনার সহিত অল্পকাল মধ্যেই নিধন করিব।" রাবণের এই বচন শুনিয়া হনুমান আপন হৃদয়ে বর্ধিত ক্রোধাগ্নির দ্বারা যেন রাবণকে দগ্ধ করতঃ বলিল— ॥২৮॥

"ওরে অধম! কোটি রাবণও আমার তুল্য হইতে পারে না। আমি ভগবান রামচন্দ্রের দাস! তুই কি তা জানিস্ না? আমার পরাক্রমের কোন সীমা নাই।" হনুমানের এইরূপ বচন শুনিয়া রাবণ সক্রোধে পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক রাক্ষসকে বলিল—"ওরে! এই বানরকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া মারিয়া ফেল। সর্বরাক্ষস, মিত্র ও বন্ধুগণ এবং সর্বলোকে এই কৌতুক দর্শন করুক।" তখন হনুমানকে মারিবার জন্য উদ্যতায়ুধ সেই প্রচণ্ড রাক্ষসকে নিবারণ করতঃ বিভীষণ বলিলেন—"রাজন্! কোন শক্তিশালী পুরুষেরই অন্য রাজ্যের (বানররূপ) দূতকে বধ করা কর্তব্য নহে। ॥২৯-৩০॥

যদি বানর দূতকে বধ করা হয় তাহা হইলে যে রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য আপনি উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাকে এই সমাচার শুনাইবে কে? ॥৩১॥

অতএব এই বানরের জন্য বধতুল্য অন্য কোন দণ্ডবিধান করুন, যাহার চিহ্ন লইয়া বানর সেখানে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার (দুর্দশা) দর্শন করিয়া সুগ্রীব সহিত রাম শীঘ্রই আগমন করিবেন, তখন তাঁহার সহিত আপনার যুদ্ধ হইবে।" বিভীষণের বচন শুনিয়া রাবণও এই প্রকার বলিল— ॥৩২-৩৩॥

"বানরগণের আপন লাঙ্গুলের উপর বিশেষ গর্ব বা অভিমান হইয়া থাকে। অতএব ইহার পুচ্ছ সযত্নে বহুবস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান পূর্বক নগরের চতুর্দিকে তাহাকে ভ্রমণ করাইয়া তৎপর তাহাকে ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলেই সর্ব বানরবাহিনীপতিগণ ইহার দুর্দশা দেখিতে পাইবে।" ॥৩৪-৩৫॥

রাক্ষসগণ উক্ত আদেশ পাইয়া হনুমানের পুচ্ছ শণবস্ত্র ও তৈলাক্ত বহুপ্রকার বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টন করতঃ পুচ্ছাগ্রে কিঞ্চিৎ অগ্নি সংযোগ করিল এবং রজ্জুদ্বারা তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করতঃ বলবান রাক্ষসগণ "এই বানর চোর" এইরূপ রণশিঙা বাদ্যধ্বনি সহকারে ঘোষণা করতঃ নগরের চতুর্দিকে মুহুর্মুহুঃ বিবিধ তাড়নাপূর্বক ভ্রমণ করাইতে লাগিল। ॥৩৬-৩৮॥

হনুমানও কিছু কৌতুক করিবার ইচ্ছায় এইসব উপদ্রব সহ্য করিল। তাহাকে লইয়া সকলে পশ্চিমদ্বার সমীপে পৌঁছিবামাত্র ক্ষণমধ্যেই সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া রজ্জুবন্ধন হইতে নির্গত হইল, এবং পুনরায় পর্বতাকার ধারণ করতঃ উল্লম্ফনে পুরদ্বারের তোরণোপরি আরোহণ করিল। ॥৩৯-৪০॥

সেখানে একটি স্তম্ভ উৎপাটন করিয়া ক্ষণমধ্যেই সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিল এবং আপন শেষকার্যটি মনে মনে স্থির করতঃ সে প্রাসাদাগ্র হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক এক গৃহ হইতে অন্য গৃহ তৎপর অন্য গৃহ এইরূপে তাহার জ্বলন্ত পুচ্ছের অগ্নিদ্বারা লঙ্কার সর্বমহল, অট্টালিকা ও তোরণাদিতে অগ্নি সংযোগ করিল। ॥৪১-৪২॥

তখন "হা তাত! হা পুত্র! হা নাথ!" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে চতুর্দিকে সর্বপ্রাসাদোপরি আরূঢ়া রোদনপরায়ণা রাক্ষসীগণ কেহ কেহ অগ্নি মধ্যে পতিত হইয়া যেন স্বর্গীয় দেবতাগণের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এইপ্রকারে হনুমান বিভীষণের গৃহ ব্যতীত সমগ্র লঙ্কানগরী অচিরে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।- ॥৪৩-৪৪॥

তদনন্তর পবননন্দন হনুমান এক উল্লম্ফনে সমুদ্রমধ্যে পতিত হইয়া আপন পুচ্ছের অগ্নি নির্বাপিত করতঃ স্বস্থচিত্ত হইল। ॥৪৫॥

সীতার প্রার্থনা বশে এবং বায়ুর প্রিয় মিত্র বলিয়া অগ্নি হনুমানের পুচ্ছ দগ্ধ করিল না। উপরন্তু হনুমান অত্যন্ত শীতলতাই অনুভব করিল। ॥৪৬॥

যাহার নাম স্মরণে সমস্ত পাপ বিমুক্ত হইয়া মনুষ্য সদ্য সদ্য তাপত্রয়রূপ অগ্নি অতিক্রম করিয়া থাকে, সেই রঘুনাথের বিশিষ্ট দূত প্রাকৃত অগ্নিদ্বারা কি প্রকারে সন্তপ্ত হইতে পারে?

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
সুন্দর কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

হনুমানের সীতার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ এবং শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার সংবাদ জ্ঞাপন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

তদনন্তর সীতার সমীপে গমন করতঃ হনুমান তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"দেবি! আপনি আমাকে আজ্ঞাপ্রদান করুন, আমি এখন শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে গমন করিব। তিনি শীঘ্রই ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ আপনাকে দর্শন করিতে আগমন করিবেন।" এইরূপ বলিয়া পবনকুমার হনুমান জানকীকে তিনবার পরিক্রমা করতঃ প্রণাম করিল এবং গমনোদ্যত হইয়া বলিল—"দেবি! আমি যাইতেছি। আপনার কল্যাণ হইক, শীঘ্রই আপনি সুগ্রীব ও কোটি কোটি বানরসেনা সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবেন।" তখন পরম দুঃখে অবসন্না সীতা হনুমানকে বলিলেন—"তোমাকে দেখিয়া আমি আপন দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন তুমি চলিয়া যাইবে, অতঃপর আমি শ্রীরামের বার্তা শ্রবণ বিনা কি প্রকারে প্রাণধারণ করিব।" ॥১-৫॥

হনুমান বলিল—"হে দেবি! যদি তাহাই হয় এবং আপনি যদি স্বীকৃতা হন তবে হে জানকী! আপনি আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন, আমি ক্ষণকাল মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের সহিত আপনার মিলন করাইয়া দিব।" ॥৬॥

সীতা বলিলেন—"যদি রামচন্দ্রজী সমুদ্রকে শোষণ করতঃ অথবা শরসমূহদ্বারা তাহাকে বন্ধন করতঃ বানরবৃন্দসহ এস্থানে আগমন করেন এবং যুদ্ধে রাবণকে বধ করতঃ আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার উহাতে অমর কীর্তিলাভ হইবে। অতএব তুমি যাও। আমি যে প্রকারেই হউক প্রাণ ধারণ করিব।" ॥৭-৮॥

সীতার নিকট হইতে এইরূপে বিদায় লইয়া বীর হনুমান তাঁহাকে প্রণাম করতঃ মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশে পর্বত শিখরোপরি আরোহণ করিল। ॥৯॥

সে স্থানে পৌঁছিয়া মহাবীর হনুমান পদদ্বয়ের চাপভরে পর্বতকে প্রপীড়িত করিয়া উল্লম্ফনে বায়ুবেগে চলিলেন এবং তাহার পদচাপে ত্রিশ যোজন উচ্চ পর্বত পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং সেইস্থান সমতল হইয়া গেল। আকাশমার্গে গমনকালে হনুমান ঘোর সিংহনাদ করিল। ॥১০-১১॥

উহা শুনিতে পাইয়া বানরগণ বুঝিতে পারিল যে হনুমান প্রত্যাগমন করিতেছে। তখন অতি আনন্দের সহিত তাহারাও ঘোর শব্দ করিতে লাগিল। ॥১২॥

(তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল)—"এই সিংহনাদ শুনিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে হনুমান কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। হে বানরগণ! ঐ দেখ, দেখ, হনুমানই আসিতেছে।" ॥১৩॥

বানরগণ এইপ্রকার বলিতে বলিতেই হনুমান গিরিশিখরে অবতীর্ণ হইল এবং তাহাদিগকে এইপ্রকার বলিল— ॥১৪॥

"আমি সীতাকে দর্শন করিয়াছি, অশোকবন সহিত লঙ্কা বিধ্বস্ত করিয়াছি, এবং দশগ্রীব রাবণের সহিত আমার সম্ভাষণও (বাগ্‌-বিতণ্ডাও) হইয়াছে। তৎপশ্চাৎ আমি পুনরাগমন করিয়াছি। ॥১৫॥

এখন আমরা এইক্ষণেই রাম ও সুগ্রীবের নিকট গমন করিব।" হনুমানের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করতঃ বানরগণ আনন্দাপ্লুত হইয়া কেহ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, কেহ বা তাহার পুচ্ছ চুম্বন করিল, কেহ বা অতি উৎসাহে নাচিতে লাগিল। তদনন্তর হনুমানজীসহ সকলে প্রস্রবণ (প্রবর্ষণ?) পর্বতে গমন করিল। ॥১৬-১৭॥

বীর বানরগণ প্রত্যাবর্তন সময়ে (কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর সমীপ স্থলে) সুগ্রীব দ্বারা সুরক্ষিত 'মধুবন' দেখিতে পাইল। উহা দেখিয়া তাহারা অঙ্গদকে বলিল— ॥১৮॥

"হে বীব! আমরা সকলে বড় ক্ষুধার্ত। অতএব হে মহামতে! আপনি অনুমোদন করুন, আজ আমরা এই বনের ফল ভোজন করতঃ এবং এইস্থানে সযত্নে সঞ্চিত অমৃততুল্য মধুপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইব এবং তৎপর লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরঘুনাথকে আজই দর্শন করিতে যাইব।" ॥১৯-২০॥

তখন অঙ্গদ বলিল—"হনুমান কার্য সিদ্ধি করিয়াছে। অতএব হে বানর শ্রেষ্ঠগণ! আজ ইহারই কৃপায় তোমরা শীঘ্র যথেষ্ট ফলমূল ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া লও।" ॥২১॥

অতঃপর অঙ্গদের আজ্ঞা পাইয়া সেই বানরগণ বনে প্রবেশ করতঃ দধিমুখ (বনপতি সুগ্রীবের প্রধান বনরক্ষক মাতুল) প্রেরিত বনরক্ষকগণকে উপেক্ষা করতঃ যথেচ্ছ মধুপান করিতে আরম্ভ করিল। ॥২২॥

বনরক্ষক বানরগণ মধুপানরত বানরগণকে সবলে বাধা দিতে আসিলে তখন তাহারাও বাধাপ্রদানকারী সেই রক্ষক বানরগণকে পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাতে হতবল করতঃ মধুপান করিতে থাকিল। ॥২৩॥

তখন সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বনরক্ষিগণসহ বানররাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করিল। ॥২৪॥

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা সুগ্রীবকে বলিল—"হে রাজন! আজ দীর্ঘকাল সুরক্ষিত আপনার মধুবন যুবরাজ অঙ্গদ ও হনুমান কর্তৃক নষ্টভ্রষ্ট হইল।" ॥২৫॥

দধিমুখের এই কথা শুনিয়া অতীব হর্ষ সহকারে সুগ্রীব বলিলেন—"পবনকুমার হনুমান নিশ্চয়ই সীতাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। নতুবা আমার সুরক্ষিত মধুবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কে সমর্থ? আর ইহাও নিঃসন্দেহ যে বায়ুপুত্র হনুমানই এই কার্য করিয়াছে।" ॥২৬-২৭॥

সুগ্রীবের বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজন্! সীতার বিষয়ে আপনি কি বলিতেছেন?" ॥২৮॥

সুগ্রীব বলিলেন—"ভগবন্! মনে হইতেছে যে ভূমিসুতা জানকীর সন্ধান মিলিয়াছে। কারণ সংবাদ পাইলাম যে হনুমান আদি সর্ব বানরগণ আমার রাজকীয় সুরক্ষিত মধুবনে প্রবেশ করতঃ যথেচ্ছ ফলভক্ষণ ও মধুপান করিতেছে এবং রক্ষিগণকে প্রহারাদি করিতেছে। হে দেব! আপনার কার্য সিদ্ধ না করিয়া কেহ আমার মধুবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহস করিত না। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে সীতার সন্ধান মিলিয়াছে। হে রক্ষকগণ! তোমরা ভয় পাইও না। তোমরা প্রত্যাবর্তন করতঃ সকলকে আমার আজ্ঞা শুনাও এবং অঙ্গদাদি সর্ব বানরগণকে আমার নিকট আনয়ন কর।" সুগ্রীবের আজ্ঞা শুনিয়া তাহারা বায়ুবেগে ধাবিত হইল এবং হনুমানাদি সকলকে বলিল—"মহারাজের আদেশ, আপনারা অতি শীঘ্র চলুন। কারণ রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মহারাজ সুগ্রীব আপনাদের দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাদের প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া অতি শীঘ্র যাইতে আদেশ করিয়াছেন।" তখন সেই আদেশ অনুসারে সকলে আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল। বানরগণ হনুমান ও যুবরাজ অঙ্গদকে পুরোভাগে রাখিয়া শীঘ্রই সুগ্রীব ও রামের সম্মুখে ভূমিতে অবতরণ করিল। ॥২৯-৩৫॥

হনুমান প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রকে ও তৎপর বানররাজ সুগ্রীবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বলিল—"আমি সীতাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। তিনি কুশলেই আছেন। ॥৩৬॥

হে রাজেন্দ্র! শোকাতুরা জানকী আপনাকে তাঁহার কুশল সমাচার জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি অশোকবাটিকা মধ্যে রাক্ষসীবৃন্দ পরিবৃতা হইয়া শিংশপা তরুতলে উপবিষ্টা ছিলেন। হে প্রভো! অন্নজল পরিত্যাগ হেতু তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও কৃশা হইয়া পড়িয়াছেন এবং সর্বদা 'হা রাম! হা রাম!' বলিয়া শোক করিয়া থাকেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন হইয়া গিয়াছে এবং মস্তকস্থ কেশরাজি অযত্নে একটি বেণীর আকার ধারণ করিয়াছে, এইরূপ দেখিলাম। আমি ধীরে ধীরে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিবার চেষ্টা করিলাম, আমি সে স্থানে গমন করতঃ প্রথমতঃ একটি সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়া বৃক্ষপত্রান্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া আপনার সব চরিত্র কথা তাঁহাকে শুনাইলাম—জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আপনার দণ্ডকারণ্যে আগমন, আপনার অনুপস্থিতি কালে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সুগ্রীব সহ মিত্রতা এবং বালীবধ ইত্যাদি কথনানন্তর

ইহাও বলিলাম যে সীতার অনুসন্ধানে সুগ্রীব কর্তৃক মহাবলী পরাক্রমী ও বিজয়শালী বানরগণ সর্বদিকে প্রেরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সুগ্রীবের মন্ত্রী ও শ্রীরামচন্দ্রের দাস একটি বানর আমি এখানে আসিয়াছি। মহাভাগ্যবশে আজ আমি জানকীর দর্শন লাভ করিলাম। ইহাতে আমার সর্বপ্রয়াস সফল হইল। ॥৩৭-৪৩॥

"আমার এইপ্রকার বচন শুনিয়া বিস্ফারিত নেত্রে সীতা বলিতে লাগিলেন—"আমার কর্ণে অমৃততুল্য এই শুভ সংবাদ কে শুনাইল? যদি ইহা (আমার ভ্রম না হইয়া) সত্য হয়, তবে সংবাদদাতা ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হউক।' হে প্রভো! আমি সূক্ষ্ম বানররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করতঃ করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলাম। তখন জানকী আমাকে 'তুমি কে' ইত্যাদি বহু কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ॥৪৪-৪৬॥

হে শত্রুদমন! তখন আমি ক্রমশঃ সব কথা তাঁহাকে বলিলাম এবং তৎপর আমি তাঁহাকে আপনার প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক অর্পণ করিলাম। ॥৪৭॥

ইহাতে আমার উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হইল এবং তিনি আমাকে এইপ্রকার বলিলেন—'হনুমন্! এই রাক্ষসীগণ আমাকে দিবানিশি কি প্রকার পীড়ন করিতেছে এবং তাহাদের ত্রাসে আমি কিরূপ দুঃখানুভব করিতেছি তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে। উহা তুমি যথাযথ রূপে রঘুনাথকে বলিও।' তখন আমি বলিলাম—'দেবি! শ্রীরামচন্দ্রও আপনার চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন এবং আপনার কোন সমাচার না পাইয়া দিবারাত্র অনুশোচনা করিয়া থাকেন। আমি এখনই যাইয়া আপনার স্থিতি বিষয়ক সর্ব সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিব। ॥৪৮-৫০॥

শ্রীরঘুনাথ উহা শ্রবণমাত্র সুগ্রীব লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরসেনাপতিসহ আপনার নিকট আগমন করিবেন। ॥৫১॥

তৎপর রাবণকে সবংশে নিধন করতঃ আপনাকে স্বীয় রাজধানী অযোধ্যানগরীতে লইয়া যাইবেন। হে দেবি! আপনি আমাকে এমন কোন একটি স্মারকচিহ্ন প্রদান করুণ, যাহা দেখিলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কারবেন। ॥৫২॥

আমি এইপ্রকার বলিবার পর তিনি স্বকীয় কেশপাশে সযত্নে রক্ষিত আপন চূড়ামণিটি আমাকে দিলেন এবং পূর্বে চিত্রকূট পর্বতে (ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তরূপ) কাকসহ যে বৃত্তান্ত হইয়াছিল তাহা আমাকে শুনাইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বলিলেন—"শ্রীরঘুনাথকে আমার কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিও এবং লক্ষ্মণকে বলিও যে 'হে কুলনন্দন! আমি পূর্বে তোমাকে যাহা কিছু কঠোর দুর্ভাষণ করিয়াছি, উহা আমি অজ্ঞানবশে করিয়াছি, সেই সমস্ত দুর্বচনের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। ইহা ব্যতীত রঘুনাথজী যাহাতে আমাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করেন বিশেষ করিয়া তুমি সেই প্রচেষ্টা করিও।" ॥৫৩-৫৫॥

এই প্রকার বলিয়া মহা দুঃখে সীতা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন আমিও আপনার সর্ববৃত্তান্ত শুনাইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলাম ও অতঃপর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপনার নিকট চলিয়া আসিলাম। আসিবার কালে আমি রাবণের প্রিয় অশোকবাটিকা ধ্বংস করিয়াছি এবং ক্ষণকালমধ্যে বহু রাক্ষসকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি। রাবণের

পুত্রকেও (অক্ষকে) হত্যা করিয়াছি এবং রাবণের সহিত অভিভাষণ (বার্তালাপ) করিয়া লঙ্কানগরী নিঃশেষে অগ্নিদগ্ধ করতঃ অচিরেই আপনার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি।" হনুমানের এই বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতি প্রসন্নচিত্তে বলিলেন— ॥৫৬-৫৯॥

"হে হনুমন্! দেবগণেরও অতি দুষ্কর কর্ম তুমি করিয়াছ, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ তোমাকে আমি কি দিব তাহা আমি জানি না। ॥৬০॥

এক্ষণে হে মারুতি! আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব অর্পণ করিতেছি"। এই বলিয়া ভক্তপ্রিয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে সম্যক্ আকর্ষণ পূর্বক গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। ॥৬১॥

রঘুনাথের নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ এবং তাহার হৃদয় প্রেমে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তখন ভক্তবৎসল রঘুনাথ হনুমানকে বলিলেন— ॥৬২॥

"পরমাত্মারূপ আমার আলিঙ্গন এ সংসারে অতি দুর্লভ। অতএব হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া আমার পরমপ্রিয় ভক্ত হইলে।" ॥৬৩॥

হে পার্বতি! যাঁহার চরণকমলযুগল তুলসিদল সহায়ে পূজন করতঃ ভক্তগণ অতুলনীয় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন স্বয়ং সেই রামচন্দ্র যাহার শরীর দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়াছেন সেই পবিত্রকর্মা পবননন্দন হনুমানের ভাগ্যবিষয়ে অধিক বর্ণন করা বাহুল্য। ॥৬৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ
সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত

যুদ্ধ কাণ্ড

যুদ্ধ কাণ্ড

প্রথম সর্গ

বানরসেনাগণের প্রস্থান

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

হনুমানের কথিত বিবরণ যথাযথ শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতি হর্ষান্বিত হইয়া বলিলেন— ॥১॥

"হনুমান যে কার্য করিয়াছে উহা দেবগণেরও অতি দুষ্কর। ভূতলোপরি অপর কেহ ইহা মনেও কল্পনা করিতে পারে না। ॥২॥

এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এবং রাক্ষসগণ কর্তৃক সুরক্ষিত লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিতে সমর্থ? ॥৩॥

হনুমান সুগ্রীবের সেবকধর্ম অশেষরূপে সম্পাদন করিয়াছে। জগতে এইরূপ আর কখনও কেহ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। ॥৪॥

হনুমান জানকীকে দর্শন করিয়া আসিয়াছে। ইহার দ্বারা সে আমাকে, রঘুবংশকে, লক্ষ্মণকে, নবজীবন দান করিয়াছে। ॥৫॥

জানকীকে অনুসন্ধান করার কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের কথা মনে হইলেই আমার মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়ে। ॥৬॥

শতযোজন বিস্তৃত কুম্ভীর ও ঝষ (বৃহৎ মৎস্য) সমাকীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করতঃ আমি কিরূপেই বা শত্রুকে বধ করিব? এবং কিরূপেই বা জানকীকে দর্শন করিব?" ॥৭॥

শ্রীরঘুনাথের এই বচন শুনিয়া সুগ্রীব তাঁহাকে বলিলেন—"আমরা বৃহদাকার কুম্ভীর ও মৎস্যাদিপূর্ণ সমুদ্র অদ্যই লঙ্ঘন করিব এবং শীঘ্রই লঙ্কা বিধ্বংস করিব এবং রাবণকে বধ করিব। হে রঘুনাথ! আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, চিন্তা কার্যের নাশক (কার্যারম্ভের পূর্বে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা উক্ত কার্য সুসম্পাদনের বিঘাতক)। ॥৮-৯॥

আপনি এই মহাপরাক্রমী শূরবীর বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইহারা সকলে আপনার প্রীতির জন্য অগ্নিপ্রবেশ করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। ॥১০॥

প্রথমতঃ সমুদ্রোত্তরণ বিষয়ে মন্ত্রণা করুন। তৎপর লঙ্কা দর্শন মাত্রই আমরা 'দশানন নিহত' এইরূপ বিবেচনা করিব। ॥১১॥

হে রাঘব! আপনি যুদ্ধে ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইলে আপনার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে ত্রিভুবনেও এরূপ কোন বীর আমি দেখিতে পাই নাই। ॥১২॥

হে রাম! আমাদের নিশ্চয়ই সর্বপ্রকারে জয় হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ আমি সুলক্ষণ সমূহ দেখিতে পাইতেছি।" ॥১৩॥

সুগ্রীবের ভক্তি ও বীর্য সমন্বিত বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহা স্বীকার করিলেন এবং সম্মুখে দণ্ডায়মান হনুমানকে বলিলেন— ৷৷১৪৷৷

"সমুদ্র উত্তীর্ণ আমরা যে কোন প্রকারে হইব নিশ্চয়, কিন্তু হে হনুমান! তুমি লঙ্কার স্বরূপ কিপ্রকার দেখিয়াছ তাহা বর্ণন কর। শুনিয়াছি লঙ্কা জয় করা দেবদানবগণেরও দুঃসাধ্য। ৷৷১৫৷৷

হে কপিশ্রেষ্ঠ! লঙ্কার স্বরূপ বিদিত হইবার পর তাহার প্রতিকার বিষয়ে মন্ত্রণা করিব।" শ্রীরামচন্দ্রের বচন শুনিয়া হনুমান সবিনয়ে করজোড়ে বলিল—"হে দেব! আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি। দিব্যপুরী লঙ্কা ত্রিকূটপর্বতের শিখরের উপর অবস্থিত। ৷৷১৬-১৭৷৷

পুরীর চতুর্দিকে সুবর্ণ নির্মিত প্রাকার (প্রাচীর) ও পুরী মধ্যে সুবর্ণ নির্মিত অট্টালিকা বিদ্যমান। নগরের চতুর্দিকে নির্মল জলপূর্ণ খাত (পরিখা) রহিয়াছে। বিভিন্ন স্থলে বহু উপবনের শোভা-সম্পন্ন সুন্দর জলাশয় এবং মণি স্তম্ভযুক্ত বিচিত্র ভবন সমূহ বিদ্যমান। ৷৷১৯৷৷

নগরের পশ্চিম দ্বারে সহস্র সহস্র গজারোহী, উত্তর দ্বারে পদাতিক সেনাসহ বহু অশ্বারোহী, পূর্ব দ্বারে দশকোটি রাক্ষসবীর এবং দক্ষিণ দ্বারেও ঐরূপ সংখ্যক রক্ষক রহিয়াছে। ৷৷২০-২১৷৷

হে প্রভু! নগরের মধ্যভাগে অসংখ্য হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য নগরকে রক্ষা করিতেছে। তাহারা সকলে নানাপ্রকার অস্ত্র চালনে সুদক্ষ। ৷৷২২৷৷

মার্গমধ্যে নানাপ্রকাব সুরঙ্গ এবং শতঘ্নি (শতপুরুষঘাতক চতুঃশত লৌহকণ্টক ব্যাপ্ত অস্ত্রবিশেষ) সুরক্ষিত রহিয়াছে, কিন্তু হে দেবেশ্বর! এত সব থাকা সত্ত্বেও আমি সেখানে যাহা করিয়া আসিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন— ৷৷২৩৷৷

আমি রাবণের একচতুর্থাংশ সেনা বধ করিয়াছি এবং লঙ্কাপুরী অগ্নিদগ্ধ করিয়া তত্রস্থ সুবর্ণপ্রাসাদ নষ্ট করিয়াছি। ৷৷২৪৷৷

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! বহু সুরঙ্গ এবং শতঘ্নি অস্ত্র আমি ধ্বংস করিয়াছি। হে দেব! আপনার দৃষ্টি-মাত্র দ্বারাই লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ৷৷২৫৷৷

হে দেবেশ্বর! এখন লঙ্কাভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করুন। আমরা সর্বদিক হইতে মহাবলবান্ বানরবীরবাহিনী লইয়া এখন সমুদ্রতটের দিকে অগ্রসর হইব।" ৷৷২৬৷৷

হনুমানের বচন শুনিয়া শ্রীরঘুনাথজী বলিলেন—"সুগ্রীব! সব সৈন্যগণকে এখনই যাত্রা (কূচ) করিবার আদেশ দাও, কারণ বিজয় নামক মুহূর্ত এইক্ষণে অতীত হইতেছে। এই মুহূর্তেই যাত্রা করিয়া রাক্ষস পরিপূর্ণ, প্রাকারাদির দ্বারা দুর্জয়, লঙ্কাপুরী ধ্বংস এবং রাবণকে বধ করিব এবং সীতাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিব। এই সময় দেখ আমার দক্ষিণ নেত্রের অধোভাগও কম্পিত হইতেছে। ৷৷২৭-২৯৷৷

বলবান বানরগণের সম্পূর্ণ সেনা এখনই চলুক। যূথপতিগণ আপন আপন সেনার অগ্র, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বভাগ রক্ষা করিয়া চলুক। ৷৷৩০৷৷

আমি হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সর্বাগ্রে চলিতেছি। তৎপর লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলুক। আর হে সুগ্রীব! তুমি আমার সহিত চল। ৷৷৩১৷৷

গয়, গবাক্ষ, গবয়, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নল, নীল, সুষেণ এবং জাম্ববান ও শত্রুনাশক অন্য সর্ব সেনাপতিগণ সেনার চতুর্দিকে চলুক।" বানরগণকে এই প্রকার আজ্ঞাপ্রদান করতঃ লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামচন্দ্র (যুদ্ধার্থ) যাত্রা করিলেন। ॥৩২-৩৩॥

সুগ্রীব সহিত ভগবান রামচন্দ্র অতি হর্ষান্বিত হইয়া বানরগণের মধ্যভাগে বিরাজমান ছিলেন। গজরাজের ন্যায় সৌষ্ঠবশালী এবং ইচ্ছানুসারে রূপধারণসমর্থ বানরগণ কখনও অতিবেগে ধাবন, উল্লম্ফন, কখনও বা গর্জন, কখনও বা মার্গমধ্যে বৃক্ষস্থ ফল ভক্ষণ ও মধুপান করিতে করিতে দক্ষিণদিশাভিমুখে চলিতেছিল— ॥৩৪-৩৫॥

এবং অতুলপরাক্রমী বানরশ্রেষ্ঠগণ 'আমরা আজই রাবণকে মারিয়া ফেলিব' পথে যাইতে যাইতে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে এই প্রকার বলিয়া আপনাদের বীর্য প্রকাশ করিতেছিল। ॥৩৬॥

গমনকালে হনুমান ও অঙ্গদের স্কন্ধোপবিষ্ট রঘুশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ যেন নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণসেবিত সূর্য ও চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ॥৩৭॥

সেই বিপুল বানরবাহিনী যেন সমগ্র পৃথিবীকে আবরণ করতঃ চলিতেছিল। বানরগণ পুচ্ছাঘাতে ভূমির উপর নানা প্রকার শব্দ ও পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করিতে করিতে এবং উল্লম্ফন সহায়ে পর্বত আরোহণ করতঃ বায়ুবেগে ধাবিত হইতেছিল। সেই সময় সর্বভূমি কেবল অসংখ্য বানর পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। ॥৩৮-৩৯॥

ভগবান রামচন্দ্র দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বানরগণ অতি প্রসন্নতার সহিত দিবারাত্রি অতি বেগের সহিত ধাবিত হইতেছিল এবং কোথায়ও ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করে নাই। ॥৪০॥

অবশেষে তাহারা সকলে মলয়াচল ও সহ্যাদ্রির মনোহর বন দর্শন করিতে করিতে উভয় পর্বত অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর গর্জনকারী সমুদ্রতটে পৌঁছিল। তখন শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের স্কন্ধ হইতে অবতরণ করতঃ সুগ্রীবসহ জলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন— "হে বানরগণ! আমরা মকরাদি পরিপূর্ণ সমুদ্রতটে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু কোন বিশেষ উপায় বিনা আর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতেছি না। অতএব এইস্থানেই সেনানিবাস (ছাউনি) স্থাপিত হউক। অতঃপর আমরা সমুদ্র উল্লঙ্ঘন বিষয়ে মন্ত্রণা করিব।" ॥৪১-৪৪॥

রামের বচন শুনিয়া সুগ্রীব শীঘ্রই সমুদ্রের নিকট সৈন্যগণের শিবির স্থাপন করিলেন ও প্রধান বানরবীরগণকে তাহার রক্ষণার্থ নিয়োগ করিলেন। ॥৪৫॥

সকলেই উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ, বিশালকায় ভয়ঙ্কর কুম্ভীরাদির আলয়, ভীষণ সমুদ্র দর্শন করিয়া মনে মনে বিষাদগ্রস্ত হইল। ॥৪৬॥

সেই আকাশের ন্যায় বিশাল অগাধ সমুদ্র দর্শন করিয়া সকলেই দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে "আমরা এই ঘোর সাগর কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইব। ॥৪৭॥

রাক্ষসাধম রাবণকে আমাদের আজই বধ করা কর্তব্য"। এইপ্রকার চিন্তাকুল হইয়া সকলে রামের সমীপে উপবেশন করিল। ॥৪৮॥

এদিকে তখন শ্রীরামচন্দ্রও সীতাকে স্মরণ করিয়া মহাদুঃখে কাতর হইয়া পড়িলেন। যদিও তিনি এক, অদ্বিতীয়, চিন্মাত্র, সনাতন পরমাত্মস্বরূপ, তথাপি কার্যবশে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া

জানকীর জন্য নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি **পরমাত্মা রামচন্দ্রের** যথার্থ স্বরূপ অবগত তাহাকে দুঃখাদি কখনও স্পর্শ করিতে পারে না , আনন্দস্বরূপ, অবিনাশী ভগবান রামচন্দ্রের যে কোন দুঃখাদি হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। দুঃখ, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ আদি এ সকল অজ্ঞানের চিহ্ন। চিদাত্মা রামচন্দ্রের উহা কি প্রকারে হইতে পারে? দেহাভিমানী ব্যক্তিগণেরই দেহের দুঃখ হইয়া থাকে। চৈতন্য স্বরূপ আত্মার কখনও দুঃখ হয় না। ॥৪৯-৫২॥

সমাধি অবস্থায় দ্বৈত প্রপঞ্চ (এবং অজ্ঞানেরও) অভাব হয় বলিয়া সেই অবস্থায় কেবল সুখ মাত্রই সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বুদ্ধি আদির অভাব হওয়াতে শুদ্ধ আত্মাতে লেশমাত্র দুঃখও অনুভব হয় না। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে দুঃখাদি সব কিছু বুদ্ধিরই ধর্ম, আত্মার নহে। ॥৫৩॥

ভগবান রামচন্দ্র পরমাত্মা, পুরাণপুরুষ, নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ, নিত্য সুখ-স্বরূপ, নিশ্চেষ্ট (নিস্পৃহ) ; তথাপি মায়িক (কাল্পিত) গুণ সম্বন্ধ বশতঃ তিনি সুখী ও দুঃখী এইরূপে অজ্ঞানী পুরুষগণের নিকট প্রতীত হইয়া থাকেন। ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধ কাণ্ডে প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

রাবণদ্বারা বিভীষণকে তিরস্কার

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

লঙ্কাতে দেবগণেরও দুষ্কর কর্ম হনুমান যাহা করিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া রাবণ তাহার সকল মন্ত্রিগণকে আহ্বান করতঃ লজ্জাবনতমুখে বলিল—'হনুমান যাহা কিছু কর্ম এখানে করিয়াছে, তাহা তোমরা সকলে সবকিছু দেখিয়াছ। ॥১-২॥

দুষ্প্রবেশ্য লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করতঃ দুষ্প্রাপ্য সীতার সন্ধান লইয়াছে, বহু রাক্ষসবীরগণসহ মন্দোদরীপুত্র অক্ষকে বধ করিয়া সম্পূর্ণ লঙ্কানগরী অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছে. তৎপর তোমাদের সকলকে তিরস্কার করতঃ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সুস্থ শরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ॥৩-৪॥

তোমরা সকলেই নীতিনিপুণ, এখন আমার হিতসাধনের জন্য কি করা কর্তব্য এ বিষয়ে সকলে সযত্নে মন্ত্রণা করিয়া স্থির কর।" ॥৫॥

রাবণের বচন শুনিয়া রাক্ষসগণ তাহাকে বলিল—"হে দেব! যুদ্ধে সর্বলোকবিজয়ী আপনি, রাম হইতে আপনার কিসের ভয়? ॥৬॥

ইন্দ্রকে আপনার পুত্র বন্ধন করতঃ রাজধানী লঙ্কাপুরীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং আপনি স্বয়ং কুবেরকে পরাভূত করিয়া তাহার পুষ্পকরথ আনয়ন করিয়াছেন এবং তাহা ভোগ করিতেছেন। ॥৭॥

হে প্রভো! আপনি যমরাজকেও জয় করিয়াছেন, সুতরাং কালদণ্ডের ভয়ও আপনার নাই এবং বরুণ ও সমস্ত রাক্ষসগণকে হুঙ্কার দ্বারাই জয় করিয়াছেন। ॥৮॥

অন্য মহাবীরগণের কথা আর কি বলিব, স্বয়ং মহাসুর 'ময়'ও আপনার ভয়ে স্বীয় কন্যা আপনাকে প্রদান করতঃ অদ্যাবধি আপনার অধীনে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ॥৯॥

হনুমান আমাদের যাহা কিছু ধ্বংস করিয়াছে তাহা আমাদের তাহাকে উপেক্ষাবশতঃই হইয়াছে। আমরা ভাবিয়াছি—এ একটি বানর, ইহাকে আপন শৌর্য বীর্য দেখাইয়া কি লাভ; এইরূপ মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। নতুবা সে আমাদের কি করিতে পারে? ॥১০॥

অতএব আমাদের অসাবধানতাবশতঃই আমরা হনুমান কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছি, ইহাতে কি হইয়াছে? আমরা সকলে যদি তাহাকে জানিতাম, তবে কি আর সে জীবন্ত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিত? আপনি আদেশ করুন, আমরা সকলে এইক্ষণেই যাইয়া পৃথিবী বানর ও মনুষ্যবিহীন করিয়া আসিব। অথবা আমাদের মধ্যে কোন একজনকেই এই কর্মে নিযুক্ত করুন।" অতঃপর কুম্ভকর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল— ॥১১-১৩॥

"আপনি যে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা স্বকীয় বিনাশের জন্যই করিয়াছেন। ইহা আপনার মহাসৌভাগ্য যে সীতাকে অপহরণকালে মহাত্মা রামচন্দ্র আপনাকে দেখিতে পান নাই। ॥১৪॥

হে রাবণ! যদি সেই সময়ে রাম আপনাকে দেখিতে পাইতেন, তবে আপনি আর জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতেন না। রাম কোন সাধারণ মনুষ্যমাত্র নহেন, তিনি সাক্ষাৎ অবিনাশী শ্রীনারায়ণ। ॥১৫॥

ভগবান রামের পত্নী যশস্বিনী সীতা সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী। সুমধ্যমা সেই সীতাকে আপনি রাক্ষসগণের বিনাশের জন্যই অপহরণ করিয়াছেন। ॥১৬॥

মহামৎস্য যে প্রকার সুস্বাদু খাদ্য মনে করিয়া বিষপিণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ (আপন নাশের নিমিত্ত) জানকীকে আনয়ন করিয়াছেন, জানি না পরে কি হইবে? ॥১৭॥

যদিও আপনি অজ্ঞানবশতঃ অনুচিত কর্ম করিয়াছেন, তথাপি আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সব ঠিক করিয়া দিব।" ॥১৮॥

কুম্ভকর্ণের এই বচন শুনিয়া ইন্দ্রজিত বলিল—"প্রভো! আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি এইক্ষণেই লক্ষ্মণ সহিত রাম, সুগ্রীব এবং সমস্ত বানরগণকে বধ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিব।" ॥১৯॥

এই সময় সেখানে পরম ভাগবৎ এবং বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণ আসিলেন। তাহার একাগ্র অন্তঃকরণবৃত্তি ভগবান রামচন্দ্রের চরণযুগলে সংলগ্ন হইয়াই ছিল। তিনি সেইস্থানে আসিয়া দেবশত্রু রাবণকে প্রণাম করতঃ তাহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ॥২০॥

আসনে উপবেশন করিয়া তিনি কুম্ভকর্ণ আদি মদোন্মত্ত রাক্ষসগণের প্রতি অতি বিস্মিতচিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং ইহাও দেখিলেন যে রাবণ কামাতুর। তথাপি কর্তব্যকর্মে সদা সাবধান এবং শুদ্ধবুদ্ধিমান বিভীষণ রাবণকে বলিলেন— ॥২১॥

"হে রাজন্! যুদ্ধকালে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ এবং অতিকায় আদি কেহই দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে না। ॥২২॥

হে রাজন্! সীতা নামক প্রবল গ্রহ (গ্রাহ?) আপনাকে গ্রাস করিয়াছে, (উপস্থিত সকলে আপনাকে যে পরামর্শ দিয়াছে তাহার দ্বারা) কোন প্রকারে আপনার মুক্তি হইবে না। আপনি এখন সীতাকে সাদরে সৎকার পূর্বক ও বহুধন উপঢৌকনসহ শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করুন এবং সুখী হউন। ॥২৩॥

যে পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ লঙ্কাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রাক্ষসগণের শিরচ্ছেদ না করে তাবৎকাল পর্যন্ত শ্রীরঘুনাথের হস্তে জানকীকে সমর্পণ করাই আপনার কর্তব্য। ॥২৪॥

যে পর্যন্ত নখদংষ্ট্রযোধী, সিংহতুল্য বলবান, পর্বতাকার বানরগণ লঙ্কানগরী আক্রমণ করিয়া উহা নষ্টভ্রষ্ট না করিয়া ফেলে তৎপূর্বেই আপনি অতি শীঘ্র সীতাকে শ্রীরঘুনাথের হস্তে সমর্পণ করুন। ॥২৫॥

তাহা না হইলে ইন্দ্র ও শিব আপনার রক্ষক হইলেও অথবা দেবরাজ ইন্দ্র ও মৃত্যু স্বীয় অঙ্কে লইয়া আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেও অথবা আপনি পাতাললোকে প্রবিষ্ট হইলেও শ্রীরামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না।" ॥২৬॥

মুমূর্ষু পুরুষ যে প্রকার ঔষধসেবন প্রত্যাখ্যান করে, বিভীষণের এই শুভ, হিতকর এবং পবিত্র বচনসমূহও দুষ্ট রাবণ সেই প্রকার গ্রহণ করিল না। ॥২৭॥

কিন্তু কালের প্রেরণায় সেই দুষ্ট দৈত্য রাবণ বিভীষণকে এইপ্রকার বলিতে লাগিল— "সকলে দেখ, এই বিভীষণ আমার প্রদত্ত ভোগে পুষ্ট হইয়া এবং আমার সমীপে বাস করিয়াও হিতকারী আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে মিত্ররূপে এই বিভীষণ আমার শত্রুই উৎপন্ন হইয়াছে। ॥২৮-২৯॥

এই অনার্য, কৃতঘ্ন ব্যক্তির আমার সহিত বাস করা সঙ্গত নহে। কারণ প্রায়ই ইহা দেখা যায় যে জ্ঞাতিগণ সদা আপন জ্ঞাতিগণের বিনাশের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ॥৩০॥

যদি অন্য কোন রাক্ষস এইরূপ একটি বাক্যও আমাকে বলিত তাহা হইলে সেই ক্ষণেই আমি তাহাকে বধ করিতাম। তুই রাক্ষসকুলের অধম! তোকে ধিক্কার!" ॥৩১॥

রাবণের এই প্রকার কঠোর বচন শুনিয়া মহাবলী বিভীষণ সভামধ্য হইতে গদাহস্তে ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডীন হইলেন। ॥৩২॥

তিনি স্বীয় মন্ত্রী চতুষ্টয়সহ আকাশে স্থিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে দশগ্রীব রাবণকে বলিলেন—"আমি আপনাকে হিত বচনই বলিয়াছি, কিন্তু আপনি তথাপি আমাকে ধিক্কার দিতেছেন। আমি ইহাই চাই যে আপনার বিনাশ না হউক, কারণ আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব পিতৃতুল্য। মহারাজ দশরথের গৃহে রামচন্দ্ররূপে আপনার কাল প্রকট হইয়াছেন। ॥৩৩-৩৪॥

আর মহাশক্তি কালী সীতা নামে জনকের কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই উভয়েই পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। ॥৩৫॥

তাঁহারই প্রেরণাবশতঃ আপনি আমার হিতবচন শুনিতেছেন না। ভগবান রাম সর্বদা সাক্ষাৎ প্রকৃতিরও অতীত। ॥৩৬॥

তিনি সর্বত্র প্রাণিগণের বাহির ও অন্তরে সমভাবে বিদ্যমান। এবং নিত্য নির্মল স্বভাব হইয়াও নাম রূপাদিভেদে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন। ॥৩৭॥

অজ্ঞানী পুরুষের দৃষ্টিতে যে প্রকার একই মহান অগ্নি নানাপ্রকার বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া বৃক্ষসমূহের আকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয় অথবা শুদ্ধ নির্মল স্ফটিক মণি যেরূপ নীল পীতাদি বর্ণ-মাত্রের সান্নিধ্য বশতঃই নীল পীতাদি বর্ণবিশিষ্ট রূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ পঞ্চকোশাদি ভেদবশতঃ আত্মাও তত্তৎ রূপে প্রতীত হন।

—(শ্রী ভগবান) নিত্যমুক্ত হইয়াও তিনি স্বীয় মায়া গুণ সমূহে প্রতিবিম্বিত হইয়া কাল, প্রধান, পুরুষ ও অব্যক্ত এই চতুর্বিধ নামধারী হইয়া থাকেন। ॥৪০॥

স্বয়ং জন্মরহিত হইয়া প্রধান ও পুরুষরূপে তিনি সম্পূর্ণ জগৎ রচনা করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং অবিনাশী হইয়াও কালরূপে জগতের বিনাশ করিয়া থাকেন। ॥৪১॥

সেই কালরূপী ভগবান ব্রহ্মার প্রার্থনা বশে আপনাকে বধ করিবার জন্য মায়িক রামরূপ ধারণ করতঃ এস্থানে আগমন করিয়াছেন। ঈশ্বর সত্য-সঙ্কল্প, সুতরাং আপন প্রতিজ্ঞা কি প্রকারে অন্যথা করিবেন? ॥৪২-৪৩॥

অতএব রাম অবশ্য পুত্র, সেনা ও বাহনাদি সহ আপনাকে বধ করিবেন। হে রাবণ! রাম কর্তৃক সম্পূর্ণ রাক্ষসবংশ ও আপনার বধ-দৃশ্য আমি দেখিতে পারিব না। অতএব আমি রঘুনাথজীর নিকট যাইতেছি। আমি চলিয়া যাইবার পর আপনি সুখপূর্বক আপন ভবনে দীর্ঘকাল নানাবিধ ভোগ করুন।” ॥৪৪-৪৫॥

এই প্রকারে শান্তচিত্ত বিভীষণ রাবণের কঠোর ভাষণ বশতঃ ক্ষণমধ্যেই যাবতীয় সামগ্রী সহিত স্বকীয় বাসভবন পরিত্যাগ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমল সেবা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

বিভীষণের শরণাগতি, সমুদ্রের ত্রাস ও সেতুবন্ধন আরম্ভ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

অতঃপর মহাভাগ্যশালী বিভীষণ স্বীয় মন্ত্রিচতুষ্টয় সহ আকাশমার্গে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং— ॥১॥

উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে কমলনয়ন, প্রভু রামচন্দ্র! আমি আপনার ভার্যাকে অপহরণকারী রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার নাম বিভীষণ। আমি আপন ভ্রাতৃ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। হে দেব! আমি অজ্ঞানী রাবণকে তাহার হিতকর বাক্য বলিয়াছিলাম। ॥২-৩॥

তাহাকে আমি বারম্বার বলিয়াছিলাম যে তিনি বিদেহনন্দিনী সীতাকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করুন, তথাপি কালপাশে বদ্ধ রাবণ আমার কোন কথাতেই কর্ণপাত করেন নাই। ॥৪॥

এই সময় ঐ রাক্ষসাধম আমাকে খড়্গহস্তে বধ করিতে আসিলে আমি প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ স্বীয় মন্ত্রিচতুষ্টয়সহ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুমুক্ষুরূপে আপনার শরণ লইয়াছি।" বিভীষণের বচন শুনিয়া সুগ্রীব বলিলেন— ॥৫॥

"হে রাম! এই মায়াবী রাক্ষসাধম বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষতঃ এ ব্যক্তি সীতাকে অপহরণকারী রাবণের বলবান কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ॥৭॥

আপন সশস্ত্র মন্ত্রিগণসহ কোন সময়ে এই ব্যক্তি একান্ত স্থানে আমাদের বধ করিবে। অতএব হে প্রভো! আপনি আমাকে আদেশ দান করুন, আমি বানরগণ দ্বারা ইহাকে বধ করাইব। ॥৮॥

হে রাম! আমার নিকট বিষয়টি এইরূপই প্রতিভাত হইতেছে। আপনি এ বিষয়ে কি স্থির করিলেন, তাহা বলুন।" সুগ্রীবের বচন শুনিয়া রাম মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন— ॥৯॥

"হে কপিশ্রেষ্ঠ! যদি আমি ইচ্ছা করি তাহা হইলে অর্ধ নিমেষ মধ্যে লোকপাল সহিত সর্ব ভুবনসমূহ ধ্বংস করিতে পারি, পুনঃ অর্ধনিমেষে সকলকে সৃষ্টিও করিতে পারি। অতএব আমি এই রাক্ষসকে অভয় প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর। ॥১০-১১॥

যদি আমার শরণাগত হইয়া কেহ 'হে প্রভু আমি তোমার' এইরূপ একবারও বলিয়া আমার নিকট অভয় প্রার্থনা করে তবে আমি তাহাকে সর্বপ্রাণী হইতে অভয় প্রদান করি,—ইহাই আমার ব্রত বা নিয়ম।" ॥১২॥

রামের এই বচন শুনিয়া সুগ্রীব অতি প্রসন্নচিত্তে বিভীষণকে আনয়ন করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টিপথে উপস্থাপিত করিলেন। ॥১৩॥

বিভীষণ শ্রীরঘুনাথকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ হর্ষে গদ্‌গদ কণ্ঠ হইয়া পরম ভক্তিসহকারে, কৃতাঞ্জলিপুটে শান্তমূর্তি, প্রসন্নবদনকমল, বিশালনয়ন, নবদূর্বাদলশ্যাম, ধনুর্বাণধারী, সলক্ষ্মণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ॥১৪-১৬॥

বিভীষণ বলিলেন—"হে রাজেন্দ্র রাম! আপনাকে নমস্কার। হে সীতা-মানসবিহারী! আপনাকে নমস্কার। হে প্রচণ্ড ধনুর্ধর! আপনাকে নমস্কার। হে ভক্তবৎসল! আপনাকে বারম্বার নমস্কার। ॥১৭॥

হে অনন্ত, শান্ত, অতুলিত তেজসম্পন্ন, সুগ্রীব-সখা, রঘুকুলপতি ভগবান রাম! আপনাকে নমস্কার। ॥১৮॥

জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ, ত্রিলোকের গুরু, অনাদিকালীন গৃহস্থ (মূল প্রকৃতিরও স্বামী), মহাত্মা রামচন্দ্রকে বারম্বার নমস্কার করি। ॥১৯॥

হে রাম! আপনি জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং অন্তকালে লয়স্থান, আপনি স্বেচ্ছাচারী (ইচ্ছানুসার বিহার করিয়া থাকেন)। ॥২০॥

হে রাঘব! চরাচর সর্বভূতের অন্তর ও বাহিরে সর্বত্র ব্যাপ্যব্যাপকরূপে বিশ্বরূপ হইয়া আপনি প্রতিভাসিত হইতেছেন। ॥২১॥

আপনার মায়ার দ্বারা সদসৎ বিবেকজ্ঞানভ্রষ্ট, নষ্টবুদ্ধি, মূঢ় পুরুষ, স্বীয় পাপপুণ্য দ্বারা বশীভূত হইয়া সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে। ॥২২॥

যে পর্যন্ত মনুষ্য একাগ্রচিত্তে আপনার জ্ঞানস্বরূপটি সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ হয় সে পর্যন্ত শুক্তিকাতে রজত বুদ্ধির ন্যায় এই সংসার সত্যরূপে তাহার নিকট প্রতীত হইয়া থাকে। ॥২৩॥

হে বিভো! আপনার স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃই লোক পুত্র, স্ত্রী ও গৃহ আদিতে আসক্ত হইয়া পরিণামে দুঃখপ্রদ বিষয় সমূহে সুখ মনে করিয়া তাহা ভোগ করিয়া থাকে। ॥২৪॥

হে পুরুষোত্তম! আপনিই ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি (অলক্ষ্মী, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ কর্ত্রী) বরুণ ও বায়ুরূপ এবং কুবের ও রুদ্র। ॥২৫॥

হে প্রভো! আপনি অণু হইতে অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং স্থূল হইতে ও স্থূলতর, পুনঃ আপনিই সর্বলোকের পিতামাতা এবং ধাতা অর্থাৎ ধারণ পোষণকারী। ॥২৬॥

আপনি আদি মধ্য ও অন্ত রহিত, সর্বত্র পরিপূর্ণ, অচ্যুত এবং অবিনাশী। আপনি হস্তপদরহিত এবং চক্ষুকর্ণবিহীন। ॥২৭॥

তথাপি হে খরান্তক! আপনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বগ্রহীতা এবং পরমবেগবান। হে প্রভো! আপনি অন্নময়াদি পঞ্চকোশ হইতে বিলক্ষণ এবং নির্গুণ ও নিরাশ্রয়। ॥২৮॥

আপনি নির্বিকল্প, নির্বিকার, নিরাকার ও নিরীশ্বর (আপনার আর প্রেরক বা শাস্তা কেহ নাই)। আপনি ছয় প্রকার ভাববিকার (উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশ) রহিত। আপনি প্রকৃতির অতীত অনাদি পুরুষ। ॥২৯॥

মায়াবশতঃই আপনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গৃহীত ও প্রতীত হইয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ আপনাকে নির্গুণ ও জন্মরহিত জানিয়া মোক্ষ লাভ করেন। ॥৩০॥

হে রাঘব! হে প্রভো! আমি আপনার চরণকমলে শুদ্ধাভক্তিরূপ সোপান আলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগ নামক সৌধশিখরে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করি। ॥৩১॥

হে পরম কারুনিক, সীতাপতি রাম! আপনাকে নমস্কার। হে রাবণারি! আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি। আপনি আমাকে এই সংসার সাগর হইতে রক্ষা করুন।" ॥৩২॥

তখন ভক্তবৎসল ভগবান রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"বিভীষণ! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" ॥৩৩॥

বিভীষণ বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! আমি আপনার চরণ দর্শন করিয়াই ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়াছি। আমি সফলকাম হইয়াছি। আপনার দর্শনমাত্র দ্বারাই আমি মুক্ত হইয়াছি, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৩৪॥

হে রাম! আপনার মনোহর মূর্তি দর্শন করিয়া আমার ন্যায় ধন্য ও পবিত্র আর কেহই নাই। আজ এই সংসারে মৎসদৃশ ভাগ্যবান আর কাহাকেও দেখিতেছি না। ॥৩৫॥
হে রঘুনন্দন! কর্মবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য আপনার প্রতি ভক্তি দ্বারা লভ্য জ্ঞান ও আপনার পরমার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিবার সাধন ধ্যান আমাকে প্রদান করুন। ॥৩৬॥

হে রাজেন্দ্র রাম! আমার বিষয় জন্য সুখের আকাঙ্ক্ষা নাই। আপনার চরণকমলে সর্বদা আসক্তিরূপ ভক্তি যেন বিদ্যমান থাকে—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।" ॥৩৭॥

তখন রঘুনাথ 'তথাস্তু' বলিয়া প্রসন্নচিত্তে বিভীষণকে পুনরায় বলিলেন—"হে সৌভাগ্যবান! শুন, আমি তোমাকে স্বকীয় নিশ্চিত রহস্যবার্তা বলিতেছি। ॥৩৮॥

শান্তস্বভাব, বিরক্ত ও যোগনিষ্ঠ আমার ভক্তগণের হৃদয়েই আমি সীতাসহ নিত্য নিবাস করি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ॥৩৯॥

অতএব তুমি সর্বদা শান্ত ও নিষ্পাপ হইয়া নিত্য আমার ধ্যান করিলেই এই ঘোর সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। ॥৪০॥

যে ব্যক্তি আমার প্রীতির জন্য এই স্তোত্র পাঠ, লিখন বা শ্রবণ করিবে সে আমার প্রিয় সারূপ্যপদ প্রাপ্ত হইবে।" ॥৪১॥

বিভীষণকে এইরূপ কথনানন্তর ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—"লক্ষ্মণ! আমার দর্শনের ফল বিভীষণ এখনই লাভ করুক। ॥৪২॥

তুমি সমুদ্র হইতে জল আনয়ন কর ; আমি বিভীষণকে এখনই লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিব। যে পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে এবং যে পর্যন্ত লোকে আমার চরিত্রকথা প্রচলিত থাকিবে ততদিন পর্যন্ত বিভীষণ লঙ্কায় রাজত্ব করিবে।" তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের দ্বারা কলসপূর্ণ জল আনাইয়া মন্ত্রিগণ এবং বিশেষতঃ লক্ষ্মণ সহায়ে বিভীষণকে লঙ্কার রাজ্যপদে অভিষিক্ত করাইলেন। ॥৪৩-৪৫॥

সমস্ত বানরগণ তখন প্রসন্নচিত্তে 'সাধু-সাধু' বলিয়া প্রশংসাপূর্বক স্তুতি করিতে লাগিল এবং সুগ্রীব বিভীষণকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন— ॥৪৬॥

"বিভীষণ! আমরা সকলে পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের দাস। তুমি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তুমি একমাত্র ভক্তিবলেই তাঁহার শরণ লইয়াছ। এখন রাবণকে বিনাশ করিতে তুমি আমাদের সহায়তা করিবে।" ॥৪৭॥

বিভীষণ বলিলেন—"আমি আর পরমাত্মা রামচন্দ্রের কি সহায়তা করিব? কিন্তু নিষ্কপটভাবে ভক্তিসহায়ে আমার যথাশক্তি তাঁহার দাস্যভাবে সেবা করিব।" ॥৪৮॥

এই সময় রাবণ প্রেরিত শুক নামক এক মহাদৈত্য আকাশে অবস্থান করিয়া সুগ্রীবকে এইপ্রকার বলিল— ॥৪৯॥

"রাক্ষসরাজ রাবণ তোমাকে আপনার ভ্রাতৃতুল্য বলিয়া মনে করেন। তিনি তোমাকে বলিয়াছেন যে তুমি উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং বনচারী বানরগণের তুমি রাজা। ॥৫০॥

তুমি আমার ভ্রাতৃতুল্য। তোমার কোন স্বার্থহানি তো আমি করি নাই। যদিও আমি কোন রাজকুমারের পত্নীকে অপহরণ করিয়াছি তাহাতে তোমার কি হইয়াছে? ॥৫১॥

তুমি আপন বানরগণ সহিত কিষ্কিন্ধ্যাতে প্রত্যাগমন কর। লঙ্কা জয় করা দেবগণেরও অসাধ্য। অল্পশক্তি মনুষ্য ও বানর যূথপতিগণের তো কথাই নাই।" ॥৫২॥

শুক যখন এইপ্রকার ভাষণ করিতেছিল তখন বানরগণ দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাতে বধ করিবার জন্য শীঘ্রই উল্লম্ফন পূর্বক তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ॥৫৩॥

বানরগণ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া শুক শ্রীরামচন্দ্রকে বলিল, "হে রাজেন্দ্র! দূত অবধ্য। বিজ্ঞজন দূতকে কখনও বধ করেন না। অতএব হে প্রভো! আপনি বানরগণকে আমাকে প্রহার করিতে নিষেধ করুন।" ॥৫৪॥

শুকের এইরূপ কাতর বচন শুনিয়া রামচন্দ্র 'ইহাকে বধ করিও না' বলিয়া বানরগণকে নিষেধ করিলেন। ॥৫৫॥

তখন শুক পুনরায় আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়া সুগ্রীবকে বলিল—"হে রাজন্! আমি লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিতেছি। বলুন দশগ্রীব রাবণকে আপনার কথা কি বলিব?" ॥৫৬॥

সুগ্রীব বলিলেন—"রাক্ষসরাজকে বলিও, আমি আপন ভাই বালীকে যেরূপ মারিয়াছিলাম সেইরূপ হে রাক্ষসাধম! পুত্র, সেনা ও বাহনাদি সহিত তোকেও আমি বধ করিব। আমার প্রিয় শ্রীরামচন্দ্রজীর ভার্যাকে অপহরণ করিয়া তুই এখন কোথায় পলায়ন করিবি?" তদনন্তর ভগবান রামের আজ্ঞাক্রমে সুগ্রীব শুককে ধরিয়া বন্ধন করতঃ বানরগণের রক্ষণাধীনে রাখিলেন। ॥৫৭-৫৮॥

শুকের পূর্বেও শার্দুল নামক একটি রাক্ষস বিপুল বানর সেনানী দর্শন করিয়া রাবণকে ঐ বিষয়ে যথাযথ বর্ণন করিয়াছিল। ॥৫৯॥

এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া রাবণ অত্যন্ত চিন্তাকুল চিত্তে আপন ভবনে বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। এই সময়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু হইয়া বলিলেন— ॥৬০॥

"লক্ষ্মণ! দেখ, এই সমুদ্র কিরূপ দুষ্ট, আমি ইহার তটভূমিতে আগমন করিয়াছি, কিন্তু হে অনঘ! এই দুরাত্মা আমাকে দর্শন করিয়াও অভিবাদন করিল না! ॥৬১॥

সে মনে করিতেছে যে—'আমি এক সাধারণ মনুষ্যমাত্র, বানরগণসহ মিলিত হইয়া আমি তাহার কি করিতে পারিব?' অতএব হে মহাবাহো! দেখ, আজ আমি এই সমুদ্রকে শোষণ করিয়া ফেলিব! ॥৬২॥

তখন বানরগণ নিশ্চিন্ত হইয়া পদব্রজেই সমুদ্রের অপর তীরে যাইতে পারিবে।" এইরূপ বলিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া আপন ধনুকে জ্যারোপণ করতঃ তূণীর হইতে

কালাগ্নিসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট একটি বাণ তাহাতে সন্ধান করিয়া চাপ আকর্ষণ করতঃ বলিলেন— ॥৬৩-৬৪॥

"সর্বপ্রাণিগণ আজ শ্রীরামের বাণের পরাক্রম দর্শন করুক। আজ এই মুহূর্তে আমি নদীপতি সমুদ্রকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছি।" ॥৬৫॥

ভগবান রাম এই কথা বলিবামাত্রই বন, কানন (উদ্যান) ও পর্বতাদি সহ সম্পূর্ণ পৃথিবী কম্পায়মান হইয়া উঠিল এবং আকাশ ও দিকসমূহ অন্ধকারাবৃত হইয়া গেল। ॥৬৬॥

সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়া উঠিল এবং ভয় বশতঃ তটভূমি হইতে এক যোজন আগে সরিয়া গেল। তখন বৃহৎকায় মৎস্য সমূহ, কুম্ভীর ও মকর এবং ক্ষুদ্র মৎস্য সকল সন্তাপবশতঃ ভয়ভীত হইয়া পড়িল। ॥৬৭॥

এইসময়ে নানাপ্রকার দিব্য আভূষণ সম্পন্ন ও দিব্য রূপধারী সমুদ্র আপন গর্ভস্থিত দিব্য রত্নসমূহ হস্তে ধারণ করতঃ এবং আপন দিব্য আভায় দশদিক আলোকিত করিয়া স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভগবান রামচন্দ্রের চরণের সম্মুখে নানাপ্রকার উপঢৌকন সমর্পণ করতঃ রক্তাক্তলোচন রামচন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সহকারে বলিলেন—"হে ত্রিলোক রক্ষক জগতপতি রামচন্দ্র! আমাকে রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! ॥৬৮-৭০॥

হে রাম! নিখিল জগৎ রচনাকালে আপনি আমাকে জড়রূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনার সৃষ্ট যথাযথ স্বভাব কেহ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। ॥৭১॥

হে রাম! পঞ্চস্থূল-ভূত-সমূহকে আপনি স্বভাবতঃ জড়রূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। ॥৭২॥

হে রাম! তামস অহঙ্কার হইতে ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উহাদের কারণের দিকে দৃষ্টিপাতই করিলেও ইহা প্রমাণিত হয় যে উহাদের জড়রূপ স্বতঃসিদ্ধ। ॥৭৩॥

হে প্রভো! আপনি নির্গুণ ও নিরাকার। যখন আপনি লীলাবশে মায়িক গুণসমূহ অঙ্গীকার করেন তখন আপনাকে 'বৈরাজ' এই নামে অভিহিত করা হয়। ॥৭৪॥

সেই গুণময় বিরাটের সাত্ত্বিক অংশ হইতে সনকাদি দেবগণ, রাজস অংশ হইতে মনু আদি প্রজাপতিগণ, এবং তামস অংশ হইতে সংহর্তা ভূতপতি অর্থাৎ রুদ্রগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ॥৭৫॥

হে প্রভো! লীলাবশে আপনি মায়াবৃত হইয়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। নির্গুণ পরমাত্মারূপ আপনাকে জড়বুদ্ধি মূর্খ আমি কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইব? লগুড় (লাঠি) যে প্রকার পশুগণকে যথার্থ মার্গে চালন করিয়া থাকে, হে অমর শ্রেষ্ঠ! তদ্রূপ দণ্ডই মূর্খগণের সন্মার্গ প্রাপক। হে ভক্তবৎসল রামচন্দ্র! আপনি শরণাগত রক্ষক, আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। আমি আপনাকে লঙ্কাগমনের পথ প্রদান করিতেছি।" ॥৭৬-৭৮॥

শ্রীরামচন্দ্র-বলিলেন, "আমার এই মহাবাণ অব্যর্থ; ইহা আমি কোন্‌দিকে নিক্ষেপ করিব? অতএব তুমি শীঘ্রই এই অমোঘ বাণের লক্ষ্য আমাকে বল।" ॥৭৯॥

রামচন্দ্রের এই বচন শুনিয়া এবং তাঁহার হস্তে সেই মহাবান দর্শন করিয়া মহাতেজস্বী সমুদ্র শ্রীরঘুনাথজীকে বলিলেন— ॥৮০॥

"হে রাম! উত্তরদিকে 'দ্রুমকুল্য' নামক এক দেশ রহিয়াছে। সেথায় বহু পাপীগণের নিবাস। তাহারা আমাকে দিনরাত বহু কষ্ট দিয়া থাকে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনার এই অব্যর্থ বাণ সেই দেশের উপরই নিক্ষেপ করুন।" তদনন্তর রাম-নিক্ষিপ্ত সেই বাণ ক্ষণকাল মধ্যেই সেই আভীরমণ্ডলিকে বধ করতঃ প্রত্যাগমন করিয়া তূণীর মধ্যে পূর্ববৎ স্থিত হইল। তখন সমুদ্র অতি বিনীতভাবে রঘুনাথকে বলিলেন— ॥৮১-৮৩॥

"হে রাম! বিশ্বকর্মার পুত্র নল আমার জলের উপর সেতু নির্মাণ করুক। এই বুদ্ধিমান বানর বরের প্রভাবে এ কার্য করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ॥৮৪॥

ইহার দ্বারা সর্বলোক আপনার সংসারমলাপহারিণী কীর্তি অবগত হইবে।" রঘুনাথজীকে এই প্রকার বলিয়া এবং তাঁহাকে প্রণাম করতঃ সমুদ্রদেবতা অন্তর্হিত হইলেন। ॥৮৫॥

অতঃপর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র নলকে বানরগণের সহায়ে শীঘ্রই সেতু নির্মাণের আদেশ করিলেন। ॥৮৬॥

তখন নল অতি প্রসন্নচিত্তে মহা পর্বততুল্য দেহধারী বানরগণের সাহায্যে পর্বত ও বৃক্ষাদি দ্বারা একশত যোজন লম্বা এবং অতি সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত একটি সেতু নির্মাণ করিলেন।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধ কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

সমুদ্র-তরণ, লঙ্কা-নিরীক্ষণ, এবং রাবণ-শুক-সংবাদ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

সেতুবন্ধনের প্রারম্ভ কালে ভগবান রামচন্দ্র রামেশ্বর নামক শিব স্থাপন ও পূজন করতঃ লোক-কল্যাণার্থ এই প্রকার বলিলেন— ॥১॥

"যে ব্যক্তি রামেশ্বর শিব দর্শন করতঃ সেতুবন্ধকে প্রণাম করিবে আমার কৃপায় সে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ॥২॥

যদি কেহ সেতুবন্ধে স্নান করতঃ রামেশ্বর মহাদেব দর্শন করে এবং পুনরায় সঙ্কল্পপূর্বক বারাণসী গমন করিয়া সেখান হইতে গঙ্গাজল আনয়ন করতঃ সেই গঙ্গাজলদ্বারা রামেশ্বর শিবের অভিষেক করিয়া সেই জলপাত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করে তবে সে ব্রহ্ম (সাযুজ্য) প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" ॥৩-৪॥

শোনা যায় বানরশ্রেষ্ঠ নল প্রথম দিবস চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশাতি যোজন এবং পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু সমুদ্রের উপরে বন্ধন করিলেন। ॥৫-৭॥

এই সেতুর উপর দিয়া বানরগণ অতি শীঘ্রই একশত যোজন সমুদ্র পার হইয়া গেল এবং অসংখ্য বানরগণ সুবেল পর্বতকে অবরোধ করিয়া ফেলিল। ॥৮॥

লঙ্কা দর্শন করিবার ইচ্ছা হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের ও লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে উপবেশন করিয়া সেই মহান পর্বতের উপর আরোহণ করিলেন। ॥৯॥

তাঁহারা দেখিলেন লঙ্কাপুরী অতি বিস্তীর্ণ ও নানাপ্রকার ধ্বজা, বিচিত্র প্রাসাদ সমূহ এবং সুবর্ণ নির্মিত প্রাকার ও তোরণাদির দ্বারা সুসজ্জিত। ॥১০॥

নগরীর চতুর্দিকে পরিখা, শতঘ্নী এবং সুরঙ্গ বিরাজিত। ইহাও দেখিলেন যে রাজ-ভবনোপরি বিস্তীর্ণ প্রদেশে স্বীয় বীর মন্ত্রিগণসহ দশগ্রীব রাবণ উপবিষ্ট, তাহার মস্তকোপরি দশটি মুকুট সুশোভিত। নীলাচল শিখর সদৃশ তাহার আকার এবং কৃষ্ণমেঘতুল্য তাহার শরীরের বর্ণ। ॥১১-১২॥

বিবিধ প্রকার রত্নদণ্ড যুক্ত শ্বেতছত্র সমূহদ্বারা অপূর্ব শোভা সেখানে বিস্তার হইয়াছে। এই সময়ে বন্ধনদশা হইতে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক মুক্ত পূর্বোক্ত শুক নামক দৈত্য বানরগণ কর্তৃক সম্যকরূপে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া রাবণের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তাহাকে হাস্য সহকারে রাবণ জিজ্ঞাসা করিল—"হে শুক! শত্রুগণ কি তোমাকে কিছু কষ্ট দিয়াছে?" ॥১৩-১৪॥

রাবণের বাক্য শুনিয়া শুক বলিল—"সমুদ্রের উত্তর তটে পৌঁছিয়া আমি আপনার বার্তা শুনাইতে আরম্ভ করিবামাত্র কিছু বানর উল্লম্ফন পূর্বক আমাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল এবং— ॥১৫॥

তাহারা বদ্ধমুষ্টি, নখ এবং দন্ত সহায়ে আমাকে মারিয়া ফেলিবারই উদ্যোগ করিয়াছিল। তখন 'হে রাম! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর' আমার এইরূপ আর্তনাদ শুনিয়া রঘুশ্রেষ্ঠ রাম বলিলেন, 'ইহাকে মুক্ত করিয়া দাও'। ইহা শুনিয়া বানরগণ আমাকে মুক্ত করিয়া দিল। তখন বানরগণের সেনা বল দর্শন করিয়া অতিশয় ভয়ে ভয়ে আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ॥১৬-১৭॥

আমার মতে দেবতা ও দানবগণের যেমন কোন সন্ধি (জিজিগীষু এবং অরির একতা বা মিলন) হইতে পারে না তদ্রূপ রাক্ষসগণের দলবল এবং বানরশ্রেষ্ঠগণেরও কোনপ্রকারে মিলন হইতে পারে না। ॥১৮॥

হে প্রভো! উহারা শীঘ্রই নগরের প্রাকারোপরি আসিয়া পৌঁছিবে। এখন আপনি শীঘ্রই দুইটি উপায়ের যে কোন একটি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন—প্রথমতঃ হয় সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করুন, তাহা না করিলে তাঁহার সহিত যুদ্ধের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় হউন। ॥১৯॥

রামচন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন—'হে শুক! তুমি রাবণকে আমার এই কথা বলিও যে, যে বলের আশ্রয় করিয়া সে আমার সীতাকে হরণ করিয়াছে, বন্ধুবান্ধব সহিত তাহার সেই সৈন্যবল যেন সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে দেখায়। আগামীকল্যই প্রাকার ও তোরণাদি সহিত লঙ্কাপুরী এবং তাহার রাক্ষস সেনা আমার শরাঘাতে বিধ্বস্ত হইতেছে, ইহা সে দেখিবে। হে

রাবণ! আমি তখন ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশ (ধারণ) করিব, তুমি ও তোমার বল সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিও।' ॥২০-২২॥

এইরূপ বলিয়া কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিলেন। শুক পুনরায় বলিল, "হে প্রভো! বানরগণের কথা থাকুক, রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ এই চার পুরুষ শ্রেষ্ঠ একত্র মিলিত হইলে মূলসহ লঙ্কানগরীকে উৎপাটিত ও ভস্মীভূত করিতে সমর্থ। আর আমি তাহাদের বল, রূপ, অস্ত্রশস্ত্রাদি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার সুদৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে অন্য তিনজন না থাকিলেও একা রামই সম্পূর্ণ নগর ধ্বংস করিতে সমর্থ। এখন আপনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অসংখ্য বানর সেনাগণকে দর্শন করুন। ॥২৩-২৬॥

দেখুন, এই পর্বতাকার বানরগণ কিরূপ গর্জন করিতেছে। ইহাদেব সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব। এইজন্য প্রধান প্রধান বানরগণের কথা বলিতেছি। ॥২৭॥

এই যে বানর লঙ্কাভিমুখে গর্জন করিতেছে এবং যে শত সহস্র যূথপতিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত, সে বানররাজ সুগ্রীবের সেনাপতি অগ্নিনন্দন 'নীল'। আর ঐ যে কমলকেশরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং পর্বতশিখর তুল্য বিশালকায় বানর অতি রোষপূর্বক ভূমিতেপুনঃ পুনঃ স্বীয় লাঙ্গুলাঘাত করিতেছে সে বালীপুত্র অতি বীর্যবান্ যুবরাজ 'অঙ্গদ'। ॥২৮-৩০॥

যে রামের অত্যন্ত প্রিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন এবং আপনার পুত্রকে বধ করিয়াছে সে ঐ বিখ্যাত বীর 'হনুমান'। ॥৩১॥

আর ঐ যে দেখিতেছেন, রজততুল্য শুক্ল বর্ণ বানর অতি শীঘ্রতার সহিত সুগ্রীবের নিকট গমনাগমন করিতেছে, মহাবুদ্ধিমান পুরুষার্থী সিংহের ন্যায় অতুল পরাক্রমী সেই বানর এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার নাম 'রম্ভ'। লঙ্কা ধ্বংস করিতে সে একাই সমর্থ। ॥৩২-৩৩॥

হে রাজেশ্বর! ঐ যে আর একটি বানর লঙ্কার প্রতি এই প্রকার দৃষ্টিপাত করিতেছে, মনে হয় যেন লঙ্কাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে সে কোটিযূথপতিগণের নায়ক 'শরভ'। ॥৩৪॥

এতদতিরিক্ত মহাপরাক্রমী 'পনস', 'মৈন্দ', 'দ্বিবিদ', এবং সেতুবন্ধনকারী বিশ্বকর্মার পুত্র মহাবলী 'নল',— ইহারা সকলেই প্রধান প্রধান যোদ্ধা। ॥৩৫॥

এই বানরগণের বর্ণন এবং সংখ্যা গণন করিতে কেহই সমর্থ নহে। ইহারা সকলে মহা শূরবীর বিশালকায় এবং যুদ্ধাভিলাষী। ॥৩৬॥

রাক্ষসগণ সহিত লঙ্কানগরী চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে ইহারা সকলেই সমর্থ। এখন আমি ইহাদের প্রত্যেকের সৈন্যসংখ্যা বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। ॥৩৭॥

ইহাদের প্রত্যেকের অধীনে একবিংশতি সহস্র কোটি, একহাজার শঙ্খ, এবং একশত অর্বুদ সৈন্য রহিয়াছে। ॥৩৮॥

হে রাবণ! আমি আপনাকে সুগ্রীবের মন্ত্রিগণের সৈন্য সংখ্যা বলিলাম। এতদতিরিক্ত সেনা সমূহের সংখ্যা বর্ণন করিতে আমি সর্বথা অসমর্থ। ॥৩৯॥

রাম কোন সাধারণ মনুষ্যমাত্র নহেন, তিনি আদিনারায়ণ পরমাত্মা এবং সীতা জগৎ-কারণরূপা, জগদরূপিণী, সাক্ষাৎ চিচ্ছক্তি। ॥৪০॥

এই উভয় হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব রাম ও সীতা স্থাবর-জঙ্গম এই জগতের মাতা ও পিতা। হে পৃথিবীপতে! তাঁহাদের সহিত কাহারও শত্রুতা কি প্রকারে হইতে পারে? আপনি না জানিয়া যে জানকীকে অপহরণ করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা। ॥৪১-৪২॥

হে রাজন! ক্ষণবিনাশী সংসারে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের * সমূহরূপ এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক শরীরে মল, মাংস, অস্থি আদি দুর্গন্ধিপূর্ণ। অহঙ্কারের আশ্রয় এবং জড়রূপ এই শরীরের প্রতি আপনি কি আস্থা করিতেছেন? আপনি এই শরীর হইতে সর্বথা পৃথক। ॥৪৩-৪৪॥

যে শরীরের জন্য আপনি ব্রহ্মহত্যাদি অনেক পাপ করিয়াছেন, সর্বভোগের ভোক্তা যে দেহ, উহা তো এইখানেই পড়িয়া থাকিবে। ॥৪৫॥

সুখদুঃখের কারণ পুণ্যপাপ জীবের সঙ্গেই গমন করে এবং তাহাই দেহসম্বন্ধাদি দ্বারা জীবকে অহর্নিশি সুখ-দুঃখাদি প্রদান করিয়া থাকে। ॥৪৬॥

যে পর্যন্ত অজ্ঞান-জন্য অধ্যাসবশতঃ জীব 'আমি দেহ, আমি কর্তা' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে সে পর্যন্ত তাহাকে বিবশ হইয়া জন্ম মৃত্যু আদি ভোগ করিতে হয়। ॥৪৭॥

অতএব হে মহামতিমান! আপনি দেহাদিতে অভিমান করিয়া থাকে সে পর্যন্ত তাহাকে বিবশ হইয়া জন্মে মৃত্যু আদি ভোগ করিতে হয়। ॥৪৭॥

অতএব হে মহামতিমান! আপনি দেহাদিতে অভিমান পরিত্যাগ করুন। আত্মা অত্যন্ত নির্মল, শুদ্ধস্বরূপ, বিজ্ঞানময়, অবিচল এবং অবিকারী। ॥৪৮॥

স্বীয় অজ্ঞানবশতই জীব বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। অতএব আপনি আত্মাকে শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব জানিয়া সর্বদা তাঁহাকেই স্মরণ করুন। ॥৪৯॥

পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদি সর্ব পদার্থ হইতে আসক্তিরহিত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করুন। কারণ বিষয়ভোগ শুনি শুকরাদি দেহে এবং নরকাদিতেও হইয়া থাকে। ॥৫০॥

[* জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চক, প্রাণাদিপঞ্চক, শব্দাদিপঞ্চক, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—ইহা কোন কোন মনীষীর মত।

সাংখ্যমতে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব এইরূপ ঃ-

'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥' সাংখ্যকারিকা ॥ মূলপ্রকৃতি বা প্রধান একটি তত্ত্ব। ইহা অবিকৃতি অর্থাৎ কাহারও বিকার নহে। ইহা নিত্যা ও ত্রিগুণাত্মিকা। মহদাদি প্রকৃতি-বিকৃতি সপ্ত সংখ্যক। মহৎ-তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধি, বা সমষ্টি অহংকার এবং শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা। এই সাতটি হইতে ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা প্রকৃতি বা কারণ ; পুনরায় ইহারা মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিকৃতি বা কার্যরূপ। অতএব এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি। ষোড়শবিকার—পঞ্চ স্থূল মহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন। এইগুলি কেবল বিকৃতি বা কার্যরূপ। এইরূপে সাংখ্যমতে সর্বসমেত চব্বিশটি তত্ত্ব। পুরুষ সাংখ্যমতে প্রকৃতি বা বিকৃতি কোনরূপই নহেন। তিনি অসঙ্গ, নির্লিপ্ত, চেতনস্বভাব, বিভু। সাংখ্যমতে বহু পুরুষ স্বীকৃত হন। এই মতে নিত্যা প্রকৃতি হইতে চেতন পুরুষ পৃথক—এই প্রকার বিবেকজ্ঞানেই মুক্তি। বেদান্তমতে পুরুষ স্বকল্পিত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া 'আমিই সর্বাধার সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম'—এই জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হন।]

সদসৎ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানব দেহ লাভ করিয়া, বিশেষতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া এবং অতি দুর্লভ কর্মভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান বিদ্বান্ দেহে আত্মবুদ্ধি সহকারে ভোগানুসক্ত হইবে? অতএব আপনি ব্রাহ্মণ শরীর এবং পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবার পুত্র হইয়া অজ্ঞানীর ন্যায় কেন সর্বদা ভোগের পশ্চাৎ ব্যর্থ ধাবন করিতেছেন? অতঃপর আপনি সর্বপ্রকার সঙ্গ (আসক্তি) ত্যাগ করতঃ অতি ভক্তিভাবে সর্বদা পরমাত্মা রামের আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং সীতাকে শ্রীরামের হস্তে সমর্পণ করতঃ তাঁহার চরণকমল সেবায় রত হউন। ৷৷৫১-৫৪৷৷

এইরূপ করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবেন। নতুবা উর্ধ্বগতি হইতে বঞ্চিত হইয়া উত্তরোত্তর অধোলোক প্রাপ্তিই হইবে। আমি আপনার হিত বচনই বলিতেছি। ইহা আপনি স্বীকার করুন (গ্রহণ করুন)। ৷৷৫৫৷৷

হে রাবণ! আপনি সর্বদা সৎসঙ্গ করুন এবং মরকৎমণি-সদৃশ-কান্তি বিশিষ্ট শরীরধারী, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ দ্বারা সেবিত চরণকমল, সেই শরণাগত বৎসল, ধনুর্বাণধারী সীতাসহিত পরমাত্মা রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করুন।" ৷৷৫৬৷৷

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধ কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

শুকের পূর্ব চরিত্র, মাল্যবান কর্তৃক রাবণকে উপদেশ ও বানর-রাক্ষস-সংগ্রাম

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

শুক-মুখ নিঃসৃত অজ্ঞান নাশক বচন সমূহ শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল— ৷৷১৷৷

"ওরে দুর্বুদ্ধি! তুই আমারই অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমাকে গুরুর ন্যায় কি প্রকারে উপদেশ করিতেছিস্? আমি তিন লোকের শাসনকর্তা, আমাকে উপদেশ দিতে তোর লজ্জা হইতেছে না। ৷৷২৷৷

যদ্যপি তুই বধযোগ্য আমি তোকে এখনই বধ করিতাম, কিন্তু পূর্বে তুই আমার অনেক উপকার করিয়াছিস্, তাহা স্মরণ করিয়া আমি তোকে মুক্তি প্রদান করিতেছি। ৷৷৩৷৷

ওরে মূঢ়! তুই এখান হইতে চলিয়া যা। আমি তোর এরূপ বাক্য আর শুনিতে চাই না।" রাবণের এইপ্রকার বচন শুনিয়া শুক 'আপনার বড় কৃপা' বলিয়া কম্পিত কলেবরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। ৷৷৪৷৷

পূর্বজন্মে শুক এক বেদজ্ঞ ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বানপ্রস্থ-বিধি-অনুযায়ী বনবাসী হইয়া স্বীয় ধর্মকর্মে নিরত থাকিতেন। ৷৷৫৷৷

এই মহাত্মা ব্রাহ্মণ দেবগণের সমৃদ্ধি এবং দেবশত্রু দৈত্যগণের নাশের নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন বহু যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ॥৬॥

সদা দেবহিতকামিত্ব বশতঃ রাক্ষসগণের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই সময় বজ্রদংষ্ট্র নামক এক বিরাট রাক্ষস শুকের অপকার করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। একদিন সেই মুনিবর শুকের আশ্রমে মহর্ষি অগস্ত্য আগমন করিয়াছিলেন। ॥৭-৮॥

শুক অগস্ত্য ঋষিকে বিধিবৎ পূজন করতঃ তাঁহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য স্নানার্থ গমন করিলে সেই সুযোগ পাইয়া উক্ত রাক্ষস অগস্ত্যের রূপধারণ করতঃ শুককে বলিল—"ব্রহ্মন্! যদি তুমি আমাকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা কর তবে আমাকে মাংস-যুক্ত অন্ন ভোজনার্থ প্রদান করিও। ॥৯-১০॥

আমি বহুদিন ছাগমাংস ভোজন করি নাই।" তখন শুক 'আপনার যেরূপ আজ্ঞা' বলিয়া বহুপ্রযত্নে মাংসময় ভোজন প্রস্তুত করাইলেন। ॥১১॥

মুনি অগস্ত্য ভোজন করিতে উপবেশন করিলে ঐ দুষ্ট রাক্ষস শুকপত্নীর সুন্দর রূপ ধারণ করিল এবং শুকের স্ত্রীকে আশ্রমের মধ্যেই মূর্চ্ছিত করিয়া রাখিয়া স্বয়ং মুনিবর অগস্ত্যকে নানাপ্রকারে প্রস্তুত সুপক্ক নরমাংস পরিবেশন করিল এবং তদনন্তর রাক্ষস অন্তর্ধান হইয়া গেল। মুনিবর অগস্ত্য অভক্ষ্য নরমাংস দর্শন করিয়া অতি ক্রুদ্ধচিত্তে শুককে বলিলেন—"হে দুর্মতি! তুমি ভোজনার্থ আমাকে নরমাংস প্রদান করিয়াছ। অতএব তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষস হইয়া থাক।" অগস্ত্য এইপ্রকার অভিশাপ প্রদান করিবার পর ভীতচিত্তে শুক অগস্ত্যকে বলিলেন—"হে মুনিবর! আপনি আমাকে আজ ভোজনার্থ উত্তমরূপে প্রস্তুত ছাগ মাংস প্রদানার্থ বলিয়াছিলেন, হে দেব! আমি আপনার আজ্ঞানুসারেই আপনাকে তদ্রূপ মাংসই প্রদান করিয়াছি কিন্তু আপনি আমাকে অভিশাপ কেন প্রদান করিতেছেন?" ॥১২-১৬॥

শুকের বচন শুনিয়া মহাবুদ্ধিমান অগস্ত্য ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়া রাক্ষসের (বজ্রদংষ্ট্র) কৃত সর্ববৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং তখন শুককে বলিলেন— ॥১৭॥

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এ সমস্তই তোমার অপকারকারী রাক্ষসের নিমিত্ত হইয়াছে। আমি বিচার না করিয়াই তোমাকে অভিশাপ দিয়াছি। ॥১৮॥

তথাপি এইরূপই হইবে, কারণ আমার বচন বৃথা হইবার নহে। যে পর্যন্ত রাবণ বধের নিমিত্ত বানরগণ সহিত শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপুরী সমীপে আগমন না করেন সে পর্যন্ত তুমি রাক্ষস শরীর ধারণ করতঃ রাবণের সহায়তা করিতে থাক। ॥১৯-২০॥

অতপর তুমি রাবণ প্রেরিত দূতরূপে শ্রীরঘুনাথজীর নিকটে যাইবে এবং তাঁহার দর্শন লাভে এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে, এবং পুনঃ রাবণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রদান করতঃ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।" মুনিবর অগস্ত্য এইপ্রকার বলিবার পর বিপ্রবর শুক সদ্য সদ্য রাক্ষস হইয়া রাবণের নিকট আসিয়া নিবাস করিতে লাগিল। এই সময়ে রাবণের দূত রূপে লক্ষ্মণ সহিত ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া এবং রাবণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রদান করিয়া শীঘ্রই পূর্ববৎ ব্রাহ্মণ শরীর প্রাপ্ত হইল এবং বাণপ্রস্থিগণ সহ নিবাস করিতে লাগিল। ॥২১-২৪॥

শুক চলিয়া যাইবার পর রাজা রাবণের মাতার প্রিয় পিতা অতি বুদ্ধিমান ও নীতিনিপুণ বৃদ্ধ রাক্ষস মাল্যবান সেখানে আগমন করিল। ॥২৫॥

শান্তচিত্তে সে রাক্ষসবীর রাবণকে বলিল—"হে রাজন্! আমার বচন শুন। তৎপর তোমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে করিও। ॥২৬॥

হে দশানন! যেদিন হইতে নগরে রামপত্নী জানকী প্রবেশ করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই নগরমধ্যে বড় ভয়ঙ্কর বিনাশহেতুসকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই সকল আমি তোমাকে বলিতেছি, শুন—অতি ভয়ঙ্কর মেঘসমূহ ঘনঘন বজ্রপাত সহ তীক্ষ্ণ গর্জন করিতেছে ও লঙ্কাপুরীর উপর উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতেছে। দেবমূর্তি সকলের গাত্র হইতে স্বেদজল এবং তাঁহাদের নয়ন হইতেও অশ্রুজল নির্গত হইতেছে, এবং তাঁহারা কম্পায়মান হইয়া স্থানচ্যুত হইতেছেন। ॥২৭-২৯॥

কালিকাদেবী রাক্ষসগণের সম্মুখে আপন শ্বেত-পীতবর্ণ বিশিষ্ট দন্তবিকাশ করতঃ হাস্য-ধ্বনি করেন, গাভিগণ হইতে গর্দভ উৎপন্ন হইতেছে, এবং মুষীক নকুল ও মার্জারসহ এবং সর্প গরুড়সহ যুদ্ধ করিতেছে। সমস্ত রাক্ষসগণের গৃহে সময় সময় কৃষ্ণ ও হরিৎবর্ণ এক মহাভয়ঙ্কর মুণ্ডিত কেশ বিকরাল বদন কাল-পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকার অমঙ্গল চিহ্ন উৎপন্ন হইতেছে ও দেখা যাইতেছে। ॥৩০-৩২॥

অতএব হে দশগ্রীব! তুমি শীঘ্র সীতাকে সৎকার পূর্বক বহুধন সহিত শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করতঃ কুলরক্ষার্থ শান্তি স্থাপন কর। ॥৩৩॥

রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিও, অতএব তাঁহার সহিত বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ কর। তাঁহার চরণকমলরূপ পোত আশ্রয় করতঃ ভক্তিপূতান্তঃকরণ জ্ঞানিগণ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অতএব তিনি কোন সাধারণ মনুষ্য নহেন। তুমি ভক্তিভাবে সর্বজন-হৃদয়-বিহারী শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লও। ॥৩৪-৩৫॥

যদিও তুমি দুরাচারী তথাপি রামভক্তি বলে পবিত্র হইয়া যাইবে। হে রাজেন্দ্র! বংশের কল্যাণের নিমিত্ত তুমি আমার বচনানুযায়ী কর্ম কর।" ॥৩৬॥

কিন্তু কালের বশীভূত দুষ্ট চিত্ত রাবণের মাল্যবান কর্তৃক প্রদত্ত এই হিতকর বাক্য সহন হইল না। ॥৩৭॥

রাবণ বলিল—"এই ক্ষুদ্র নীচ, তুচ্ছ মনুষ্য রাম, যে বনচারী বানরগণের আশ্রয় লইয়াছে, যাহাকে তাহার পিতা নির্বাসিত করিয়াছে, তাহাকে তুমি অতি সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছ কেন? রাম বনবাসী মুনিগণেরই মাত্র প্রিয়। ॥৩৮॥

মনে হয়, তুমি রাম কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইপ্রকার অবাধে বাক্য উচ্চারণ করিতেছ। যাও, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ এবং তুমি আমার আত্মীয় বলিয়াই আমি তোমার এইসব বাক্য সহন করিয়াছি। ॥৩৯॥

কিন্তু এখন তোমার বাক্য আমার কর্ণবিদাহী বলিয়া বোধ হইতেছে।" এইরূপ বলিয়া রাবণ সমস্ত মন্ত্রিগণ সহ সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ॥৪০॥

অতঃপর রাবণ রাজভবনের সর্বোচ্চ প্রদেশে উপবেশন করিয়া সেখান হইতে অদূরে অবস্থিত বানর সেনাগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে আপন সমীপে উপস্থিত রাক্ষসগণকে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত করিতে লাগিল। ॥৪১॥

এ দিকে রামচন্দ্র রাবণকে প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া অতি ক্রোধবশে লক্ষ্মণ কর্তৃক আনীত ধনুক উত্তোলন করিলেন। ॥৪২॥

(রামচন্দ্র দেখিলেন) রাবণ মস্তকে মুকুট ধারণ করতঃ মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট। তখন রামচন্দ্র অর্ধনিমেষ মধ্যেই একটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা রাবণের অগণিত শ্বেত ছত্র তাহার দশটি মুকুট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক হইল। ॥৪৩-৪৪॥

ইহাতে অতি লজ্জিত হইয়া রাবণ ভবন মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই দুষ্টাত্মা শীঘ্রই প্রহস্ত আদি প্রমুখ সর্ব রাক্ষস বীরগণকে আহ্বান করতঃ বানরগণের সহিত শীঘ্রই যুদ্ধের জন্য আদেশ প্রদান করিল। তখন রাক্ষসগণ ভেরী, মৃদঙ্গ, পনব, আনক ও গোমুখ আদি বাদ্য যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে মহিষ, উট, গর্দভ, সিংহ এবং ব্যাঘ্র আদি বাহনোপরি আরূঢ় হইয়া খড়্গ, শূল, ধনুষ, পাশ, যষ্টি, তোমর ও শক্তি আদি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া লঙ্কার প্রতি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবান রামচন্দ্রও বানর শ্রেষ্ঠগণকে তৎপূর্বেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ॥৪৫-৪৮॥

অতএব তাহারা পর্বত-শিলা এবং বৃহৎ শিখর সকল উঠাইয়া এবং নানাপ্রকার বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক যুদ্ধার্থ চলিল এবং রাবণের পৃথক পৃথক সেনাসমূহ দেখিতে পাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় কার্য সম্পাদন করিবার জন্য লঙ্কানগরী অবরোধ করিল। ॥৪৯-৫০॥

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহস্র যূথপতি, কেহ কোটিযূথপতি, পুনঃ কেহ শতকোটি যূথনায়ক ছিল। সেই বানরগণ উল্লম্ফন ও গর্জন আদি করতঃ বৃক্ষ, পর্বতশিখর লইয়া বা মুষ্টিবদ্ধ হস্তে চতুর্দিক হইতে নগরকে ঘিরিয়া ফেলিল। ॥৫১-৫২॥

"মহাবলী রাম ও বীরবর লক্ষ্মণের জয় হউক, রঘুনাথ কর্তৃক সুরক্ষিত রাজা সুগ্রীবের জয় হউক," এইপ্রকার ধ্বনি করিতে করিতে বানরগণ শত্রুবৃন্দ সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। হনুমান, অঙ্গদ, কুমুদ, নীল, নল, শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, দধিমুখ, কেসরী, তার এবং অন্যান্য সর্ব বলবান বানর ও যূথপতিগণ উল্লম্ফন করিতে করিতে লঙ্কার সর্ব দ্বারসমূহ চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তৎপর ঐ মহাকায় বানরগণ বৃক্ষ, পর্বতশিখর, এবং নখ ও দন্ত সহায়ে রাক্ষসগণকে সত্বর বধ করিতে লাগিল। তখন মহাভয়ানক বিশালকায় মহাবলবান রাক্ষসগণও অতিশয় ক্রোধ সহকারে নগরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া ভিন্দিপাল, খড়্গ, শূল ও পরশু আদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সহায়ে বানর সৈন্য বধ করিতে লাগিল। ॥৫৩-৫৮॥

এই প্রকারে বিজয়ী বানর বীরগণও রাক্ষসদিগকে নিধন করিতে লাগিল। এই সময় সেই স্থানে রাক্ষস ও বানরগণের বড় বিচিত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং সমগ্র রণভূমি রক্ত ও মাংসে কর্দমাক্ত হইয়া উঠিল। বীর রাক্ষস-শার্দূলগণ, অশ্ব, হস্তী, ও সুবর্ণময় রথোপরি আরোহণ করতঃ ঘোরশব্দে দশদিক্ কম্পিত করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। রাক্ষস ও বানরগণ পরস্পর একে অপরকে পরাজয় করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিল। ॥৫৯-৬১॥

বানরগণ রাক্ষসদিগকে এবং রাক্ষসগণ বানরদিগকে বধ করিতে লাগিল। বিষ্ণুরূপ ভগবান রামচন্দ্রের দৃষ্টিপূত ও দেবগণাংশে উৎপন্ন বানরগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, এবং তাহারা যেন অমৃতপানে অতি হর্ষ ও উৎসাহ সহ সীতাপহরণ ও অবমানজনিত মহাপাপী রাবণ-পালিত নিস্তেজ ও বলহীন রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে রাক্ষসসেনা ধ্বংস হইয়া কেবল এক চতুর্থাংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ॥৬২-৬৪॥

রাক্ষস সৈন্যগণকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ব্রহ্মার প্রদত্ত বরদৃপ্ত দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষস মেঘনাদ নভোমণ্ডলে অন্তর্হিত হইল। ॥৬৫॥

সেই দৈত্য সর্বপ্রকার অস্ত্রচালনে কুশল ছিল। সে আকাশে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র সহায়ে বানরসেনা মর্দন করিতে করিতে সর্বদিকে নানাবিধ শস্ত্র ও শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক হইল। অস্ত্রবিদ্গণ-শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রও ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষার্থ একক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া বানর সেনার পতন দর্শন করিলেন। অতঃপর রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ॥৬৬-৬৮॥

এবং বলিলেন—"লক্ষ্মণ! আমার ধনুক আনয়ন কর। আমি এই অসুরকে ক্ষণমধ্যেই ভস্ম করিয়া ফেলিব। হে রঘূত্তম! আজ তুমি আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিবে।" ॥৬৯॥

মেঘনাদও শ্রীরামচন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সাবধান হইল এবং মহামায়াবী সেই দৈত্য মায়া সহায়ে অতি শীঘ্র আপন নগরে প্রস্থান করিল। ॥৭০॥

বানর সেনা বিনষ্ট হইতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতীব দুঃখিত চিত্তে হনুমানকে বলিলেন— "হে হনুমন্! তুমি শীঘ্রই ক্ষীর-সাগরে গমন কর। সেখানে দ্রোণাচল নামক পর্বতে নানাপ্রকার দিব্য ঔষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে মহাবুদ্ধিমান! তুমি শীঘ্র যাইয়া সেই পর্বত আনয়ন করতঃ এই মহাপরাক্রমী মৃত বানর সৈন্য সমূহকে সঞ্জীবিত কর। ইহাতে তোমার অবিচল কীর্তি স্থাপিত হইবে।" ইহা শুনিয়া পবনকুমার 'আপনার আদেশ শিরোধার্য' এইরূপ বলিয়া প্রস্থান করিল এবং অতি শীঘ্রই পর্বত আনয়ন করতঃ ঔষধি সহায়ে সমগ্র বানরগণকে পুনর্জীবিত করিয়া ও সেই পর্বতকে পুনঃ স্বস্থানে শীঘ্রই স্থাপন করিয়া আসিল। ॥৭১-৭৪॥

তখন বানর সেনাগণের পূর্বের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদ শুনিয়া রাবণ অতি বিস্মিত চিত্তে বলিতে লাগিল— ॥৭৫॥

"দেবগণ কর্তৃক প্রকটিত রামচন্দ্র আমার মহাশত্রু আগমন করিয়াছে। তাহাকে যুদ্ধে বধ কবিরার জন্য আমার সেনাপতিগণ, মন্ত্রিগণ, বন্ধু-বান্ধব এবং আমার হিতাকাঙ্ক্ষী অন্য সকল শূর-বীরগণ শীঘ্রই আমার আদেশে যুদ্ধে গমন করুক। ॥৭৬-৭৭॥

ভীরু যাহারা প্রাণের ভয়ে যুদ্ধ করিতে যাইবে না ও আমার আদেশ পালন করিবে না তাহাদের সকলকে আমি বধ করিব।" ॥৭৮॥

রাবণের এই আদেশ শুনিয়া 'অতিকায়', প্রহস্ত, মহানাদ, মহোদর, দেবশত্রু, নিকুম্ভ, দেবান্তক ও নরান্তক আদি রণকুশল বীরগণ তথা অন্য সমস্ত বলবান যোদ্ধাগণ ভয়-ত্রস্ত চিত্তে বানরগণ সহ যুদ্ধ করিতে গমন করিল। ॥৭৯-৮০॥

তাহারা এবং অপর শতসহস্র শূরবীরগণ আপন বলগর্বে উন্মত্ত হইয়া বানর সেনামধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে মর্দন করিতে লাগিল। ॥৮১॥

তাহারা ভূশুণ্ডি, ভিন্দিপাল, বাণ, খড়্গ, পরশু, আদি নানা প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা বানর যূথপতিগণকে বধ করিতে লাগিল। ॥৮২॥

এদিকে বানর বীরগণও বৃক্ষ, পর্বতশিখর, নখ, দন্ত এবং মুষ্ট্যাঘাতে সর্বরাক্ষস সেনাপতিগণকে নিধন করিতে লাগিল। ॥৮৩॥

রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ শ্রীরামের হস্তে, কেহ সুগ্রীবের দ্বারা, কেহ হনুমান ও অঙ্গদের দ্বারা, কেহ মহাত্মা লক্ষ্মণের হস্তে, পুনঃ অপর সকলে অন্যান্য বানর সেনাপতিগণের দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপে সমস্ত রাক্ষসসেনা ধ্বংস হইল। ॥৮৪॥

শ্রীরামের তেজসমাবেশ হওয়াতেই বানরগণ এইরূপ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। রাম-শক্তি বিহীন (রাক্ষসগণের) এই প্রকার সামর্থ্য কি প্রকারে হইতে পারে? ॥৮৫॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বেশ্বর, সর্বময়, সর্বনিয়ন্তা এবং সদা চিদানন্দ স্বরূপ। তথাপি মায়া সহায়ে মনুষ্যোচিত যুদ্ধাদি লীলা-বিস্তার (প্রদর্শন) করিয়া থাকেন। ॥৮৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ

লক্ষ্মণ-মূর্চ্ছা, রাম-রাবণ-সংগ্রাম, হনুমানের ঔষধি আনয়নে গমন এবং রাবণ-কালনেমী-সংবাদ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি

যুদ্ধে অতিকায়-আদি রাক্ষসগণের মহতি সেনাবিনাশের বার্তা শুনিয়া রাবণ দুঃখ সন্তপ্ত হইয়া মহা ক্রোধাবিষ্ট হইল। ॥১॥

এবং ইন্দ্রজিতকে লঙ্কারক্ষণ জন্য নিযুক্ত করিয়া সেই মহাতেজস্বী (রাবণ) স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিল। ॥২॥

মহাবলশালী রাক্ষসরাজ নানা শস্ত্র ও অস্ত্র সুসজ্জিত এক দিব্য রথোপরি আরূঢ় হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের দিকেই ধাবিত হইল। ॥৩॥

সে আপন সর্পতুল্য উগ্রবাণ সহায়ে বহু বানরগণকে বধ করতঃ সুগ্রীব আদি যূথপতিগণকে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। ॥৪॥

অতঃপর মহাপরাক্রমী বিভীষণকে গদা হস্তে তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া রাবণ ময়দানব প্রদত্ত মহান শক্তি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। ॥৫॥

সেই শক্তি বিভীষণকে নাশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া "রাম ইঁহাকে অভয়প্রদান করিয়াছেন, অতএব এই অসুর-কুমার বিভীষণ বধযোগ্য নহে" এই কথা বলিয়া

মহাবীর্যবান লক্ষ্মণ তাহার ভয়ানক ধনুক হস্তে ধারণ করতঃ বিভীষণের পুরোভাগে পর্বতের ন্যায় অচল হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ॥৬-৭॥

অমোঘ সামর্থ্যবান সেই শক্তি লক্ষ্মণের শরীরে প্রবেশ করিল। সংসারের যাবতীয় শক্তি মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহাত্মা লক্ষ্মণ, তাহাদের সকলের আশ্রয় ও ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপভূত শেষনাগের অংশাবতার। সুতরাং এই মায়াশক্তি দ্বারা তাঁহার কি ক্ষতি হইতে পারে? ॥৮-৯॥

তথাপি এই সময় মনুষ্যভাব অঙ্গীকার ও তদনুকরণ করতঃ তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণকে লইয়া যাইবার জন্য আপন হস্তে তাঁহাকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিয়াও সফল হইল না। উহাতে রাবণ বড়ই বিস্মিত হইল। সর্বজগতের সার পরমেশ্বর বিরাট পুরুষ, সেই সর্বলোকাশ্রয় বিষ্ণু ভগবানকে এক ক্ষুদ্র রাক্ষস কি প্রকারে উঠাইবে? যখন হনুমান দেখিল যে রাবণ লক্ষ্মণকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের বক্ষদেশে এক বজ্রসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিল। সেই প্রবল আঘাতে রাবণ জানুদ্বয় অবনত করতঃ ভূপতিত হইল। ॥১০-১৩॥

তখন রাবণ আপন বহু মুখ, নেত্র ও কর্ণদ্বারে প্রচুর রক্তবমন করিতে করিতে বিঘূর্ণিত নয়নে রথের পশ্চাদভাগে উপবিষ্ট হইল। ॥১৪॥

তদনন্তর হনুমান রাবণ কর্তৃক আহত লক্ষ্মণকে আপন হস্তদ্বয়োপরি উত্তোলন করতঃ রামচন্দ্রের নিকট লইয়া গেল। ॥১৫॥

হনুমানের সৌহার্দ ও ভক্তিভাবের কারণেই সেই অজন্মা প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বর (লক্ষ্মণ) অত্যন্ত দুর্বহ ভারী হওয়া সত্ত্বেও তাহার নিকট অত্যন্ত লঘু (হালকা) ভাব প্রাপ্ত হইলেন। ॥১৬॥

লক্ষ্মণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ অংশ সম্ভূত জানিয়া সেই শক্তি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া রাবণের রথে প্রত্যাবর্তন করিল। এদিকে রাবণ ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে ধনুক উত্তোলন করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া জগৎপতি শ্রীরামও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলী হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করতঃ রথোপরি উপবিষ্ট রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন। ॥১৭-১৯॥

ভগবান রামচন্দ্র আপন ধনুকের জ্যা দ্বারা বজ্রনিষ্পেষণকারী অতি তীব্র কঠোর নিনাদ করিলেন এবং অতি গম্ভীর বাণীসহায়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ বলিলেন— ॥২০॥

“ওরে রাক্ষসাধম্! কিঞ্চিত অপেক্ষা কর্; সর্বত্র সমদর্শী আমার প্রতি এইরূপ অপরাধ করিয়া তুই আমার সম্মুখ হইতে কোথায় পলায়ন করিবি? ॥২১॥

ওরে! তুই আমার সম্মুখে ক্ষণকাল অবস্থান কর। যে বাণের দ্বারা আমি জনস্থানে তোর খর-দুষণাদি বহু রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছিলাম সেই বাণের দ্বারাই আজ তোকেও বধ করিব।” ॥২২॥

শ্রীরামচন্দ্রের এই বচন শুনিয়া তাঁহাকে যুদ্ধকালে স্কন্ধে বহনকারী পবননন্দন হনুমানকে রাবণ তীক্ষ্ণ বাণ প্রয়োগে জর্জরিত করিল। ॥২৩॥

কিন্তু তীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জরিত হইলেও পবননন্দনের তেজ আপন প্রভাবেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং সেই মহান্ কপি আরও তীব্র গর্জন করিতে লাগিল। ॥২৪॥

হনুমানকে এইরূপে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া শ্রীরঘুনাথ দ্বিতীয় কাল-রুদ্র তুল্য মহাভয়ঙ্কর ক্রোধমূর্তি ধারণ করিলেন। ॥২৫॥

তখন তিনি আপন তীক্ষ্ণ শরাঘাতে শীঘ্রই অবলীলাক্রমে রাবণের অশ্বসহিত রথ, ধ্বজা, সারথি, শস্ত্রসমূহ, ধনুক, ছত্র ও পতাকাদি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ॥২৬॥

ইন্দ্র যেরূপ বজ্রদ্বারা পর্বত বিদীর্ণ করিয়া থাকেন শ্রীরঘুনাথও সেই প্রকার বজ্রতুল্য এক বাণসহায়ে রাবণকে বিদ্ধ করিলেন। ॥২৭॥

রামের বাণাঘাতে সেই বীর (রাবণ) বিচলিত হইয়া মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইল এবং তাহার হস্ত হইতে ধনুক স্খলিত হইল। তাহার এই দশা দেখিয়া শ্রীরঘুনাথ একটি অর্ধ চন্দ্রকার বাণ সহায়ে সূর্যতুল্য প্রকাশমান তাহার মুকুটটিও ছিন্ন করতঃ বলিলেন—"রাবণ! তুমি আমার বাণাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছ ; অতএব আমি তোমাকে আজ্ঞা প্রদান করিতেছি—এখন তুমি যাও। ॥২৮-২৯॥

আজ লঙ্কায় যাইয়া বিশ্রাম কর। আগামীকল্য আমার পরাক্রম দেখিতে পাইবে।" শ্রীরামচন্দ্রের বাণে বিদ্ধ হইয়া হতদর্প রাবণ মহালজ্জিত ও ব্যাকুল হইয়া লঙ্কা নগরে প্রবেশ করিল। এদিকে রামচন্দ্রও ভূপতিত লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দর্শন করিয়া মনুষ্যভাব অবলম্বন করতঃ লীলাবশে শোক করিতে লাগিলেন এবং হনুমানকে বলিলেন —বৎস! পূর্ববৎ (দ্রোণাচল হইতে) মহৌষধি আনয়ন করতঃ লক্ষ্মণ ও বানরগণকে জীবিত কর।" রঘুনাথ এই প্রকার বলিলে মহাকপি হনুমান 'যেরূপ আজ্ঞা' বলিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই মহাসাগর পার হইয়া বায়ুবেগে চলিল। এই সময় রাবণকে তাহার গুপ্তচরগণ যাইয়া বলিল— ॥৩০-৩৪॥

"প্রভো! লক্ষ্মণকে জীবিত করিবার জন্য মহৌষধি আনয়ণার্থ হনুমানকে রাম ক্ষীর সাগর তটে প্রেরণ করিয়াছেন (এবং হনুমানও সেই উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছে।)" ॥৩৫॥

চরমুখে এই বার্তা শুনিয়া রাক্ষসরাজ অতি চিন্তাকুল হইল এবং তৎক্ষণাৎ রাত্রিকালেই একক কালনেমীর গৃহে গমন করিল। ॥৩৬॥

রাবণকে আপন গৃহে আগত দেখিয়া কালনেমী বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইল এবং তাহাকে অর্ঘ্যাদি প্রদানানন্তর তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতি ভয়-ভীত চিত্তে করজোড়ে বলিল— ॥৩৭॥

"হে রাজরাজেশ্বর! আপনি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? বলুন, আমি আপনার কি সেবা করিব।" তখন রাবণ অতি দুঃখিত চিত্তে কালনেমীকে বলিল— ॥৩৮॥

"কালবশে আজ আমার বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আমার শক্তির দ্বারা আহত হইয়া বীর লক্ষ্মণ ভূপতিত হইয়াছেন। ॥৩৯॥

তাহাকে জীবিত করিবার জন্য ঔষধি আনয়নার্থ হনুমান গমন করিয়াছে। হে মহাবুদ্ধিমান! তুমি এমন কিছু উপায় কর যাহাতে ঐ কর্মে বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। ॥৪০॥

তুমি মায়াবলে মুনিবেশ ধারণ করতঃ হনুমানকে মোহিত করিয়া এরূপ কিছু কর যাহাতে (ঔষধ প্রয়োগের) সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। কার্য সমাপনানন্তর তুমি নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিও।" ॥৪১॥

রাবণের কথা শুনিয়া কালনেমী তাহাকে বলিল—"মহারাজ রাবণ! আমার কথা শ্রবণ করুন ও উহা যথার্থ বলিয়া অবধারণ করুন। ॥৪২॥

আমি আপনার হিত অবশ্যই করিব। সেজন্য আমি প্রাণ বিসর্জন করিতেও কাতর নহি। (কিন্তু তাহাতে কি লাভ?) হে দশানন! ইহা নিঃসন্দেহ যে পূর্বে দণ্ডকারণ্যে মৃগরূপধারী মারীচের যে অবস্থা হইয়াছিল আমারও সেই দশা হইবে। দেখুন! আপনার পুত্র, পৌত্র এবং বহু আত্মীয়স্বজন রাক্ষসবৃন্দ নিহত হইয়াছে। ॥৪৩-৪৪॥

এই প্রকারে রাক্ষস বংশ বিনাশ করাইয়া আপনার জীবন ধারণেই বা কি ফল? অথবা রাজ্য, সীতা এবং আপনার এই জড়দেহ সহায়েই বা কি লাভ হইবে? ॥৪৫॥

হে মহাবাহো! আপনি রামচন্দ্রকে সীতা এবং বিভীষণকে রাজ্যপ্রদান করতঃ মুনিগণ সেবিত রমণীয় তপোবনে নিবাসার্থ গমন করুন। ॥৪৬॥

সেখানে প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করতঃ সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম সমাপন করিয়া নির্জনদেশে সুখাসনে উপবেশন করুন। ॥৪৭॥

এবং সর্বপদার্থ হইতে নিঃসঙ্গ হইয়া বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করতঃ বাহ্যবৃত্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয় সমূহকে শান্ত করিয়া ধীরে ধীরে অন্তর্মুখ করুন। ॥৪৮॥

হে অনঘ! আপনি আত্মা, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এইরূপ সর্বদা বিচার করুন। দেহবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি ও চরাচর সম্পূর্ণ জগত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত যাহা কিছু দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে তাহা সবই (সাংখ্য মতে) প্রকৃতি এবং (বেদান্ত মতে) মায়া বলিয়া কথিত হয়। ॥৪৯-৫০॥

সেই মায়াই সর্বদা সংসাররূপী বৃক্ষের উৎপত্তি, স্থিতি, ও বিনাশের কারণ এবং তাহাই সর্বদা শ্বেত (সাত্ত্বিক), লোহিত (রাজস্) ও কৃষ্ণবর্ণ (তামস) প্রজাসকল উৎপন্ন করিয়া থাকে। ॥৫১॥

এই মায়াই আপন গুণসমূহ দ্বারা অহর্নিশি সর্বব্যাপক আত্মদেবকে মোহিত করিয়া কাম ক্রোধাদি পুত্রগণ এবং হিংসা, তৃষ্ণাদি কন্যাগণের জন্ম প্রদান করিয়া থাকে। ॥৫২॥

মায়াই কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব আদি স্বগুণ সমূহ আপন প্রভু আত্মাতে আরোপিত করিয়া এবং তাহাকে স্ব-বশীভূত করিয়া তাহার সহিত সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকে। ॥৫৩॥

মায়া যুক্ত আত্মা মায়িক গুণ-মোহিত হইয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়া যান। এবং নিত্যশুদ্ধ হইয়াও যেন বাহ্য বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। ॥৫৪॥

যখন সদ্‌গুরু লাভ হয় তখন তিনি (সদ্‌গুরু) তাহাকে নির্মল জ্ঞানদৃষ্টি সহায়ে প্রবুদ্ধ করেন। তখন সেই জীবাত্মা বাহ্য বিষয় হইতে দৃষ্টি প্রত্যাহৃত করিয়া স্বস্বরূপকে স্পষ্টরূপে সাক্ষাৎকার করেন। ॥৫৫॥

তখন এই দেহধারী জীব জীবন-মুক্ত হইয়া মায়িক গুণসঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া যান। হে রাবণ! আপনি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এইরূপে আপন বাস্তব আত্মস্বরূপ চিন্তন করুন। ॥৫৬॥

এইরূপে আত্মাকে প্রকৃতি বা মায়া হইতে ভিন্ন জানিয়া আপনি মুক্ত হইয়া যাইবেন। যদি আপনি নিজেকে এই প্রকার ধ্যান করিতে অসমর্থ মনে করেন, তাহা হইলে সগুণ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করুন। ॥৫৭॥

(সগুণ ধ্যানবিধি—) হৃদয় কমলের কর্ণিকাতে মণিগণ খচিত অতি মৃদুল স্বচ্ছ স্বর্ণসিংহাসনোপরি যিনি জানকীসহিত বিরাজমান, যিনি বীরাসনে উপবিষ্ট, যাঁহার নেত্র অতি বিশাল এবং বস্ত্র বিদ্যুল্লতাতুল্য তেজোময় এবং যিনি কিরীট, হার, কেয়ূর ও কৌস্তুভ মণি আদি আভূষণে সুশোভিত ; নূপুর, কটক ও বনমালা আদি, যাঁহার অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে, লক্ষ্মণ আপন হস্তে দুইটি ধনুক (একটি নিজের ও অপরটি শ্রীরামচন্দ্রের) ধারণ করিয়া যাঁহার সেবায় দণ্ডায়মান—সেই সর্বজীবের হৃদয়-বিহারী স্বস্বরূপ একমাত্র ভগবান রামকে এইপ্রকার সর্বদা অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক ধ্যান করিলে আপনি মুক্ত হইয়া যাইবেন—ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৫৮-৬১॥

অনন্যচিত্তে আপনি রামভক্তগণের মুখ-নিঃসৃত তাঁর পবিত্র চরিত্রকথা শ্রবণ করুন। এইরূপ করিলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত তুলারাশি যেমন নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ আপনার পূর্বকৃত মহান্ পাপসমূহও ক্ষণমধ্যেই ভস্ম হইয়া যাইবে। ॥৬২॥

সর্বত্র ব্যাপক সেই অদ্বিতীয় ভগবান রামের সহিত শত্রুভাব পরিত্যাগ করতঃ আত্মপ্রেম পূর্বক নামরূপাদি রহিত পুরাণপুরুষ সেই তাঁহাকেই (শ্রীরামচন্দ্রকেই) সগুণভাবে চিন্তন করতঃ সর্বদা তাঁহারই ভজন করুন।" ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে যুদ্ধ কাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তম সর্গ

কালনেমীর কপট, হনুমান দ্বারা কালনেমী বধ, লক্ষ্মণের মূর্চ্ছাভঙ্গ এবং রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

জলসিঞ্চনে অগ্নি-সুতপ্ত-ঘৃত যে প্রকার উচ্ছলিত হইয়া থাকে কালনেমীর এই প্রকার অমৃতস্বরূপ বচন শ্রবণ করিয়া রাবণও সেইপ্রকার যেন জ্বলিয়া উঠিল এবং ক্রোধে তাহার নেত্র রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ॥১॥

রাবণ বলিতে লাগিল—"ওরে! মনে হইতেছে যে তুই শত্রুর নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াই রামের ক্রীতদাসের ন্যায় এই প্রকার বলিতেছিস্। আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনকারী তোকে আমি এখনই বধ করিব।" ॥২॥

তখন কালনেমী রাবণকে বলিল—"হে দেব! আপনি ক্রোধ করিতেছেন কেন? যদি আমার কথা আপনার মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে আমি এখনই আপনার কথনানুসারে কাজ করিতে যাইব।" ॥৩॥

এইরূপ বলিয়া মহাদৈত্য কালনেমী রাবণের প্রেরণায় হনুমানের কার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য সেখান হইতে শীঘ্রই প্রস্থান করিল। ॥৪॥

হিমালয়ের পার্শ্বে পৌঁছিয়া সে বায়ুপুত্র মহাত্মা হনুমানের গমনমার্গে এক মায়িক তপোবন রচনা করিল এবং সেখানে ঐ দুষ্ট কালনেমী স্বয়ং মুনিবেশ ধারণ করতঃ শিষ্যবর্গ পরিবৃত হইয়া (হনুমানের জন্য) অপেক্ষা করিতে লাগিল। যখন হনুমান সেখানে পৌঁছিল তখন সে সেখানে একটি রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইল। ॥৫-৬॥

উহা দেখিয়া শ্রীমান্ পবননন্দন মনে মনে বিচার করিতে লাগিল—'পূর্বে তো আমি এই স্থানে এরূপ উত্তম মুনিমণ্ডল দর্শন করি নাই? ॥৭॥

তবে আমি কি রাস্তা ভুল করিয়াছি? অথবা আমার চিত্তে কোন ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে? অথবা এই আশ্রমে যাইয়া মুনিশ্বরগণকে দর্শন করিব? এবং জলপান করতঃ তৎপর অত্যুত্তম 'দ্রোণাচল' পর্বতে গমন করিব? এইরূপ বিচার করিয়া সেই আশ্রমে হনুমান প্রবেশ করিল। সেই আশ্রমটি চতুর্দিকে এক যোজন পরিমাণ বিস্তৃত ছিল এবং সেখানে পরিপক্ক ফলভারাবনত শাখা বিশিষ্ট কদলী, শাল, খর্জুর, ও কাঁঠাল আদি বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। ॥৮-১০॥

শুদ্ধ ও নির্মল ঐ আশ্রমে সম্পূর্ণ বৈরভাব বিনির্মুক্ত বলিয়া লক্ষিত হইল। এই সুরম্য মহাশ্রমে রাক্ষস কালনেমী ইন্দ্রজালবিদ্যা আশ্রয় করিয়া শিবপূজা করিতেছিল। হনুমান সেই মহাদৈত্যকে সগৌরবে অভিবাদন পূর্বক বলিল— ॥১১-১২॥

"হে ভগবন্! আমি ভগবান্ রামের দূত, আমার নাম হনুমান এবং আমি শ্রীরামচন্দ্রের একটি মহান কার্য সম্পাদন করিবার জন্য ক্ষীর সাগরে যাইতেছি। ॥১৩॥

হে ব্রহ্মণ্! আমি অত্যন্ত পিপাসার্ত হইয়াছি, এবং যথেচ্ছ জলপান করিতে ইচ্ছা করি। হে মুনীশ্বর! আপনি কৃপা করিয়া বলুন জল কোথায় আছে।" ॥১৪॥

হনুমানের এই কথা শুনিয়া কালনেমী বলিল—"তুমি আমার কমণ্ডলুর জল পান করিতে পার! ॥১৫॥

এখানে বহু পক্ক ফল বিদ্যমান, তাহা ভোজন কর এবং সুখপূর্বক বিশ্রাম ও সুখনিদ্রা উপভোগ কর। বিশেষ ত্বরার প্রয়োজন নাই। ॥১৬॥

আপন তপোবলে আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এ তিন কালের সর্ব বৃত্তান্ত অবগত আছি। এইক্ষণেই শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টিপাতেই লক্ষ্মণ ও সমস্ত বানরগণ সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে।" ॥১৭॥

ইহা শুনিয়া হনুমান বলিল—"আমার তীব্র পিপাসা পাইয়াছে, এই কমণ্ডলুর জলে উহা তৃপ্ত হইবার নহে। অতএব আপনি আমাকে জলাশয় প্রদর্শন করুন।" ॥১৮॥

তখন "আচ্ছা তাহাই হইবে" এরূপ বলিয়া সে এক মায়াকল্পিত ব্রহ্মচারীকে আদেশ করিল, "হে ব্রহ্মচারিণ্! হনুমানকে বিস্তৃত জলাশয় প্রদর্শন করাও।" ॥১৯॥

(পুনঃ কালনেমী হনুমানকে বলিল—) "দেখ, তুমি দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জলপান করতঃ শীঘ্র আমার নিকটে প্রত্যাবর্তন করিও। আমি তোমাকে একটি মন্ত্র উপদেশ করিব, যাহাতে তুমি ঔষধি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে।" ॥২০॥

তখন ব্রহ্মচারী 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া শীঘ্রই হনুমানকে জলাশয় দেখাইয়া দিল। হনুমানও জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জলপান করিতে লাগিল। ॥২১॥

তখন এক মহা মায়াবিনী ঘোররূপিণী মকরী আসিয়া শীঘ্রই মহাকপি হনুমানকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। ॥২২॥

হনুমানও তখন সেই মকরী তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত দেখিয়া অতি ক্রোধ সহকারে আপন হস্তে তাহার মুখ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং তখন সেই মকরীও তৎকাল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ॥২৩॥

ঐ সময় আকাশে দিব্যরূপধারিণী এক স্ত্রী দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার নাম ধান্যমালী। সে হনুমানকে বলিল ॥২৪॥

"হে কপীশ্বর। আপনার কৃপায় আজ আমি শাপ বিমুক্ত হইলাম। আমি পূর্বে এক অপ্সরা ছিলাম। কোন কারণবশতঃ এক মুনীশ্বর আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। (সেই জন্য আমার মকরী-দেহ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।) ॥২৫॥

এই আশ্রমে তুমি যে মুনীশ্বরকে দেখিয়াছ, সে কালনেমী নামক এক মহাদৈত্য। রাবণ ইহাকে তোমার গমন পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছে। ॥২৬॥

মুনি বেশধারী সে ব্যক্তি বস্তুতঃ কোন মুনি নহে, সে মুনি এবং ব্রাহ্মণগণের হিংসাকারী। এই দুষ্টকে বধকরতঃ তুমি শীঘ্র পর্বতশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচলে গমন কর। ॥২৭॥

আমি তোমার স্পর্শে নিষ্পাপ হইয়া এখন ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছি।" এইরূপ বলিয়া সে স্বর্গলোকে চলিয়া গেল এবং হনুমানও আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিল। ॥২৮॥

হনুমানকে আসিতে দেখিয়া কালনেমী বলিল—"হে বানরশ্রেষ্ঠ! আর অধিক বিলম্বে তোমার কি লাভ? ॥২৯॥

আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর এবং আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।" তাহার এই প্রকার বলিবার পর হনুমান আপনার মুষ্টি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করতঃ সেই রাক্ষসকে বলিল— ॥৩০॥

"নাও, এই গুরুদক্ষিণা গ্রহণ কর" এইরূপ বলিয়া তাহাকে এক তীব্র মুষ্ট্যাঘাত করিল। তখন মহাদৈত্য কালনেমী মুনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার মায়া সহায়ে পবন নন্দনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু হনুমান মহা-মায়াধীশ ভগবান্ রামচন্দ্রের দূত এবং তুচ্ছ-মায়াবী রাক্ষসগণের শত্রু। ॥৩১-৩২॥

হনুমান সেই রাক্ষসের মস্তকে এক তীব্র মুষ্ট্যাঘাত করিলে তাহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং সেই রাক্ষসও শীঘ্রই মৃত্যু প্রাপ্ত হইল। অতঃপর হনুমান ক্ষীর-সমুদ্রতটে পৌঁছিয়া

মহাগিরি দ্রোণাচল অনুসন্ধান করিয়াও যখন ঔষধি মিলিল না তখন সমগ্র পর্বতটিকেই সত্বর উৎপাটন করিয়া তাহা বায়ুবেগে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া গেল এবং তাঁহাকে বলিল—"হে দেবেশ্বর! আমি এই পর্বত আনয়ন করিয়াছি। এখন আপনি যাহা যোগ্য বিবেচনা করেন তাহাই শীঘ্র করুন। এ কার্যে আর বিলম্ব করা উচিৎ নহে।" ॥৩৩-৩৫॥

হনুমানের বচন শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে মহামতি শ্রীরামচন্দ্র সুষেণের দ্বারা শীঘ্রই ঔষধি প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা লক্ষ্মণের চিকিৎসা করাইলেন। তখন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সচেতন হইয়া লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন— ॥৩৬-৩৭॥

"ওরে দুষ্ট দশানন! দাঁড়া, দাঁড়া, তুই কোথায় যাইবি? আমি তোকে এখনই বধ করিব।" লক্ষ্মণকে এই প্রকার বলিতে শুনিয়া রঘুনাথ তাহার মস্তক আঘ্রাণ করতঃ হনুমানকে বলিলেন—"হে বৎস! হে মহাকপি! তোমার কৃপাতেই আজ আমি আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিরাময় দেখিতে সমর্থ হইলাম।" ॥৩৮-৩৯॥

হনুমানকে এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণসহ বিভীষণের মতানুসারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ॥৪০॥

তখন যুদ্ধোৎসুক সর্ব বানরগণ পাষাণ, বৃক্ষ ও পর্বতশিখরাদি লইয়া যুদ্ধার্থ গমন করিল। ॥৪১॥

যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান রামচন্দ্রের বাণে বিদ্ধ হইয়া মহারাক্ষস রাবণ, সিংহ কর্তৃক পীড়িত হস্তি এবং গরুড় কর্তৃক আহত সর্পের ন্যায়, ব্যাকুল হইয়া পড়িল। রাক্ষসরাজ মহাত্মা রামচন্দ্রের হস্তে পরাভূত হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল এবং আপন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে এইপ্রকার বলিতে লাগিল— ॥৪২-৪৩॥

"পূর্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা মনুষ্যহস্তে আমার মৃত্যু হইবে এইপ্রকার বলিয়াছিলেন, কিন্তু এ জগতে আমাকে বধ করিতে পারে এমন কোন মনুষ্য নাই। ॥৪৪॥

অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে সাক্ষাৎ নারায়ণ মনুষ্যাবতার ধারণ করিয়াছেন এবং দশরথনন্দন রামরূপে আমাকে বধ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। ॥৪৫॥

পূর্বকালে অযোধ্যার এক রাজা অনরণ্য আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, 'হে রাক্ষসরাজ! আমার বংশে সনাতন পুরুষ পরমাত্মা অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহারই হস্তে তুমি নিঃসন্দেহ আপন পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণ সহ নিহত হইবে।'—এইরূপ বলিয়া তিনি স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেই পরমপুরুষই আমার জন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনি আমাকে অবশ্য বধ করিবেন। আমার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ একান্তই মূঢ়, সে সর্বদা নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। ॥৪৬-৪৮॥

তোমরা সকলে সেই মহাবীরকে জাগ্রত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর।" রাবণ এই প্রকার বলিবার পর সেই মহাকায় রাক্ষসগণ শীঘ্রই গমন করতঃ বহু প্রযত্নে কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে রাবণের নিকট আনয়ন করিল। সেখানে পৌঁছিয়া কুম্ভকর্ণ রাজাকে প্রণাম করতঃ আসনোপরি উপবেশন করিল। ॥৪৯-৫০॥

তখন রাজা রাবণ অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে আপন ভ্রাতাকে বলিতে লাগিল—"কুম্ভকর্ণ! আমার উপর মহাসংকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শোন। ॥৫১॥

রাম, আমার শ্রেষ্ঠ বীরগণ, পুত্র, পৌত্র, ও বন্ধুবান্ধবগণ সকলকেই নিহত করিয়াছে। ভাই! আমার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত। এখন আমার কি কর্তব্য বল। ॥৫২॥

এই মহাবলবান দশরথনন্দন রাম, সুগ্রীব সহ দলবল লইয়া এবং সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আমার মূলোচ্ছেদ করিতেছে। ॥৫৩॥

আমার যেসব মুখ্য মুখ্য রাক্ষসগণ ছিল তাহারা সকলেই বানরগণ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধে বানরগণের ক্ষয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ॥৫৪॥

হে মহাবাহু! তুমি ইহাদিগকে বিনাশ কর। এই জন্যই তোমাকে আমি নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছি। হে মহাবীর! আপন ভ্রাতার জন্য তুমি এই দুষ্কর কর্মটি কর।" ॥৫৫॥

রাজা রাবণের এই কাতর বচন শুনিয়া কুম্ভকর্ণ অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করতঃ এই প্রকার বলিল— ॥৫৬॥

"হে রাজন্! পূর্বে মন্ত্রণা কালে আমি যাহা কিছু বলিয়াছিলাম, আপনার পাপ কর্মের ফলে আজ তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। ॥৫৭॥

আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে রাম সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম নারায়ণ এবং সীতা যোগমায়া। কিন্তু আপনাকে বোঝানো সত্ত্বেও আপনি তাহা বুঝিলেন না। ॥৫৮॥

একদিন রাত্রিকালে আমি বনে পর্বতপৃষ্ঠে এক বিশাল শিলার উপরে বসিয়াছিলাম। সেই সময় আমি সাক্ষাৎ নারদমুনির দিব্যদর্শন পাইলাম। ॥৫৯॥

তাঁহাকে দেখিয়া আমি বলিলাম—'হে মহাভাগ! বলুন, এই সময় আপনি কোথায় যাইতেছেন।' আমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ বলিয়াছিলেন—'আমি এখন পর্যন্ত দেবগণের এক গুপ্ত মন্ত্রণাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। ॥৬০॥

সেখানে যাহা কিছু হইয়াছিল তাহা তোমাকে যথাযথ শুনাইতেছি। দেবগণ তোমাদের উভয় ভ্রাতার দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া বিষ্ণুভগবানের নিকট গিয়াছিলেন। ॥৬১॥

এবং সেই দেব-দেবেশ্বরকে ভক্তিভর চিত্তে একাগ্রতার সহিত স্তুতি করতঃ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'হে দেব! এই দুর্দমনীয় এবং ত্রিলোকের কণ্টক স্বরূপ রাবণকে আপনি শীঘ্র সংহার করুন। ॥৬২॥

পূর্বকালে ব্রহ্মাজী মনুষ্যের হস্তে তাহার মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছেন। অতএব আপনি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া রাবণরূপ-কণ্টক বিনাশ করুন।' ॥৬৩॥

তখন সত্যসংকল্প মহাবিষ্ণু বলিলেন—'আচ্ছা, তাহাই হইবে।' তিনি এই সময়ে রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়া 'রাম' এই নামে বিখ্যাত। ॥৬৪॥

তিনি তোমাদের সকলকে বধ করিবেন।' এইরূপ বলিয়া নারদমুনি প্রস্থান করিলেন। অতএব আপনি নিশ্চিতরূপে ইহা জানুন যে রাম সনাতন পরব্রহ্ম। ॥৬৫॥

সুতরাং আপনি শত্রুভাব পরিত্যাগ করতঃ এখন সেই মায়া মনুষ্যরূপ ভগবানের ভজন করুন। শ্রীরঘুনাথ ভক্তিভাবে ভজনকারীদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ॥৬৬॥

ভক্তিই জ্ঞানের জননী এবং মোক্ষদাত্রী। ভক্তিহীন পুরুষ যাহাকিছু করিয়া থাকে সবই বৃথা। ॥৬৭॥

ভগবান বিষ্ণুর অনেক অবতার হইয়াছে এবং তাঁহারা সকলেই আপন ভাবে মনুষ্যলীলা করিয়াছেন। কিন্তু শিবস্বরূপ জ্ঞানময় রামাবতার ঐরূপ এক সহস্র অবতারের তুল্য। ॥৬৮॥

যাহারা দিবানিশি মন ও বাণী সহায়ে ভগবান রামচন্দ্রের উত্তমরূপে ভজন করে তাহারা অনায়াসে সংসারোত্তীর্ণ হইয়া শ্রীহরির পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ॥৬৯॥

শুদ্ধচিত্ত মহানুভাব সজ্জন ব্যক্তি যাঁহারা এই ভূমণ্ডলে নিরন্তর শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান ও তাঁহার চরিত্র পাঠ করেন তাঁহারাই সাংসারিক ভোগপ্রদ বিষয়রূপ মহানাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীসীতাপতির অনন্ত সুখময় চরণকমল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" ॥৭০॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধ কাণ্ডে সপ্তম সর্গ

অষ্টম সর্গ

কুম্ভকর্ণ বধ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

কুম্ভকর্ণের বচন শুনিয়া রাবণের মুখ ও ভ্রূকুটি ক্রোধে বিকরাল রূপ ধারণ করিল এবং সে যেন আসন হইতে উচ্ছলিত (উত্থিত) হইয়া এই প্রকার বলিল— ॥১॥

"আমি জানি যে তুমি বড় বুদ্ধিমান, কিন্তু এই সময়ে আমি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবার জন্য আহ্বান করি নাই। যদি তোমার মনঃপূত হয় তাহা হইলে আমি যাহা করিয়াছি তাহা উচিত মানিয়া লইয়া যুদ্ধ কর। ॥২॥

নতুবা যাও, নিদ্রাগত হও। বোধ হয় এই সময় তোমার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে।" রাবণের এই বচন শুনিয়া কুম্ভকর্ণ বুঝিল যে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তখন সে শীঘ্রই যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল। সেই মহাপর্বতাকার বিশালকায় রাক্ষস নগর প্রাকার উল্লঙ্ঘন করতঃ নগরের বাহিরে আসিল। এবং সম্পূর্ণ বানরসৈন্য বাহিনীকে ভয়াকুল করিয়া এরূপ ঘোর নিনাদ করিতে লাগিল যে তাহাতে সমুদ্রও গুঞ্জায়মান হইয়া উঠিল। ॥৩-৫॥

কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপন বাহুদ্বয় দ্বারা বানরগণকে মর্দিত করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন যমরাজকে দেখিয়া যেমন সমস্ত প্রাণী ভয়ে পলায়ন করে, সেই প্রকার সপক্ষ পর্বততুল্য বিশালকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া বানরগণও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় মহাবলী কুম্ভকর্ণ মুদ্গর ধারণ করিয়া বানরবাহিনী মধ্যে ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, স্থানে

স্থানে বানরগণকে বধ করিতেছিল, তাহাদিগকে বেগে ভক্ষণ করিতেছিল, এবং আপন মুদগর ও মুষ্ট্যাঘাতে নানাপ্রকারে বানরবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিতেছিল। ইহা দেখিয়া পরম বুদ্ধিমান্ গদাপাণি বিভীষণ আসিয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে প্রণাম করিল। ॥৬-৯॥

এবং বলিল—"হে মহামতি! আমি আপনার ভাই বিভীষণ, আপনি আমাকে দয়া করুন। ভাই! আমি রাবণকে বারম্বার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে রাম সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভগবান, আপনি তাঁহার হস্তে সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। কিন্তু তিনি আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত তরবারি হস্তে বলিলেন—তোকে ধিক্কার। তুই এখান হইতে চলিয়া যা। পাপী মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিবৃত ভাই রাবণ আমাকে পদাঘাত করিলেন। তখন আমি আমার চারি মন্ত্রিসহ আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হইলাম।" ॥১০-১২॥

ইহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণও আপন ভাই আসিয়াছে, ইহা জানিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ বলিল—"বৎস! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের পদাশ্রয় লাভ করিয়া আপন বংশ রক্ষা এবং রাক্ষসগণের কল্যাণের নিমিত্ত চিরজীবী হও! পূর্বকালে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছি যে তুমি মহা ভগবৎ ভক্ত। ॥১৩-১৪॥

ভাই! তুমি এখন যাও। আমার নেত্রদ্বয় এখন যুদ্ধমদে মত্ত হইয়া আছে। অতএব এই সময় আমার কে আপন, কে পর এই ভেদ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।" ॥১৫॥

ভাই কুম্ভকর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া বিভীষণের নেত্রযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। এবং তিনি কুম্ভকর্ণের চরণে প্রণাম করিয়া চিন্তাগ্রস্তচিত্তে ভগবান রামচন্দ্রের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। ॥১৬॥

এদিকে কুম্ভকর্ণও মদমত্ত গন্ধহস্তির ন্যায় আপন হস্ত ও পদ সহায়ে বানরগণকে মর্দন করিতে করিতে বানরসেনা মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ॥১৭॥

কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সক্রোধে বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করতঃ অতি সাবধানতা সহিত তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এই অস্ত্র দ্বারা তিনি সেই রাক্ষসের মুগর সহিত দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলে সে মহাঘোর গর্জন করিতে লাগিল। সেই ছিন্নহস্ত বহু বানরগণকে মর্দিত করিয়া ভূপতিত হইল। ॥১৮-১৯॥

তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সর্ব বানরগণ ভয়কম্পিত চিত্তে ভগবান রাম ও রাক্ষস কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। ॥২০॥

দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইবার পর কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রকে যুদ্ধে বধ করিবার জন্য অন্য হস্তে একটি শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া অতি বেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র ঐন্দ্র অস্ত্রদ্বারা শালবৃক্ষসহিত তাহার বামহস্তও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। উভয় হস্ত ছিন্ন হইবার পরও তাহাকে গর্জন করিতে করিতে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র দুইটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অর্ধ চন্দ্রাকার বাণ সন্ধান করতঃ তাহার উভয় চরণও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন পদদ্বয় ভীষণ শব্দ করিতে করিতে লঙ্কার দ্বারদেশে পতিত হইল। ॥২১-২৩॥

হস্ত ও পদ কর্তিত হইবার পরও মহাভয়ানক কুম্ভকর্ণ চন্দ্রমার পশ্চাৎ ধাবণকারী রাহুর ন্যায় সমুদ্রস্থ ঘোটকি সম মুখব্যাদন পূর্বক চিৎকার করিতে করিতে ভগবান রামচন্দ্রের দিকে

ধাবিত হইল। কিন্তু রঘুনাথজী অতি তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা তাহার মুখবিবর পরিপূর্ণ করিলেন। ॥২৪-২৫॥

বাণদ্বারা মুখ পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়াতে সেই রাক্ষস অতি ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতে লাগিল। তখন শ্রীরামচন্দ্র সূর্যসম প্রকাশমান অতি উত্তম ঐন্দ্র বাণ সন্ধান করিলেন এবং সেই বজ্র ও বিদ্যুৎসম কঠোর বাণ রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রের বজ্র যে প্রকার বৃত্রাসুরের শিরচ্ছেদ করিয়াছিল সেই প্রকার এই বাণও কুম্ভকর্ণের কুণ্ডল ও দংষ্ট্র বিরাজিত পর্বত সদৃশ শির ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কুম্ভকর্ণের সেই ধড় অর্থাৎ পদমস্তক বিহীন দেহ সমুদ্রে পতিত হইল। ॥২৬=২৮॥

সেই খণ্ডিত মস্তক লঙ্কার দ্বার অবরুদ্ধ করিল এবং তাহার ধড়ও মকরাদি বহু জলজন্তুকে পিষ্ট করিয়া ফেলিল। এই প্রকারে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হইবার পর ঋষিগণ সহিত দেবগণ এবং অপ্সরাগণ সহিত গন্ধর্ব, নাগ, পক্ষী, সিদ্ধ, যক্ষ ও গুহ্যকাদি(কুবেরানুচর)-গণ অতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে তাঁহার স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। ॥২৯-৩০॥

এই সময়ে আপন প্রভায় সর্বদিক প্রকাশিত করতঃ দেবর্ষি নারদ ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় অতি ত্বরা সহকারে নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ করিলেন। ॥৩১॥

নীলকমল সম শ্যামবর্ণ, মনোহর মূর্তি, ধনুর্বাণধারী, অরুণাভ বিশাল নয়ন, ঐন্দ্রাস্ত্র সুশোভিত হস্ত, শরপীড়িত বানরগণকে দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে দর্শনকারী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতঃ ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে দেবর্ষি শ্রীনারদ এই প্রকার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ॥৩২-৩৩॥

নারদ বলিলেন—"হে দেবাদিদেব! হে জগন্নাথ! হে পরমাত্মন্! হে সনাতন পুরুষ! হে সর্বাধার! হে বিশ্বসাক্ষী! আপনাকে নমস্কার। ॥৩৪॥

আপনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ হইয়াও লোকদিগকে বঞ্চনা (মোহিত) করিবার জন্য স্বীয় মায়াবলাবলম্বনে মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া যেন সুখী ও দুঃখী এইরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ॥৩৫॥

মায়াচ্ছাদিত হইয়া আপনি সর্ব হৃদয়ে (অন্তর্যামীরূপে) অবস্থান করিতেছেন। আপনি স্বভাবতঃই স্বয়ংপ্রকাশ এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের নিকটই আপনি প্রকাশিত হন। ॥৩৬॥

হে রাম! আপনার চক্ষুর্দ্বয়ের উন্মীলনেই ত্রিলোক রচিত হইয়া থাকে এবং আপনার চক্ষু-নিমীলন দ্বারাই সর্ব সৃষ্টি বিলয় প্রাপ্ত হয়। ॥৩৭॥

যাঁহাতে এই সম্পূর্ণ চরাচর জগত প্রতিভাসিত হইতেছে, যাঁহা হইতে সর্ব চরাচর উৎপত্তি হইয়া থাকে, যাঁহা হইতে ভিন্ন এই জগতে আর কিছু নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে প্রণাম। ॥৩৮॥

মুনিশ্রেষ্ঠগণ যাঁহাকে প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপ বলিয়া জানেন সেই রামরূপ আপনাকে প্রণাম। ॥৩৯॥

শ্রুতি আপনাকে নির্বিকার, শুদ্ধ এবং জ্ঞানস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। পুনঃ সেই শ্রুতিই আপনাকে সর্বজগদাকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ॥৪০॥

হে দেব! বেদবাদিগণ মধ্যে বেদবচনে এইরূপ বিরোধ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার কৃপা বিনা বিজ্ঞজনেরাও ইহার কোন নিশ্চিত মীমাংসা করিতে সমর্থ হন না। ॥৪১॥

হে দেব! আপনি মায়াবলাবলম্বনেই লীলা করিয়া থাকেন। অতএব বেদবাক্য সমূহে কোন বিরোধ নাই। সূর্যের কিরণসমূহ যে প্রকার ভ্রম বশতঃ (মরীচিকা দর্শন কালে) জলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, হে রাম! সেই প্রকার এই সম্পূর্ণ জগতও অজ্ঞানবশতই আপনাতে কল্পিত হইয়াছে, আপনার বাস্তব নির্গুণরূপ মনেরও অবিষয়। ॥৪২-৪৩॥

হে দেব! এই নির্গুণ রূপ কি প্রকারে সকলের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে? পুনঃ দৃষ্টিগোচর না হইলে তাঁহার ভজনই বা কি প্রকারে সকলে করিতে সমর্থ হইবে? অতএব সংসারে বুদ্ধিমান ও নিপুণ ব্যক্তিগণ আপনার অবতার সমূহের রূপ চিন্তন করতঃ এই প্রকারে সংসার সাগর পার হইয়া থাকেন। এই (ভক্তি) মার্গে কাম, ক্রোধ আদি বহু বিঘ্নও বিদ্যমান। ॥৪৪–৪৫॥

মার্জার যে প্রকার মুষিককে ভয়ভীত করিয়া থাকে সেই প্রকার ঐ বিঘ্ন সমূহও সর্বদা চিত্তে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু হে রাম! যে ব্যক্তি নিরন্তর আপনার নাম স্মরণ করে, হৃদয়ে আপনার রূপ ধ্যান করে, আপনার পূজায় সর্বদা তৎপর হয়, আপনার কথামৃত পান করিয়া থাকে, এবং আপনার ভক্তগণের সঙ্গ-রসাস্বাদনে তৎপর হয়, তাহার নিকট (সমুদ্রতুল্য দুস্তর হইলেও) এই সংসার গোষ্পদ তুল্য অর্থাৎ গোখুর খনিত গর্তস্থলে স্বল্প পরিমাণ জলের ন্যায় তুচ্ছ প্রতীত হইয়া থাকে। ॥৪৬-৪৭॥

অতএব আমি সর্বদা আপনার সগুণ রূপ ধ্যান করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া সর্বলোকে বিচরণ করিয়া থাকি। এবং সমস্ত দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকি। ॥৪৮॥

হে রাম! আপনি দেবগণের হিতকামনা করিয়া একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। আজ আপনার হস্তে এই কুম্ভকর্ণের বধ দ্বারা পৃথিবী ভারমুক্ত হইল। ॥৪৯॥

আগামীকল্য* লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে বধ করিবেন এবং তৎপর অর্থাৎ আগামী পরশ্ব দিবসে আপনি দশগ্রীব রাবণকে বধ করিবেন। ॥৫০॥

হে দেবেশ্বর! আমি সিদ্ধগণসহ আকাশমার্গে স্থিত হইয়া আপনার এই সব লীলা দর্শন করিব। হে দেব! আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, আমি এখন দেবলোকে গমন করিব।” ॥৫১॥

এইরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়া সর্বদেব পূজিত ভগবান দেবর্ষি নারদ পাপবিহীন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ॥৫২॥

অনায়াসে অদ্ভুতকর্ম করিতে সমর্থ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক মহাবলী ভ্রাতা নিহত হইয়াছে শুনিয়া রাবণ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। এবং মূর্চ্ছা নিবৃত্তির পর উঠিয়া বিলাপ

---

* এই শ্লোকে 'কল্য' ও 'পরশ্ব' শব্দদ্বয় রাবণ ও ইন্দ্রজিতের মৃত্যু আসন্ন ইহাই বুঝাইতেছে। কারণ অন্যত্র লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের দিবসত্রয়ব্যাপী এবং রাম ও রাবণের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধের কথা প্রসিদ্ধ আছে। অঃ রাঃ, যুদ্ধ কাণ্ড ৯/৫৭ দ্রঃ।

করিতে লাগিল। তখন পিতৃব্য কুম্ভকর্ণের নিধন বার্তাও পিতাকে অতি বিহ্বল শুনিয়া শোকাকুল পিতা রাবণকে ইন্দ্রজিৎ বলিল—"হে মহামতে আপনি শোক করিবেন না। হে রাজেন্দ্র! আমি মহাবলী মেঘনাদ বাঁচিয়া থাকিতে আপনার দুঃখের কারণ কোথায়? হে দেবগণের কালস্বরূপ মহাবুদ্ধিমান পৃথিবীপতি! আপনি সর্বদুঃখ পরিত্যাগ করতঃ স্বস্থ হউন। ॥৫৩-৫৬॥

আমি সব কিছু যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিব এবং শত্রুগণকে আমি অবশ্যই বধ করিব। আমি এইক্ষণেই নিকুম্ভিলা গুহায় গমন করিতেছি এবং সেখানে অগ্নিদেবতাকে আহুতি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া রথ আদি লাভ করিব এবং তৎসহায়ে আমি শত্রুগণের অজেয় হইব।" এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রজিৎ নির্দিষ্ট যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিল। ॥৫৭-৫৮॥

এই নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে সে রক্তবর্ণ বস্ত্র, রক্তবর্ণ পুষ্পমালা ধারণ এবং রক্তচন্দন শরীরে লেপন করত মৌনী হইয়া হবন করিতে আরম্ভ করিল। ॥৫৯॥

ইন্দ্রজিতের যজ্ঞারম্ভের বার্তা শুনিয়া বিভীষণ সেই দুরাত্মার সর্ব প্রচেষ্টার সমাচার শ্রীরামচন্দ্রকে জ্ঞাপন করিলেন। ॥৬০॥

(এবং বলিলেন)—"হে রাম! যদি দুরাত্মা মেঘনাদের এই হবনকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সুর বা অসুর কেহই তাহাকে জয় করিতে পারিবে না, সে অজেয় হইবে। ॥৬১॥

অতএব আমি শীঘ্রই লক্ষ্মণের দ্বারা রাবণের এই পুত্র মেঘনাদকে বধ করাইব। আপনি বলবানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমান লক্ষ্মণকে আমার সহিত যাইবার আজ্ঞা প্রদান করুন। ইহা নিঃসন্দেহ যে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ মেঘনাদকে অবশ্যই বধ করিতে সমর্থ হইবেন।" ॥৬২॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"সর্বরাক্ষসকুল-ধ্বংস-সমর্থ মহান আগ্নেয় অস্ত্র সহায়ে শত্রু ইন্দ্রজিতকে বধ করিবার জন্য আমি স্বয়ংই যাইব।" ॥৬৩॥

তখন বিভীষণ বলিলেন—"এই রাক্ষস অপর কাহারও হস্তে নিহত হইবে না। যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ আহার ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, ব্রহ্মা তাহারই হস্তে এই দুরাত্মার মৃত্যু নির্দিষ্ট করিয়াছেন। হে রঘুনাথ! এই লক্ষ্মণ যে অবধি অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া আপনার সঙ্গে আসিয়াছেন, তদবধি তিনি আপনার সেবালগ্নতা বশতঃ নিদ্রা আহারাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র। আমি এই সব বার্তা অবগত আছি। ॥৬৪-৬৬॥

অতএব হে দেবেশ্বর। আপনি শীঘ্রই লক্ষ্মণকে আমার সহিত যাইতে আদেশ প্রদান করুন। সাক্ষাৎ ধরাধর শেষনাগাবতার লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে অবশ্যই বধ করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৬৭॥

আপনিই সাক্ষাৎ জগদীশ্বর নারায়ণ এবং লক্ষ্মণই শেষনাগ। আপনারা উভয়ে এই সংসাররূপী নাটকের সূত্রধর এবং পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্যই আপনারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে যুদ্ধ কাণ্ডে অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

মেঘনাদ বধ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

বিভীষণের এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"বিভীষণ! আমি ঐ মহাভয়ঙ্কর রাক্ষস ইন্দ্রজিতের মায়ার বিষয় অবগত আছি। ॥১॥

সে ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্, অত্যন্ত শূরবীর, মায়াবী ও মহাবলী। লক্ষ্মণ যেরূপে আমার সেবা করিতেছে, তদ্বিষয়েও আমি অবগত আছি (অর্থাৎ আমার সেবার কারণ সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, তাহা আমি অবগত আছি।) ॥২॥

কিন্তু ভবিষ্যত কার্যের কঠিনতা বিচার করিয়াই আমি সবকিছু জানিয়াও এ পর্যন্ত কিছুই বলি নাই।" বিভীষণকে এইরূপ বলিয়া জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥৩॥

"ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আর হনুমানাদি সমস্ত যূথপতি মহান সৈন্যবল সহ যাও এবং রাবণ পুত্র মেঘনাদকে বধ কর। ॥৪॥

আপন সেনাসহিত ঋক্ষরাজ জাম্ববান এবং মন্ত্রিগণ সহিত বিভীষণও তোমার সহিত যাইবেন। ॥৫॥

এই বিভীষণ ইন্দ্রজিতকে উত্তমরূপে জানেন, এবং তাহার আত্মগোপন স্থলসমূহও সব অবগত আছেন।" শ্রীরামচন্দ্রের এই বচন শুনিয়া মহা পরাক্রমী লক্ষ্মণ বিভীষণকে সঙ্গে লইলেন এবং একটি পৃথক অতি উত্তম ধনুক গ্রহণ করতঃ অতি প্রসন্নচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-কমল স্পর্শ করিয়া বলিলেন— ॥৬-৭॥

"হে প্রভো! আজ আমার ধনুক হইতে নিঃসৃত বাণসমূহ রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিতের শরীর ভেদ করিয়া পাতাল-গঙ্গা 'ভোগবতী'র জলে স্নান করিবার জন্য পাতাল লোকে প্রবেশ করিবে।"। ॥৮॥

শ্রীরামচন্দ্রকে এইপ্রকার বলিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিক্রমা করতঃ প্রণাম করিলেন এবং ইন্দ্রজিতকে বধ করিবার জন্য ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হইলেন। ॥৯॥

তাহার পশ্চাতে বহুসহস্র বানরগণ সহ হনুমান এবং মন্ত্রিগণ সহিত বিভীষণও ত্বরিতগতিতে চলিলেন। ॥১০॥

জাম্ববানাদি ঋক্ষগণও শীঘ্রই লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন। বানরগণ সহিত লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা স্থানে পৌঁছিয়া দূর হইতেই সেইস্থানে রাক্ষসগণের এক মহান সেনা সঙ্ঘাত একত্রিত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। তখন মহাপরাক্রমী লক্ষ্মণ ধনুহস্তে সাবধান চিত্তে প্রস্তুত হইলেন। ॥১১-১২॥

তৎক্ষণাৎ মহাবীর অঙ্গদ সহ জাম্ববানও যুদ্ধার্থ সাবধান হইলেন। তখন রাক্ষসরাজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন—"হে লক্ষ্মণ! রাক্ষসগণকে দেখুন। সম্মুখে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ

যে রাক্ষস সেনাবাহিনী দৃষ্টিগোচর হইতেছে সেই প্রবল সেনাবাহিনী ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা করুন। ৷৷১৩-১৪৷৷

এই সেনাসমূহ ধ্বংস হইবার পর রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও দৃষ্টিগোচর হইবে। তাহার যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত হইবার পূর্বেই শীঘ্র যাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করুন। ৷৷১৫৷৷

হে বীর! এই দুরাত্মা হিংসাপরায়ণ অধার্মিককে আপনি শীঘ্রই বধ করুন।" বিভীষণের বচন শুনিয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজকুমার মেঘনাদের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বানর যূথপতিগণও চতুর্দিক হইতে পাষাণ খণ্ড, পর্বত শিখর ও বৃক্ষাদি সহায়ে রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণও ঐ প্রকার বানর সেনা ও তাহাদের যূথপতিগণকে পরশু, তীক্ষ্ণবাণ, তরবারি, যষ্টি ও তোমর আদি শস্ত্রসহায়ে আক্রমণ করিল। তখন সেখানে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৷৷১৬-১৯৷৷

আপন সেনাগণকে এইরূপে মর্দিত হইতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ শীঘ্রই নিকুম্ভিলা স্থল এবং হোমকর্ম পরিত্যাগ করতঃ বহির্নিগত হইল। ৷৷২০৷৷

সে সত্বর একটি রথারূঢ় হইয়া ধনুহস্তে মহাক্রোধাবেশে রণভূমির সম্মুখভাগে উপস্থিত হইল এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ সগর্বে প্ররোচিত করিয়া বলিল— ৷৷২১৷৷

"হে লক্ষ্মণ! আমি মেঘনাদ। আমার হস্ত হইতে তুমি জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।" অতঃপর সেখানে আপন পিতৃব্য বিভীষণকে দেখিয়া তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ করিতে লাগিল। ৷৷২২৷৷

"তুমি এই লঙ্কানগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এখানেই বর্ধিত হইয়াছ এবং আমার পিতার সহোদর ভ্রাতা ; কিন্তু এখন তুমি আপন স্বজনগণকে পরিত্যাগ করতঃ শত্রুগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ। ৷৷২৩৷৷

আমি তোমার পুত্রতুল্য, জানি না, তুমি কেন আমার প্রতি শত্রুতা করিতেছ। অবশ্যই তুমি মহাপাপী এবং দুরাত্মা।" এইরূপ বলিয়া সে হনুমানের স্কন্ধে আরূঢ় লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ৷৷২৪৷৷

এবং নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ শস্ত্রপূর্ণ সেই মহান রথে উপবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎ একটি সুবৃহৎ ধনু ধারণ করিয়া তাহাতে ভয়ঙ্কর টঙ্কার করতঃ বলিল— ৷৷২৫৷৷

"ওহে বানরগণ! আজ আমার বাণ তোমাদের প্রাণসমূহ (শোণিত) পান করিবে।" তখন ক্রোধে সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস লইতে লইতে শত্রুদমন দশরথ কুমার লক্ষ্মণ শরসন্ধান করিয়া তাহা মহান রাক্ষস ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন ক্রোধে আরক্ত নয়ন হইয়া ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ৷৷২৬-২৭৷৷

লক্ষ্মণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ইন্দ্রের বজ্রতুল্য মহান কঠোর বাণাঘাতে এক মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রজিৎ অচেতন হইয়া পড়িল, পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্তির অনন্তর সম্মুখে দশরথনন্দন বীর লক্ষ্মণকে দণ্ডায়মান দেখিয়া ক্রোধে আরক্তনয়ন সেই রাক্ষস তাহার প্রতি ধাবিত হইল। ৷৷২৮-২৯৷৷

এবং স্বকীয় ধনুকে বাণ সন্ধান করতঃ তাহাকে এইপ্রকার বলিল—"যদি কখনও পূর্বে যুদ্ধকালে আমার পরাক্রম না দেখিয়া থাক তাহা হইলে আজ আমি তোমাকে তাহা প্রদর্শন করিব; তুমি কিছুকাল স্থির হইয়া অপেক্ষা কর।" এইরূপ বলিয়া সেই মহা বীর্যবান ইন্দ্রজিৎ সাতটি বাণদ্বারা লক্ষ্মণকে, তীক্ষ্ণ দশটি বাণদ্বারা হনুমানকে এবং ক্রোধাবেশে দ্বিগুণ উৎসাহে উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত একশত বাণের দ্বারা বিভীষণকে বিদ্ধ করিল। এ দিকে লক্ষ্মণও শত্রুগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ॥৩০-৩৩॥

লক্ষ্মণের বাণাঘাতে মেঘনাদের সুবর্ণাভ কবচ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া রথের পশ্চাৎভাগে ও ভূমিতে পতিত হইল। ॥৩৪॥

তখন যুদ্ধ করিতে করিতে রাবণকুমার মেঘনাদও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপরাক্রমী লক্ষ্মণকে সহস্র বাণে বিদ্ধ করিল। ॥৩৫॥

লক্ষ্মণেরও দিব্যকবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া নিম্নে পতিত হইল। এইপ্রকারে উভয়ে পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিল। ॥৩৬॥

উভয়ে বারম্বার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং তাহাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধিরাপ্লুত হইয়া গেল। ॥৩৭॥

এই প্রকারে উভয় মহাপরাক্রমী বীরবর দীর্ঘকাল পর্যন্ত একে অপরের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতঃ সমরে ব্যাপৃত রহিল। কিন্তু উহাতে কাহারো জয়-পরাজয় নির্ণীত হইল না। ॥৩৮॥

অতঃপর বীরবর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণের দ্বারা মেঘনাদের সারথি এবং তাহার অশ্ব সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ॥৩৯॥

এবং আপন হস্তকৌশল প্রদর্শন পূর্বক তাহার ধনুকটিও কাটিয়া ফেলিলেন। তখন মেঘনাদ অতি শীঘ্র অন্য একটি ধনুক হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ সন্নদ্ধ (সজ্জিত) হইল। ॥৪০॥

লক্ষ্মণ তিনটি বাণে সেই ধনুকটিও কাটিয়া ফেলিলেন এবং ছিন্নধনুক মেঘনাদকে বহু শরাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেন। ॥৪১॥

তখন ভীমবিক্রম ইন্দ্রজিৎ অপর একটি ধনুক লইয়া সূর্যসদৃশ প্রকাশমান তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা সর্বদিক ব্যাপ্ত করিয়া লক্ষ্মণ ও সমস্ত বানরগণকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন ঐন্দ্রবাণ গ্রহণ করিয়া বীরবর লক্ষ্মণ ধনুক উত্তোলন পূর্বক মেঘনাদের প্রতি ঐ বাণ সন্ধান করিলেন এবং সেই কঠোর ধনুকের জ্যা আকর্ণ আকর্ষণ করতঃ হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমল স্মরণ করিতে করিতে এইরূপ বলিলেন— ॥৪২-৪৪॥

"যদি দশরথনন্দন ভগবান রাম পরমধার্মিক, সত্য-সন্ধ (সত্যের মর্যাদা রক্ষাকারী) এবং লোকত্রয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন হন, তাহা হইলে হে বাণ! তুমি মেঘনাদকে বধ কর।" ॥৪৫॥

বীরবর লক্ষ্মণ রণক্ষেত্রে এইরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ-লক্ষ্য-ভেদকারী বাণ আকর্ণ আকর্ষণ করতঃ ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ॥৪৬॥

সেই বাণ শিরস্ত্রাণ সহিত ও উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভিত ইন্দ্রজিতের কান্তিমান্ মস্তক ছিন্ন করতঃ ভূপাতিত করিল। ॥৪৭॥

এই প্রকারে ইন্দ্রজিতের বধ হইবার পর দেবগণ অতি প্রসন্ন হইয়া রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের গুণগান ও তাহার বারম্বার প্রশংসা করতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ॥৪৮॥

দেবতা ও মহর্ষিগণ সহিত দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন। নভোমন্ডল হইতেও তখন দেবগণের দুন্দুভি বাদন নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ॥৪৯॥

রাবণ পুত্র মেঘনাদ বধ হইয়াছে দেখিয়া সর্বত্র জয়-জয়াকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। আকাশ নির্মল আকার এবং (রাক্ষসের ভয়ে কম্পমান) জগদ্ধাত্রী ধরণী স্থির আকার ধারণ করিল। ॥৫০॥

বিশ্রামান্তে লক্ষ্মণ শঙ্খ বাদনে রণভূমি গুঞ্জায়মান করিলেন এবং পুনঃ সিংহনাদ করতঃ আপনার ধনুকে টঙ্কার করিলেন। ॥৫১॥

তাহা শ্রবণ করিয়া বানরগণের অতি আনন্দ হইল এবং তাহাদের সর্ব পরিশ্রম অপনোদন হইল। প্রসন্নচিত্ত বানর-বীরগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া লক্ষ্মণ তাহাদের সহিত অতি আনন্দে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাহাকে দর্শন করিলেন। হনুমান ও বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণ অতিবিনয়পূর্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করতঃ বলিলেন—"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনার কৃপায় যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে।" ॥৫২-৫৪॥

লক্ষ্মণের ভক্তিসংযুক্ত বচন শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ অতি প্রসন্নচিত্তে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সপ্রেমে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করতঃ বলিলেন— ॥৫৫॥

"লক্ষ্মণ! তুমি ধন্য। তোমার এই কার্যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজ তুমি অতি দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করিয়াছ। হে শত্রুদমন! মেঘনাদের নিধনে যেন আমাদের সর্বজয় হইয়াছে, মনে হইতেছে। ॥৫৬॥

বীরবর তুমি তিনদিন* ও তিনরাত্রি নিরন্তর সংগ্রাম করতঃ কোনপ্রকারে সেই মহান যোদ্ধাকে বধ করিয়াছ, ইহাতে তুমি আজ আমাকে শত্রুহীন করিলে। এখন পুত্রশোকাকুল রাবণ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে। তখন আমি তাহাকে বধ করিব। ॥৫৭-৫৮॥

লক্ষ্মণ কর্তৃক মহাবলী ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং মূর্চ্ছাভঙ্গে পুনরায় উত্থিত হইয়া পুত্রশোকে রাবণ দীনহীনের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। ॥৫৯॥

পুত্রের গুণ এবং কর্মসমূহ স্মরণ করতঃ রাবণ অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে বলিতে লাগিল—"আজ সর্বদেবগণ, লোকপাল এবং মহর্ষিগণ ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইবেন।" পুত্রের প্রতি আসক্তি বশতঃ রাবণ এইরূপে বহু প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। ॥৬০-৬১॥

---

* অষ্টম সর্গ, কুম্ভকর্ণ বধ, ৫০নং শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তদনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুগণকে যুদ্ধে ধ্বংস করিবার কামনায় সর্ব রাক্ষসগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ॥৬২॥

পুত্রশোকে ব্যাকুল শূরবীর রাবণ তখন আপন মনে কিছু বিচার করিয়া সক্রোধে সীতাকে হত্যা করিবার জন্য ধাবিত হইল। ॥৬৩॥

খড়্গহস্তে রাবণকে সক্রোধে আপনার দিকে আসিতে দেখিয়া রাক্ষসিগণ-মধ্যে উপবিষ্টা সীতা অতীব ভয়ভীতা ও শোকাকুলা হইয়া পড়িলেন। ॥৬৪॥

এই সময়ে রাবণের সুপার্শ্ব নামক পরম বুদ্ধিমান, পবিত্র হৃদয়, বিচারবান, এক মন্ত্রী তাহাকে বলিল— ॥৬৫॥

"হে দশগ্রীব রাবণ! (আপনি এ কি করিতেছেন?) আপনি সাক্ষাৎ বিশ্রবনন্দন কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বেদবিদ্যানিপুণ, যজ্ঞান্তে (অবভৃথ্) স্নানকারী এবং স্বধর্মপরায়ণ। ॥৬৬॥

এই প্রকার বহুগুণ সম্পন্ন আপনি কি প্রকারে স্ত্রী-বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আমাদের সঙ্গে লইয়া আপনি রাম লক্ষ্মণকে বধ করতঃ শীঘ্রই জানকীকে লাভ করিবেন।" সুপার্শ্বের এই প্রকার মন্ত্রণায় রাবণ নিবৃত্ত হইল। ॥৬৭॥

তদনন্তর দুরাত্মা শোকে মূঢ়বুদ্ধি, রাবণ আপন সুহৃৎ সুপার্শ্বের ধর্মানুকূল বাণী স্বীকার করতঃ শীঘ্রই আপন ভবনে প্রত্যাবর্তন করিল এবং পুনরায় আপন বন্ধু-বান্ধবগণ পরিবৃত হইয়া সভামণ্ডপে আগমন করিল। ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে যুদ্ধ কাণ্ডে নবম সর্গ

দশম সর্গ

বানরগণ কর্তৃক রাবণের যজ্ঞ বিধ্বংস এবং মন্দোদরীকে রাবণের প্রবোধ দান

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

সভামধ্যে আপন রাক্ষস-মন্ত্রিগণ সহ বিচার করতঃ, পতঙ্গ যে প্রকার অন্যান্য পতঙ্গগণকে সঙ্গে লইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে ধাবিত হয়, রাবণও সেই প্রকার অবশিষ্ট রাক্ষসগণ সহ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র অপর সকল রাক্ষসগণকে যুদ্ধে বধ করিলেন। ॥১-২॥

স্বয়ং রাবণও বক্ষস্থলে ভগবান রামচন্দ্রের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়া শীঘ্রই লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। ॥৩॥

ভগবান রামচন্দ্র ও হনুমানের বহুপ্রকার অমানুষিক পৌরুষ দর্শন করিয়া রাবণ অতি শীঘ্রই শুক্রাচার্যের নিকট গমন করিল। ॥৪॥

এবং তাঁহাকে করজোড়ে নিবেদন করিল—"হে ভগবন্! রাম সমস্ত রাক্ষস যূথপতিগণসহ লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়াছে এবং প্রধান প্রধান দৈত্য ও আমার বন্ধু-বান্ধব যাহারা ছিল তাহাদের

সকলকে বধ করিয়াছে। আপনার ন্যায় সদ্‌গুরু বিদ্যমান থাকিতে আমাকে এইরূপ মহান দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। ॥৫-৬॥

রাবণের এই প্রকার প্রার্থনা শুনিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাহাকে বলিলেন—"হে দশানন! তুমি অতি যত্নে কোন একান্ত দেশে হোমকর্ম সম্পাদন কর। ॥৭॥

যদি তোমার হোমে কোন বিঘ্ন না হয় তাহা হইলে সেই হোমাগ্নি হইতে একটি বৃহৎ রথ, অশ্ব, ধনুক ও তূণীর উৎপন্ন হইবে। ঐ সকল সহায়ে তুমি অপরাজেয় হইবে। ॥৮-৯॥

মদ্‌প্রদত্ত মন্ত্র গ্রহণ কর এবং এই মন্ত্র সহায়ে শীঘ্রই হোম কর।" শুক্রাচার্যের এই প্রকার বচন শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ আপন ভবনে গমন করিল। এবং সেখানে শীঘ্রই পাতাল সদৃশ এক গুহা নির্মাণ করাইল এবং অতি সাবধানে লঙ্কার সকল প্রবেশদ্বার সমূহের কপাটাদি বন্ধ করিয়া দিল। ॥১০-১১॥

এবং শাস্ত্রে অভিচার কর্মের জন্য যে যে হবন সামগ্রীর কথা উল্লেখিত আছে সেই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিল। অতঃপর রাবণ সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া একান্তে মৌনাবলম্বন পূর্বক হোম কর্ম আরম্ভ করিল। ॥১২॥

তখন রাবণের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ লঙ্কানগরী মধ্য হইতে ঊর্ধ্ব আকাশে মহান ধূমপুঞ্জ উত্থিত হইতে দেখিয়া ভয়ভীত চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে তাহা দেখাইলেন। ॥১৩॥

এবং বলিলেন—"হে রাম! দেখুন, দশানন রাবণ হোম করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদি ঐ হোম নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয় তাহা হইলে সে অপরাজেয় হইবে। ॥১৪॥

অতএব ঐ কর্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য বানর সেনাপতিগণকে প্রেরণ করুন।" তখন শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া সুগ্রীবের অনুমত্যানুসারে অঙ্গদ হনুমানাদি মহাবলবান বানর বীরগণকে উক্ত হোমকর্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারাও নগর প্রাকার উল্লঙ্ঘন করতঃ রাবণের ভবনে পৌঁছিল। ॥১৫-১৬॥

এই দশকোটি বানরগণ সেখানে পৌঁছিয়া ভবনের দ্বারপালদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্ষণমধ্যেই বহু অশ্ব ও হস্তি বধ করিল। ॥১৭॥

(এইরূপে লঙ্কায় সমগ্র রাত্রিব্যাপী মহাকোলাহল চলিতে লাগিল।) প্রাতঃকাল হইলেই বিভীষণের পত্নী সরমা আপন হস্তদ্বারা সঙ্কেত করতঃ যজ্ঞস্থল সূচিত করিয়া দিলেন। ॥১৮॥

গুহামুখের আচ্ছাদন মহান পাষাণখণ্ডটি অতুল পরাক্রমী অঙ্গদ পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করতঃ গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ॥১৯॥

এবং সেখানে নিমীলিত নেত্র ও দৃঢ় আসনে উপবিষ্ট দশানন রাবণকে দেখিতে পাইল। তদনন্তর অঙ্গদের আজ্ঞাক্রমে সমস্ত বানরগণ শীঘ্রই সেই গুহায় প্রবেশ করিল। ॥২০॥

গুহায় প্রবেশ করিয়া তাহারা সেবকগণকে প্রহার করিতে লাগিল এবং সেখানে মহাকোলাহল উৎপন্ন করিল। তৎপর যত্রতত্র রক্ষিত যজ্ঞসামগ্রী তাহারা হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। ॥২১॥

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান অত্যন্ত রোষভরে রাবণের হস্ত হইতে স্রুব (হোমার্থ কাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ) বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারাই রাবণকে আঘাত করিতে লাগিল। ॥২২॥

এবং বানরগণ রাবণকে বিভিন্ন দিক হইতে দন্তসহায়ে এবং কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু বিজয় কামনাবশতঃ রাবণ আহত হইয়াও আপন ধ্যান ভঙ্গ করিল না। ॥২৩॥

তখন অত্যন্ত বেগবান্ অঙ্গদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ শুভলক্ষণা মন্দোদরীর কেশাকর্ষণ পূর্বক তাহাকে সেই যজ্ঞস্থলে লইয়া আসিল। ॥২৪॥

এবং রাবণের সম্মুখেই অনাথার ন্যায় মন্দোদরী তখন বিলাপ করিতে লাগিল। অঙ্গদ তাহার রত্নভূষিত কাঁচুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ॥২৫॥

কাঁচুলি হইতে বিচ্ছিন্ন মুক্তাসকল রত্নসমূহ সহিত চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই প্রকারে মন্দোদরীর রত্নজড়িত শ্রোণিসূত্র (কটিবন্ধন সূত্র)ও ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ॥২৬॥

রাবণের দৃষ্টির সম্মুখেই মন্দোদরীর অধো-বস্ত্র-বন্ধন স্খলিত হইয়া কটিপ্রদেশ হইতে বিচ্যুত হইল এবং তাহার সমস্ত আভূষণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। ॥২৭॥

অন্যান্য বানরগণও এইপ্রকার উৎসাহের সহিত রাবণের অন্যান্য বহু পত্নী দেব-গন্ধর্বাদি কন্যাগণকে ধরিয়া লইয়া আসিল। তখন মন্দোদরী রাবণের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতঃ— ॥২৮॥

অতি করুণস্বরে দীনহীন ভাবে রাবণকে বলিতে লাগিল—"অহো! তুমি বড়ই নির্লজ্জ, তোমার সম্মুখেই শত্রুগণ সবলে তোমার ভার্যার কেশাকর্ষণ করিয়া লাঞ্ছিত করিতেছে! আর তুমি হোম করিতেছ? তোমার লজ্জা হইতেছে না? যাহার সম্মুখে পাপী শত্রুগণ তাহার ভার্যাকে অপমানিত করে, তাহার জীবনধারণ অপেক্ষা সেই স্থানেই মৃত্যুই শ্রেয়। হায় মেঘনাদ! তোমার মাতা আজ বানরগণের হস্তে লাঞ্ছিত হইতেছে! ॥২৯-৩১॥

হা পুত্র! তুমি বাঁচিয়া থাকিলে কি আজ আমার এই প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হইত? আমার পতি আপন জীবন রক্ষার্থ স্বীয় ভার্যা ও লজ্জাকেও পরিত্যাগ করিয়াছে।" ॥৩২॥

মন্দোদরীর এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করতঃ রাক্ষসরাজ রাবণ, 'অরে! দেবীকে ছাড়িয়া দাও' এইরূপ বলিয়া খড়্গ হস্তে আসন হইতে উত্থিত হইল। ॥৩৩॥

উঠিয়াই রাবণ সাবধান হইয়া অঙ্গদের কটিদেশে খড়্গ প্রহার করিল। তখন সমস্ত বানরগণ রাবণের মহাযজ্ঞ বিধ্বংস করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ॥৩৪॥

এবং তাহারা সকলে অতি প্রসন্নতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ॥৩৫॥

তখন রাবণ স্বীয় ভার্যা মন্দোদরীকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক বলিল—"হে কল্যাণী! জীবের সুখ দুঃখাদি সবই দৈবাধীন। জীবিতাবস্থায় কি সকলকেই নানাপ্রকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হয় না? হে বিশালনয়নি! এই প্রকার নিশ্চিত জ্ঞান সহায়ে তুমি শোক পরিত্যাগ কর। ॥৩৬॥

শোক অজ্ঞান-বশতঃই হইয়া থাকে এবং ঐ শোকই জ্ঞানের বিনাশকারী। শরীরাদি অনাত্ম পদার্থে অহং বুদ্ধিও অজ্ঞানেরই কার্য। ॥৩৭॥

এই মিথ্যা অহংকার বশেই স্ত্রী-পুত্র-আদি সম্বন্ধ হইয়া থাকে এবং সেই সম্বন্ধে সত্যতা বুদ্ধি বশতঃই জন্ম-মরণ রূপ সংসার এবং হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও স্পৃহা আদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ॥৩৮॥

এই জন্ম মৃত্যু জরা আদি অবস্থা অজ্ঞানেরই কার্য। আত্মা একমাত্র শুদ্ধ, সর্ববস্তু হইতে পৃথক এবং অসঙ্গ। ॥৩৯॥

আত্মা আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও সুখ-দুঃখাদি সর্বভাব বিবর্জিত। এই সত্যস্বরূপ আত্মার কোন কিছুর সহিত সংযোগ বা বিয়োগ হয় না। ॥৪০॥

হে অনিন্দিতে! আপন আত্মার এই প্রকার স্বরূপ জানিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর। আমি এখনই যাইতেছি। আমি লক্ষ্মণ সহিত রামকে বধ করিয়া এখনই ফিরিয়া আসিব অথবা শ্রীরামই আমাকে তাঁহার বজ্রসদৃশ বাণদ্বারা আমার শরীর ছিন্নভিন্ন করিবেন। তখন আমি তাঁহার পরমপদ প্রাপ্ত হইব। ॥৪১-৪২॥

হে প্রিয়ে! আমার আজ্ঞাবশতঃ তখন তুমি একটি কাজ করিও। তুমি তখন সীতাকে বধ করতঃ আমার শবদেহের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিও।" ॥৪৩॥

রাবণের বচন শুনিয়া অতি দুঃখের সহিত মন্দোদরী বলিল—"প্রভো! আমি আপনাকে অতি সত্য কথা বলিতেছি, উহা শুনিয়া আপনি সেইরূপই করুন। ॥৪৪॥

আপনি বা অপর কেহ কখনই শ্রীরামকে জয় করিতে পারিবেন না। দেবাদিদেব ভগবান রামচন্দ্র সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক। ॥৪৫॥

ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রই কল্পারম্ভে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বৈবস্বত মনুকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ॥৪৬॥

ভগবান রামচন্দ্রই পূর্বকালে এক লক্ষ যোজন বিস্তার বিশিষ্ট কচ্ছপ রূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র মন্থন সময়ে আপন পৃষ্ঠোপরি সুমেরু পর্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। ॥৪৭॥

কোন সময় বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার কালে এই মহাত্মাই অতি দুর্বৃত্ত হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। ॥৪৮॥

এই শ্রীরঘুনন্দনই নৃসিংহ শরীর ধারণ করতঃ লোকত্রয়ের কণ্টক স্বরূপ হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে নিধন করিয়াছিলেন। ॥৪৯॥

এই রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র বামন অবতারে বলিকে বন্ধন পূর্বক সম্পূর্ণ লোকত্রয় স্বীয় তিন পদক্ষেপে ব্যাপ্ত করতঃ আপন সেবক ইন্দ্রকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। ॥৫০॥

যখন রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়রূপে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়াছিল তখন এই শ্রীরামচন্দ্রই পরশুরামরূপে তাহাদের বহুবার সংগ্রামে নিধন করতঃ পৃথিবী জয় করিয়া তাহা কশ্যপমুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ॥৫১॥

বর্তমানে সেই পরাৎপর প্রভুই রঘুবংশে শ্রীরামরূপে আপনার জন্যই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। ॥৫২॥

আপনি তাঁহার পত্নী সীতাকে আমার পুত্রের মৃত্যু এবং নিজেরও নিধনের নিমিত্ত, বলপ্রয়োগ করিয়া তপোবন হইতে অপহরণ করিয়াছেন কেন? ॥৫৩॥

আপনি এখনও জানকীকে শ্রীরঘুনাথের নিকট প্রেরণ করুন এবং বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করুন। তখন আমরা উভয়ে (বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করতঃ) বনে গমন করিব।" ॥৫৪॥

মন্দোদরীর বচন শুনিয়া রাবণ বলিল—"অয়ি ভদ্রে! যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে আপন পুত্রগণ, ভ্রাতা এবং সমস্ত রাক্ষসকুল ধ্বংস করাইয়া আমি এখন বনবাসী হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? অতএব আমিও শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাঁহার শীঘ্রগামী বাণে বিদ্ধ ও বিদীর্ণ হইয়া সেই বিষ্ণুভগবানের পরমধাম প্রাপ্ত হইব। শ্রীরাম সাক্ষাৎ বিষ্ণু এবং জানকী ভগবতী লক্ষ্মী, ইহা জানিয়াই আমি 'শ্রীরামের হস্তে নিহত হইয়া তাঁহার পরমপদ প্রাপ্ত হইব' —এই অভিপ্রায়ে জনকনন্দিনী সীতাকে তপোবন হইতে বলপ্রয়োগ পূর্বক লইয়া আসিয়াছি। হে প্রিয়ে! আমি এখন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্য রাক্ষসবীরগণ সহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। ॥৫৫-৫৮॥

এবং মুমুক্ষুগণ যে বিশুদ্ধা পরমানন্দময়ী গতি লাভ করিয়া থাকেন, সংগ্রামে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া আমি সেই গতি লাভ করিব। ॥৫৯॥

এই প্রকারে স্বকীয় সমগ্র পাপপুঞ্জ প্রক্ষালন কবতঃ আমি দুর্লভ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইব। ॥৬০॥

যে সংসার সাগরে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ নামক পঞ্চ ক্লেশ রূপ তরঙ্গ, ভ্রমরূপ ঘূর্ণিপাক, স্ত্রীপুত্র স্বজন, বিভব এবং বন্ধু আদি মৎস্য ও আপন ক্রোধরূপী বাড়বানল (সমুদ্রোত্থিত অগ্নি) বিদ্যমান, এবং যাহার মধ্যে কামরূপী জাল বিস্তৃত, সেই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আমি শ্রীহরিপদ প্রাপ্ত হইব।" ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে যুদ্ধ কাণ্ডে দশম সর্গ

একাদশ সর্গ

রাম-রাবণ সংগ্রাম ও রাবণ বধ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

মহারাণী মন্দোদরীকে প্রেমপূর্বক আশ্বস্ত করিয়া রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রণভূমিতে গমন করিল। ॥১॥

মহাভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ পরিবৃত হইয়া সে এক সুদৃঢ় রথোপরি উপবিষ্ট হইল। ষোলটি চক্র বিশিষ্ট সেই রথে বরূথ (রথগুপ্তিস্থান, রথরক্ষার্থ লৌহাবরণ) ও কুবর (বন্ধনার্থ কাষ্ঠবিশেষ) সংলগ্ন ছিল। ॥২॥

পিশাচ সদৃশ মুখ বিশিষ্ট অশ্বতর অর্থাৎ খচ্চর চালিত এবং সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ও সর্বযুদ্ধসামগ্রীপূর্ণ সেই রথ অতি ভয়াবহ দেখাইতেছিল। ॥৩॥

এই প্রকারে মহাভয়ঙ্কর রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কাপুরী মধ্য হইতে সহসা বহির্নিগত হইল। যুদ্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভীষণাকৃতি রাবণকে আসিতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র-পালিত বানর সেনা ভয়ভীত হইয়া পড়িল। ॥৪-৫॥

তখন হনুমান রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উল্লম্ফন পূর্বক সম্মুখে অগ্রসর হইল। নিকটে আসিয়াই অতুল পরাক্রমী পবনকুমার মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতঃ অতিশয় বেগে রাবণের বক্ষদেশে তীব্র আঘাত করিল। সেই মুষ্টিপ্রহারে রাবণ জানু অবনত করতঃ রথোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ॥৬-৭॥

এক মুহূর্ত মূর্চ্ছিতাবস্থায় থাকিয়া ও তদনন্তর সচেতন হইয়া রাবণ হনুমানকে বলিল—"হাঁ, আমি স্বীকার করি, তুমি বস্তুতঃই এক মহা শূরবীর বটে!" ॥৮॥

তখন হনুমান বলিল—"ওরে রাবণ! আমাকে ধিক্কার যে আমার মুষ্ট্যাঘাতের পর তুই এখনও জীবিত আছিস্। আচ্ছা, তুই আমার বক্ষদেশে মুষ্ট্যাঘাত কর্! ॥৯॥

পুনরায় আমার মুষ্ট্যাঘাতে তোর প্রাণবিয়োগ হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।" তখন রাবণ তাহাতে সম্মত হইয়া হনুমানের বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত করিল। ॥১০॥

সেই আঘাতে হনুমানের নেত্র বিঘূর্ণিত হইল ও কিঞ্চিৎকাল মূর্চ্ছা অবস্থার পর পুনঃ সচেতন হইয়া কপিরাজ হনুমান রাবণকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ॥১১॥

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ভয়ভীত হইয়া অন্যদিকে পলায়ন করিল। হনুমান, অঙ্গদ, নল ও নীল এই চারিজন একত্রিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, অগ্নিবর্ণ, সর্প-রোমা, খড়্গ-রোমা এবং বৃশ্চিক-রোমা নামক রাক্ষসচতুষ্টয়কে দেখিয়া তাহারা চারিজন ক্রমশঃ ঐ মহাপরাক্রমী রাক্ষস চতুষ্টয়কে হত্যা করিল। এবং পৃথকভাবে গর্জন করিতে করিতে শ্রীরঘুনাথের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ॥১২-১৪॥

অতঃপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর দশগ্রীব রাবণ ক্রোধে দন্তদ্বারা নিজের ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে বিস্ফারিত নয়নে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল। রাবণ রথারূঢ় হইয়া মেঘ যে প্রকার জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে তদ্রূপ মহাভয়ঙ্কর বজ্রসদৃশ বাণসমূহ দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে পীড়িত করিতে লাগিল এবং শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখেই সমস্ত বানরগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। ॥১৫-১৭॥

তখন শ্রীরামচন্দ্রও অতি সাবধানতার সহিত রণভূমিতে রাবণের প্রতি অগ্নিসমান তেজস্বী সুবর্ণভূষিত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। (স্বর্গ হইতে) ইন্দ্র দেখিলেন যে রাবণ রথারূঢ় হইয়া আছে এবং শ্রীরামচন্দ্র ভূমির উপর দণ্ডায়মান। তখন তিনি সারথি মাতলিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন— ॥১৮-১৯॥

হে অনঘ! তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া (ভূর্লোকে) শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন কর এবং আমার কার্য সম্পাদন কর। দেখ, শ্রীরঘুনাথ (রথাভাবে) ভূমির উপর দণ্ডায়মান। ॥২০॥

ইন্দ্রের এই আদেশ পাইয়া দেবসারথি মাতলি তাঁহাকে প্রণাম করতঃ তাহার উত্তম রথে হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট অশ্ব সংযোজন করিয়া ভগবান রামচন্দ্রের বিজয়ার্থ স্বর্গ হইতে প্রস্থান করিয়া ভূর্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল এবং যুক্তকরে তাঁহাকে বলিল—"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ॥২১-২২॥

হে প্রভো! দেবরাজ ইন্দ্রের এই রথটি তিনি আপনার বিজয়ের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। এবং হে মহারাজ! রথসহ শোভায়মান ঐন্দ্রধনুক, অভেদ্য কবচ, খড়গ ও দুইটি দিব্য তূণীরও পাঠাইয়াছেন। হে রাম! আমাকে সারথিরূপে লইয়াই ইন্দ্র যে প্রকার বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার হে দেব! আপনিও এই রথে আরূঢ় হইয়া রাক্ষস রাবণকে বধ করুন।" মাতলি এই প্রকার বলিবার পর শ্রীরামচন্দ্র সেই উত্তম রথকে পরিক্রমা করতঃ প্রণাম পূর্বক সেই দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ॥২৩-২৫॥

তাহাতে চতুর্দিকে সর্বলোক শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। অতঃপর মহাত্মা রাম ও বুদ্ধিমান রাবণের মহা ভয়ানক ও রোমাঞ্চকারী ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অস্ত্রবিদ্যা পরমকুশল শ্রীরামচন্দ্র রাবণের আগ্নেয়াস্ত্রকে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা এবং দৈবাস্ত্রকে দৈবাস্ত্রদ্বারা প্রতিহত করিতে লাগিলেন। তখন অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহা ভয়ঙ্কর রাক্ষসাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ॥২৬-২৮॥

রাবণের ধনুর্মুক্ত সুবর্ণময় পঞ্চতুল্য ভাসমান বাণসমূহ মহাবিষধর সর্পরূপ ধারণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল। ॥২৯॥

তাহাদের মুখে অগ্নি নির্গত হইতেছিল, রাবণের সেই সকল সর্পমুখ বাণদ্বারা তৎকালে সম্পূর্ণ দিক্‌বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। ॥৩০॥

রণভূমির সর্বত্র সর্পব্যাপ্ত দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহাভয়ঙ্কর গরুড়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ॥৩১॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণ সর্পগণের শত্রু গরুড় রূপ ধারণ করিয়া সর্পরূপ সকল বাণসমূহকে বিনাশ করিতে লাগিল। ॥৩২॥

শ্রীরাম দ্বারা আপন শস্ত্র প্রতিহত হইতে দেখিয়া রাবণ তাহার উপর ভয়ঙ্কর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ॥৩৩॥

এবং অক্লিষ্ট কর্মা (লীলাবিহারী) শ্রীরামচন্দ্রকে তীব্র বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত করিয়া সারথি মাতলিকে বাণবিদ্ধ করিল। ॥৩৪॥

ক্রোধে উন্মত্ত রাবণ ইন্দ্রপ্রেরিত রথের সুবর্ণময়ী ধ্বজাটিকেও কাটিয়া উহা ঐ রথের পৃষ্ঠদেশে নিক্ষেপ করিল এবং ইন্দ্রদত্ত অশ্বগুলিকেও ক্ষত-বিক্ষত করিল। ॥৩৫॥

ভগবানকে এইরূপ দুঃখ-ক্লিষ্ট দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব, চারণ ও পিতৃগণ আদি সকলে বিষাদগ্রস্ত হইলেন এবং মহর্ষিগণও মনে মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলেন। ॥৩৬॥

বিভীষণ সহিত সমস্ত বানর যূথপতিগণ অতি দুঃখিত হইলেন। ঐ সময় ধনুকবাণ হস্তে দশমুখ এবং বিংশতি হস্তবিশিষ্ট রাবণকে মৈনাক পর্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল। ক্রোধে

শ্রীরামচন্দ্রের নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি ভ্রূকুটিবদ্ধ নয়নে রাক্ষসকে যেন ভস্ম করিয়া ফেলিবেন এইরূপ ক্রোধাবেশে ইন্দ্রধনুক তুল্য একটি বিচিত্র ধনুক এবং কালাগ্নি তুল্য তেজোময় একটি বাণ হস্তে ধারণ করতঃ সমীপবর্তী শত্রুর উপর এইরূপ দৃষ্টিপাত করিলেন যেন এখনই তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ॥৩৭-৪০॥

তখন কালরূপী ভগবান রাম যেন স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া সকলের সম্মুখে আপন পরাক্রম প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। ॥৪১॥

তিনি আপন ধনুক আকর্ষণ করতঃ রাবণকে বিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ বানর সৈন্যগণকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহাকে যেন লোকান্তকারী কাল সদৃশ দেখাইতেছিল। ॥৪২॥

শত্রুগণের প্রতি ধাবনকারী ভগবান রামচন্দ্রের ক্রোধাবিষ্ট বদন দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভয়ভীত হইতে লাগিল এবং বসুন্ধরাও কম্পিত হইতে লাগিল। ॥৪৩॥

শ্রীরামের এই মহান রৌদ্ররূপ এবং নানা দারুণ উৎপাত সমূহ দেখিয়া সর্বপ্রাণীগণের মধ্যে মহা ত্রাসের সঞ্চার হইল। এবং রাবণের অন্তঃকরণেও আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। ॥৪৪॥

ঐ সময় দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ বিমানে আরোহণ করতঃ জগতের মহাপ্রলয় সদৃশ এই ঘোর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরামচন্দ্র ঐন্দ্রাস্ত্র সহায়ে রাবণের শিরচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। ॥৪৫॥

তখন রাবণের রুধিরাপ্লুত মস্তকসমূহ আকাশমণ্ডল হইতে এইরূপ ভূপতিত হইতে লাগিল যেন তালবৃক্ষ হইতে নিম্নে সুপক্ক তালফল পতিত হইতেছে। ॥৪৬॥

ঐ সময় দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, অথবা দিকসকল কিছুই স্পষ্ট অনুভব হইতেছিল না এবং ঐ সংগ্রামভূমিতে রাবণের রূপও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না (কেবল রাবণের ছিন্নমুণ্ড সমূহই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল)। ॥৪৭॥

ইহাতে শ্রীরামচন্দ্র অতি বিস্মিত হইলেন। (তিনি ভাবিতে লাগিলেন) 'আমি তুল্য-তেজবিশিষ্ট একশত একটি মস্তক ছিন্ন করিয়াছি। ॥৪৮॥

কিন্তু তথাপি রাবণ হতসংজ্ঞ বা বিগতপ্রাণ হইল না।' তখন বহু অস্ত্রসম্পন্ন ও সর্বাস্ত্র বিশারদ দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৌশল্যানন্দ-বর্ধনকারী শ্রীরামচন্দ্র বিচার করিলেন—'আমি যে বাণসমূহের দ্বারা বহু তেজস্বী ও পরাক্রমী দৈত্যগণকে বধ করিয়াছি, এই রাবণকে বধ করিতে তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইল।' ভগবান রামচন্দ্রকে এইপ্রকার চিন্তাকুল দর্শন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান বিভীষণ বলিলেন—"ভগবন্! রাবণ ব্রহ্মার প্রদত্ত বর-প্রাপ্ত। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—'রাবণের মস্তক ও বাহু ছিন্ন হইলেও পুনঃ শীঘ্রই নূতন মস্তক ও বাহু উৎপন্ন হইবে।' ইহার নাভিদেশে কুণ্ডলাকারে অমৃত বিদ্যমান। ॥৪৯-৫৩॥

আপনি আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা উহা শোষণ করুন। তখনই উহার মৃত্যু হইবে।" বিভীষণের বচন শুনিয়া শীঘ্র-পরাক্রমী ভগবান রামচন্দ্র আপন ধনুকে আগ্নেয়াস্ত্র সংযোজন করিয়া তাহা

রাক্ষসের নাভিদেশে নিক্ষেপ করিলেন ও তদনন্তর মহাবলী রামচন্দ্র রাবণের মস্তক ও বাহুসকল ছেদন করিলেন। ইহাতে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে বধ করিবার জন্য এক ভয়ানক 'শক্তি' নিক্ষেপ করিল। কিন্তু শ্রীরঘুনাথ শীঘ্রই উহা সুবর্ণমণ্ডিত বাণসমূহ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ॥৫৪-৫৭॥

মস্তক ছিন্ন হওয়াতে রাবণের তেজ তাহার দেহ ইহতে নির্গত হইল। এবং ঐ ভয়ঙ্কর শিরসমূহ ছিন্ন হওয়াতে রাবণের শরীর যেন ম্লান ও বিরূপ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ॥৫৮॥

তখন রাবণের একটি মুখ্য মস্তক ও দুইটি বাহুমাত্র অবশিষ্ট রহিল কিন্তু তথাপি রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান রামের উপর নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপ শ্রীরামচন্দ্রও রাবণের উপর ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণ করিলেন। তখন সেখানে রোমাঞ্চকারী ঘোর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ॥৫৯-৬০॥

তখন মাতলি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে—"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! রাবণকে বধ করিবার জন্য অতি শীঘ্রই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করুন। ॥৬১॥

দেবতাগণ ইহার বিনাশের জন্য যে সময় নিশ্চিত করিয়াছেন তাহা এইক্ষণেই উপস্থিত। হে রাঘব! আপনি ইহার মস্তক ছেদন করিবেন না। ॥৬২॥

কারণ হে প্রভো! মস্তক ছেদন করিলে ইহার মৃত্যু হইবে না। মর্মস্থান হৃদয় বিদ্ধ হইলেই ইহার বিনাশ হইবে।" মাতলি স্মরণ করাইয়া দিবার পর ভগবান রামচন্দ্র সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ করতঃ এক পরমতেজস্বী বাণ গ্রহণ করিলেন। সেই বাণের পার্শ্বভাগে পবন, ফলকের উপর সূর্য ও অগ্নি, গুরুত্বে সুমেরু ও মন্দারাচল সদৃশ তথা পর্বদেশে (গ্রন্থিদেশে) মহাতেজস্বী লোকপালগণ স্থাপিত ছিলেন। এবং সেই বাণের শরীর ছিল আকাশময়। ॥৬৩-৬৫॥

সেই বাণ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সূর্যসদৃশ প্রকাশমান ছিল। সর্বলোকের ভয়নাশকারী অত্যন্ত উগ্র এবং অদ্ভুত সেই অস্ত্র মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বেদোক্ত বিধি অনুসারে অভিমন্ত্রিত করতঃ আপন ধনুকে সন্ধান করিলেন। ॥৬৬-৬৭॥

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সেই বাণ ধনুকে সংযোজিত হইতে দেখিয়া সর্বপ্রাণী ভয়ভীত হইয়া পড়িল এবং পৃথিবীও কম্পিত হইতে লাগিল। ॥৬৮॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তমরূপে ধনুক আকর্ষণ করতঃ অতি সাবধান চিত্তে সেই মর্মঘাতী বাণ রাবণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ॥৬৯॥

বজ্রপাণি ইন্দ্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় অতীব ভয়ঙ্কর মুখবিশিষ্ট কৃতান্ততুল্য সেই অসহ্য বাণ রাবণের বক্ষস্থলে নিপতিত হইল। ॥৭০॥

সেই শরীরান্তকারী মহাভয়ঙ্কর বাণ রাবণের শরীরে প্রবেশ করিল ও তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিল। ॥৭১॥

রাবণের প্রাণ হরণ করিয়া উহা পৃথিবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং রাবণকে বিনাশ করিবার পর পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের তূণীরে ফিরিয়া আসিল। ॥৭২॥

বাণাহত রাবণের মহাধনুক বাণসহিত তাহার হস্ত হইতে শীঘ্রই স্খলিত হইল এবং রাক্ষসরাজ প্রাণরহিত হইয়া বিঘূর্ণিত মস্তকে ভূমিতলে পতিত হইল। ॥৭৩॥

রাবণকে ভূপতিত হইতে দেখিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ অনাথ হইয়া ভয়-ত্রস্ত চিত্তে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। ॥৭৪॥

সমর বিজয়ী বানরগণ তখন অতি উৎফুল্লচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের জয় ও রাবণের পরাজয় ঘোষণা করিতে করিতে 'ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জয় ও রাবণের ক্ষয়' শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। তখন অন্তরীক্ষ মণ্ডলেও দিব্যগম্ভীর দুন্দুভি নিনাদ হইতে লাগিল। ॥৭৫-৭৬॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপর তখন চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং মুনি, সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিল। ॥৭৭॥

অন্তরীক্ষে সর্বত্র অপ্সরাগণ অতি প্রসন্নচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় রাবণের দেহ হইতে সূর্যসম প্রকাশমান একটি জ্যোতি নির্গত হইয়া সর্ব দেবগণের দৃষ্টি-সম্মুখেই রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া দেবগণ বলিতে লাগিলেন—"অহো! মহাত্মা রাবণের কি ভাগ্য! ॥৭৮-৭৯॥

আমরা সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবগণ বিষ্ণুভগবানের করুণাভাজন হইয়াও ভয়-দুঃখাদি পরিব্যাপ্ত এই সংসারে পুনরাবর্তিত হইতেছি। ॥৮০॥

কিন্তু এই মহাক্রুর, রাক্ষস রাবণ ব্রহ্মঘাতী, মহাতমোগুণী, পরদারাসক্ত, ভগবৎবিদ্বেষী এবং তাপসগণের হিংসক। ॥৮১॥

কিন্তু দেখ, আমাদের সকলের চক্ষুর সম্মুখেই সে ভগবান রামচন্দ্রের শরীরে বিলীন হইয়া গেল।" দেবগণ এই প্রকার বলিবার পর মৃদু হাস্য সহকারে নারদ বলিলেন— ॥৮২॥

"হে দেবগণ! তোমরা ধর্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অবগত আছ। অতএব শোন ঃ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দ্বেষবশতঃ সেবকগণ সহিত রাবণ অহর্নিশি আপন হৃদয়ে সর্বদা শ্রীরামচন্দ্র চরিত্র ধ্যান করিত এবং রামের হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে শুনিয়া ভয়ে সর্বত্র রামকেই দর্শন করিত এবং নিত্য স্বপ্নেও তাহার রামদর্শন হইত। এই প্রকারে রাবণের (শ্রীরামের প্রতি) ক্রোধও গুরুমুখে শ্রুত উপদেশ হইতে অধিকতর উপযোগী হইয়াছিল। ॥৮৩-৮৫॥

অন্তকালে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হওয়াতে তাহার সমস্ত পাপরাশি বিধৌত হইয়া গেল। অতএব সর্ববন্ধন মুক্ত হইয়া রাবণ রাম-সাযুজ্য মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। ॥৮৬॥

যদি কেহ (পূর্বে) মহাপাপী, দুরাচারী এবং পরধন ও পরস্ত্রীতে আসক্তও হয় তথাপি যদি নিত্য প্রেমপূর্বক অথবা ভয়ে রঘুকুলতিলক ভগবান রামচন্দ্রকে চিন্তন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে তাহা হইলে সে শুদ্ধচিত্ত হইয়া শত জন্মার্জিত সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়া শীঘ্রই বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান রামচন্দ্রের সুরবরবন্দিত আদিস্থান বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকে। ॥৮৭॥

ত্রিভুবনের কণ্টকস্বরূপ রাবণকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া যিনি আপন বাম হস্তে ধনুকের একটি অগ্রভাগ ভূমিতে স্থাপন করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া অন্য (দক্ষিণ) হস্তে একটি বাণ লইয়া ভ্রামিত

করিতেছেন, যাঁহার নেত্রের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, অসংখ্য বাণাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইলেও যাঁহার শরীর কোটিসূর্যের ন্যায় প্রকাশমান এবং বীরশ্রী সুশোভিত উন্নতদেহ, সেই দেবেন্দ্র-বন্দিত বীরবর রামচন্দ্র আমাকে রক্ষা করুন।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে যুদ্ধ কাণ্ডে একাদশ সর্গ

দ্বাদশ সর্গ

ভ্রাতৃশোকে বিভীষণের বিলাপ ও লক্ষ্মণ কর্তৃক তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান বিভীষণের রাজ্যাভিষেক ও সীতার অগ্নিপরীক্ষা

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ, হনুমান, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, বানররাজ সুগ্রীব, জাম্ববাম এবং অন্যান্য বীরগণকে দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহাদের সকলকে বলিলেন—"আপনাদের বাহুবলেই আজ আমি রাবণকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ৷৷১-২৷৷

যাবৎ চন্দ্রদিবাকর আপনাদের এই পবিত্র কীর্তি বিদ্যমান থাকিবে এবং যাহারা আমার ও আপনাদের সকলের কলিমলহারিণী, ত্রিলোকপাবনী পবিত্র কথা কীর্তন করিবে তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।" এই সময়ে রাবণকে প্রাণহীন দেখিয়া তাহার সুপালিতা মন্দোদরী আদি সমস্ত পত্নিগণ পতির নিকটে ভূপতিত হইয়া শোকে বিলাপ করিতে লাগিল। ৷৷৩-৫৷৷

বিভীষণও মহাশোকে কাতর হইয়া রাবণের পার্শ্বে পতিত হইলেন ও নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৷৷৬৷৷

তখন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—"হে মানদ! বিভীষণকে প্রবোধ দান কর এবং বল যে সে শীঘ্র ভ্রাতার (ঔর্ধ্বদৈহিক) সংস্কার করুক। আর বিলম্বের কি প্রয়োজন? ৷৷৭৷৷

এবং মন্দোদরী আদি যে স্ত্রীগণ বারম্বার ভূপতিত হইয়া বিলাপ করিতেছে, রাবণের সেই প্রেয়সী রাক্ষসীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ ঐরূপ করিতে নিষেধ কর।" ৷৷৮৷৷

শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার বলিবার পর লক্ষ্মণ মৃত রাবণের পার্শ্বে মহাশোকে মুহ্যমান ও মৃতবৎ পতিত বিভীষণের নিকট আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন— ৷৷৯৷৷

"বিভীষণ! তুমি দুঃখে যাহার জন্য শোক করিতেছ সে তোমার কে? ৷৷১০৷৷

জন্ম হইবার পূর্বে, এখন বা অতঃপর, তুমিই বা ইহার কে? জলপ্রবাহে পতিত বালুকারাশি যে প্রকার সেই প্রবাহের অধীন হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, দেহধারী প্রাণিগণও সেই প্রকার কালগতিবশীভূত হইয়াই পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। বীজ হইতে যে প্রকার অন্য বীজ উৎপন্ন হয় এবং তাহা নষ্ট হইয়া যায় তদ্রূপ ভগবানের মায়াদ্বারা প্রেরিত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণ অন্য প্রাণী হইতে উৎপন্ন ও তৎপর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তোমার আমার, ইহাদের বা অন্য সকলেরই এই প্রকারে কালবশীভূত হইয়া জন্ম হইয়াছে। ৷৷১১-১৩৷৷

জন্ম ও মৃত্যু যে সময় বা যেরূপে হইবার, সেই সময় উহা তদ্রূপেই হইয়া থাকে। জন্মরহিত ঈশ্বরই প্রাণিগণ হইতে অন্য প্রাণী সৃষ্টি করেন। সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়াও বালকের ন্যায় বিনোদ বা লীলা করিবার জন্য স্বসৃষ্ট অস্বতন্ত্র প্রাণিগণ হইতেই অন্য সমস্ত প্রাণিগণকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন ও তৎপর বিনাশ করিয়া থাকেন। দেহ সংযোগ বশতঃ জীবকে দেহী বলা হয় এবং দেহও অন্যদেহ অর্থাৎ মাতাপিতার দেহ হইতে বীজ যে প্রকার অন্য বীজ হইতে উৎপন্ন হয় তদ্রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সনাতন আত্মা দেহ হইতে পৃথক। দেহ, দেহী এইরূপ বিভাগও অবিবেকবশতঃ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দেহের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধই নাই। ৷৷১৪-১৬৷৷

কাষ্ঠগত আকারাদি বিক্রিয়া যেরূপ বৃথাই অগ্নিতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তদ্রূপ সাক্ষী আত্মাতে নানাত্ব, জন্ম, মরণ, ক্ষয়, বৃদ্ধি, কর্ম ও কর্মফলাদি প্রতীত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সকল আত্মার ধর্ম নহে।

মিথ্যা ভ্রান্তিবশতঃ আত্মার সহিত দেহের সংযোগজনিত পূর্বোক্ত সর্বধর্ম সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। সেই প্রকার সত্য আত্মার স্বরূপ নিশ্চয় করতঃ আত্মার ধ্যানে নিরত থাকিলে উহা (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ধর্মসমূহ) ক্রমে অসত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ৷৷১৮৷৷

গাঢ় সুষুপ্তি অবস্থায় নিদ্রিত পুরুষের তৎকালে অহঙ্কারের অভাব বশতঃ যে প্রকার জগৎ প্রতীতি হয় না, সেই প্রকার অহঙ্কার বিহীন মুক্ত পুরুষের জীবদ্দশাতেও দ্বৈত প্রপঞ্চের ভান (প্রতীতি) হয় না। ৷৷১৯৷৷

অতএব তুমি অহঙ্কার, মমতা এবং ভ্রান্তিরূপ মায়াময় মনোধর্ম পরিত্যাগ কর। এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় সম্বন্ধ হইতে মনকে উপরত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে আপন স্বরূপ ও সর্বভূত-আত্মা পরমেশ্বর মায়া-মনুষ্যরূপ ভগবান রামচন্দ্রের ধ্যানে নিবিষ্ট কর। ৷৷২০-২১৷৷

বাহ্য বিষয়ে দোষচিন্তন পূর্বক চিত্তকে রামানন্দে নিযুক্ত কর, (অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে নিযুক্ত কর)। দেহবুদ্ধিবশতঃই এই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ, প্রিয়জন, এই সকল ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে। ৷৷২২৷৷

বিশুদ্ধান্তঃকরণে যখন দেহ হইতে পৃথকরূপে আত্মার অনুভব হয় তখন কে কাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু অথবা সুহৃদ? ৷৷২৩৷৷

স্ত্রী ও দেহ আদি, শব্দাদি বিষয়, বিবিধ সম্পদ, বল, ধনাগার, ভৃত্যবর্গ, পৃথিবী ও পুত্রাদি এই সকলই অজ্ঞানজনিত বলিয়া ক্ষণভঙ্গুর এবং তাহাদের সহিত মিলনও ক্ষণস্থায়ী। ৷৷২৪-২৫৷৷

অতএব উঠ, হৃদয়ে ভাবিত ভগবান রামচন্দ্রের স্মরণ করতঃ নিরন্তর প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে রাজ্যাদি পালন কর। ৷৷২৬৷৷

ভূত ও ভবিষ্যতের চিন্তা না করিয়া কেবল বর্তমান বিষয়েই ন্যায়ানুকূল আচরণ কর। ইহাতে তুমি সংসার দোষে লিপ্ত হইবে না। ৷৷২৭৷৷

ভগবান রামচন্দ্র তোমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি আপন ভ্রাতার ঔর্ধ্বদৈহিক কর্মসকল শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন কর। হে মহাবুদ্ধিমান! এই রোদন-পরায়ণা স্ত্রীগণকে ক্রন্দন

করিতে নিষেধ কর, এবং তাহারা শীঘ্রই লঙ্কাপুরীতে গমন করুক"। লক্ষ্মণের যুক্তিযুক্ত বচন শুনিয়া বিভীষণ শোক ও মোহ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। ধর্মজ্ঞ বিভীষণ আপন মনে কিছু বিচার করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের অনুবর্তন করিবার জন্য এই প্রকার ধর্মার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন—"প্রভো! এই রাবণ অতীব নৃশংস, মিথ্যাবাদী, ক্রূর এবং সর্বধর্মব্রত আদি রহিত ছিল। হে দেব! এই পরস্ত্রীগামীর সংস্কার করিতে আমি সমর্থ নহি।" বিভীষণের বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—"ভাই! শত্রুতা মৃত্যু পর্যন্তই বর্তমান থাকে, আমাদের সর্বপ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন এ যেমন তোমার, তেমনি আমার। অতএব ইহার পারলৌকিক সংস্কার কর।" ॥২৮-৩৩॥

তখন ভগবান রামচন্দ্রের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বিভীষণ শীঘ্রই সান্ত্বনা বাক্যে মহা বুদ্ধিমতী রানী মন্দোদরীকে আশ্বস্ত করিলেন। এবং তদনন্তর ধর্মাত্মা ধর্মবুদ্ধি ও ধর্মজ্ঞ বিভীষণ আপন বন্ধুবান্ধবগণকে রাবণের অন্তিম সংস্কার শীঘ্র করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ॥৩৪-৩৫॥

বিভীষণ পিতৃমেধ বিধান অনুসারে শবদেহ চিতার উপরে বিধিপূর্বক স্থাপন করিলেন এবং অগ্নিহোত্রিগণ যে প্রকার করিয়া থাকেন সেই প্রকার আপন বন্ধুবান্ধব ও মন্ত্রিগণসহ মিলিত হইয়া রাবণের সর্বপ্রকার অন্ত্যেষ্টি সংস্কার করিলেন ও তদনন্তর বিভীষণ বিধিবৎ চিতাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। ॥৩৬-৩৭॥

অতঃপর স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে তিল-কুশ মিশ্রিত জলদ্বারা বিধিবৎ জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ॥৩৮॥

তদনন্তর ভূমিষ্ঠ হইয়া তিনি প্রণাম করিলেন এবং রাবণের স্ত্রীগণকে বারম্বার সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করতঃ বলিলেন, 'এখন আপনারা সকলে পুরীমধ্যে গমন করুন।' ॥৩৯॥

তখন তাহারাও সকলে লঙ্কাপুরীমধ্যে গমন করিলেন। সমস্ত রাক্ষসীগণের পুরীমধ্যে গমন করিবার পর বিভীষণ অতি বিনীতভাবে শ্রীরামচন্দ্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। শত্রুসমূহের নাশ হওয়াতে, বৃত্রাসুরবধে ইন্দ্রের যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, সেনা সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ সহিত ভগবান রামচন্দ্রেরও সেইরূপ আনন্দ হইল। অতঃপর মাতলি শ্রীরামচন্দ্রকে পরিক্রমা এবং প্রণাম করিয়া তাহার আজ্ঞায় আকাশমার্গে স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। তখন প্রসন্নচিত্তে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই প্রকার বলিলেন— ॥৪০-৪৩॥

"আমি তো বিভীষণকে লঙ্কার রাজ্য পূর্বেই প্রদান করিয়াছি, তথাপি তুমি পুনরায় এই সময় লঙ্কায় গমন করতঃ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক মন্ত্রপাঠ পূর্বক বিধিবৎ বিভীষণের রাজ্যাভিষেক করাও।" শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণ বানরগণ সহিত শীঘ্রই লঙ্কাপুরীতে গমন করতঃ সমুদ্র জলপূর্ণ অসংখ্য সুবর্ণ কলসদ্বারা মহাবুদ্ধিমান রাক্ষসরাজ বিভীষণের শুভ রাজ্যাভিষেক করাইলেন। ॥৪৪-৪৬॥

তখন পুরবাসিগণ সহ হস্তে নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য লইয়া লক্ষ্মণসহ বিভীষণ ঐ সকল উপহার দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া লীলাপ্রিয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও বিভীষণের রাজ্যপ্রাপ্তিতে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং লক্ষ্মণসহ আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। তদনন্তর সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করতঃ শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—॥৪৭-৪৯॥

"হে বীর! তোমার সহায়তা দ্বারাই আমি মহাবলী রাবণকে জয় করিয়াছি, আর হে অনঘ! বিভীষণকেও লঙ্কার রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি।" ॥৫০॥

অতঃপর আপন পার্শ্বে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হনুমানকে বলিলেন—"বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তুমি রাবণের মহলে গমন কর। ॥৫১॥

এবং জানকীকে রাবণ বধাদি সর্ব বৃত্তান্ত শুনাও এবং তাহার উত্তরে জানকী কি বলিলেন, তাহা সব আমাকে আসিয়া জানাও।" ॥৫২॥

বুদ্ধিমান পবননন্দন হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া নিশাচরগণ তৎপ্রীত্যর্থ নানাপ্রকারে পূজা করিতে লাগিল। ॥৫৩॥

রাবণের মহলে প্রবেশ করিয়া শিংশপা বৃক্ষের মূলদেশে উপবিষ্টা অতি দুর্বল, দুঃখিনী অনিন্দিতা জনকনন্দিনীকে সে দেখিতে পাইল। ॥৫৪॥

রাক্ষসীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু জানকী তখন একমাত্র ভগবান রামচন্দ্রের ধ্যানেই নিমগ্না ছিলেন। পবনকুমার অতি বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ॥৫৫॥

এবং অত্যন্ত ভক্তি ও নম্রতার সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে দেখিয়া জানকী কিছুকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবার পর তাঁহার পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইল। ॥৫৬॥

তখন তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের দূত জানিয়া সীতার মুখ আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে প্রসন্নমুখী দেখিয়া হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের সর্ববৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। ॥৫৭॥

"দেবি! বিভীষণ যাঁহার সহায়ক সেই শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বানর সেনা সহিত কুশলেই আছেন। ॥৫৮॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে পুত্র, সেনা ও মন্ত্রিগণ সহিত বধ করতঃ এবং লঙ্কার রাজ্য বিভীষণকে প্রদান করতঃ তাঁহার কুশল বার্তা আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ॥৫৯॥

পতির প্রিয় সন্দেশ শুনিয়া হর্ষ গদ্‌গদ স্বরে সীতা হনুমানকে বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার কি প্রিয় করিতে পারি? ত্রিভুবনেও তোমার প্রিয় বাক্যের সমতুল্য রত্ন আভরণ আদি আমি দেখিতেছি না! (যাহা প্রদান করতঃ আমি তোমার ঋণ মুক্ত হইতে পারি)।" জানকী এই প্রকার বলিবার পর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান বলিল— ॥৬০-৬১॥

"মাতঃ! শত্রুগণ নাশ করিয়া স্বস্থচিত্তে বিরাজমান বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিতেছি— ইহাই আমার পক্ষে নানাপ্রকার রত্নরাশি এবং দেবরাজ্যাপেক্ষাও সর্বাধিক বাঞ্ছিত।" ॥৬২॥

হনুমানের এই কথা শুনিয়া মিথিলেশকুমারী তাহাকে বলিলেন—"হে সৌম্য! সর্ব শুভ গুণ তোমাতে বিদ্যমান। ॥৬৩॥

এখন আমি শীঘ্র রঘুনাথকে দর্শন করিব। তিনি সত্বর আমাকে সেই আদেশ করুন।" তখন হনুমান তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শ্রীরঘুনাথকে দর্শন করিবার জন্য প্রস্থান করিল। ॥৬৪॥

সেখানে যাইয়া হনুমান জানকী কথিত সম্যক্ ভাষণ শ্রীরামচন্দ্রকে শুনাইয়া বলিল—ভগবন্! যাঁহার জন্য এই যুদ্ধাদি যাবতীয় কর্ম আরব্ধ হইয়াছিল এবং যিনি এই সমস্ত কর্মের ফল-স্বরূপা সেই শোকসন্তপ্তা মিথিলেশকুমারী দেবী জানকীকে (আনাইয়া) দর্শন করুন।" হনুমান এই প্রকার বলিবার পর জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভগবান রামচন্দ্র মায়াসীতা ত্যাগ ও অগ্নিস্থিতা জানকীকে গ্রহণ করিবার জন্য মনে মনে বিচার করিয়া বিভীষণকে বলিলেন— ॥৬৫-৬৭॥

"হে রাজন্! তুমি যাও এবং শীঘ্রই জানকীকে স্নান, বিশুদ্ধ নির্মল বস্ত্র পরিধান ও সম্পূর্ণ অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করাইয়া আমার নিকট আনয়ন কর।" ॥৬৮॥

ইহা শুনিয়া বিভীষণ মারুতিকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই পুরীমধ্যে গমন করিলেন ও শুভলক্ষণা জানকীকে অতি বৃদ্ধা রাক্ষসীগণদ্বারা স্নান ও সম্পূর্ণ বস্ত্র ও আভূষণাদি দ্বারা সুসজ্জিত করাইয়া এক অতি সুন্দর শিবিকাতে আরোহণ করাইলেন এবং তাহা উত্তম কঞ্চুক ও উষ্ণীষ শোভিত যষ্টিধারী রক্ষকগণ পরিবেষ্টিত করিয়া লইয়া চলিলেন। ॥৬৯-৭০॥

সেই সময় সীতাকে দর্শন করিবার জন্য সর্ব বানরবৃন্দ ব্যস্ততা সহিত দ্রুত আগমন করিল। তাহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য তাড়না করিয়া বেত্রপাণি রক্ষকগণ চতুর্দিক হইতে বহুকোলাহলপূর্বক ঐ শিবিকা শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিল। শ্রীরামচন্দ্র দূর হইতেই সীতাকে শিবিকারূঢ়া দেখিয়া বলিলেন— ॥৭১-৭২॥

"বিভীষণ! তোমার এই বেত্রহস্ত রক্ষকবৃন্দ বানরগণকে তাড়না করিতেছে কেন? সমস্ত বানরগণ মাতৃতুল্যা সীতাকে দর্শন করুক। ॥৭৩॥

এবং সীতা আমার নিকটে পদব্রজেই আগমন করুন"। শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সীতা শিবিকা হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন ও ধীরে ধীরে পাদচারণ পূর্বক শ্রীরাম-সান্নিধ্যে আগমন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও (বিচিত্র লীলা-) কার্যবশতঃ-নির্মিতা মায়া-সীতাকে দর্শন করতঃ তাঁহাকে (তাঁহার চরিত্র-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া) অকথ্য ভাষায় বহু অনুযোগ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কথিত দুর্বাক্য সকল সহন করিতে না পারিয়া সীতা লক্ষ্মণকে বলিলেন—"ভগবান রামচন্দ্রের বিশ্বাস ও সর্বলোকের প্রত্যয় জননার্থ হে লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্রই আমার জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।" ॥৭৪-৭৭॥

এ বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মতি বুঝিয়া শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বিশাল কাষ্ঠখণ্ড সমূহ একত্রিত এবং তাহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতঃ নিঃশব্দে শ্রীরামচন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সীতা অতি ভক্তিসহকারে শ্রীরামচন্দ্রকে পরিক্রমা করিলেন। ॥৭৮-৭৯॥

পুনরায় জনকনন্দিনী সীতা সর্বলোক, দেবতা এবং রাক্ষসকুলের স্ত্রীগণের দৃষ্টির সম্মুখেই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করতঃ অগ্নি সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রকার বলিলেন—"যদি আমার হৃদয় এই রঘুনাথ বিনা অন্য কাহারও প্রতি আসক্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে সর্বলোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।" এইরূপ বলিয়া সতী শিরোমণি শ্রীসীতা অগ্নিকে পরিক্রমা করতঃ নির্ভয়চিত্তে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। ॥৮০-৮৩॥

সেই সময় শ্রীসীতাকে মহা প্রচণ্ড অগ্নিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সর্বসিদ্ধ ও ভূতগণ

অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"অহো! সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সব কিছুর যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াও শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় লক্ষ্মীরূপা পত্নী সীতাকে কেন ত্যাগ করিলেন?" ॥৮৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে যুদ্ধ কাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ

দেবগণ কর্তৃক ভগবান রামচন্দ্রের স্তুতি, সীতা সহিত অগ্নিদেবের আবির্ভাব, সকলের অযোধ্যায় প্রস্থান

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

এই সময়ে সহস্রনয়ন ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, মহাতেজস্বী বৃষভবাহন শ্রীমহাদেব, মুনি, সিদ্ধ, চারণগণ সহিত ব্রহ্মবিদ্শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, পিতৃগণ, ঋষি, সাধ্য, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও নাগগণ—ইঁহারা সকলে এবং অন্যান্য দেবগণ শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করতঃ শ্রীরঘুনাথ সমীপে আগমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সকলে পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন— ॥১-৩॥

"আপনি সর্বলোক সমূহের কর্তা, সকলের সাক্ষী, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান স্বরূপ, বসুগণের মধ্যে অষ্টম বসু এবং রুদ্রগণের মধ্যে ভগবান শঙ্কর। ॥৪॥

আপনি সর্বলোকের আদি কর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং সূর্য ও চন্দ্রমা আপনার নেত্রদ্বয়। ॥৫॥

আপনি সর্বলোকের উৎপত্তি ও লয়স্থান, নিত্যস্বরূপ, এক ও সদা প্রকাশস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, সদামুক্ত, নির্গুণ ও অদ্বিতীয়। ॥৬॥

হে রাম! আপনার মায়াদ্বারা আবৃত পুরুষগণের নিকট আপনি মনুষ্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। কিন্তু আপনার নাম স্মরণকারী জনগণ আপনাকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াই জানেন। ॥৭॥

রাবণ আমাদের তেজ ও প্রতিষ্ঠা হরণ করিয়াছিল, সেই দুষ্ট রাবণ আজ আপনার হস্তে নিহত হওয়াতে আমরা আমাদের পদ পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। ॥৮॥

দেবতাগণ এইরূপ স্তুতি করিবার পর সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা প্রণত হইয়া সদা সত্যব্রত-ধারী ভগবান রামচন্দ্রকে বলিলেন। ॥৯॥

ব্রহ্মা বলিলেন—"হে রাম! সম্পূর্ণ প্রাণিগণের স্থিতির কারণ, আত্মজ্ঞানিগণ কর্তৃক স্ব স্ব হৃদয়ে সদা ধ্যেয়, ত্যাজ্য গ্রাহ্য উভয় প্রকার দ্বন্দ্ব রহিত, সর্বাতীত, অদ্বিতীয়, সত্তামাত্র, সর্বহৃদয়ে বিরাজমান এবং সাক্ষীস্বরূপ বিষ্ণু ভগবান আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। ॥১০॥

নির্মোহ সন্ন্যাসিগণ প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিশ্চিত বুদ্ধি সহায়ে হৃদয়ে অবরোধ করিয়া এবং স্ব স্ব সম্পূর্ণ সংশয়-বন্ধন ও বিষয় বাসনা সমূহ ছেদন করতঃ যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই রত্ন-কিরীটধারী সূর্যসম তেজস্বী ভগবান রামকে আমি প্রণাম করিতেছি। ॥১১॥

যিনি মায়াতীত, লক্ষ্মীপতি, সকলের আদি কারণ, জগতের উৎপত্তিস্থান, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাগোচর, মোহ বিনাশক, মুনিগণ-বন্দনীয়, যোগিগণের সদা ধ্যেয়, যোগমার্গ প্রবর্তক, সর্বত্র ব্যাপক অর্থাৎ পরিপূর্ণ এবং সর্বলোকের আনন্দদাতা, সেই পরমসুন্দর ভগবান রামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করিতেছি। ॥১২॥

যিনি ভাব ও অভাব উভয়রূপ প্রতীতি রহিত এবং যোগ-পরায়ণ, শঙ্করাদি দেবগণ যাঁহার যুগল-চরণ-কমল পূজন করিয়া থাকেন, যিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও অনন্ত, সর্বদানবগণের নিকট দাবানল সদৃশ, সেই ওঙ্কার নামক বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করিতেছি। ॥১৩॥

হে রাম! আপনি আমার প্রভু ও আমার প্রার্থিত সর্বকার্য পূরণকারী, দেশকালাদি পরিমাণ রহিত, লক্ষ্মীপতি, সর্ববিশ্বধারণকারী, ভক্তি-প্রাপ্য, আপনার স্বরূপ ধ্যানকারিগণের সংসারভয় বিদূরণকারী এবং যোগাভ্যাস সহায়ে শুদ্ধচিত্ত জনগণের সদা হৃদয়বিহারী। ॥১৪॥

আপনি সর্বলোকের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান, সম্পূর্ণ লোকসমূহের মহেশ্বর, প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের অনধিগম্য, একমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি সম্পন্ন পুরুষগণ কর্তৃকই ভজনযোগ্য, নীলকমলতুল্য শ্যামসুন্দর শ্রীরামচন্দ্র! আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। ॥১৫॥

হে লক্ষ্মীপতে! আপনি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর এবং সর্বথা অভিমান রহিত। মায়াসক্ত কোন প্রাণীই আপনাকে জানিতে সমর্থ নহে। আপনি মুনিগণের মাননীয়। (কৃষ্ণাবতার সময়ে) বৃন্দাবনে অখিল দেবসমূহের বন্দনা করিলেও রামরূপে আপনি স্বয়ং শিব আদি দেবগণের বন্দনীয় ; এইরূপ আনন্দঘন হে ভগবান রামচন্দ্র! আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি! ॥১৬॥

যিনি বিবিধ শাস্ত্র ও বেদসমূহ দ্বারা প্রতিপাদিত, নিত্য আনন্দ ও নির্বিকল্প জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি এবং যিনি আমার বাঞ্ছিত কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই মরকতমণি-তুল্য নীল-বর্ণ-বিশিষ্ট (কৃষ্ণাবতারে) মথুরানাথ-রূপে আবির্ভূত ভগবান রামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি। ॥১৭॥

মর্ত্যলোকবাসী যে কেহ বাঞ্ছিত-কামনা-পূরণকারী শ্যামমূর্তি ভগবান রামচন্দ্রের ধ্যানকরতঃ শ্রীব্রহ্মারচিত ব্রহ্মজ্ঞানবিধায়ক এই দিব্য স্তোত্র শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করিবে, সেই ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষ সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে।" ॥১৮॥

লোকগুরু ব্রহ্মাজীর এই রামস্তুতি শ্রবণানন্তর অগ্নিদেব নির্মল অরুণকান্তি সুশোভিতা, রক্তবস্ত্র-পরিহিতা ও দিব্য আভূষণ-ভূষিতা বিদেহনন্দিনী জানকীকে আপন অঙ্কে লইয়া আবির্ভূত হইলেন ও শরণাগত-দুঃখ-হারী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—"রঘুবীর! পূর্বে তপোবনে আমার নিকট গচ্ছিত শ্রীজানকীকে এখন গ্রহণ করুন। ॥১৯-২০॥

হে হরে! রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য আপনি মায়াসীতা রচনা-করতঃ পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণ সহিত রাবণকে বধ করিয়াছেন। হে প্রভো! আপনার এই মহৎ কর্মদ্বারা পৃথিবীর ভার অপনোদন হইল।" ॥২১॥

তখন সেই প্রতিবিম্বরূপিণী মায়াসীতা যে কার্যের নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল তাহা পূর্ণ করতঃ তিরোহিত হইয়া গেল। অগ্নিদেবতার এই বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতি হৃষ্টচিত্তে তাঁহার পূজন করতঃ প্রসন্নবদনা জানকীকে গ্রহণ করিলেন। ॥২২॥

তদনন্তর লক্ষ্মীপতি ভগবান রামচন্দ্র নিজের সহিত সদা অভিন্না জগৎ জননী লক্ষ্মীরূপা জানকীকে আপন অঙ্কে ধারণ করিলেন। এই সময় জনকনন্দিনী সীতা সহ পরমকান্তি-সুশোভিত ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অতি আনন্দের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ॥২৩॥

ইন্দ্র বলিলেন—"যিনি নীল কমলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, যাঁহার নাম সংসার রূপ বনের দাবানল সদৃশ, শ্রীপার্বতী যাঁহার আনন্দরূপ সর্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি সংসার বন্ধন হইতে নিস্তারকারী ও শঙ্করাদি দেবগণের আশ্রয়স্বরূপ, সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি। ॥২৪॥

যিনি দেবগণের সর্ব দুঃখনাশের একমাত্র কারণ, মনুষ্যরূপধারী, আকারহীন ও স্তুতিযোগ্য, পৃথিবীর ভারনাশকারী, সেই পরমেশ্বর পরমানন্দস্বরূপ, সকলের বন্দনীয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি। ॥২৫॥

যিনি শরণাগতগণকে সর্বানন্দদাতা ও তাহাদের আশ্রয়, যাঁহার নাম শরণাগত ভক্তগণের সর্বদুঃখনাশক, তপ, যোগ সহায়ে যোগীশ্বরগণ ভাবনাদ্বারা যাঁহার চিন্তন করিয়া থাকেন, যিনি বানররাজ সুগ্রীব-আদির মিত্র, সেই মিত্ররূপ ভগবান রামচন্দ্রের আমি ভজনা করি। ॥২৬॥

যিনি ভোগপরায়ণ জনগণের নিকট হইতে অতিদূরে এবং যোগনিষ্ঠ পুরুষগণের অতি সমীপে বিরাজমান, বৈদেহী জানকীর সদানন্দস্বরূপ, সেই চিদানন্দঘন শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সর্বদা ভজনা করি। ॥২৭॥

হে ভগবন্! স্বকীয় যোগমায়া গুণযুক্ত হইয়াই লীলাবশে আপনি মনুষ্যাকার রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। যাহাদের কর্ণদ্বয় আপনার লীলাকথামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তাহারাই সংসারে সদা আনন্দরূপ হইয়া থাকে। ॥২৮॥

হে প্রভো! সম্মান ও সোমপানাদি দ্বারা আমি উন্মত্তবৎ হইয়াছিলাম এবং সর্বেশ্বরত্বের অভিমানবশতঃ নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতাম। এখন আপনার চরণ-কমল-কৃপায় আমার ত্রিলোকাধিপত্যের অভিমান চূর্ণ হইল। ॥২৯॥

উজ্জ্বল রত্নখচিত কেয়ূর ও হার সুশোভিত, পৃথিবীর ভারস্বরূপ রাক্ষসগণের বিনাশার্থ দাবানল সদৃশ, শরচ্চন্দ্রতুল্য মনোহর মুখমণ্ডল ও নেত্রকমল এবং যাহার আদি অন্ত দুর্জ্ঞেয়, সেই রঘুনাথের আমি ভজনা করি। ॥৩০॥

ইন্দ্রনীলমণি ও মেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামকান্তি বিশিষ্ট যাঁহার শরীর, যিনি বিরাধ আদি রাক্ষসগণকে বধ করিয়া সর্বলোকে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন, কিরীট আদি সুশোভিত এবং ত্রিপুরারী শ্রীমহাদেবের পরমধন সেই রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি। ॥৩১॥

যিনি তেজোময় সুবর্ণতুল্য বর্ণবিশিষ্টা ও বিজলীতুল্য-কান্তিময়ী জানকীকে অঙ্কে ধারণ করতঃ কোটিচন্দ্রতুল্য দীপ্তিমান সিংহাসনোপরি বিরাজমান, সেই সর্বদুঃখাতীত আলস্যবিহীন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।" ॥৩২॥

অতঃপর নভঃস্থিত বিমানোপরি উপবিষ্ট ভবানী সহিত ভগবান শঙ্কর কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥৩৩॥

"হে রঘুনন্দন! আমি আপনার রাজ্যাভিষেক দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যাপুরী গমন করিব। এখন আপনি আপনার এই বর্তমান দেহের জন্মদাতা পিতা দশরথকে দর্শন করুন।" ॥৩৪॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র আপন সম্মুখে বিমানোপরি উপবিষ্ট মহারাজ দশরথকে দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীরামচন্দ্র অতি প্রসন্নচিত্তে অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহিত তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন পূর্বক ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিলেন। ॥৩৫॥

দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করতঃ বলিলেন—"হে বৎস! তুমি আমাকে সংসাররূপ দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছ।" ॥৩৬॥

এইরূপ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় আলিঙ্গন করতঃ এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শ্রদ্ধাভক্তি বিনয়াদি দ্বারা পূজিত হইয়া শ্রীদশরথ প্রত্যাগমন করিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন— ॥৩৭॥

"হে সহস্রনয়ন ইন্দ্র! আমার আজ্ঞাক্রমে তুমি অমৃত বর্ষণ করতঃ আমারই জন্য যুদ্ধে মৃত ও ভূপতিত বানরগণকে শীঘ্র সঞ্জীবিত কর।" ॥৩৮॥

ইহাতে সম্মত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত বর্ষণ করতঃ সেই সব বানরগণকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। যে যে বানর পূর্বে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহারা সকলই নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ও পূর্ববৎ বলবান ও প্রসন্নচিত্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিল। ॥৩৯॥

কিন্তু সেখানে যুদ্ধে মৃত রাক্ষসগণ অমৃত স্পর্শ হওয়াতেও কেহ পুনর্জীবিত হইল না।* এই সময়ে বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন— ॥৪০॥

"হে ভগবন্! আপনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন, অতএব আমার প্রতি কৃপাবশতঃ আজ আপনি শ্রীসীতা সহ মঙ্গল-স্নান করুন। ॥৪১॥

আগামীকল্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহিত বস্ত্রাভূষণে সুসজ্জিত হইয়া আমরা (অযোধ্যা) যাত্রা করিব।" বিভীষণের এই বচন শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ বলিলেন— ॥৪২॥

---

* কারণ শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

"আমার ভ্রাতা ভরত অতি সুকুমার ও আমার প্রতি অতি অনুরক্ত। সে জটা বল্কল ধারণ করিয়া ভগবন্নামে সমাহিতচিত্তে আমার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ॥৪৩॥

তাহার সহিত সর্ব প্রথম মিলিত না হইয়া আমি কি প্রকারে স্নান ও বস্ত্রাভূষণ ধারণ করিব? অতএব তুমি এখন শীঘ্র সুগ্রীব আদি মুখ্য বানরগণকে বিশেষরূপে পূজা ও সৎকারাদি কর। ॥৪৪॥

এই বানরশ্রেষ্ঠগণের সৎকার পূজাদি হইলেই উহা আমার সৎকার পূজাই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।" ॥৪৫॥

শ্রীরঘুনাথ এই প্রকার বলিবার পর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ বানরগণকে তাহাদের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী বহু সুবর্ণ, রত্ন ও বস্ত্রাদি মুক্ত-হস্তে বিতরণ করিলেন। এই প্রকারে সকল বানরযূথপতিগণকে রত্নাদি দ্বারা পুরস্কৃত হইতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহাদের যথাযোগ্য অভিনন্দন করতঃ বিদায় দিলেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র লজ্জাশীলা যশস্বিনী জানকীকে আপন অঙ্কে ধারণ করতঃ মহাপরাক্রমী ধনুর্ধর ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহিত বিভীষণ কর্তৃক আনীত সূর্যসমতেজস্বী অতি উত্তম পুষ্পকবিমানে আরূঢ় হইলেন। সেই বিমানে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ, বিভীষণ ও সমস্ত বানরগণকে বলিলেন—"আপনারা সমস্ত বানরগণসহ মিত্রের কার্য যথাযথ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ॥৪৬-৫০॥

এখন আপনারা আমার সম্মতিক্রমে স্ব স্ব বাঞ্ছিত স্থানে গমন করুন। হে সুগ্রীব! তুমি সর্বসৈনিকগণ সহিত শীঘ্রই কিষ্কিন্ধ্যা প্রত্যাবর্তন কর। ॥৫১॥

হে বিভীষণ! তুমি আমার ভক্ত। তুমি আপন রাজ্য লঙ্কাতেই নিবাস কর। ইন্দ্র সহিত দেবগণও তোমাকে উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হইবে না। ॥৫২॥

এখন আমি আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যাপুরীতে যাইতে ইচ্ছা করি।" শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার বলিবার পর সমস্ত মহাবলবান বানরগণ এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণ বলিলেন—"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমরা সকলে আপনার সহিত অযোধ্যায় যাইব, এইরূপ আমাদের ইচ্ছা। ॥৫৩-৫৪॥

হে প্রভো! আপনার রাজ্যাভিষেক দর্শন ও মাতা কৌশল্যাকে বন্দনা করতঃ তদনন্তর আমরা আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিব। আপনি আমাদের (আপনার সঙ্গে যাইবার) আজ্ঞা প্রদান করুন।" ॥৫৫॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"আচ্ছা তাহাই হউক। হে সুগ্রীব! তুমি বানরগণ সহিত শীঘ্রই বিভীষণ ও হনুমানকে সঙ্গে লইয়া বিমানে আরোহণ কর। ॥৫৬॥

তখন সেনাগণ সহিত সুগ্রীব ও মন্ত্রিগণ সহ বিভীষণ, ইঁহারা সকলেই ত্বরান্বিত হইয়া দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন। ॥৫৭॥

তাহারা সকলে বিমানারূঢ় হইবার পর কুবেরের সেই শ্রেষ্ঠ বিমান শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া চলিল। ॥৫৮॥

সেই হংসযুক্ত তেজস্বী বিমানে যাইতে যাইতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বড়ই প্রসন্নতা অনুভব করিলেন এবং তাঁহাকে যেন তৎকালে হংসারূঢ় চতুর্মুখ দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় দেখাইতেছিল। ॥৫৯॥

তৎকালে কুবেরের তপস্যালব্ধ বিমান সূর্যবিম্বতুল্য শোভাশালী হইলেও সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিদ্যমানতায় সেই শোভা অধিক বিস্তার প্রাপ্ত হইল। ॥৬০॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধ কাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দশ সর্গ

অযোধ্যায় যাত্রা, ভরদ্বাজ মুনির আতিথ্য ও ভরত মিলন

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি।

তদনন্তর চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র মিথিলেশকুমারী চন্দ্রবদনী সীতাকে বলিলেন— ॥১॥

"দেখ, ত্রিকুট পর্বতশিখরে স্থিত মহাপ্রকাশময়ী ঐ লঙ্কাপুরী। আর ঐ দেখ মাংস ও রক্ত কর্দমাক্ত রণভূমি। ॥২॥

এই স্থানেই রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল এবং এইস্থানেই রাক্ষসরাজ রাবণ আমার হস্তে নিহত হইয়া ভূশায়ী হইয়াছিল। ॥৩॥

এই স্থানেই কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ আদি রাক্ষস বীরগণ যুদ্ধে নিপাতিত হইয়াছিল। আর ঐ দেখ জলপূর্ণ সমুদ্রোপরি আমাকর্তৃক নির্মিত সেতু। ॥৪॥

দেখ, এই বিশাল সমুদ্রতটে সেতুবন্ধ নামক ত্রিভুবন বিখ্যাত ও পূজিত তীর্থ। ॥৫॥

এই তীর্থ অতি পবিত্র, উহা দর্শনমাত্র সর্বপাপ নাশ করিয়া থাকে। এই স্থানেই আমি রামেশ্বর নামক মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ॥৬॥

এইস্থানেই মন্ত্রিগণ সহিত বিভীষণ আমার শরণ লইয়াছিল। আর ঐ দেখ, বিচিত্র উপবন শোভিত সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যানগরী দৃষ্টিগোচর হইতেছে।" ॥৭॥

কিষ্কিন্ধ্যা পৌঁছিবার পর সীতার প্রসন্নতা উৎপাদন করিবার জন্য সুগ্রীব রামের আজ্ঞায় তারা আদি বানর পত্নীগণকে লইয়া আসিল। ॥৮॥

তাহাদের সকলকে বিমানে শীঘ্রই উঠাইয়া লইয়া চলিতে চলিতে দৃষ্টিপাত করতঃ শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় সীতাকে বলিলেন—"সীতা! ঐ ঋষ্যমুখ পর্বত দেখ। ঐ স্থানে আমি বালীকে বধ করিয়াছিলাম। ॥৯॥

ঐ দেখ, পঞ্চবটী! ঐ স্থানে আমি খর, দূষণ আদি রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছিলাম। ঐ দেখ, মুনিবর অগস্ত্য ও সুতীক্ষ্ণের অতি পবিত্র আশ্রম। ॥১০॥

হে বরবর্ণিনী! হে সাধ্বি! দেখ, ঐ যে সব তপস্বিগণকে দেখা যাইতেছে। আর হে দেবি! পর্বতশ্রেষ্ঠ চিত্রকূটও আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। ॥১১॥

এই স্থানেই আমাকে প্রসন্ন করতঃ অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইবার জন্য কৈকেয়ীপুত্র ভরত আসিয়াছিলেন। আর ঐ দেখ, যমুনাতটে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ॥১২॥

ঐ যে ত্রিলোকপাবনি ভাগীরথী গঙ্গা দেখা যাইতেছে। আর হে সীতে! (সূর্য বংশী রাজাগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের) যূপ অর্থাৎ যজ্ঞ স্তম্ভযুক্ত সরযূ নদীও আমরা দেখিতে পাইতেছি। ॥১৩॥

হে মানিনি! দেখ ঐ যে অযোধ্যাপুরী দেখা যাইতেছে। প্রণাম কর।" এই প্রকার ক্রমানুসারে ভগবান রামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পৌঁছিলেন। ॥১৪॥

চতুর্দশ বর্ষ সমাপ্ত হইবার পর পঞ্চমী তিথিতে মুনিবর ভরদ্বাজকে দর্শন করতঃ শ্রীরঘুনাথ ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ॥১৫॥

অতঃপর আশ্রমে বিরাজমান মুনিবরকে রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অতি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভ্রাতা শত্রুঘ্ন সহিত ভরতের কুশল সংবাদ আপনি কিছু শুনিয়াছেন কি? ॥১৬॥

অযোধ্যা সুকাল অর্থাৎ অযোধ্যা ধন-ধান্যপূর্ণ আছে তো? মাতাগণ জীবিত আছেন তো?" ভগবান রামচন্দ্রের এই বচন শুনিয়া ভরদ্বাজ মুনি প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—"হাঁ, সকলেই কুশলেই আছেন। মহামনা ভরত জটাবল্কল ধারণ ও ফল-মূল আহার করতঃ আপনার পাদুকা যুগলে সর্বরাজ্যভার সমর্পণ করিয়া আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! আপনি দণ্ডকারণ্যে সীতাহরণ অবধি রাক্ষসগণের বিনাশরূপ যে সকল কর্ম করিয়াছেন তাহা আপনার কৃপায় তপোবলে আমি অবগত আছি। ॥১৭-২০॥

আপনি আদি অন্ত মধ্য রহিত সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ও সর্বভূত সমূহের সৃষ্টিকর্তা। আপনি সর্বপ্রথম জল সৃষ্টি করিয়া তদুপরি সুপ্ত হইয়াছিলেন। আপনি সমস্ত মনুষ্যগণের অন্তরাত্মা, হে বিশ্বাত্মন্ আপনি নারায়ণ, আপনার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা সর্বলোকের পিতামহ। ॥২১-২২॥

অতএব আপনি সর্বলোকের বন্দিত ও সর্বজগতের স্বামী, আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভগবান, জানকী লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মণ শেষনাগের অবতার। ॥২৩॥

আপনি অধিষ্ঠানরূপে আপনার ভিতরেই আপনার মায়াদ্বারা স্বয়ং আপনিই এই সম্পূর্ণ জগৎ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু আকাশের ন্যায় আপনি কোন কিছুর সহিত লিপ্ত নহেন। আপন চিচ্ছক্তি সহায়ে সকলের সাক্ষী। ॥২৪॥

হে রঘুনন্দন! সর্বপ্রাণিগণের অন্তরে ও বাহিরে আপনি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই প্রকার পরিপূর্ণ স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও আপনি মূঢ়বুদ্ধিগণের নিকট পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ॥২৫॥

হে জগৎপতে! আপনি জগৎ, জগতের আধার ও তাহার পালক। আপনি সর্ব প্রাণিগণের (কালরূপে) ভোক্তা এবং (অন্নরূপে) ভোজ্য। ॥২৬॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত ও স্মৃত হইয়া থাকে, সে সব আপনারই রূপ। আপনা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই। ॥২৭॥

হে রাম! আপনার শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়াই মায়া স্বকীয় অহঙ্কারাদি গুণ সহায়ে সর্বলোক সমূহ রচনা করিয়া থাকে, এই জন্যই এই সর্বসৃষ্টি আপনাতে আরোপিত (উপচরিত) হয়। ॥২৮॥

চুম্বকের সান্নিধ্যে যে প্রকার লৌহ আদি জড়পদার্থ ক্রিয়াশীল হয় সেইরূপ আপনার দৃষ্টি প্রভাবেই মায়া সম্পূর্ণ জগৎ রচনা করিয়া থাকে। ॥২৯॥

বিশ্বকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় স্বয়ং দেহহীন হইয়াও আপনি দেহদ্বয় বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। আপনার স্থুল শরীর 'বিরাট্' ও সূক্ষ্ম শরীর 'সূত্র' নামে অভিহিত। ॥৩০॥

হে রঘুনন্দন! আপনার বিরাট্ শরীর হইতে সহস্র সহস্র অবতার উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং আপন কার্য সমাপ্তির অনন্তর উহারা পুনঃ ঐ বিরাট শরীরে বিলীন হইয়া যায়। ॥৩১॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! সংসারে যাহারা অনন্যচিত্ত হইয়া আপনার বিচিত্র অবতারগণের কথা কীর্তন বা শ্রবণ করে তাহাদের অবশ্যই মুক্তি হইয়া থাকে। ॥৩২॥

হে রাঘব! পূর্বকালে পৃথিবীর ভার অপনয়ন করিবার জন্য ব্রহ্মা আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আপনি রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ॥৩৩॥

হে রাম! দেবগণের সর্ব দুষ্কর কর্ম আপনি সম্পাদন করিয়াছেন। অতঃপর আপনি বহু সহস্র-বর্ষ এই মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়া লোকদ্বয়ের কল্যাণার্থ বহু কঠিন পাপহারী দুষ্কর কর্ম করতঃ সর্বলোকে আপনার সুযশ বিস্তার করিবেন। ॥৩৪-৩৫॥

হে জগন্নাথ! আমার ইহাই প্রার্থনা যে আজ সেনাসহিত এখানে ভোজন ও অবস্থান করতঃ আমার গৃহ পবিত্র করুন। আগামীকল্য আপনি রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবেন।" ॥৩৬॥

তখন শ্রীরঘুনাথ তাহাতে সম্মত হইয়া সেনা, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ সকলে মুনিবর ভরদ্বাজের আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করতঃ সেই অতি উত্তম আশ্রমে অবস্থান করিলেন। ॥৩৮॥

অতঃপর এক মুহূর্ত অন্তরে বিচার করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মারুতিকে বলিলেন—"হে হনুমান্! তুমি শীঘ্রই এখান হইতে অযোধ্যায় গমন কর। ॥৩৮॥

এবং ইহা জানিয়া আইস যে রাজমন্দিরে সকলে কুশলে আছেন কিনা। তৎপর শৃঙ্গবের-পুর গমন করতঃ আমার মিত্র গুহকের সহিত বার্তালাপ করিও। ॥৩৯॥

এবং তাহাকে জানকী ও লক্ষ্মণ সহিত আমার প্রত্যাবর্তন সংবাদের সূচনা দিও। তৎপর নন্দীগ্রামে গমন করতঃ আমার ভ্রাতা ভরতের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে স্ত্রী ও ভ্রাতাসহ আমার কুশল সংবাদ প্রদান করিও। অতঃপর ভরতকে সীতাপহরণ আদি ও রাবণ বধ আদি পর্যন্ত আমার সমস্ত লীলা ক্রমপূর্বক শুনাইবে এবং ইহাও বলিবে যে সর্বশত্রু সংহারপূর্বক সফল-মনোরথ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র স্ত্রী ও লক্ষ্মণ সহিত এবং ভল্লুক ও বানর সেনা সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। এই সব বৃত্তান্ত ভরতকে শুনাইয়া তাহার মনের প্রতিক্রিয়া ও দৈহিক চেষ্টাদি লক্ষ্য করতঃ শীঘ্রই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিও। হনুমানও তদাদেশ অনুযায়ী মনুষ্য শরীর ধারণ করতঃ শীঘ্রই বায়ুবেগে নন্দীগ্রামে চলিল। তখন মনে হইতেছিল যেন কোন শ্রেষ্ঠ সর্পকে ধরিবার জন্য স্বয়ং গরুড় সবেগে ধাবিত হইতেছেন। ॥৪০-৪৫॥

শৃঙ্গবেরপুর পৌঁছিয়া মারুতি গুহকের নিকট গমন করতঃ অতি প্রসন্নচিত্তে সুমিষ্ট বাক্যে বলিল— ॥৪৬॥

"তোমার মিত্র পরমধার্মিক কল্যাণমূর্তি দশরথ-কুমার শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসহ তাঁহার কুশল সংবাদ তোমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। ॥৪৭॥

আজ মুনীশ্বর ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীরঘুনাথ আসিবেন। তখন তোমাদেরও রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ হইবে।" ॥৪৮॥

পরমহর্ষে রোমাঞ্চিত-কলেবর গুহককে এই প্রকার বলিয়া মহাতেজস্বী ও অত্যন্ত বেগশালী হনুমান পুনরায় বায়ুবেগে আকাশমার্গে চলিল। ॥৪৯॥

কিয়দ্দূর যাইবার পর রামতীর্থ (অযোধ্যা) ও মহানদী সরযূ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। উহা অতিক্রম করিয়া হনুমান অতি প্রসন্নচিত্তে নন্দীগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হইল। ॥৫০॥

অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে ভরতকে হনুমান দেখিতে পাইল। দেখিল অতি দীন ও দুর্বল অবস্থাপ্রাপ্ত, চীর-বস্ত্র ও কৃষ্ণ-মৃগ-চর্মধারী, আশ্রমনিবাসী, মলপঙ্কলিপ্ত শরীর, জটাধারী, বল্কলবস্ত্র পরিহিত, ফল মূলাদি আহার করতঃ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে তৎপর, শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা যুগল সম্মুখে রাখিয়া ভরত পৃথিবী শাসন করিতেছেন। কাষায়াম্বরধারী মন্ত্রিগণ ও মুখ্য মুখ্য পুরবাসিগণ কর্তৃক পরিবৃত সাক্ষাৎ মূর্তিমান ধর্মের সমান ভরতকে দেখিয়া পবননন্দন হনুমান কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল— ॥৫১-৫৪॥

"হে ভরত! আপনি যে দণ্ডকারণ্যবাসী তপোনিষ্ঠ, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিতেছেন এবং যাঁহার জন্য এত অনুশোচনা (তাপ) সহন করিতেছেন, সেই ককুৎস্থনন্দন শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে তাঁহার কুশল বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। ॥৫৫॥

হে দেব! অপনি এই দারুণ শোক পরিত্যাগ করুন। আমি আপনাকে অতি প্রিয় বার্তা শুনাইতেছি, আপনি এই মুহূর্তেই প্রিয়ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবেন। ॥৫৬॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং সর্বকার্য সিদ্ধকরতঃ সীতা ও লক্ষ্মণসহ আগমন করিতেছেন।"

হনুমানের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ীর প্রিয়পুত্র মহাতেজস্বী ভরত হর্ষে মূর্চ্ছিত ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন। ॥৫৮॥

(মূর্চ্ছাভঙ্গের অনন্তর) ভরত শীঘ্রই প্রিয়বাদী হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আনন্দাশ্রুজলে হনুমানকে সিঞ্চিত করতঃ বলিলেন— ॥৫৯॥

"ভাই! তুমি এত দয়া করিয়া এখানে আসিয়াছ, তুমি কি কোন দেবতা বা মনুষ্য? এই প্রিয় সমাচার শুনাইবার পরিবর্তে আমি তোমাকে এক লক্ষ গাভী, অতি উত্তম একশতটি গ্রাম এবং সর্বাভরণ সম্পন্না পরমাসুন্দরী ষোলটি কন্যা সম্প্রদান করিতেছি।" ॥৬০-৬১॥

এই প্রকার বলিয়া ভরত বায়ুপুত্র হনুমানকে পুনরায় বলিলেন—"আমার প্রভুর ভয়ঙ্কর বনগমনের বহু বৎসর ব্যতীত হইবার পর আজ তাঁহার শুভ সমাচার শ্রবণগোচর হইল। আজ

আমার নিকট এই কল্যাণময়ী লৌকিক গাথা (প্রবচন) 'জীবিত থাকিলে শতবর্ষের অনন্তরও মানুষের জীবনে আনন্দপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে'—সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। তোমার কল্যাণ হউক। এখন তুমি সত্য সত্যই আমাকে বল, রঘুনাথের সহিত বানরগণের সমাগম কি প্রকারে হইল। তাহা হইলেই আমি তোমার বচনে পূর্ণ বিশ্বাস করিব।" মহাত্মা ভরত এই প্রকার বলিবার পর হনুমান তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের সম্পূর্ণ চরিত ক্রমশ বর্ণন করিল। হনুমানের মুখে সম্পূর্ণ বিবরণ শুনিয়া ভরত পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। ॥৬২-৬৬॥

এবং অতি প্রসন্নচিত্তে আনন্দমগ্ন শত্রুঘ্নকে আজ্ঞা করিলেন—"হে রঘুনন্দন! নগরে যত দেবমন্দির বিদ্যমান মহাবুদ্ধি পণ্ডিতগণ সেই সকল (মন্দিরস্থ) দেবগণকে নানাপ্রকার দ্রব্য উপহার আদি দ্বারা বিশেষ পূজন করুন। সূত, বৈতালিক, স্তুতিগায়ক বন্দিগণ এবং প্রমুখ বারাঙ্গনাগণ আজই শত শত সংখ্যায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নগরের বাহিরে নির্গত হউক। এতদতিরিক্ত রাজমহিষিগণ, মন্ত্রিগণ, হস্তি, অশ্ব ও পদাতি আদি সেনা, ব্রাহ্মণ, পুরোবাসিগণ এবং এইস্থানে সমাগত রাজন্যবর্গ সকলেই শ্রীরঘুনাথের মুখচন্দ্র দর্শনার্থ নগরের বহির্দেশে নির্গত হউন।" ॥৬৭-৭০॥

ভরতের বচন শুনিয়া ও শত্রঘ্নের প্রেরণায় নানাবিধ রচনাকুশল পুরবাসিগণ আপন গৃহসমূহ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার উজ্জ্বল মোতি ও রত্নময় তোরণ এবং বিচিত্র রং-এর বহু পতাকা সমূহের দ্বারা অযোধ্যাপুরী অলঙ্কৃত করিল। ॥৭১-৭২॥

তখন ভগবান রামচন্দ্রের দর্শন লালসায় বিরাট জনসমূহ বহু দলে বিভক্ত হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদানার্থ এক লক্ষ অশ্ব, দশসহস্র হস্তি, এবং সুবর্ণসূত্র বিভূষিত দশসহস্র রথ আদি বহু ঐশ্বর্যসূচক সামান্য ও মহার্ঘ উপহার বস্তু সঙ্গে লইয়া নগরের বহির্দেশে গমন করিতে লাগিল। ॥৭৩-৭৪॥

তাহাদের পশ্চাতে শিবিকারূঢ়া হইয়া রাজমহিষিগণ চলিলেন। এবং শ্রীরঘুনাথের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভ্রাতা শত্রুঘ্ন সহিত ভরত আপন শিরোপরি ভগবানের পাদুকা স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় দূর হইতে ব্রহ্মার মনোনির্মিত চন্দ্রতুল্য কান্তিবিশিষ্ট এবং সূর্যতুল্য তেজস্বী পুষ্পক বিমান দৃষ্টিগোচর হইল। উহা দেখিয়া হনুমান সকলকে সম্বোধন করতঃ বলিল—"অহো, সকলে দেখুন! ঐ বিমানে জানকী সহিত দুই বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ এবং কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ও মন্ত্রিগণ সহ বিভীষণকে দেখা যাইতেছে।" ॥৭৫-৭৮॥

তখন "ঐ যে রাম! ঐ যে রাম!" এই প্রকার স্ত্রী, বালক, যুবা এবং বৃদ্ধগণের হর্ষ গদ্‌গদ কণ্ঠের ধ্বনিতে আকাশ গুঞ্জায়মান হইয়া উঠিল। ॥৭৯॥

যাহারা রথ, হস্তি ও অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহারা ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সকলে আকাশে চন্দ্রদর্শনের ন্যায় বিমানারূঢ় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। ॥৮০॥

ঐ সময়ে প্রসন্নচিত্ত ভরত বিমনোপরি উপবিষ্ট শ্রীরঘুনাথের দিকে উন্মুখ হইয়া সুমেরু পর্বতোপরি প্রকট সূর্যকে লোকে যে প্রকার প্রণাম করিয়া থাকে সেই প্রকার অতি হর্ষের সহিত

বিনীত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় বিমান ভূতলোপরি অবতরণ করিল। ॥৮১-৮২॥

তদনন্তর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নসহিত ভরতকে বিমানোপরি উঠাইয়া লইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে পৌঁছিয়া ভরত অতি আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে পুনঃ প্রণাম করিলেন। ॥৮৩॥

তখন দীর্ঘকাল পর ভ্রাতা ভরতকে দেখিয়া শ্রীরঘুনাথ শীঘ্রই তাহাকে উঠাইলেন ও প্রসন্নতা সহিত অঙ্কে ধারণ করতঃ আলিঙ্গন করিলেন। ॥৮৪॥

তৎপর প্রেমবিহ্বল ভরত লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া বিদেহনন্দিনী সীতাকে আপন নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অতি প্রীতির সহিত প্রণাম করিলেন। ॥৮৫॥

অতঃপর ভরত সুগ্রীব, জাম্ববান, যুবরাজ অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ এবং সুষেন, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ এবং পনসকেও আলিঙ্গন করিলেন। ॥৮৬-৮৭॥

এই প্রকার ভরতের নিকট হইতে সৎকার প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নচিত্তে এই সৌম্য বানরবৃন্দ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ভরতকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ॥৮৮॥

তখন ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া অতি প্রেমপূর্বক বলিলেন—"সুগ্রীব! তোমার সহায়তা বশতঃই শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় ও রাবণ বধ হইয়াছে ; অতএব তুমি আমাদের চারি ভাইয়ের পঞ্চম ভ্রাতা।" তদনন্তর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ ও শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করতঃ অতি বিনীতভাবে সীতার চরণকমল বন্দনা করিলেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র শোকবশে অতি বিহ্বলা, কৃশা ও বিবর্ণা মাতা কৌশল্যার নিকট গমন করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহার চরণ স্পর্শ করতঃ প্রণামপূর্বক মাতার চিত্তে প্রসন্নতা উৎপাদন করিলেন। এবং আপন বিমাতা কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাকেও প্রণাম করিলেন। ॥৮৯-৯২॥

অতঃপর ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে উত্তম প্রকারে পূজন করতঃ তাঁহার পাদুকাযুগল ভক্তি সহকারে উভয় চরণে সংযোজিত করিলেন। ॥৯৩॥

(এবং বলিলেন,) "প্রভো! আপনার এ রাজ্য আপনি আমার নিকট গচ্ছিতরূপে রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি আজ পুনঃ প্রত্যর্পণ করিতেছি ; আজ আমি আপনাকে অযোধ্যানগরে প্রত্যাগত দেখিতে পাইতেছি—ইহাতে আমার জন্ম সফল হইয়া গিয়াছে এবং আমার সর্বকামনা পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে জগন্নাথ! আপনার প্রতাপে আমি অন্নভাণ্ডার, সেনা ও কোষাদি দশ গুণ বৃদ্ধি করিয়ছি। এখন আপনি আপনার নগর স্বয়ং পালন করুন।" ভরতকে এই প্রকার বলিতে শুনিয়া মুখ্য মুখ্য সর্ব বানরগণ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র অতি আনন্দের সহিত ভরতকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ঐ বিমানেই আরোহণ করতঃ ভরতের আশ্রমে গমন করিলেন। সেখানে বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পক হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিমানকে বলিলেন, "যাও, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি—এখন তুমি বিশ্রবার পুত্র ধনপতি কুবেরের অনুগত হও এবং তাঁহাকেই বহন কর।" ॥৯৪-৯৭॥

অতঃপর ইন্দ্র বৃহস্পতিকে যে প্রকার বন্দনা করিয়া থাকেন, সেই প্রকার শ্রীরামচন্দ্রও গুরু বশিষ্ঠের চরণকমলে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে একটি অতি সুন্দর মহামূল্য আসন প্রদান করতঃ স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে যুদ্ধ কাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ

পঞ্চদশ সর্গ

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

অতঃপর কৈকেয়ীপুত্র ভরত অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করতঃ অতি ভক্তিসহকারে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥১॥

"হে রাম! আপনি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার মাতার সৎকার করা হইয়াছে। এখন আপনি আমাকে যেরূপ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও সেই রাজ্য আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি।" ॥২॥

এইরূপ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণে ভক্তিপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ তিনি স্বয়ং এবং কৈকেয়ী ও গুরু বশিষ্ঠ সহিত সকলেও বহু প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ॥৩॥

তখন স্বকীয় মায়া আশ্রয় করতঃ সর্বপ্রকার মনুষ্যলীলা করিতে প্রবৃত্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ভরতের নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ॥৪॥

সর্ব বিষয়ানন্দ রহিত পরমানন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ-স্বরাজ্যানুভবকারী (স্বাত্মানন্দনিমগ্ন), পরমাত্মা, জগদীশ্বর, যাঁহার ভ্রূকুটি বিলাসমাত্র ক্ষণকাল মধ্যেই ত্রিলোক বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার এই তুচ্ছ লৌকিক রাজ্যের কি প্রয়োজন? ॥৫-৬॥

যাঁহার কৃপায় ইন্দ্রতুল্য রাজ্যশ্রী অধিগত হয় এবং যিনি লীলাবশে এই মহান সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা (এই অযোধ্যা রাজ্য) কতটুকু? ॥৭॥

তথাপি ভক্তগণের কামনা পূরণার্থ তিনি মায়া মানবদেহ ধারণ করিয়া সর্বপ্রকার অভিনয় করিয়া থাকেন। ॥৮॥

তখন শত্রুঘ্নের আজ্ঞায় কুশল ক্ষৌরকারকে আহ্বান করা হইল এবং শ্রীরঘুনাথের রাজ্যাভিষেকের জন্য যাবতীয় সামগ্রী একত্রিত করা হইল। ॥৯॥

প্রথম ভরত, তদনন্তর মহাত্মা লক্ষ্মণ তৎপর বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণও স্নান করিলেন। ॥১০॥

অতঃপর শ্মশ্রু-জটাদি মুণ্ডনের পর শ্রীরঘুনাথ স্নান করিলেন এবং বিচিত্র মালা, অঙ্গরাগ ও বহুমূল্যবস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ও আপন কান্তি সহায়ে দীপ্তিমান হইয়া বিরাজমান হইলেন। ॥১১॥

মহামতি লক্ষ্মণ ও ভরত শ্রীরামচন্দ্রের এবং রাজমহিলাগণ সীতার যাবতীয় অঙ্গসজ্জাদি করাইলেন। ॥১২॥

রাজমহিলাগণ সুমধ্যমা সুন্দরী সীতাকে নানাপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্র ও আভূষণাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিলেন। অতঃপর পুত্রবৎসলা শোভাময়ী মাতা কৌশল্যা অতি প্রসন্নচিত্তে সমস্ত বানরপত্নিগণকে সুসজ্জিত করাইলেন। এই সময় শত্রুঘ্নের আজ্ঞাক্রমে বুদ্ধিমান সুমন্ত্র সূর্যতুল্য প্রকাশমান রথ সজ্জিত করিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল। তখন সত্যধর্মপরায়ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সেই রথে উপবেশন করিলেন। ॥১৩-১৫॥

এই সময় সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ, হনুমান ও বিভীষণ স্নানাদি করতঃ দিব্য বস্ত্রাভূষণে ভূষিত হইয়া রথ, অশ্ব, হস্তি আদি বাহনে আরোহণ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের অগ্রে ও পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। সুগ্রীবের পত্নিগণ ও সীতা বহু সুন্দর শিবিকায় উপবিষ্টা হইয়া অযোধ্যাপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ॥১৬-১৭॥

বজ্রপাণি ইন্দ্র যে প্রকার হরিতবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট রথে উপবিষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত স্থানান্তরে গমন করেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও সেই প্রকার মহাপুরী অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ॥১৮॥

মহাতেজস্বী ভরত সারথি হইয়া রথ পরিচালনা করিতে লাগিলেন, শত্রুঘ্ন রত্নজড়িত দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র এবং লক্ষ্মণ ব্যজন (তালবৃন্ত পাখা) ধারণ করিলেন। ॥১৯॥

ভগবানের এক পার্শ্বে শত্রুদমন সুগ্রীব এবং অন্য পার্শ্বে রাক্ষসরাজ বিভীষণ চন্দ্রমাতুল্য কান্তিবিশিষ্ট চামর দোলাইতে লাগিলেন। ॥২০॥

দিব্যদর্শন দেবগণ, সিদ্ধসমূহ এবং ঋষিগণের উচ্চারিত রামস্তুতির সুমধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ॥২১॥

বানরগণ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া গজারূঢ় হইল। এই প্রকারে রঘুশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পণব, নাগাড়া আদি বাদ্যঘোষসহ অতি সুসজ্জিত অযোধ্যাপুরী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পুরবাসিগণ ভগবানের শুভাগমন দর্শন করিতে লাগিল। ॥২২-২৩॥

সেই মহাভাগ্যবান সর্ব প্রজাগণ নবদুর্বাদলতুল্য শ্যাম শরীর, মহামূল্য মুকুট ও রত্নজড়িত আভূষণ মণ্ডিত, কমলতুল্য অরুণ বর্ণ বিশাল নয়নবিশিষ্ট, বিচিত্র রত্নযুক্ত সুবর্ণ সূত্রমণ্ডিত পীতাম্বরধারী, বিশাল বক্ষ, বহুমূল্য মুক্তা ও দিব্যহার সুশোভিত, সুগ্রীবাদি শান্তস্বভাব বানরগণ সেবিত, সূর্যসম তেজস্বী, কস্তুরি ও চন্দনলিপ্ত সর্বাঙ্গ, কল্পবৃক্ষপুষ্পমাল্য-ধারণকারী—শ্রীরঘুনাথজীকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইল। ॥২৪-২৬॥

শ্রীরামচন্দ্র আসিতেছেন শুনিয়া (অযোধ্যানগরীর) পুরাঙ্গনাগণের অতি প্রসন্নতা ও হর্ষবশতঃ মুখকান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহারা আপন আরব্ধ গৃহকর্ম পরিত্যাগ করতঃ উত্তম বস্ত্র ও ভূষণাদি সজ্জিত হইয়া শ্রীরামকে দর্শনার্থ স্ব স্ব গৃহোপরি আরোহণ করিল। ॥২৭॥

সুমধুর মৃদুহাস্য-শোভিত বদন, মনোহর পুরনারীগণ নয়ন-আনন্দকর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া (তাঁহার উপর) পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। এবং নেত্র ও মনের প্রীতিকর

ভগবানের আনন্দময়ী মূর্তি নেত্রমার্গে হৃদয়ে আনয়ন করতঃ মনে মনেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। ॥২৮॥

এই প্রকারে বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় মৃদুহাস্য সহিত প্রজাগণকে দর্শন করিতে করিতে ধীরে ধীরে পিতার ইন্দ্রভবনতুল্য সুসজ্জিত মহলে গমন করিলেন। ॥২৯॥

রাজমহলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতি প্রসন্নচিত্তে মাতা কৌশল্যার চরণ বন্দনা করিলেন এবং তৎপর রঘুবংশকেতু প্রভু ক্রমশঃ সর্ব বিমাতাগণকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলেন। ॥৩০॥

তখন সত্যপরাক্রমী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিলেন—"আমার সর্ব সম্পদযুক্ত শ্রেষ্ঠ ভবন আমার মিত্র বানররাজ সুগ্রীবকে নিবাসার্থ প্রদান কর এবং অপর সকলের জন্যও সুখপূর্বক নিবাসযোগ্য ভবন নির্দিষ্ট কর।" ॥৩১-৩২॥

শ্রীরঘুনাথের আজ্ঞানুযায়ী ভরত তদ্রূপই করিলেন এবং তদনন্তর মহাতেজস্বী ভরত সুগ্রীবকে বলিলেন— ॥৩৩॥

"শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত চতুঃসমুদ্রের পবিত্রজল আনয়ন করিবার জন্য অবিলম্বে দ্রুতগামী দূতগণকে প্রেরণ করুন।" ॥৩৪॥

তখন সুগ্রীব জাম্ববান, হনুমান, অঙ্গদ ও সুষেণকে তজ্জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা অতি শীঘ্রই বায়ুবেগে গমন করতঃ রত্নখচিত সুবর্ণময় কলস সকল পবিত্র জলপূর্ণ করিয়া লইয়া আসিল। মন্ত্রিগণ সহিত শত্রুঘ্ন ঐ তীর্থ সলিল দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক কার্য সম্পাদন করিবার জন্য গুরু শ্রীবশিষ্ঠকে নিবেদন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ সহিত বয়োবৃদ্ধ জিতেন্দ্রিয় গুরু বশিষ্ঠ সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্রকে রত্নসিংহাসনোপরি উপবেশন করাইলেন এবং তৎপর বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালী, গৌতম ও বাল্মিকী আদি সর্ব মহর্ষিগণ অতি আনন্দের সহিত কুশ ও তুলসী-সংপৃক্ত পবিত্র গন্ধযুক্ত জলদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করিলেন। ॥৩৫-৩৯॥

অতঃপর ঋত্বিকগণ, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, কন্যাগণ ও মন্ত্রিগণ সহিত পূর্বোক্ত মহর্ষিগণ আকাশস্থিত দেবতাগণ ও স্ব স্ব গণ সহিত লোকপাল চতুষ্টয় স্তুতি করিতে করিতে, বসুগণ ইন্দ্রের যে প্রকার অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার সর্বৌষধি-রসদ্বারা শ্রীরঘুনাথের অভিষেক করিলেন। ॥৪০-৪১॥

ঐ সময়ে শত্রুঘ্ন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শিরোপরি সুন্দর শ্বেতছত্র ধারণ করিলেন এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ শ্বেতচামর ধারণ করিলেন। ॥৪২॥

ইন্দ্রের প্রেরণায় বায়ু সুবর্ণময়ী মালা প্রদান করিলেন। এবং স্বয়ং ইন্দ্রও অতি ভক্তিপূর্বক মহারাজ রামচন্দ্রকে সর্বরত্নসমাযুক্ত মণিকাঞ্চনভূষিত একটি হার প্রদান করিলেন। তদনন্তর দেবতা ও গন্ধর্বগণ সুমধুর সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ॥৪৩-৪৪॥

আকাশ হইতে দেব-দুন্দুভীর ধ্বনিসহ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন নবদূর্বাদল শ্যাম, কমলদলতুল্য বিশাল নয়ন, কোটি-সূর্য সদৃশ প্রভাযুক্ত মুকুট সুশোভিত, কোটি কামদেবতুল্য

লাবণ্য সম্পন্ন, পীতাম্বরাবৃত, দিব্যাভরণ বিভূষিত, দিব্যচন্দন-চর্চিত, সহস্র সহস্র সূর্যতুল্য তেজস্বী, সর্বাধিক শোভায়মান, দ্বিভুজ রঘুনাথকে আপন বামপার্শ্বে করকমলে রক্তকমল-ধারিণী উপবিষ্টা সর্বাভরণভূষিতা সীতাকে আপন বামবাহুদ্বারা আলিঙ্গন করতঃ সিংহাসনে বিরাজমান দেখিয়া পার্বতী সহিত ভক্তিভাব-সমন্বিত ভগবান শঙ্কর সর্বদেবগণ সহ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ॥৪৫-৫০॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন—"নীলকমলতুল্য সুকোমল শ্যাম শরীরধারী, কিরীট, হার ও ভুজবন্ধ আদি বিভূষিত ও আপন শক্তি সীতাসহ সিংহাসনোপরি বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করি। ॥৫১॥

হে রাম! আপনি আদি অন্ত ও মধ্য রহিত অদ্বিতীয়। আপন মায়াদ্বারা আপনি লোকসমূহ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিলেও তাহাতে লিপ্ত নহেন। কারণ আপনি সদা স্বাত্মানন্দরসে নিমগ্ন এবং অনিন্দনীয়। ॥৫২॥

আপনি মায়াগুণে আবৃত হইয়া আপন শরণাগত ভক্তগণকে সন্মার্গ প্রদর্শনার্থ দেবতা মনুষ্যাদি নানা অবতার রূপে বিচিত্র লীলা করিয়া থাকেন। ঐ সময় কেবল জ্ঞানিগণই আপনাকে সদা জানিতে সমর্থ হন। ॥৫৩॥

আপনি আপনার এক অংশে সর্বলোকসমূহ সৃষ্টি করতঃ নিম্নদেশ হইতে শেষনাগরূপে তাহাদিগকে (মস্তকে) ধারণ করেন এবং সূর্য, বায়ু, চন্দ্র, ওষধি ও বৃষ্টিরূপ হইয়া ভূতলোপরি সেই লোকসকলকে পালন করেন। ॥৫৪॥

আপনিই জঠরাগ্নিরূপে পঞ্চপ্রাণের সহায়তায় প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করতঃ উহাদ্বারা সর্বদা সম্পূর্ণ জগতের পালন করিয়া থাকেন। ॥৫৫॥

হে ঈশ! চন্দ্র সূর্য অগ্নিতে যে তেজ, সর্ব শরীরধারীগণের মধ্যে যে চেতন এবং উহাদের মধ্যে যে ধৈর্য, শৌর্য, আয়ু ও বল দৃষ্টিগোচর হয় উহা আপনারই সত্তা। ॥৫৬॥

হে রাম! এক আপনিই বিভিন্ন মতবাদীগণের নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে ও কাল, কর্ম, চন্দ্রমা ও সূর্যরূপে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন ; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে আপনি বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম! ॥৫৭॥

বেদ, পুরাণ ও লোকে যে প্রকার এক আপনিই মৎস্যাদি বহুরূপে প্রসিদ্ধ, সেই প্রকার সংসারে যাহাকিছু সৎ-অসৎ-রূপ বিভাগ বিদ্যমান, উহা আপনারই রূপ — আপনা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই। ॥৫৮॥

এই অনন্ত সৃষ্টিমধ্যে যাহাকিছু উৎপন্ন হইয়াছে বা উৎপন্ন হইতেছে বা উৎপন্ন হইবে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সম্পূর্ণ প্রপঞ্চ আপনা বিনা অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব আপনি সর্বকারণ প্রকৃতিরও পারে অবস্থিত। ॥৫৯॥

হে রাম! আপনার মায়াতে মোহিত হইয়াই সর্ব প্রাণিগণ আপনার পরমাত্মস্বরূপ-তত্ত্ব জানে না। অতএব যাহাদের অন্তঃকরণ আপনার ভক্তগণের সেবা প্রভাবে নির্মল হইয়াছে, কেবল তাহাদেরই নিকট আপনার অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপ প্রকটিত হয়। ॥৬০॥

বাহ্যবিষয়ে যাহাদের সত্যত্ব বুদ্ধি রহিয়াছে এইরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণও আপনার চিৎ-স্বরূপ অবগত নহেন, (অপরের কথাতো বলাই বাহুল্য)। অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ আপনার এই শ্যাম-সুন্দর রূপটিই ভক্তিপূর্বক ভজন করিয়া সর্বদুঃখ রহিত হন ও মুক্তি লাভ করেন। ॥৬১॥

হে প্রভো! আপনার নাম উচ্চারণে কৃতার্থ হইয়া আমি অহর্নিশি পার্বতী সহিত কাশীতে নিবাস করিয়া থাকি এবং সেখানে মুমূর্ষু জনগণের মোক্ষলাভার্থ আপনার তারক-মন্ত্র 'রাম' নাম উপদেশ করিয়া থাকি। ॥৬২॥

(আমার এখন আপনার নিকট ইহাই প্রার্থনা যে) যাহারা মৎকথিত এই স্তোত্রটি নিত্য অনন্য ভক্তির সহিত শ্রবণ করিবে অথবা কীর্তন করিবে বা লিখিবে তাহারা আপনার কৃপায় সম্পূর্ণ পরমানন্দ লাভ করতঃ আপনার পদ প্রাপ্ত হউক।" ॥৬৩॥

ইন্দ্র বলিলেন—

"হে দেব! ব্রহ্মার বরপ্রভাবে রাক্ষসরাজ রাবণ আমার দেবোচিত সর্বসুখ সম্পদ হরণ করিয়াছিল। এখন সেই দুষ্ট শত্রু নিহত হওয়াতে আপনার কৃপায় আমি সর্বসুখ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।" ॥৬৪॥

দেবগণ বলিলেন—

"হে মুরারে! হে বিষ্ণু! এই দুষ্ট আদি দৈত্য (রাবণ) ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রদত্ত আমাদের সর্ব যজ্ঞ-ভাগ হরণ করিত। এখন আপনি তাহাকে নিহত করিয়াছেন। অতএব আপনার কৃপায় এখন হইতে আমরা পূর্বের ন্যায় যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইব।" ॥৬৫॥

পিতৃগণ বলিলেন—

"হে মহাত্মন্! এই দুষ্ট দৈত্য (রাবণ) গয়া আদি পুণ্যক্ষেত্রে মনুষ্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত আমাদের প্রাপ্য পিণ্ড ও উদকাদি অন্ন বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিত। আজ আপনি তাহাকে বধ করিয়াছেন। অতএব এখন আমরা স্ব স্ব ভাগ প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ শক্তিমান হইব।" ॥৬৬॥

যক্ষগণ (কুবেরের অনুচরগণ) বলিলেন—

"হে রঘুনাথ! এই রাবণ আমাদিগকে বলপূর্বক বিনা বেতনে (বেগার) কর্মে নিয়োগ করিত। এবং উহার শিবিকা বহন করিতে করিতে আমাদের বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। অতএব আজ এই দুরাত্মাকে বধ করতঃ আপনি আমাদের অনেক দুঃখ হইতে মুক্ত করিলেন।" ॥৬৭॥

গন্ধর্বগণ বলিলেন—

"প্রভো! সঙ্গীতকুশলী আমরা আপনার অমৃততুল্য লীলাকথা গান করতঃ পূর্বে আনন্দামৃতরস সমূহে মগ্ন হইয়া থাকিতাম। ॥৬৮॥

কিন্তু দুরাত্মা রাবণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে তাহারই গুণগান ও তাহারই সেবায় তৎপর হইয়া থাকিত হইত। এই দুষ্ট রাক্ষসকে বধ করিয়া আপনি আমাদিগকেও রক্ষা

করিয়াছেন।" এইপ্রকারে মহানাগ, সিদ্ধ, কিন্নর, বসু, মুনি, গাভী, গুহ্যক, (কুবেরানুচর দেব-যোনি বিশেষ), পক্ষী, প্রজাপতি ও অপ্সরাগণের সমূহ সকলেই ভগবান রামচন্দ্রের সমীপে পৃথিবীলোকে আগমন করিলেন এবং নয়নানন্দ বর্ধক প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহার পৃথক পৃথক স্তুতি গান করিলেন। অতঃপর রাঘব শ্রীরামচন্দ্রের অভিবন্দন অর্থাৎ প্রশংসাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা আপন আপন লোকে গমন করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা ও মহাদেব আদি দেবগণও আনন্দপূর্বক ভগবান রামচন্দ্রের প্রশংসা করতঃ, তাঁহার লীলাকীর্তন করিয়া এবং সিংহাসনোপরি বিরাজমান অভিষেক বারিদ্বারা আর্দ্রগাত্র রাজরাজেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে, সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত, ধ্যান করিতে করিতে সেখান হইতে আপন আপন লোকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ॥৬৯-৭৪॥

ঐ সময় নভোমণ্ডলে বাদ্যধ্বনি হইতেছিল। স্বর্গে দেবতাগণ প্রসন্নচিত্তে স্তুতিগান সহকারে পুষ্প বর্ষণ করিতেছিলেন, মহর্ষিমণ্ডল চতুর্দিকে তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন। কোটি সূর্যতুল্য প্রকাশমান ও মৃদু প্রসন্নহাস্যযুক্ত মনোহর মুখ, শ্যামবর্ণ ভগবান রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান, মুনিগণ ও বানরগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া দিব্য শোভায় বিরাজমান হইলেন। ॥৭৫॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধ কাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ

ষোড়শ সর্গ

বানরগণের বিদায় ও গ্রন্থ প্রশংসা

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

সর্বলোক সুখদাতা রাজরাজেশ্বর শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর পৃথিবী শস্য-সম্পন্না ও বৃক্ষসকল ফলবন্ত হইতে লাগিল। ॥১॥

গন্ধহীন পুষ্পসকল সুগন্ধ যুক্ত হইয়া শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। শ্রীরঘুনাথ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ অশ্ব, এক লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী (ধেনু) এবং অসংখ্য বৃষ দান করিয়াছিলেন। পুনঃ তিনি ব্রাহ্মণগণকে ত্রিশকোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। ॥২-৩॥

অতঃপর তিনি প্রসন্নতাপূর্বক নানা প্রকার বস্ত্র, আভূষণ এবং রত্নসমূহও ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। তদনন্তর ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র সর্বপ্রকার রত্নখচিত সূর্যসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট একটি উজ্জ্বল সুবর্ণহার অত্যন্ত প্রীতির সহিত সুগ্রীবকে এবং দুইটি দিব্য ভুজবন্ধ অঙ্গদকে প্রদান করিলেন। ॥৪-৫॥

তদনন্তর রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অতি প্রেমের সহিত কোটিচন্দ্রসম প্রকাশমান অমূল্য মণিরত্ন বিভূষিত একটি সুবর্ণহার সীতাকে প্রদান করিলেন। ॥৬॥

জনকনন্দিনী সীতা সেই হার আপন গলদেশ হইতে উন্মোচন করতঃ বারংবার শ্রীরামচন্দ্র ও বানরগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ॥৭॥

শ্রীরামচন্দ্র সীতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন—"হে সুমুখি জনকনন্দিনী! তুমি যাহার উপরে প্রসন্ন, তাহাকে উহা দান করিতে পার।" ॥৮॥

তখন সীতা শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখেই তাহা হনুমানকে প্রদান করিলেন। উক্ত হার গলদেশে ধারণ করিয়া ও অত্যন্ত গৌরবান্বিত হইয়া শ্রীহনুমান অতীব শোভান্বিত হইলেন। ॥৯॥

আপন সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হনুমানকে তাহার ভক্তিবলে প্রসন্ন হইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন— ॥১০॥

"হনুমান! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার যেরূপ ইচ্ছা বর প্রার্থনা করিয়া লও। যে বর ত্রিলোকে দেবগণেরও দুর্লভ, তাহা আমি তোমাকে অবশ্য প্রদান করিব।" ॥১১॥

তখন হনুমান অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণামপূর্বক বলিলেন—"হে ভগবান রামচন্দ্র! আপনার নাম সর্বদা স্মরণ করিতে করিতে আমার মনের পরিতৃপ্তি হইতেছে না (আরও অধিক করিবার ইচ্ছা হইতেছে)। ॥১২॥

অতএব আমি নিরন্তর আপনার নাম স্মরণ করিতে করিতে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিব। হে রাজেন্দ্র! যতদিন সংসারে আপনার নাম বিদ্যমান থাকিবে ততদিন আমার দেহও যেন বিদ্যমান থাকে।" তখন শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"আচ্ছা, এইরূপই হইবে। তুমি জীবনমুক্ত হইয়া সুখপূর্বক এই সংসারে অবস্থান কর। ॥১৩-১৪॥

এই বর্তমান কল্পের অন্ত হইলে তুমি আমার সাযুজ্য লাভ করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।" অতঃপর জানকীও অত্যন্ত প্রীতি সহকারে তাহাকে বলিলেন—"হে মারুতি! তুমি যেখানে থাক না কেন আমার আজ্ঞায় তোমার বাঞ্ছিত সর্বপ্রকার ভোগ সেখানে উপস্থিত হইবে।" ভগবান রাম ও সীতা এই প্রকার বলিবার পর মহামতি হনুমান অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ॥১৫-১৬॥

এবং তিনি আনন্দাশ্রুপূর্ণ-নয়নে উভয়কে বারংবার প্রণাম করতঃ (তাঁহাদের দুর্লভ সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া) অতি দুঃখের সহিত তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। ॥১৭॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র করজোড়ে দণ্ডায়মান গুহকের নিকট যাইয়া বলিলেন—"হে সখা! তুমি আপন পরম রমণীয় স্থান শৃঙ্গবেরপুরে গমন কর। ॥১৮॥

সেখানে সদা আমার চিন্তনে নিমগ্ন থাকিয়া স্বকীয় সদুপায়ে উপার্জিত ভোগসমূহ ভোগ কর। অন্তে তুমি আমার সারূপ্য লাভ করিবে।" ॥১৯॥

এইরূপ বলিয়া ভগবান রামচন্দ্র তাহাকে দিব্য আভূষণ, বিপুল রাজ্যপ্রদান এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিলেন। ॥২০॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলে গুহক হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অন্যান্য বানরশ্রেষ্ঠগণও যাহারা অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্র তাহাদের সকলকেই

মহার্ঘ বস্ত্র ও আভূষণ আদি প্রদানে সৎকার করিলেন। এইপ্রকারে সুগ্রীব সহিত সমস্ত বানরগণ ও বিভীষণ সকলেই পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট যথোচিত সৎকার প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। ॥২১-২৩॥

সুগ্রীব আদি সমস্ত বানরগণ প্রসন্নচিত্তে কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিলেন এবং ভগবান রামচন্দ্র কর্তৃক সংকৃত বিভীষণ আনন্দে নিষ্কণ্টক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া অতি প্রীতির সহিত লঙ্কানগরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর সকলের উপর স্নেহপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্র সম্পূর্ণ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ॥২৪-২৫॥

লক্ষ্মণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবান তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তিনিও পরম ভক্তিসহকারে শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় ব্রতী হইলেন। ॥২৬॥

পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র সর্বকর্মের সাক্ষী, নিত্যনির্মল স্বরূপ, কর্তৃত্বাদি রহিত, সর্বদা নির্বিকার, ও স্বানন্দরসতৃপ্ত হইয়াও সকলকে উপদেশ করিবার জন্য মনুষ্যরূপ আশ্রয় করতঃ বিপুল দক্ষিণা প্রদান সহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিলেন। মহারাজ রামচন্দ্রের রাজ্য শাসনকালে বিধবাগণের বিলাপ ধ্বনি শোনা যাইত না। এবং সর্পভয় ও ব্যাধিজাত ভয় এবং দস্যুগণকৃত কোন ভয়ও ছিল না। কোথায়ও কোন অনর্থ হইত না। ॥২৭-৩০॥

বৃদ্ধগণ জীবিত থাকিতে বালকগণের মৃত্যুভয় ছিল না। সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও তাঁহার স্মরণে তৎপর থাকিত। ॥৩১॥

যথাসময়ে মেঘ যথেষ্ট জল বর্ষণ করিত এবং প্রজাগণ স্ব স্ব ধর্ম পালন করতঃ বর্ণাশ্রম-উচিত গুণসমূহে বিভূষিত ছিল। ॥৩২॥

প্রজাগণকে শ্রীরামচন্দ্র আপন পুত্র সদৃশ জ্ঞানে পিতৃবৎ পালন করিতেন। এই প্রকারে সর্বলক্ষণ সম্পন্ন, সর্বধর্মপরায়ণ, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিলেন। ॥৩৩-৩৪॥

ধনধান্যাদি সম্পদ বৃদ্ধিকারী, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও পুণ্যবর্ধক এই আধ্যাত্মিক রামায়ণ নামক পরম পবিত্র এবং গোপনীয় রহস্য পূর্বকালে শ্রীআদি-মহাদেব পার্বতীকে শুনাইয়াছিলেন। ॥৩৫॥

যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে ভক্তির সহিত এই গ্রন্থ শ্রবণ করে অথবা ভক্তিপূর্বক পাঠ করে, তাহার সর্ব মনোগত কামনা সিদ্ধ হয় এবং ক্ষণকাল মধ্যেই সে কোটি কোটি পাপ হইতে মুক্ত হয়। ॥৩৬॥

ধনাভিলাষী কোন পুরুষ এই রামরাজ্যাভিষেক একাগ্রচিত্তে যদি শ্রবণ করে, তবে সে মহান সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে এবং পুত্রাভিলাষী কেহ যদি এই গ্রন্থ আদি হইতে পাঠ করে তবে সে সৎপুরুষগণ কর্তৃক মাননীয় অতি যোগ্যপুত্র লাভ করিয়া থাকে। ॥৩৭॥

যে রাজা এই অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব সম্পদসম্পন্ন রাজ্য লাভ করেন এবং শত্রুগণ কর্তৃক কখনও ধর্ষিত না হইয়া সর্বদুঃখ রহিত হন ও বিজয় লাভ করেন। ॥৩৮॥

স্ত্রীগণ মধ্যে যদি কেহ এই আধ্যাত্মিক রাম-সংহিতা শ্রবণ করেন তাহা হইলে তাহার সন্তান চিরজীবী হয় এবং তিনি স্বয়ং সেই পুত্রদ্বারা সম্মান প্রাপ্তা হন। বন্ধ্যা স্ত্রীও এই রামায়ণ কথা ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিলে সুন্দর রূপবান পুত্র প্রাপ্ত হয়। ॥৩৯॥

যে ব্যক্তি ঈর্ষা ও ক্রোধহীন হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক এই গ্রন্থ শ্রবণ বা পাঠ করে সে সর্বদোষ রহিত হইয়া নির্ভয়, সুখী ও রামভক্তি পরায়ণ হইয়া থাকে। ॥৪০॥

এই অধ্যাত্ম রামায়ণ আরম্ভ হইতে শ্রবণকারী পুরুষের উপর সমস্ত দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহার সম্পূর্ণ বিঘ্ন দূর হইয়া যায়, এবং তাহার সর্ব সম্পদ লাভ হয়। ॥৪১॥

যদি রজস্বলা স্ত্রী ভগবান রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে আদি হইতে আরম্ভ করিয়া এই রামায়ণ শ্রবণ করে তবে তাহার অতি উত্তম দীর্ঘায়ু পুত্র হয় এবং তিনি স্বয়ং পতিব্রতারূপে সংসারে সম্মানিতা হন। ॥৪২॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এ গ্রন্থের পূজা করতঃ নিত্য প্রণাম করে সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ॥৪৩॥

যাহারা এই সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে অথবা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে, তাহাদের প্রতি ভগবান রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ॥৪৪॥

ভগবান রামচন্দ্রই পরব্রহ্ম, অতএব সেই সর্বাত্মা শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হইলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে যে যাহা ইচ্ছা করে তার তাহাই লাভ হয়। ॥৪৫॥

এই জন্য দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্য প্রদানকারী এবং কোটিকল্পের পাপসমূহ বিনাশকারী এই রামায়ণ নিত্য, নিরন্তর নিয়মপূর্বক শ্রবণ করা কর্তব্য। ॥৪৬॥

এই গ্রন্থ শ্রবণ করিলে সমস্ত দেবগণ, গ্রহগণ ও সর্ব মহর্ষিগণ প্রসন্ন হন এবং পিতৃগণও পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। ॥৪৭॥

যে ব্যক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত,এই অতি অদ্ভুত প্রাচীন অধ্যাত্ম রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ, লিখন, অথবা শ্রবণ করেন তাহার এই সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না। ॥৪৮॥

ভূতনাথ শিব শঙ্কর ভগবান পুনঃপুনঃ সর্ব বেদরাশি আলোড়ন করিয়া ইহাই নিশ্চিতরূপে জানিয়াছিলেন যে তারক ব্রহ্ম "রাম" মন্ত্র বিষ্ণুভগবানের রহস্য অর্থাৎ গুপ্ত মূর্তি। ইহা জানিয়াই তিনি সর্ব বেদ ও উপনিষদের সার ও সংগ্রহরূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিগূঢ় তত্ত্ব আপন প্রেয়সী শ্রীপার্বতীকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে যুদ্ধ কাণ্ডে ষোড়শ সর্গ
যুদ্ধ কাণ্ড সমাপ্ত

উত্তর কাণ্ড

উত্তর কাণ্ড

প্রথম সর্গ

ভগবান রামচন্দ্রের নিকট অগস্ত্য আদি মুনিগণের আগমন ও রাবণাদি রাক্ষসগণের পূর্ব চরিত্র বর্ণন

মাতা কৌশল্যার হৃদয়ে আনন্দ প্রদানকারী, দশগ্রীব রাবণনিহন্তা, রঘুবংশ শ্রেষ্ঠ, দশরথ-কুমার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জয় হউক। ॥১॥

পার্বতী বলিলেন—

মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী, মহাপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র রাবণাদি রাক্ষসসমূহকে নিহত করিয়া অযোধ্যাপুরীতে সীতা সাহিত রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর তাঁহার সেই লীলামানবদেহ লইয়া আর কি কি কার্য করিয়াছিলেন? পৃথিবীতে সেই দেহে তিনি আর কত বৎসর বিদ্যমান ছিলেন? এবং এই মনুষ্যলোকে তাঁহার সেই দিব্যদেহ কি প্রকারেই বা ত্যাগ করিয়াছিলেন? ॥২-৪॥

হে প্রভো! শ্রদ্ধাবতী আমাকে সেই সব বৃত্তান্ত ব্যাখ্যান করুন। হে ভগবন্! শ্রীরাম কথামৃত আস্বাদন করতঃ আমার তৃষ্ণা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই জন্য আপনি শ্রীরামকথা আমাকে বিস্তার পূর্বক বলুন। ॥৫॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

রাক্ষসগণ বধের অনন্তর ভগবান রামচন্দ্র রাজপদে কিছুকাল বিরাজমান থাকিবার পর সমস্ত মুনিগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য আগমন করিলেন। ॥৬॥

ঐ সময় বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, নির্মল স্বভাব সপ্তর্ষিগণ এবং আপন শিষ্যগণ ও অন্যান্য মুনিগণ সহ অগস্ত্য আগমন করিলেন। ভগবান রামচন্দ্রের দ্বারদেশে পৌঁছিয়া অগস্ত্যমুনি দ্বারপালকে বলিলেন— ॥৭-৮॥

"তুমি মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রকে যাইয়া বল যে আপনাকে আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিবার জন্য অগস্ত্য আদি সমস্ত মুনিগণ আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহারা বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।" ॥৯॥

তখন দ্বারপাল অগস্ত্যমুনির কথা শুনিয়া শীঘ্রই যাইয়া ভগবান রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া অতি বিনয় সহকারে তাঁহাকে নিবেদন করিল। ॥১০॥

কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বারপাল বলিল—"দেব! আপনার দর্শনের নিমিত্ত মুনিগণসহ শ্রীঅগস্ত্য আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহারা বাহিরে দণ্ডায়মান আছেন।" ॥১১॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দ্বারপালকে বলিলেন—"অতি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগকে অন্দরে আনয়ন কর।" তখন বিধিবৎ পূজিত হইয়া মুনিগণ নানাবিধ রত্নবিভূষিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ॥১২॥

মুনিগণকে দেখিবামাত্রই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অতি শীঘ্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অর্ঘ্য পাদ্যাদি সহায়ে তাঁহাদের পূজন করতঃ তাহাদিগকে বিধিপূর্বক এক একটি গাভী প্রদান করিলেন। ॥১৩॥

তদনন্তর তাঁহাদের সকলকে নমস্কার করিয়া যথাযোগ্য দিব্য আসন প্রদান করিলেন। অতঃপর মুনিগণ ভগবান রামচন্দ্র কর্তৃক পূজিত হইয়া অতি আনন্দসহকারে আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ॥১৪॥

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা নিজেদের সর্বাঙ্গীন কুশল জ্ঞাপন করতঃ তাঁহাকে বলিলেন—"হে রঘুনন্দন! হে মহাবাহো! আপনার রাজ্যে সর্বত্রই কুশল। ॥১৫॥

হে শত্রুদমন! বহুভাগ্যবশতঃ আজ আমরা আপনাকে শত্রুবিহীন দেখিতেছি। হে রাম! আপনার রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করা কিছু কঠিন কর্ম ছিল না। ॥১৬॥

কারণ আপনি ধনুক ধারণ করিলে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ। ইহা আমাদেরই সৌভাগ্য যে আপনি রাবণাদি সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছেন। ॥১৭॥

হে মহাবাহো! রাবণ বধ সুকর কর্ম ছিল কিন্তু রাবণের পুত্র রাবণী অর্থাৎ মেঘনাদকে বধ করাই ছিল অতি দুষ্কর কর্ম। ॥১৮॥

এই কুম্ভকর্ণাদি সকল রাক্ষসগণই সাক্ষাৎ যমরাজ তুল্য ছিল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি তাহাদের সকলকেই কালসদৃশ বাণ সহায়ে নিহত করিয়াছেন। ॥১৯॥

আপনি আমাদিগকে প্রথমেই অভয় দান করিয়াছিলেন। এখন আপনি স্বয়ংও এই রাক্ষসগণকে যুদ্ধে বধ করতঃ কৃতকৃত্য হইলেন"। ॥২০॥

সেই আত্মনিষ্ঠ মুনীশ্বরগণের ভাষণ শ্রবণ করতঃ শ্রীরামচন্দ্র অতি বিস্মিত হইয়া করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥২১॥

"হে মুনিগণ! আপনারা ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ ও কুম্ভকর্ণাদির কথা না বলিয়া রাবণ পুত্র মেঘনাদের কেন প্রশংসা করিলেন?" ॥২২॥

মহাত্মা রঘুনাথের বচন শুনিয়া মহাতেজস্বী মুনি অগস্ত্য অতি প্রীতির সহিত তাঁহাকে বলিলেন— ॥২৩॥

"হে রাম! ঐ রাবণ ও তাহার পুত্রের জন্ম কর্ম ও বরপ্রাপ্তি আদির বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, আমি তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। ॥২৪॥

হে রাম! পূর্বকালে সত্যযুগে ব্রহ্মার পুত্র মহাবুদ্ধিমান ও বিদ্বান পুলস্ত্য তপস্যা করিবার জন্য সুমেরু পর্বতে গমন করিয়াছিলেন। ॥২৫॥

সেই মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ তৃণবিন্দুর আশ্রমে নিবাস করতঃ তথায় নিরন্তর স্বাধ্যায়ে (প্রণব জপ ও আত্মধ্যানে) তৎপর হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ॥২৬॥

সেই মহারমণীয় আশ্রমে দেব ও গন্ধর্বগণের সুন্দরী কন্যাগণ সঙ্গীত, বাদ্য, হাস্য, নৃত্য ইত্যাদি করতঃ পুলস্ত্যের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। তখন মহাতেজস্বী পুলস্ত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন— ॥২৭-২৮॥

"দেব বা গন্ধর্ব যে কোন কন্যা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হইবে।" তখন সেই কন্যাগণ শাপভয়ে ভীত হইয়া আর কেহই সেই আশ্রমে আসিত না। ॥২৯॥

কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা সেই শাপের কথা শুনিতে পান নাই। এজন্য সে নির্ভীক চিত্তে মুনীশ্বরের দৃষ্টির সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। ॥৩০॥

ইহাতে (গর্ভিনী হইয়া) তাহার শরীরের বর্ণ পাণ্ডুর (শ্বেত-পীত) ধারণ করিল এবং শরীরে গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। আপন শরীর বিবর্ণ হইতে দেখিয়া ভীতচিত্তে সেই কন্যা আপন পিতার নিকট গমন করিল। ॥৩১॥

মহা তেজস্বী রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যাকে দেখিয়াই ধ্যান সহায়ে আপন জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা মুনিবর পুলস্ত্যের সর্ব বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। ॥৩২॥

তখন পিতা তৃণবিন্দু মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে সেই কন্যা দান করিলেন এবং পুলস্ত্যও সেই কন্যা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ॥৩৩॥

সেই কন্যাকে অত্যন্ত সেবাপরায়ণা দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে মুনিবর পুলস্ত্য তাহাকে বলিলেন—"আমি তোমাকে উভয়কুল (মাতৃকুল ও পিতৃকুল) সমুজ্জ্বলকারী একটি পুত্র দান করিব।" ॥৩৪॥

তখন সেই কন্যার গর্ভে পুলস্ত্যের ঔরসে এক ত্রিভুন বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সেই পুলস্ত্য-পুত্রই ব্রহ্মবেত্তা মুনি বিশ্রবা নামে প্রসিদ্ধ। ॥৩৫॥

বিশ্রবার উত্তম স্বভাব চরিত্র দেখিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ সানন্দে আপন কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ॥৩৬॥

পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবার ঔরসে এই কন্যার গর্ভে লোকত্রয় প্রসিদ্ধ এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। বিশ্রবার পুত্র (বৈশ্রবণ) আপনার পিতৃতুল্যই (গুণবান্) হইয়াছিল এবং ব্রহ্মাও তাহার প্রশংসা করিতেন। ॥৩৭॥

তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট ব্রহ্মা তাহাকে তাহার মনোবাঞ্ছিত শুভ বর, অখণ্ডিত ধনেশ্বরত্ব পদ প্রদান করিয়াছিলেন। ॥৩৮॥

ব্রহ্মার বরে ধনাধ্যক্ষ হইয়া তিনি (বৈশ্রবণ) ব্রহ্মাকর্তৃক প্রদত্ত মহাতেজস্বী পুষ্পক বিমানে আরোহণ করতঃ আপন পিতৃদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। ॥৩৯॥

পিতাকে আপন তপস্যার ফল নিবেদন করিয়া প্রণাম করতঃ বলিয়াছিলেন—"ভগবন্! ভগবান ব্রহ্মা আমাকে এই অতি উত্তম বর প্রদান করিয়াছেন। ॥৪০॥

কিন্তু আমার নিবাসার্থ সেই পরমেশ্বর কোন স্থান নির্দেশ করেন নাই। অতএব আপনি আমাকে এইরূপ একটি স্থান নিশ্চিতরূপে বলুন, যেখানে নিবাস করিলে অন্য কাহারও হিংসা হইবে না।" ॥৪১॥

তখন বিশ্রবা তাহাকে বলিলেন—"বিশ্বকর্মা রাক্ষসগণের নিবাসার্থ লঙ্কানামক একটি সুন্দর পুরী নির্মাণ করিয়াছেন। ॥৪২॥

কিন্তু দৈত্যগণ বিষ্ণু ভগবানের ভয়ে ঐ স্থান পরিত্যাগ করতঃ রসাতলে চলিয়া গিয়াছে। সেই পুরী সাগরমধ্যে স্থিত বলিয়া কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ॥৪৩॥

তুমি এখন সেই স্থানে নিবাসার্থ যাও। অদ্যাবধি সেখানে কাহারাও নিবাস করে নাই।" তখন ধনপতি বৈশ্রবণ (কুবের) পিতার আজ্ঞানুসারে সেই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ॥৪৪॥

পিতার সম্মতিক্রমে তিনি সেখানে দীর্ঘকাল নিবাস করিয়াছিলেন। কোন সময় সুমালী নামক এক মাংসভোজী রাক্ষস সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী আপন কন্যাকে সঙ্গে লইয়া রসাতল হইতে নির্গত হইয়া মর্ত্যলোকে বিচরণ করিতেছিল। ॥৪৫-৪৬॥

সেই সুমালী কুবেরকে পুষ্পক বিমানে আরূঢ় হইয়া বিচরণ করিতে দেখিল। তখন বুদ্ধিমান সুমালী রাক্ষসগণের কল্যাণের জন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ॥৪৭॥

*** কৈকসী নাম্নী আপন কন্যাকে সুমালী বলিল—বৎসে! তোমার বিবাহের সময় এবং যৌবনকালও ব্যতীত হইয়া যাইতেছে। ॥৪৮॥**

কিন্তু হে কল্যাণি! তুমি প্রত্যাখ্যান করিবে এই ভয়ে তোমাকে কোন বর বরণ করিতেছে না। অতএব তোমার কল্যাণ হউক! তুমি স্বয়ং যাইয়া ব্রহ্মার বংশে উৎপন্ন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাকে বরণ কর। তাহার ঔরসে তোমারও কুবের তুল্য সর্বশোভা সম্পন্ন মহাবলবান পুত্রলাভ হইবে। ॥৪৯-৫০॥

তখন সেই কন্যা পিতার কথায় সম্মতা হইয়া মুনীশ্বর বিশ্রবার আশ্রমে গমন করতঃ সেখানে অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল ও চরণনখের সহায়ে ভূমিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল। ॥৫১॥

মুনীশ্বর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে উত্তমবর্ণা সুন্দরি! তুমি কে ও কাহার কন্যা? (এখানে কি প্রয়োজন?)" কৈকসী করজোড়ে বলিল—"ব্রহ্মন! আপনি ধ্যান দ্বারা সবই জানিতে সমর্থ।" ॥৫২॥

তখন মুনিবর ধ্যান সহায়ে সর্ব বার্তা অবগত হইয়া তাহাকে বলিলেন—"আমি তোমার মনোগত অভিলাষ জানিতে পারিয়াছি, তুমি আমার ঔরসে পুত্রাভিলাষিণী। ॥৫৩॥

কিন্তু হে সুন্দরি! তুমি এই দারুণ (সন্ধ্যা) সময়ে আগমন করিয়াছ। এই জন্য তোমার দুইটি মহাভয়ঙ্কর রাক্ষস পুত্র উৎপন্ন হইবে। ॥৫৪॥

তখন সেই কন্যা বলিল—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার এইরূপ পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইবে, ইহা অত্যন্ত অনুচিত।" তখন মুনীশ্বর তাহাকে বলিলেন—"ঐরূপ দুই পুত্রের জন্মের পর তোমার যে তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন হইবে সে মহাবুদ্ধিমান, পরম ভগবদ্ভক্ত, শ্রীসম্পন্ন এবং রামভক্তি পরায়ণ হইবে।" মুনীশ্বর এই প্রকার বলিবার পর সেই কন্যা যথাসময়ে দশটি মস্তক ও বিংশতি হস্তবিশিষ্ট দুরন্ত রাক্ষস রাবণকে প্রসব করিল। সেই রাক্ষসের জন্মকালেই পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল। ॥৫৫-৫৭॥

*** কৈকসী — মতান্তরে 'নৈকসী' - নিকস**

— এবং সংসারে বিনাশের সর্ব হেতুসমূহ যেন প্রকট হইয়া উঠিল। তৎপর মহাপর্বততুল্য বিরাট আকার কুম্ভকর্ণ উৎপন্ন হইল। ॥৫৮॥

অতঃপর রাবণের ভগ্নি শূর্পনখার জন্ম হইল এবং তৎপশ্চাৎ অতি শান্তচিত্ত, প্রিয়দর্শন বিভীষণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি অত্যন্ত স্বাধ্যায় সম্পন্ন (স্বশাখার-বেদাধ্যায়ী), আহারাদিতে সংযত স্বভাব এবং নিত্যকর্মানুষ্ঠানে নিয়ত তৎপর ছিলেন। পরদুঃখদাতা অতিদুষ্ট কুম্ভকর্ণ অতি শান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণকে ভক্ষণ করতঃ পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিত। এই প্রকার সর্বলোকের ভয়ের কারণ মহা বলবান রাবণও ত্রিভুবন বিনাশ করিবার জন্য জীবের দেহাশ্রিত কঠিন রোগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ॥৫৯-৬১॥

হে রাম! আপনি সকলের অন্তরে বিরাজমান, সর্বসাক্ষীরূপে স্বীয় জ্ঞানদৃষ্টি সহায়ে সব কিছুই অবগত হইয়া থাকেন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ এবং নির্মল স্বভাব। হে স্বমহিমায় সদা বিরাজমান পরমেশ্বর! আপনি লীলা করিবার জন্যই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি মায়িক গুণের সহিত লিপ্ত নহেন। তথাপি আপনি লীলাবশেই আমাকে (রাক্ষসগণের জন্মবৃত্তান্ত) জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেই জন্যই আমি আপনাকে তাহা শুনাইতেছি। ॥৬২॥

হে রাম! আমি আপনাকে অদ্বিতীয়, অনন্ত, অচিন্ত্যশক্তি, চিন্মাত্র, অক্ষর, জন্মরহিত এবং বিদিতাত্মস্বরূপ বলিয়া জানি। এবং মায়াদ্বারা মনুষ্য শরীরে আপন স্বরূপ প্রচ্ছন্নকারী আপনার কৃপায় মূঢ় আমি আপনার স্বরূপচিন্তন-পরায়ণ হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছি।" ॥৬৩॥

অগস্ত্য মুনি এই প্রকার বলিবার পর সূর্যবংশের পবিত্রকীর্তি-স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র সহাস্যে অগস্ত্য মুনিকে বলিলেন—"এই সর্বসংসার মায়াময়, বস্তুতঃ কিছুই আমা হইতে পৃথক নহে। অতএব হে মুনীশ্বর! আমার রূপ-গুণাদি কীর্তনই এই জগতে সর্বপাপ-হরণকারী, ইহাই জ্ঞাতব্য।" ॥৬৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে উত্তর কাণ্ডে প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

রাক্ষসগণের রাজ্য স্থাপনের বিবরণ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বোক্ত বচন শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য মুনি অতি আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সভাস্থ সকলের শ্রবণগোচরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন— ॥১॥

"হে রাম! কোন সময় ধনপতি কুবের আপন পিতাকে দর্শন করিবার জন্য অকস্মাৎ পুষ্পক বিমানে আরূঢ় হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। ॥২॥

রাক্ষসী কৈকসী মহাতেজস্বী কুবেরকে তাহার পিতার নিকট বিরাজমান দেখিয়া আপন পুত্র রাবণের নিকট গমন করিয়া বলিল—"বৎস! স্বকীয় তেজে প্রকাশমান এই ধনপতি

কুবেরকে দেখ! তুমিও তো মহাশক্তিমান। তুমিও যাহাতে এইরূপ হইতে পার, তাহার চেষ্টা কর।" ॥৫॥

ইহা শুনিবামাত্রই অত্যন্ত ক্রোধের সহিত রাবণ প্রতিজ্ঞা করিল—"হে শুভব্রতচারিণী মাতঃ! আমি শীঘ্রই কুবেরের সমান অথবা তাহাপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্যশালী হইব ; তুমি শোক করিও না।" এইরূপ বলিয়া ভ্রাতাগণ সহিত রাবণ বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তির জন্য গোকর্ণ-ক্ষেত্রে দুষ্কর তপস্যা করিবার জন্য চলিয়া গেল। সেখানে আপন আপন ব্রতনিষ্ঠায় দৃঢ় থাকিয়া তিন ভ্রাতা সর্বলোক তাপনকারী মহান তপস্যা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কুম্ভকর্ণ দশহাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিল। ॥৮॥

সত্যধর্ম পরায়ণ ধর্মাত্মা বিভীষণও পাঁচ হাজার বৎসর পর্যন্ত একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ॥৯॥

রাবণ একসহস্র দিব্যবর্ষ নিরাহার থাকিয়া সহস্রবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে আপন একটি মস্তক অগ্নিতে হবন করিত। এই প্রকারে তাহার নয় সহস্র দিব্য বৎসর ব্যতীত হইয়াছিল। ॥১০॥

অতঃপর দশম বর্ষ-সহস্র পরিপূর্ণ হইবার সময় রাবণ যখন আপন দশম মস্তকটি হোমার্থ ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন ধর্মাত্মা ব্রহ্মা সেখানে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন—"বৎস দশগ্রীব রাবণ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। ॥১১॥

তুমি আপন মনোবাঞ্ছিত যে কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।" ইহা শুনিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে রাবণ বলিল—"হে ঈশ্বর! যদি আপনি আমাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি অমরত্ব বর প্রার্থনা করি। আমি যেন গরুড়, সর্প, যক্ষ, দেবতা ও দানব কাহারও হস্তে নিহত না হই, মনুষ্যগণকে আমি তৃণতুল্য গণনা করি—(অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি কোন ভয় করি না)।" ॥১২-১৩॥

"আচ্ছা, এই রূপই হইবে" ইহা বলিয়া ব্রহ্মা পুনরায় রাবণকে বলিলেন—"হে অসুর শ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার যে সকল মস্তক অগ্নিতে হবন করিয়াছিলে সেই সকল মস্তক তোমার পূর্বের ন্যায় উদ্‌গত হইবে এবং তাহাদের কখনও নাশ হইবে না।" ॥১৪-১৫॥

হে রাম! রাবণকে এই প্রকার বলিয়া ভক্তবৎসল ব্রহ্মা প্রণত বিভীষণকে এইরূপ বলিলেন— ॥১৬॥

"বৎস বিভীষণ! তুমি ধর্মার্থ এই শ্রেষ্ঠ তপস্যা করিয়াছ। এই জন্য হে প্রিয় বৎস! তোমার হিতকর যে কোন অভীষ্ট বর তুমি প্রার্থনা কর।" ॥১৭॥

তখন বিভীষণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া করজোড়ে বলিলেন—"আমার বুদ্ধি যেন সর্বাবস্থায় নিশ্চলরূপে ধর্মনিষ্ঠ হইয়াই থাকে, তাহার কখনও কোন অবস্থায় অর্ধমে যেন রুচি না হয়।" ॥১৮॥

ইহাতে অতি প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা বিভীষণকে বলিলেন—"বৎস! তুমি অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ, তুমি যেরূপ বাঞ্ছা করিয়াছ, সেইরূপই হইবে। ॥১৯॥

হে বিভীষণ! তুমি প্রার্থনা না করিলেও আমি তোমাকে অমরত্ব বর প্রদান করিতেছি।" তদন্তর ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বলিলেন—"হে সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর।" ॥২০॥

তখন কুম্ভকর্ণ (দেবগণের প্রেরণায়) সরস্বতী দেবীর মায়ায় মোহিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিল— "হে দেব! আমি ছয় মাস নিদ্রা যাইব ও একদিন ভোজন করিব" (এইরূপ বর প্রার্থনা করিল)। ॥২১॥

ব্রহ্মাও তখন দেবগণের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ তাহাকে বলিলেন—"আচ্ছা, এইরূপই হইবে।" সরস্বতীও তখন শীঘ্রই কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে নির্গত হইয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। ॥২২॥

তখন দুষ্টচিত্ত কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—অহো! বিধির কি প্রকার বিড়ম্বনা দেখ! যাহা আমার অভিপ্রেত নহে এইরূপ বর প্রার্থনা বাক্যও আমার মুখ হইতে কেন নির্গত হইল?" ॥২৩॥

আপন তিন রাক্ষস দৌহিত্রের বরপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া সুমালী প্রহস্তাদি রাক্ষসগণ সহ নির্ভয়ে রসাতল হইতে আগমন করিল। ॥২৪॥

এবং রাবণকে আলিঙ্গন করতঃ বলিল—"বৎস! ইহা বড়ই আনন্দের কথা যে আজ তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। আমিও তোমার জন্য ইহাই কামনা করিতেছিলাম। ॥২৫॥

যাহার ভয়ে আমরা লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করতঃ রসাতলে চলিয়া গিয়াছিলাম, হে মহাবাহো! আজ আর আমাদের সেই বিষ্ণুকৃত ভয় নাই। ॥২৬॥

এই লঙ্কাপুরী তোমার ভাই কুবের এখন অধিকার করিয়াছে, পূর্বে আমরাই এইস্থানে নিবাস করিতাম। এখন তুমি সামনীতি, অথবা বলপূর্বক পুনরায় উহা অধিকার কর। (কুবের তোমার ভ্রাতা এরূপ বিচার নিরর্থক, কারণ) রাজাগণের বন্ধুই বা কে? সুহৃৎ অর্থাৎ হিতকারীই বা কে?" সুমালী এইরূপ বলিবার পর রাবণ বলিল—"আপনার এইরূপ কথন অনুচিত। ॥২৭-২৮॥

ধনপতি কুবের আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।" ইহা শুনিয়া অতি নম্রতা পূর্বক প্রহস্ত রাবণকে বলিল— ॥২৯॥

"হে রাবণ! আমি যাহা বলিতেছি তাহা যত্নপূর্বক শোন। তোমার এইরূপ বলা উচিত নয়। এখনও তুমি রাজধর্ম ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই। ॥৩০॥

শূরবীরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বলিয়া কিছু নাই। হে বীরবর! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। মহর্ষি কশ্যপের সন্তান দেবতা ও রাক্ষসগণ বড়ই শূরবীর ছিল। ॥৩১॥

তাহারা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পরিহার পূর্বক পরস্পর অস্ত্র-শস্ত্র সহায়ে যুদ্ধ করিয়াছিল। হে রাজন্! দেবগণ সহ আমাদের শত্রুভাব ইদানীন্তন নহে (অর্থাৎ ইহা বহুদিন হইতে চলিতেছে।)" ॥৩২॥

দুরাত্মা প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া দশগ্রীব রাবণ বলিল— "হাঁ তুমি ঠিক বলিয়াছ।" ঐ সময় রাবণের নেত্র ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে শীঘ্রই ত্রিকূট পর্বতে গমন করিল। ॥৩৩॥

রাবণ প্রহস্তকে দূতরূপে লঙ্কায় প্রেরণ করিল এবং কুবেরকে লঙ্কাপুরী হইতে নিষ্কাসিত

করিয়া সেস্থানে আপনার অধিকার স্থাপন করতঃ আপন রাক্ষস মন্ত্রিগণ সহিত সানন্দে নিবাস করিতে লাগিল। ॥৩৪॥

মহা যশস্বী কুবের পিতৃবাক্য অনুসারে লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করতঃ কৈলাস পর্বতে গমন করিয়া আপন তপস্যার দ্বারা শ্রীমহাদেবকে প্রসন্ন করিল। ॥৩৫॥

সেখানে শিবসহ মিত্রতা করতঃ এবং তাঁহার দ্বারাই সুরক্ষিত হইয়া বিশ্বকর্মার সহায়ে অলকা নামক একটি নগরী নির্মাণ করাইল। ॥৩৬॥

সেখানে শিবকর্তৃক রক্ষিত হইয়া সে দিক্‌পালত্ব (একটি দিকের অধিকার) প্রাপ্ত হইল। এদিকে লঙ্কায় মহাদুষ্ট রাবণ রাক্ষসগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া আপন ভ্রাতৃগণসহ রাক্ষস-রাজ্য পালন করতঃ ত্রিভুবনের সর্বপ্রাণীকে নানা দুঃখ প্রদান করিতে লাগিল। সেই মহামায়াবী রাক্ষস রাবণ আপন বিকরাল-বদনা ভগ্নিকে (শূর্পনখাকে) কালখঞ্জ বংশোৎপন্ন বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষসের সহিত বিবাহ দিয়াছিল। এই সময় রাক্ষসগণের বিশ্বকর্মা দিতিপুত্র 'ময়' দানব আপন সর্বলোক সুন্দরী কন্যা মন্দোদরীকে রাবণের হস্তে সমর্পণ করিল এবং অতি প্রসন্নচিত্তে রাবণকে একটি অমোঘ শক্তিও প্রদান করিল। ॥৩৭-৪০॥

অতঃপর রাবণ বৈরোচনের স্বয়ং প্রদত্ত দৌহিত্রী বৃত্রজ্বালার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ দিল। ॥৪১॥

তদনন্তর গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা অতিসুন্দরী সর্ব সুলক্ষণ সম্পন্না সর্বধর্ম-পরায়ণা সরমার সহিত বিভীষণের বিবাহ দিল। অতঃপর মন্দোদরীর গর্ভে মেঘনাদ নামক একপুত্র উৎপন্ন হইল। ॥৪২-৪৩॥

সেই পুত্র জন্মমাত্রই মেঘের ন্যায় গর্জন করিয়াছিল, এই জন্য সকলে তাহাকে বারম্বার 'এই মেঘনাদ' এরূপ বলিত। ॥৪৪॥

অতঃপর কুম্ভকর্ণ বলিল—"প্রভো! আমি অত্যন্ত নিদ্রাবশ হইয়া পড়িয়াছি।" তখন রাবণ একটি বিস্তৃত দীর্ঘ বিশাল গুহা নির্মাণ করাইল। ॥৪৫॥

সেইস্থানে মূঢ়মতি কুম্ভকর্ণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নাসিকা গর্জন করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হইবার পর লোক-রাবণ (সকলকে যে দুঃখ প্রদান করতঃ ক্রন্দন করায়) রাবণ ব্রাহ্মণ, মুখ্য ঋষিগণ, দেবতা, দানব, কিন্নর, মনুষ্য এবং মহানাগগণকে বধ করিল এবং দেবগণের সম্পত্তি ধ্বংস করিল। ॥৪৬-৪৭॥

তখন মহামনা কুবের রাবণের যথেচ্ছাচারিতার বৃত্তান্ত শুনিয়া দূতমুখে তাহাকে এইরূপ অধম আচরণ করিতে নিষেধ করিল। ॥৪৮॥

ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ কুবেরের পুরী আক্রমণ করতঃ কুবেরকে পরাজিত করিয়া তাহার অতি উত্তম পুষ্পক বিমান বলপূর্বক হরণ করিল। ॥৪৯॥

অতঃপর এই রাক্ষস যম আর বরুণকে যুদ্ধে পরাজিত করিল এবং ইন্দ্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় স্বর্গলোক আক্রমণ করিল। ॥৫০॥

তখন ইন্দ্র ও অন্য দেবগণের সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র অগ্রসর হইয়া রাবণকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। ॥৫১॥

তখন মহাবলী মেঘনাদ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অকস্মাৎ সেখানে আগমন করিয়া দেবগণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করতঃ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রকে বন্ধন করিল। অতঃপর মহাবলী মেঘনাদ পিতাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া এবং ইন্দ্রকে আপনার সহিত লইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিল। ॥৫২-৫৩॥

অতঃপর ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া ইন্দ্রকে মেঘনাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন, এবং মেঘনাদকে বহু বর প্রদান করতঃ আপন ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ॥৫৪॥

বিজয়ী রাবণ ক্রমশঃ সর্বলোক জয় করতঃ তাহার মুদ্‌গর সদৃশ দীর্ঘবাহু সমূহের দ্বারা কৈলাস পর্বত উত্তোলন করিল। ॥৫৫॥

সেখানে নন্দীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন যে— "মনুষ্য ও বানরগণের হস্তেই তোমার মৃত্যু হইবে।" ॥৫৬॥

কিন্তু রাবণ এই অভিশাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ শীঘ্রই হৈহয়রাজ সহস্রার্জুনের রাজধানী আক্রমণ করিল। সেখানে সহস্রার্জুন রাবণকে বন্ধন করিলে পুলস্ত্য স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। ॥৫৭॥

অতঃপর রাবণ অত্যন্ত বলবান বানররাজ বালীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বালী তাহাকে আপন বাহুমূলে বদ্ধ করতঃ চারি সমুদ্র ভ্রমণ করাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে রাবণ তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। ॥৫৮-৫৯॥

হে রাম! এই প্রকারে মহাবলবান রাবণ সর্বলোক আপন অধীন করতঃ পরমানন্দে স্বয়ংই সর্বাধিপত্য ভোগ করিতে লাগিল। ॥৬০॥

হে রাজেন্দ্র! দশগ্রীব রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। সর্বলোকের দুঃখদাতা রাবণকে আপনি বধ করিয়াছেন ও মহাত্মা লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছেন। পর্বতসদৃশ দীর্ঘকায় কুম্ভকর্ণও আপনার হস্তে নিহত হইয়াছে। ॥৬১-৬২॥

আপনি সর্বলোকস্রষ্টা, সর্বব্যাপক সাক্ষাৎ নারায়ণ। চরাচর সর্বজগৎ আপনারই স্বরূপ। ॥৬৩॥

সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা আপনার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! বাণীসহ অগ্নিদেব আপনার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ॥৬৪॥

আপনার বাহুযুগল হইতে লোকপালগণ, নেত্রদ্বয় হইতে চন্দ্রমা ও সূর্য এবং কর্ণ হইতে দিক্‌সকল জাত হইয়াছে। ॥৬৫॥

এই প্রকার আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে প্রাণ ও দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বিনী কুমারদ্বয় প্রকট হইয়াছেন। তদ্রূপ আপনার জঙ্ঘা, জানু, উরু এবং জঘনাদি অঙ্গ হইতে ভুবর্লোকাদি সৃষ্টি হইয়াছে। ॥৬৬॥

হে হরে! আপনার কুক্ষিদেশ হইতে চারিসমুদ্র, স্তনযুগল হইতে ইন্দ্র ও বরুণ এবং বীর্য হইতে বালখিল্যাদি মুনীশ্বর সৃষ্ট হইয়াছেন। ॥৬৭॥

আপনার উপস্থেন্দ্রিয় হইতে যম, পায়ু হইতে মৃত্যু, ক্রোধ হইতে ত্রিনয়ন মহাদেব, অস্থি সমূহ হইতে পর্বতসকল, কেশ হইতে মেঘ, রোমাবলি হইতে ওষধিসকল এবং নখ হইতে গর্দভাদি উৎপন্ন হইয়াছে। আপন মায়াশক্তি সমন্বিত হইয়া আপনিই বিশ্বরূপ পরম-পুরুষ। ॥৬৮-৬৯॥

প্রাকৃতিক গুণসমূহ যুক্ত হইয়া আপনিই নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন, আপনাকে আশ্রয় করিয়াই দেবগণ যজ্ঞকালে অমৃত পান করিয়া থাকেন। ॥৭০॥

এই সম্পূর্ণ স্থাবর-জঙ্গম জগৎ আপনারই সৃষ্টি এবং আপনাকে আশ্রয় করিয়াই চরাচর সকল জগৎ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ॥৭১॥

দুগ্ধে যে প্রকার ঘৃত ওতপ্রোত হইয়া সর্বতঃ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে সেই প্রকার ব্যবহার কালেও আপনি সর্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত। ॥৭২॥

সূর্যচন্দ্রাদি সকল আপনার প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু আপনি তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত হন না। আপনি সর্বগত, নিত্য ও এক অদ্বিতীয়। জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষগণই আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ॥৭৩॥

অন্ধব্যক্তি যে প্রকার সূর্য দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, অজ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষও সেই প্রকার আপনাকে দর্শন করিতে পারে না। যোগিগণ উপনিষদ বাক্যসমূহ দ্বারা অনাত্ম পদার্থ সমূহের বাধ (অর্থাৎ মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) করতঃ অহর্নিশি পরমাত্মা আপনাকে স্বীয় হৃদয় মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনার শ্রীচরণে লেশমাত্র ভক্তির প্রভাব বিদ্যমান থাকিলে তবেই তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে অন্তে চিন্মাত্রস্বরূপ আপনার দর্শন পাইয়া থাকে, অন্য কোন প্রকারে নহে। সর্বজ্ঞ আপনার সম্মুখে কিছু প্রলাপ (অনর্থক বাক্য) উচ্চারণ করিলাম, সেজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, কারণ হে দেবেশ্বর! আমি আপনার কৃপার পাত্র। ॥৭০-৭৬॥

যিনি দিক্, দেশ ও কাল রহিত ও অনন্য, এক, চিন্মাত্র, অবিনাশী, জন্মরহিত, চলনাদি ক্রিয়ারহিত, সেই সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, অনন্তগুণ সম্পন্ন, মায়াহীন এবং ভক্তগণের সহিত সদা অভিন্ন রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।" ॥৭৭॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে উত্তর কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

বালী ও সুগ্রীবের পূর্ব চরিত্র এবং রাবণ-সনৎকুমার সংবাদ

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"হে মুনে! বালী ও সুগ্রীবের জন্ম বৃত্তান্ত যথাবৎ শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ শুনিয়াছি যে ইন্দ্র ও সূর্যই ঐরূপ বানর আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ॥১॥

অগস্ত্য বলিলেন, "হে রাম! মেরুপর্বতে মণির ন্যায় প্রকাশমান সুবর্ণময় মধ্যশিখরের উপর ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তীর্ণ একটি সভা বিদ্যমান। ॥২॥

সেই স্থানে কোনসময় ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার নেত্র হইতে বহু দিব্য আনন্দাশ্রু নির্গত হইয়াছিল। ॥৩॥

তখন ব্রহ্মা আপনার হস্তে উহা ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ ধ্যানানন্তর তাহা পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ভূমিতে সেই অশ্রুজল পতিত হইবামাত্র তাহা হইতে এক বিশালকায় মহাকপি উৎপন্ন হইয়াছিল। ॥৪॥

ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন—"বৎস! তুমি কিছুকাল এই সর্বশোভা-সম্পন্ন স্থানে আমার নিকট নিবাস কর, ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।" ॥৫॥

ব্রহ্মা এই প্রকার বলিবার পর সেই মহাকপি সেখানেই নিবাস করিতে লাগিল। বহুকাল ব্যতীত হইবার পর একদিন সেই পরম বুদ্ধিমান ঋক্ষপতি (ঐ বানরের নাম) বানর ফলমূলাদির সন্ধানে পর্বতে পর্যটন করিতে করিতে এক দিব্য জলপূর্ণ ও রত্নময় শিলাশোভিত জলাশয় দেখিতে পাইল। ॥৬-৭॥

যখন সে তৃষ্ণার্ত হইয়া সেই জল পান করিবার জন্য জলাশয়ের সমীপে গমন করিল তখন সে সেই জলে একটি ছায়াময় বানর দেখিতে পাইয়া তাহাকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বানর মনে করিয়া সে সেই জলমধ্যে লম্ফ প্রদান করিল। ॥৮॥

কিন্তু সেখানে কোন বানর না পাইয়া সে শীঘ্রই লম্ফপ্রদান করতঃ জলমধ্য হইতে বহির্নির্গত হইল। কিন্তু আপনাকে এক অতি সুন্দরী নারীরূপে পরিণত হইতে দেখিয়া বিস্ময়চকিত হইয়া পড়িল। ॥৯॥

ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাকে পূজন করতঃ মধ্যাহ্নকালে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে-ছিলেন। ইন্দ্র সেই পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে দর্শন করিবামাত্র কামদেবের শরবিদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তখন তাহার উত্তমবীর্য স্খলিত হইল। সেই বীর্য সেই স্ত্রী প্রাপ্ত হইল না, কিন্তু তাহার কেশ স্পর্শপূর্বক ভূমিতলে পতিত হইল। ॥১০-১১॥

উহা হইতে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বালীর জন্ম হইল। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে একটি সুবর্ণময়ী মালা প্রদান করতঃ স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। ॥১২॥

এই সময়ে সূর্যদেবও সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনিও সেই সুন্দরীকে দর্শন করিয়া কামাতুর হইয়া পড়িলেন। এবং সেই স্ত্রীর গ্রীবাদেশে আপন উগ্রবীর্য পরিত্যাগ করিলেন। তাহা হইতে তৎকালেই এক বিশাল শরীরধারী বানর উৎপন্ন হইল। সূর্যদেব সেই সদ্যোৎপন্ন বানরের সহায়ার্থ হনুমানকে প্রদান করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ॥১৩-১৪॥

পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সেই স্ত্রী কোথাও রাত্রিকালে নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। পরদিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই সে আপনাকে পূর্বের ন্যায় বানর রূপেই দেখিতে পাইল। ॥১৫॥

তখন সেই পরমবুদ্ধিমান ঋক্ষরাজ মহাকপি ফলমূলাদি লইয়া আপন পুত্রগণের সহিত ব্রহ্মার সভায় আগমন করিল, এবং ব্রহ্মাকে প্রণাম করতঃ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ॥১৬॥

তখন ব্রহ্মা সেই বানর বীরকে বহু আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং এক দেবতুল্য দেবদূতকে আহ্বান করতঃ তাহাকে বলিলেন— ॥১৭॥

"হে দূত! আমার আদেশে এই বানরশ্রেষ্ঠকে তুমি বিশ্বকর্মা নির্মিত দিব্য কিষ্কিন্ধা নগরীতে লইয়া যাও। ॥১৮॥

সেই নগরী সর্ব ঐশ্বর্য-সম্পন্ন এবং দেবগণেরও দুর্জয়। সেখানে সিংহাসনে এই বীরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিও। ॥১৯॥

সপ্তদ্বীপে যত বড় বড় দুর্জয় বানর বীর আছে তাহারা সকলেই এই ঋক্ষরাজের অধীন থাকিবে। ॥২০॥

যখন সাক্ষাৎ পরমপুরুষ নারায়ণ ভূ-ভার-স্বরূপ অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত ভূর্লোকে রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন তখন সমস্ত বানরগণ তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিবে।" ব্রহ্মা এই প্রকার বলিবার পর মহাবুদ্ধিমান দেবদূত ব্রহ্মা যে প্রকার বলিয়াছিলেন বানররাজের সর্ব ব্যবস্থা সেইরূপই করিলেন এবং ব্রহ্মার নিকট প্রত্যাবর্তন করতঃ তাঁহাকে সর্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সেই সময় হইতে কিষ্কিন্ধানগরী বানরগণের রাজধানী হইল। ॥২১-২৪॥

হে রাম! আপনি সর্বেশ্বর, সকলের স্বামী। ব্রহ্মার প্রার্থনাবশে আপনি এইসময় মায়া-মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর সর্বভার হরণ করিয়াছেন। যিনি সর্বভূতের অন্তরে বিরাজমান, নিত্যমুক্ত এবং চৈতন্যস্বরূপ সেই অখণ্ড এবং অনন্তরূপ আপনার পক্ষে এই পরাক্রম অতি নগণ্য, তুচ্ছ। তথাপি সর্বলোকের পাপনাশ এবং তাহাদিগকে সুখ প্রদান করিবার জন্য সাধুজন আপনার মায়া-মনুষ্যরূপ ভগবানের সুযশ কীর্তন করিয়াই থাকেন। যে ব্যক্তি বালী ও সুগ্রীবের এই মহান জন্মকথা কীর্তন করিবে সে আপনার আশ্রয় লাভ বশতঃ সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। ॥২৫-২৮॥

হে রাম! আপনার সহিত সম্বদ্ধ অন্য একটি বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইতেছি, যে জন্য দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল। ॥২৯॥

পূর্বে একসময়ে একান্ত স্থানে উপবিষ্ট ব্রহ্মার পুত্র শ্রীসনৎকুমারকে বিনয়াবনত হইয়া প্রণাম করতঃ রাবণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— ॥৩০॥

"যাহার আশ্রয়ে বলী হইয়া দেবগণ সংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করেন, সর্বদেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক বলবান সেই দেবতা কে? ॥৩১॥

ব্রাহ্মণগণ নিত্য কাহার পূজা করেন এবং যোগিগণই বা কাহার ধ্যান করেন? হে ভগবন্! সর্ব প্রশ্নের উত্তর সম্যক্ অবগত আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর করুন।" ॥৩২॥

যোগদৃষ্টি সহায়ে সনৎকুমার রাবণের মনোগত অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়া তাহাকে বলিলেন—"বৎস! তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ॥৩৩॥

যিনি সর্বদা সম্পূর্ণ সংসারকে পালন করিয়া থাকেন, যিনি জন্ম-মৃত্যু বিহীন, যিনি দেবতা ও দৈত্যগণের সদা বন্দিত, অবিনাশী, যিনি শ্রীহরি নারায়ণ নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন— ॥৩৪॥

সৃষ্টিকর্তাগণেরও স্বামী ব্রহ্মা যাঁহার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই সর্বজগত রচনা করিয়াছেন, তাঁহারই আশ্রয়-বলে বলী হইয়া দেবগণ সংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকেন এবং যোগিগণও ধ্যান ও যোগাবলম্বনে তাঁহারই নাম জপ করিয়া থাকেন।" ॥৩৫-৩৬॥

মহর্ষি সনৎকুমারের এই কথা শুনিয়া রাবণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই বিষ্ণু ভগবান কর্তৃক নিহত দানব ও রাক্ষসগণ মৃত্যুর পর কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে?" তখন মুনিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন— ॥৩৭-৩৮॥

"সাধারণ দেবগণের হস্তে নিহত হইলে তাহারা অতি উত্তম স্বর্গলোকে গমন করে এবং আপন আপন ভোগ ক্ষয় হইবার পর সেইস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় ভূর্লোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ॥৩৯॥

অতঃপর পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত স্ব স্ব পাপপুণ্যের অনুসারে পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাহারা ভগবান বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয় তাহারা বিষ্ণুপদই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" ॥৪০॥

শ্রীসনৎকুমারের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া রাবণ মনে মনে অতি প্রসন্ন হইল এবং এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে আমি ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। ॥৪১॥

মুনিবর রাবণের অন্তরের বাসনা জানিতে পারিয়া বলিলেন—"বৎস! তোমার অভীষ্ট অবশ্যই পূরণ হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৪২॥

হে দশানন! তুমি সুখে থাক, কিছুকাল প্রতীক্ষা কর।" হে মহাবাহু রঘুনাথ! রাবণকে এইরূপ বলিয়া মুনি পুনরায় তাহাকে বলিলেন— ॥৪৩॥

"হে রাবণ! তিনি (সেই পরমপুরুষ) রূপবিহীন, তথাপি আমি তোমাকে তাঁহার মায়িক স্বরূপ বলিতেছি। তিনি নদনদী আদি সর্ব স্থাবর পদার্থে পরিব্যাপ্ত। ॥৪৪॥

তিনিই ওঁকার, সত্য, সাবিত্রী, পৃথিবী এবং সম্পূর্ণ জগতের আধার শেষনাগ। ॥৪৫॥

সম্পূর্ণ দেবগণ, সমুদ্র, কাল, সূর্য, চন্দ্রমা, সূর্যোদয়, দিন, রাত্রি, যম, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু, মেঘ, বসুগণ, ব্রহ্মা ও রুদ্র আদি এবং আরও যত দেব দানব আছে সব তাঁহারই রূপ। ॥৪৬-৪৭॥

সম্পূর্ণ বিশ্বের স্রষ্টা সেই সনাতন বিষ্ণু ভগবান মায়াশ্রয়ে নানাপ্রকার লীলা করিয়া থাকেন। তিনি বিদ্যুতরূপে প্রকাশিত হন, অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত হন, বিষ্ণুরূপে সকলকে পালন করেন এবং রুদ্ররূপে সকলকে ভক্ষণ (বিনাশ) করিয়া থাকেন। ॥৪৮॥

সচরাচর স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ত্রিভুবন তিনি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নীল-কমল-দল তুল্য শ্যামবর্ণ ও বিদ্যুতের ন্যায় আভাবিশিষ্ট পীতাম্বরধারী। ॥৪৯॥

তিনি আপন বামপার্শ্বে উপবিষ্টা কাঞ্চনবর্ণা অবিনাশিনী ভগবতী লক্ষ্মীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ সদা বিরাজমান। ॥৫০॥

দেব দানব বা নাগগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ নহে। যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা বর্ষণ হয় কেবল সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ। ॥৫১॥

যজ্ঞ, তপ, দান, অধ্যয়ন অথবা অন্য কোন উপায়েই ভগবানের দর্শন লাভ হয় না। ॥৫২॥

যে তাঁহার ভক্ত, যাহার প্রাণমন তাঁহাতেই সংলগ্ন ও যাহার চিত্ত সর্বদা তাঁহারই চিন্তনে নিষ্পাপ হইয়াছে এবং বেদান্তবিচার সহায়ে যাহাদের দৃষ্টি নির্মল হইয়াছে, সেই সর্ব কল্মষবিহীন মহাত্মাগণই ভগবান বিষ্ণুকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ॥৫৩॥

(পূর্বোক্ত উপায়াদি বিনাই) যদি তোমার পরমেশ্বরের দর্শন ইচ্ছা থাকে তবে শোন— সেই দেবাধিদেব শ্রীহরি ত্রেতাযুগে দেবতা ও মনুষ্যগণের কল্যাণার্থ নৃপ শরীরে ইক্ষাকুবংশে মহারাজ দশরথের পুত্র মহাবীর ও পরাক্রমী ভগবান রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। ॥৫৪-৫৫॥

সেই পরম ধার্মিক রঘুনাথ পিতৃ আজ্ঞাবশে আপন ভ্রাতা (লক্ষ্মণ) ও স্বীয় পত্নী জগত-জননী-মায়া সহ দণ্ডকবনে বিচরণ করিবেন। ॥৫৬॥

হে রাবণ, এই প্রকারে আমি তোমাকে সর্ববৃত্তান্ত বিস্তারপূর্বক বর্ণন করিলাম। এখন তুমি সর্বদা ভক্তিপূর্বক লক্ষ্মী (সীতা) সহিত ভগবান রামচন্দ্রের ভজন কর।" ॥৫৭॥

অগস্ত্য বলিলেন—

"হে রাম! ইহা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ কিছুকাল মনে মনে বিচার করতঃ তদনন্তর আপনার সহিত বিরোধ করিবার জন্যই দৃঢ় সংকল্প করিল এবং তাহাতেই তাহার মনের প্রসন্নতা লাভ হইল। ॥৫৮॥

যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সে সর্বলোকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার হস্তে নিহত হইবার ইচ্ছা করিয়াই মহাবুদ্ধিমান রাবণ দেবী জানকীকে অপহরণ করিয়াছিল। ॥৫৯॥

যে ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ বা পাঠ করিবে অথবা শ্রবণার্থীগণকে সর্বদা শ্রবণ করাইবে সে দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, অনন্ত সুখ, বাঞ্ছিত বস্তু লাভ এবং অক্ষয় ধন লাভ করিবে। ॥৬০॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা মহেশ্বর সংবাদে
উত্তর কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

রামরাজ্য বর্ণন ও সীতা-বনবাস

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

একদিন বিভিন্ন লোকে পর্যটন করিতে করিতে রাবণ শ্রীনারদ মুনিকে ব্রহ্মালোক হইতে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥১॥

"ভগবন্! বলবান পুরুষগণ সহ আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। ত্রিভুবনের সর্বত্র আপনার

পরিচিত, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন আমার সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন বলশালী পুরুষ কোথায় আছে?" ॥২॥

তখন মুনীশ্বর দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"হে মহাবুদ্ধিমান! শ্বেতদ্বীপ নিবাসিগণ বিশাল শরীর ও মহাবল সম্পন্ন। তুমি সেখানে যাও। ॥৩॥

যাহারা বিষ্ণু ভগবানের পূজায় তৎপর অথবা যাহারা বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয় তাহারাই সেখানে জাত হইয়া থাকে। দেবতা বা দানবগণ কেহই তাহাদিগকে জয় করিতে পারে না।" ॥৪॥

ইহা শুনিয়া রাবণ শীঘ্রই আপন মন্ত্রিগণ সহ পুষ্পক-বিমানারূঢ় হইয়া যুদ্ধার্থ শ্বেতদ্বীপের নিকট গমন করিল। ॥৫॥

সেই দ্বীপের প্রভাদ্বারা তেজহীন হইয়া পুষ্পক বিমান আর অগ্রে চলিতে সমর্থ হইল না। অতএব রাবণ বিমান ও মন্ত্রিগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই অগ্রে চলিল। ॥৬॥

সেই দ্বীপে প্রবেশ করিবামাত্রই একটি স্ত্রী তাহার হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বল তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমাকে এখানে কে প্রেরণ করিয়াছে?" ॥৭॥

এই প্রকারে সেখানে বহু স্ত্রী লীলাপূর্বক সহাস্যে পুনঃপুনঃ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এবং রাবণ ঐ সকল ভক্তগণের হস্ত হইতে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাইল। ॥৮॥

ইহা দেখিয়া তাহার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। এবং তখন দুর্বুদ্ধি রাবণ চিন্তা করিতে লাগিল,—'আমি বিষ্ণু ভগবানের হাতে নিহত হইয়া নিঃসন্দেহ বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিব। ॥৯॥

অতএব আমার এরূপ কার্য করা কর্তব্য যাহাতে বিষ্ণু ভগবান আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।' এইরূপ বিচার করিয়াই সেই অসুর রাবণ দণ্ডকারণ্যে জানকীকে অপহরণ করিয়াছিল। ॥১০॥

হে রাম! আপনার হস্তে নিহত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াই এবং আপনাকে সাক্ষাৎ পরমাত্মা জানিয়াও সে সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে মাতৃতুল্য পালন করিয়াছিল। ॥১১॥

হে রাম! আপনি পরমেশ্বর, আপনি ত্রিকালদর্শী, সর্ববিকল্প রহিত। জ্ঞানদৃষ্টি সহায়ে আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবকিছু অবগত আছেন। হে স্বামিন্! আপনি ভক্তগণকে সন্মার্গ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই বিবিধ লীলা রচনা করিয়া থাকেন এবং সর্বলোক পূজিত হইয়াও মনুষ্যরূপে আমাদের ন্যায় মুনিগণের বচন শ্রবণ করিতেছেন, এই প্রকার প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।" ॥১২॥

এই প্রকার শ্রীরঘুনাথের স্তুতি করতঃ এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পূজা সৎকারাদি লাভান্তে শ্রীঅগস্ত্যমুনি অন্য মুনীশ্বরগণ সহ হৃষ্ট চিত্তে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। ॥১৩॥

লক্ষ্মীপতি ভগবান রাম, সীতা, ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণ সহ সংসারী পুরুষের ন্যায় সানন্দে গৃহে কাল-ব্যতীত করিতে লাগিলেন। ॥১৪॥

স্বয়ং অসঙ্গ হইয়াও আপন প্রিয়া পত্নীসহ নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করিলেন। সর্বদা তিনি হনুমানাদি শ্রেষ্ঠ বানরগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিতেন। ॥১৫॥

একসময়ে পূর্বের ন্যায় পুষ্পক বিমান ভগবান রামচন্দ্রের নিকট আগমন করতঃ বলিল—"ভগবন্! কুবের আমাকে পুনরায় আপনারই সেবা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ॥১৬॥

(তিনি আমাকে বলিয়াছেন) পূর্বে তোমাকে রাবণ জয় করিয়াছিল, পুনঃ (রাবণ বধ করতঃ) শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে জয় করিয়াছেন। অতএব যতদিন শ্রীরামচন্দ্র পৃথিবীতলে বিদ্যমান থাকেন, ততদিন তাঁহাকে নিত্য বহন কর। ॥১৭॥

যখন রঘুনাথ বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, তখন তুমি আমার নিকট ফিরিয়া আসিও।" ইহা শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ সূর্য-তুল্যদীপ্তিমান পুষ্পককে বলিলেন— ॥১৮॥

"তোমার কল্যাণ হোক! যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি আমার নিকট আসিও, এখন তুমি যাও ও আমার আদেশানুসারে লোকচক্ষুর অন্তরালে সর্বত্র বিরাজিত থাক।" ॥১৯॥

পুষ্পককে এই প্রকার আজ্ঞা প্রদান করতঃ শ্রীরামচন্দ্র আপন ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণ সহ মিলিত হইয়া পুরবাসিগণের যাবতীয় কর্ম যথাযথ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ॥২০॥

লোকনাথ লক্ষ্মীপতি ভগবান রামচন্দ্রের শাসনকালে পৃথিবী ধনধান্য পূর্ণ এবং বৃক্ষসমূহ ফলবন্ত থাকিত। ॥২১॥

তাঁহার রাজ্যে সমস্ত পুরুষগণ ধর্মপরায়ণ, স্ত্রীগণ পতিভক্তি পরায়ণা ছিল এবং কাহাকেও পুত্রমরণ প্রত্যক্ষ করিতে হয় নাই। ॥২২॥

ভগবান রাম, সীতা, ভ্রাতৃগণ ও বানরগণ সহিত বিমানারূঢ় হইয়া পৃথিবীতে সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। ॥২৩॥

তিনি সংসারে বহু অমানবীয় লীলা করিয়াছিলেন। একসময় এক ব্রাহ্মণ কুমারের বাল্যাবস্থায় অসময়ে মৃত্যু হইলে, সেই শোকাকুল ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রঘুশ্রেষ্ঠ মহামতি রামচন্দ্র বনে তপস্যারতঃ জনৈক শূদ্রকে (ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যুর কারণ জানিয়া) বধ করিয়াছিলেন। এবং সেই মৃত বালককে পুনর্জীবিত করিয়া তপস্যাচারী শূদ্রকে অতি উত্তম স্বর্গলোক প্রদান করিয়াছিলেন। সর্বজনগণের কল্যাণার্থ ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রকার অলৌকিক ভোগাদি প্রদান সহায়ে সীতার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। ॥২৪-২৭॥

এই প্রকারে পরমধর্মবিদ্ ভগবান রামচন্দ্র ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এবং সর্বলোকের (শ্রবণমাত্র) পাপাপহারী আপন পবিত্র লীলাকথা সংসারে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ॥২৮॥

সর্বজন যাঁহার চরণকমল বন্দনা করিয়া থাকেন, সেই মায়ামনুষ্যধারী শ্রীরামচন্দ্র দশসহস্র বৎসর রাজত্ব করিলেন। ॥২৯॥

রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র একপত্নী ব্রতধারী ছিলেন। পবিত্র চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র সর্বজন শিক্ষার্থ গৃহস্থ আশ্রমের যাবতীয় ধর্ম পালন করিলেন। ॥৩০॥

সাধ্বী সীতাও পতির হৃদগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া আপন প্রেম, আজ্ঞাপালন, নম্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, লজ্জা ও ভীরুতা আদি গুণের দ্বারা পতির মন হরণ করিতেন। ॥৩১॥

একদিন শ্রীরঘুনাথ ক্রীড়াবনে সর্বভোগ সমন্বিত দিব্যভবনে একান্ত স্থানে সুখাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরকান্তি নীলমণি সদৃশ ছিল এবং তিনি দিব্যাভরণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার মুখও প্রসন্ন ও ভাবগম্ভীর ছিল এবং তিনি বিদ্যুতপুঞ্জ সদৃশ দীপ্তিমান পীতাম্বরধারী ছিলেন। ঐ সময় সর্বালঙ্কারভূষিতা, কমলদললোচনা সীতা আপন করকমলের দ্বারা শ্রীরঘুনাথের চরণকমল সেবা করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন— ॥৩২-৩৪॥

—"দেবাধিদেব! হে জগন্নাথ! হে সনাতন পরমাত্মা! হে চিদানন্দস্বরূপ! হে আদি-মধ্য-অন্ত-রহিত সর্বকারণ! হে দেব! দেবতাগণ আসিয়া আমাকে একান্তে বহু প্রার্থনা করতঃ আপনার বৈকুণ্ঠ গমনের বিষয় বলিয়াছেন। ॥৩৫-৩৬॥

তাঁহারা আমাকে বলিলেন—"চিৎ-শক্তি তোমার সহিত যুক্ত হইয়াই শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে এবং স্বীয় সনাতন স্থান বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করতঃ পৃথিবীতলে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। ॥৩৭॥

হে জগদ্ধাত্রি! কমললোচন রাম সর্বদা তোমার সহিত বিরাজ করেন। যদি তুমি অগ্রে বৈকুণ্ঠে গমন কর তাহা হইলে তৎপর শ্রীরঘুনাথও বৈকুণ্ঠে আগমন করিবেন এবং আমাদিগকে স-নাথ করিবেন।" আমাকে তাহারা যে প্রকার বলিয়াছেন তাহা আমি আপনাকে নিবেদন করিলাম। ॥৩৮-৩৯॥

হে প্রভো! ইহা আমার কোন আদেশ নহে। আপনি যাহা যোগ্য বিবেচনা করিবেন তাহাই করিবেন।" সীতার এই প্রকার বচন শুনিয়া রঘুনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥৪০॥

"দেবি! আমি ইহা সবই জানি। তথাপি (এই কার্য সিদ্ধির জন্য) তোমাকে একটি উপায় বলিতেছি। তোমার সম্বন্ধীয় একটি লোকাপবাদের ছলে লোকনিন্দার ভয়ে অপর পুরুষগণের ন্যায় তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিব। সেখানে বাল্মীকির আশ্রমের নিকট তোমার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। ॥৪১-৪২॥

তোমার শরীরে গর্ভাবস্থার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। (বালকদ্বয়ের জন্মগ্রহণের পর) তুমি পুনঃ আমার নিকট আসিবে এবং সর্বজনের প্রত্যয়ার্থ সাদরে শপথ গ্রহণ পূর্বক ভূবিবর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শীঘ্রই বৈকুণ্ঠ ধামে চলিয়া যাইবে। তৎপর আমিও সেখানে যাইব, ইহা সুনিশ্চিত জানিও।" ॥৪৩-৪৪॥

জ্ঞানস্বরূপ ভগবান রামচন্দ্র সীতাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণ ও মুখ্য সেনাপতিগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। সুহৃদগণ সেইস্থানে উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের পরিচর্যায় রত হইলেন এবং হাস্য কৌতুকাদি করিতে কুশল বিদূষকগণ তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। ॥৪৫-৪৬॥

তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে বিজয় নামক এক দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার, সীতার, মাতা কৌশল্যার, আমার ভ্রাতাগণের অথবা মাতা কৈকেয়ীর বিষয়ে পুরবাসিগণ ভাল বা মন্দ কিছু বলে কি? তুমি আমার নামে শপথ করিয়া সব কথা সত্য সত্য বল, কোন ভয় করিও না।" ॥৪৭-৪৮॥

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার পর বিজয় বলিল—"হে দেব! সকলেই এই কথা বলে যে তত্ত্বজ্ঞানী মহারাজ রামচন্দ্র অতি দুষ্কর কর্মসকল করিয়াছেন। ॥৪৯॥

কিন্তু তিনি রাবণ বধানন্তর সীতাকে কোনপ্রকার সন্দেহ না করিয়াই আপন সঙ্গে গৃহে আনয়ন করিয়াছেন। ॥৫০॥

যে সীতাকে দুরাত্মা রাবণ জনশূন্য বনে হরণ করিয়াছিল, তাহার সহিত বিষয় ভোগাদি করিয়া শ্রীরামচন্দ্র কি সুখ লাভ করেন জানি না। ॥৫১॥

এখন আমাদের স্ত্রিগণের দুশ্চরিত্রতাও সহ্য করিতে হইবে। কারণ রাজা যে প্রকার হন প্রজাগণও সেই প্রকার হয়, ইহা নিঃসন্দেহ।" ॥৫২॥

দূতের এই প্রকার বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় আত্মীয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারাও শ্রীরঘুনাথকে প্রণাম করতঃ ইহাই বলিল যে দূত কথিত বার্তা যথার্থ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ॥৫৩॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রিগণ, বিজয় এবং আত্মীয়গণকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণকে আহ্বান করতঃ এইপ্রকার বলিলেন—"ভাই লক্ষ্মণ! সীতাকে নিমিত্ত করিয়া আমার বড় লোকনিন্দা হইতেছে। অতএব তুমি আগামীকল্য প্রাতে সীতাকে রথে লইয়া বাল্মীকি মুনির আশ্রমের নিকট পরিত্যাগ করতঃ প্রত্যাগমন করিবে। এবিষয়ে তুমি যদি কোন কথা বল অর্থাৎ আপত্তি কর তাহা হইলে আমার হত্যা দোষে লিপ্ত হইবে।" ॥৫৪-৫৬॥

ভগবানের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া ভয়ভীত লক্ষ্মণ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই সুমন্ত্রের দ্বারা সজ্জিত রথে জানকীকে লইয়া শীঘ্রই বনের দিকে যাত্রা করিলেন। ॥৫৭॥

বাল্মীকি মুনির আশ্রমের নিকট পৌঁছিয়াই সীতাকে সেখানে পরিত্যাগ করতঃ লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রীরামচন্দ্র লোকাপবাদের ভয়ে আপনাকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ॥৫৮॥

হে মাতঃ! এ বিষয়ে আমার কোন দোষ নাই। আপনি এখন মুনীশ্বরের আশ্রমে গমন করুন।" সীতাকে এইপ্রকার বলিয়া লক্ষ্মণ শীঘ্রই শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। ॥৫৯॥

তখন সীতা অত্যন্ত দুঃখাতুরা হইয়া সাধারণ মূর্খ নারিগণের ন্যায় বিলাপ করিতে লগিলেন। যখন মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের মুখে শুনিলেন যে কোন একটি নারী আশ্রমের সন্নিকটে রোদন করিতেছে, তখন তিনি দিব্যদৃষ্টি সহায়ে জানিলেন যে ঐ নারী সীতা। ॥৬০॥

মুনি ভবিতব্য সকলই জানিতেন, সুতরাং তিনি অর্ঘ্যাদি দ্বারা সীতাকে পূজন ও আশ্বাস প্রদান করতঃ তাহাকে মুনিপত্নিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ॥৬১॥

সীতা সাক্ষাৎ পরমাত্মার শক্তি লক্ষ্মী ইহা মুনীশ্বরগণের নিকট জানিয়াই ঐ মুনিপত্নিগণ অতি ভক্তিভাবে নিত্য তাঁহার পূজা এবং সর্বদা অত্যন্ত আদর ও নম্রতার সহিত সেবা করিতেন। ॥৬২॥

সীতাকে পরিত্যাগের পর, যাঁহার চরণকমল মুনিগণ সেবা করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞানচক্ষু, অদ্বিতীয়, আদিদেব, পরমাত্মা রামও সর্ববিষয়ভোগ পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্বক মুনিগণের ন্যায় ব্রতধারী হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে উত্তর কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

রাম-গীতা

শ্রীমহাদেব বলিলেন— হে পার্বতি!

তদনন্তর রঘুশ্রেষ্ঠ ভগবান রামচন্দ্র জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ধৃত, স্বীয় দিব্যমঙ্গল স্বরূপ, দেহসহায়ে রামায়ণরূপ (রামজন্মাদি কথারূপ) উত্তমকীর্তি স্থাপন করতঃ পূর্বকালে শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ যে প্রকার আচরণ করিতেন, তিনিও স্বয়ং সেই প্রকার জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ॥১॥

উদারবুদ্ধি লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে অতি উত্তম প্রাচীন কাহিনী সকল শুনাইতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরঘুনাথ প্রমাদবশতঃ ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাজা 'নৃগের' তীর্যগ্‌যোনিত্ব প্রাপ্তির কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। ॥২॥

কোন একদিন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যাঁহার চরণকমল সেবা করিয়া থাকেন সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নির্জনে একান্তস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় অতি শুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ নিকটে যাইয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করতঃ অতি বিনীতভাবে বলিলেন— ॥৩॥

"হে বিশাল বুদ্ধে! আপনি শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ, আপনি সর্ব দেহধারিগণের আত্মা, সকলের স্বামী এবং স্বরূপতঃ নিরাকার। আপনার চরণকমলের ভ্রমররূপ পরমভক্তগণের সঙ্গ রসিকগণকেই জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করতঃ আপনি আপনার সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন। ॥৪॥

হে প্রভো! যোগিজন নিরন্তর যাঁহার চিন্তন করিয়া থাকেন, সংসার বন্ধন হইতে মোচনকারী আপনার সেই চরণকমলে শরণ লইতেছি। আপনি আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমি অনায়াসে অজ্ঞানরূপী অপার সংসারসমুদ্র পার হইয়া যাইতে পারি।" ॥৫॥

লক্ষ্মণের এই সকল বচন শুনিয়া শরণাগত-বৎসল রাজেন্দ্র-শিরোমণি ভগবান রাম, তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে অতি উৎসুক লক্ষ্মণকে তাহার অজ্ঞান নাশ করিবার জন্য, প্রসন্নচিত্তে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন— ॥৬॥

"সর্বপ্রথম স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত শাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্রিয়াসকল যথাবৎ পালন করতঃ

চিত্তশুদ্ধির অনন্তর সেই সকল কর্ম (মুমুক্ষু) পরিত্যাগ করতঃ এবং সংযমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত সদ্‌গুরুর শরণ লইবে। ॥৭॥

কর্মই দেহান্তর প্রাপ্তির হেতু, কারণ কর্মে অত্যন্ত আসক্তিবশতঃই পুরুষ ইষ্টানিষ্ট উভয় প্রকার কর্ম করিয়া থাকে। তাহা হইতে ধর্ম ও অধর্ম উভয়ের প্রাপ্তি হয় এবং তৎবশতঃ পুনরায় জীব নূতন শরীর প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ কর্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে এই সংসার, চক্রের ন্যায় আবর্তিত হইতে থাকে। ॥৮॥

অজ্ঞানই সংসারের মূল কারণ। শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা অজ্ঞানের নাশই সংসার হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় বর্ণিত হইয়াছে। কেবল জ্ঞানই অজ্ঞান নাশ করিতে সমর্থ ; (সকাম) কর্ম নহে, কারণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন কর্মের সহিত ঐ অজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। ॥৯॥

(সকাম) কর্মের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ অথবা বিষয়াসক্তির ক্ষয় হইতে পারে না। বরং উহা হইতে আরও সদোষ কর্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা পুনরায় অনিবার্য রূপে সংসার প্রাপ্তি ঘটে। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির জ্ঞান বিচারেই তৎপর হওয়া কর্তব্য। ॥১০॥

কোন কোন বিতর্কবাদী এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, যেরূপ জ্ঞান বেদে পুরুষার্থ-সাধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কর্মও সেইপ্রকার বেদবিহিত ; আর প্রাণিগণের জন্য কর্ম অবশ্য কর্তব্য, বেদে এইরূপ বিধানও রহিয়াছে। এইজন্য কর্ম জ্ঞানের সহকারী (সহায়ক) এইরূপই স্বীকার করা উচিত। পুনঃ কর্ম না করিলে দোষ হয়, ইহাও শ্রুতি বলিয়াছেন, অতএব মুমুক্ষুগণের সর্বদা কর্ম করা উচিৎ।

আর যদি কেহ এই প্রকার বলেন যে জ্ঞান স্বতন্ত্র এবং উহা অবশ্যই ফল প্রদান করিয়া থাকে, স্বপ্নেও অপর কাহারও সহায়তার আবশ্যক হয় না। (তবে আমরা বলিব যে) ঐরূপ কথন ঠিক নহে; কারণ বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম যে প্রকার অন্য কারকাদির অপেক্ষা রাখে, সেই প্রকার বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান সহায়েই জ্ঞান মুক্তির সাধক হইতে পারে। অতএব কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে। ॥১১-১৩॥

(সিদ্ধান্তী) — যদি কোন বিতর্কবাদী এইরূপ বলেন, তাহা হইলে আমরা বলি যে উহা ঠিক নহে, কারণ তাহাতে প্রত্যক্ষ বিরোধ হয়। কর্ম দেহাভিমান হইতে হইয়া থাকে আর জ্ঞান হয় অহঙ্কারের সমূল নাশে। ॥১৪॥

বেদান্তবাক্য বিচার করিতে করিতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত যে চরম ব্রহ্মাকারাবৃত্তি হইয়া থাকে তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে। কিন্তু কর্ম সম্পূর্ণ কারকাদির সহায়ে সম্পন্ন হয়, আর বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) সমস্ত কারকাদি সমূহ (মিথ্যাত্বনিশ্চয় দ্বারা) নাশ করিয়া থাকে। ॥১৫॥

অতএব বিষয় হইতে সর্বেন্দ্রিয় উপরত করতঃ নিরন্তর আত্মচিন্তন তৎপর-বুদ্ধিমান পুরুষ সম্পূর্ণ কর্ম সর্বদা পরিত্যাগ করিবেন, কারণ বিদ্যাবিরোধী কর্মের সহিত ঐ বিদ্যার কোন সমুচ্চয় হইতে পারে না। ॥১২॥

মায়াবশতঃ শরীরাদিতে যে পর্যন্ত আত্মত্ববুদ্ধি থাকে সে পর্যন্তই বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান কর্তব্য। "নেতি নেতি" আদি বেদবাক্য সহায়ে সম্পূর্ণ অনাত্ম পদার্থ (মিথ্যাজ্ঞানে) নিষেধ

করতঃ স্বীয় পরমাত্মস্বরূপ অবগত হইবার পর (সাধকের) সর্বকর্ম ত্যাগ করাই কর্তব্য। ॥১৭॥

যখন পরমাত্মার ও জীবাত্মার ভেদনাশক প্রকাশময় ব্রহ্মাকারাবৃত্তি অন্তঃকরণে স্পষ্টরূপে অবভাসিত হয়, সেইক্ষণেই জীবাত্মার সংসার-প্রাপ্তির কারণ মায়া কর্তৃত্বাদি কারকাদি সহিত বিনা আয়াসেই বিলীন হইয়া যায়। ॥১৮॥

শ্রুতিপ্রমাণ জন্য জ্ঞানদ্বারা মায়া বিধ্বস্ত হইবার পর সেই মায়া পুনঃ আপন কার্য করিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে? কারণ পরমার্থ তত্ত্ব একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, নির্মল ও অদ্বিতীয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের পর অবিদ্যা আর পুনরায় উৎপন্ন হইতে পারে না। ॥১৯॥

একবার নষ্ট হইবার পর অবিদ্যার যখন আর পুনর্জন্ম হয় না তখন 'আমি কর্তা' জ্ঞানীর এইপ্রকার বুদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? অতএব জ্ঞান স্বতন্ত্র। জীবের মোক্ষের জন্য জ্ঞান, কর্মাদি অপর কোন সাধনের সহায়তার অপেক্ষা রাখে না। মোক্ষপ্রদানে জ্ঞান এককই সমর্থ। ॥২০॥

তৈত্তিরীয় শাখার প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্য অতি আদরের সহিত ইহাই স্পষ্ট বলিয়াছেন যে সর্বকর্ম ত্যাগই যুক্তিযুক্ত, এবং বাজসনেয়ী শাখার শ্রুতি 'বৃহদারণ্যক', 'এতাবৎ' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যদ্বারা ইহাই ঘোষণা করিয়া থাকেন যে জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, কর্ম নহে। ॥২১॥

হে বাদি! তুমি যে জ্ঞানের সহিত কর্মের সমানতা প্রদর্শন করিবার জন্য যজ্ঞের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলে, উহাও যথার্থ নহে। কারণ ঐ উভয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন। আরও দেখ, যজ্ঞ (হোতা, ঋত্বিক্, যজমান আদি) বহু কারক দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞান উহার বিপরীত অর্থাৎ জ্ঞান কারকাদির সাধ্য নহে। ॥২২॥

কর্ম পরিত্যাগ করিলে আমার প্রত্যবায় (পাপ) হইবে এবং আমি প্রায়শ্চিত্ত-ভাগী হইব, — এইপ্রকার বুদ্ধি অনাত্মজ্ঞ অজ্ঞানীরই হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞানীর কখনও হয় না। এই জন্য নির্বিকার চিত্ত জ্ঞানীপুরুষের বিহিত কর্মসমূহের বিধিপূর্বক ত্যাগ করাই অর্থাৎ সন্ন্যাস করাই কর্তব্য। ॥২৩॥

অতঃপর শুদ্ধচিত্ত শিষ্য শ্রদ্ধাপূর্বক গুরুকৃপায় তাঁহার মুখনিঃসৃত 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য শ্রবণ ও বিচার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব জ্ঞানলাভে সুমেরু পর্বততুল্য নিশ্চলতা ও আনন্দপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ॥২৪॥

বাক্যের অর্থ জানিতে হইলে প্রথমে সেই বাক্যের পদসমূহের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, ইহাই নিয়ম। এই তত্ত্বমসি মহাবাক্যেও 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই উভয় পদ ক্রমশঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মার বাচক এবং 'অসি' পদ ঐ উভয়ের একত্ববোধক। ॥২৫॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের মধ্যে জীবাত্মা প্রত্যক্ (অন্তঃকরণ সাক্ষী), আর পরমাত্মা পরোক্ষ (ইন্দ্রিয়াতীত), উভয়ের এই বাচ্যার্থের বিরোধাংশ পরিত্যাগ করিয়া ও লক্ষণাবৃত্তি সহায়ে লক্ষিত তাহাদের শুদ্ধ চৈতন্য অংশ গ্রহণ করিয়া উহাই আপন স্বরূপ আত্মা এইরূপ জানিয়া সাধক অদ্বিতীয় তত্ত্বে স্থিত হইয়া থাকেন। ॥২৬॥

এই 'তৎ' ও 'ত্বম্' উভয়পদ এক চৈতন্যরূপ বলিয়া ইহাতে জহল্লক্ষণা হইতে পারে না

এবং পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া অজহল্লক্ষণাও প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব 'সোহয়ম্' এই উভয়পদের অর্থের ন্যায় 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদদ্বয়ে ও ভাগত্যাগ লক্ষণাই নির্দোষরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। ॥২৭॥

ক্ষিতি, অপ্ আদি পঞ্চীকৃত ভূত হইতে উৎপন্ন, সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ভোগের আশ্রয়, পূর্বোপার্জিত কর্মফল বশতঃ প্রাপ্ত, আদি অন্তবিশিষ্ট মায়াময় এই স্থূল শরীরকে বিদ্বানগণ আত্মার স্থূল উপাধি বলিয়া থাকেন। এবং দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অঙ্গবিশিষ্ট এবং অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে উৎপন্ন, ভোক্তা জীবের সুখ-দুঃখাদি অনুভবের সাধন, সূক্ষ্ম শরীরকেই জ্ঞানিগণ আত্মার দ্বিতীয় দেহ বলিয়া থাকেন। ॥২৮-২৯॥

অনাদি অনির্বাচ্য মায়াময় কারণ শরীরই জীবের তৃতীয় দেহ। এইপ্রকার উপাধি ভেদে পৃথকরূপে স্থিত আপন আত্ম স্বরূপকে ক্রমশঃ উপাধি সমূহের বাধ করতঃ (অর্থাৎ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করতঃ) আপন হৃদয়ে অবধারণ করিবে। ॥৩০॥

স্ফটিক মণির ন্যায় এই আত্মাও অন্নময়াদি ভিন্ন ভিন্ন কোষের সঙ্গ বশতঃ তত্তৎ কোষাকারে প্রতিভাত হন। কিন্তু উত্তমরূপে বিচার করিলে ইহাই নিশ্চিত রূপে অবধারিত হয় যে অদ্বিতীয়ত্ব বশতঃ আত্মা অসঙ্গরূপ এবং জন্মরহিত। ॥৩১॥

ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধিই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভেদে তিন প্রকার বৃত্তিবিশিষ্টা দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই তিন বৃত্তির প্রত্যেকটিই পরস্পর ব্যভিচারিত হয় বলিয়া উহারা একমাত্র কল্যাণ স্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মে কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা (অর্থাৎ বস্তুত ব্রহ্মে এই তিনটি বৃত্তিরই অভাব)। ॥৩২॥

বুদ্ধিবৃত্তিই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও চেতন আত্মার সংঘাতে অর্থাৎ সঙ্গ বশতঃ সর্বদা পরিবর্তিত হইতে থাকে। তমোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহা অজ্ঞানরূপ এবং যতদিন পর্যন্ত এই বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে ততদিন পর্যন্ত জীবের এই সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম হইতে থাকে। ॥৩৩॥

'নেতি নেতি' আদি শ্রুতি প্রমাণ সহায়ে সর্বপ্রপঞ্চকে বাধ এবং হৃদয়ে চিদ্‌ঘনামৃত আস্বাদন করতঃ জগতের সার রূপ ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়া জগতকে মিথ্যাবোধে নারিকেল মধ্যস্থ জল পান করিয়া লোকে যে প্রকার উক্ত ফল পরিত্যাগ করে তদ্রূপ ত্যাগ করিবে। ॥৩৪॥

আত্মা কখনও মৃত হন না, তাঁহার জন্মও হয় না, তিনি কখনও ক্ষীণ হন না এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হন না। তিনি পুরাতন, সর্ব বিশেষণ রহিত, সুখস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ, সর্বগত এবং অদ্বিতীয়। ॥৩৫॥

এই প্রকার জ্ঞানময় ও সুখস্বরূপ আত্মাতে এই দুঃখময় সংসারের প্রতীতি কি প্রকারে হইতে পারে? অজ্ঞানবশতঃ অধ্যাসের জন্যই এইরূপ প্রতীতি হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে ইহা ক্ষণকালেই বিলীন হইয়া যায়, কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরস্পর বিরোধ, ইহা প্রসিদ্ধ। ॥৩৬॥

ভ্রমবশতঃ এক বস্তুতে যে অন্য বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে, বিদ্বানগণ তাহাকে অধ্যাস বলেন। অসর্পভূত রজ্জু আদিতে যে প্রকার ভ্রমবশতঃ সর্প প্রতীতি হয় সেই প্রকার ঈশ্বরেও এই সংসার প্রতীতি হইতেছে। ॥৩৭॥

সর্ব বিকল্প ও মায়া রহিত, সর্ব কারণ, নিরাময়, অদ্বিতীয়, চিৎস্বরূপ, পরমাত্মা ব্রহ্মে সর্বপ্রথম এই 'অহঙ্কার' রূপ অধ্যাসের কল্পনা হইয়া থাকে। ॥৩৮॥

সর্বসাক্ষী আত্মাতে ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রাগ, দ্বেষ ও সুখ দুঃখাদিরূপ বুদ্ধিবৃত্তি সমূহই জন্মমরণ রূপ সংসার প্রাপ্তির হেতু। কারণ সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের অভাব হইলে আত্মা-সুখ স্বরূপেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হন। ॥৩৯॥

অনাদি, অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত স্বরূপ চৈতন্যের যে প্রকাশ তাহাকে 'জীব' বলে (তাহাকেই চিদ ভাস বা জীব বলে)। বুদ্ধির সাক্ষীরূপে আত্মা তাহা হইতে (অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে) পৃথক। বুদ্ধির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সেই আত্মাই পরমাত্মা। ॥৪০॥

অগ্নি তপ্ত লৌহখণ্ডের ন্যায় চিদাভাস, সাক্ষী আত্মা ও বুদ্ধি একস্থানে থাকে বলিয়া পরস্পর অন্যোন্যাধ্যাস বশতঃ তাহাদের জড়তা ও চেতনতা প্রতীত হইয়া থাকে (অর্থাৎ তপ্তলৌহখণ্ডে যেরূপ অগ্নি ও লৌহে তাদাত্ম্য বশতঃ অগ্নির উষ্ণতা লৌহে এবং লৌহের আকার অগ্নিতে প্রতীত হয়, সেইরূপ বুদ্ধি ও আত্মার তাদাত্ম্যবশতঃ আত্মার চেতনতা বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি আদির জড়তা আত্মাতে প্রতীত হইতে থাকে। এই জন্যই অধ্যাস বশতঃ বুদ্ধি হইতে শরীর পর্যন্ত সর্ব অনাত্ম বস্তুতেই লোকে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে।) ॥৪১॥

গুরু সমীপে বাস ও তাঁহার মুখ নিঃসৃত বেদবাক্য শ্রবণ করতঃ আত্মজ্ঞান হইলে আপন হৃদয়স্থ উপাধি রহিত আত্মার সাক্ষাৎকার পূর্বক আত্মারূপে প্রতীয়মান দেহাদি যাবতীয় জড়পদার্থ সমূহ ত্যাগ করা কর্তব্য। ॥৪২॥

আমি প্রকাশ স্বরূপ, জন্মরহিত, অদ্বিতীয়, সদা ভাসমান, অতীব নির্মল, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন, নিরাময়, ক্রিয়ারহিত এবং সদানন্দ স্বরূপ। ॥৪৩॥

আমি সদা মুক্ত, অচিন্ত্য শক্তি, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানস্বরূপ, অবিকারী এবং অনন্ত ও অপার। বেদবাদী পণ্ডিতগণ অহর্নিশি আমাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন। ॥৪৪॥

এই প্রকার সর্বদা অখণ্ডবৃত্তি সহায়ে চিন্তনকারী পুরুষের অন্তঃকরণে উৎপন্ন বিশুদ্ধজ্ঞান শীঘ্র কর্তৃকর্ম-কারকাদির সহিত, নিয়মানুসারে ঔষধি সেবনে রোগ নিবৃত্তির ন্যায়, অবিদ্যার সমূল নাশ করিয়া থাকে। ॥৪৫॥

আত্মচিন্তনকারী পুরুষ নির্জন প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করতঃ মনকে বশীভূত করিয়া ও অপর কোন সাধনের আশ্রয় না লইয়া শুদ্ধচিত্তে আত্মাতেই স্থিতিলাভ করিবেন ও কেবল জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা এক আত্মারই চিন্তন করিবেন। ॥৪৬॥

এই বিশ্ব পরমাত্মারই রূপ, ইহা জানিয়া যাবতীয় সর্বকারণ আত্মাতে বিলীন করিলে পূর্ণ চিদানন্দ স্বরূপে স্থিতি লাভ হয়। তখন আর তাহার বাহ্য বা আন্তর কোন ভেদজ্ঞানই থাকে না। ॥৪৭॥

সমাধি লাভ করিবার পূর্বে এই সম্পূর্ণ চরাচর জগত কেবল ওঁকার মাত্র এইরূপ চিন্তা করিবে। এই সংসার বাচ্য এবং ওঁকার তাহার বাচক ; অজ্ঞানবশতঃই এই ভিন্নতা প্রতীতি হয় জ্ঞান হইলে এই ভেদবুদ্ধি আর থাকে না। ॥৪৮॥

(ওঁকারের 'অ'-'উ'-'ম' এই তিন বর্ণের মধ্যে) 'অ' কার জাগ্রত অবস্থার অভিমানী পুরুষ বিশ্ব, 'উ' কার স্বপ্নাভিমানী পুরুষ তৈজস, এবং 'ম' কার সুষুপ্তিঅভিমানী পুরুষ প্রাজ্ঞ রূপে কথিত। এইরূপ ব্যবস্থা সমাধি লাভের পূর্বেই বলা হইয়া থাকে, তত্ত্বদৃষ্টিতে কোন ভেদ নাই। ॥৪৯॥

'ওঁ'কারের প্রথম বর্ণ নানারূপে অবস্থিত 'অ'কার রূপ বিশ্বপুরুষকে 'উ' কারে লয় করিবে এবং 'ওঁ' কারের দ্বিতীয় বর্ণ 'তৈজস' রূপ 'উ' কারকে 'ওঁ' কারের অন্তিমবর্ণ 'ম' কারে লয় করিবে। অতঃপর কারণাত্মা 'প্রাজ্ঞ'রূপ 'ম' কারকেও চিদ্‌ঘনরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবে। সেই নিত্যমুক্ত বিজ্ঞানস্বরূপ উপাধিরহিত নির্মল পরব্রহ্মই আমি, (এইরূপ জানিবে)। ॥৫০-৫১॥

এইপ্রকারে নিরন্তর পরমাত্ম চিন্তন করিতে করিতে চিত্ত আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইলে সাধকের নিকট সর্ব বিশ্ব প্রপঞ্চও বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন আত্মানন্দানুভবকারী এই জীবনমুক্ত পুরুষ তরঙ্গবিহীন সমুদ্রের ন্যায় সাক্ষাৎ মোক্ষ স্বরূপই হইয়া যান। ॥৫২॥

এই প্রকার নিরন্তর সমাধি যোগের অভ্যাসকারী, যাঁহার নিকট সর্বেন্দ্রিয়গোচর বিষয়সমূহ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে এবং যিনি কামক্রোধাদি সর্ব রিপুগণকে এবং মন ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও জয় করিয়াছেন সেই মহাত্মাই নিরন্তর আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ॥৫৩॥

এইরূপে অহর্নিশি আত্মচিন্তনকারী মুনি সর্ববন্ধন মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। তখন তিনি কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমান পরিত্যাগ করতঃ প্রারব্ধ ফলমাত্র ভোগ করিতে থাকেন এবং (প্রারব্ধ) ভোগান্তে সাক্ষাৎ আমার স্বরূপে বিলীন হইয়া যান। ॥৫৪॥

আদি অন্ত ও মধ্য সর্বত্রই সংসার ভয় ও শোকের কারণ ইহা জানিয়া মুমুক্ষ বেদবিহিত সর্ব (কাম্য) কর্মসমূহ পরিত্যাগ করিবে ও সম্পূর্ণ প্রাণিগণের অন্তরাত্মাস্বরূপ স্বকীয় আত্মার চিন্তন করিবে। ॥৫৫॥

যে প্রকার সমুদ্রে জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, মহাকাশে ঘটাকাশ, বায়ুতে বায়ু মিশিয়া এক হইয়া যায় সেই প্রকার এই সম্পূর্ণ জগত আপন আত্মাসহ অভিন্নরূপে চিন্তন করিয়া জীব পরমাত্মা আমার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। ॥৫৬॥

লৌকব্যবহারে স্থিত মুনি — এই দৃশ্যমান জগত শ্রুতি, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া তাহা চন্দ্রভেদ ও দৃগ্‌ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা — এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। ॥৫৭॥

যতদিন পর্যন্ত সর্ববিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমারই রূপ এইরূপ দর্শন না হয় ততদিন পর্যন্ত আমার আরাধনা-পরায়ণ থাকিবে। শ্রদ্ধা এবং উর্জিতা ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আপন হৃদয়ে আমাকে সর্বদা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। ॥৫৮॥

হে প্রিয় (লক্ষ্মণ)! সম্পূর্ণ শ্রুতি সমূহের সংক্ষিপ্ত সাররূপ এই গুপ্তরহস্য আমি তোমাকে আজ নিশ্চিতরূপে বলিলাম। যে বুদ্ধিমান ইহার আলোচনা অর্থাৎ বিচার বা মনন করিবে সে ক্ষণকাল মধ্যেই সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ॥৫৯॥

হে ভ্রাতঃ! এই বহির্জগত যাহাকিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা সবই মায়া (অর্থাৎ

দৃষ্টিগোচর হইলেও বস্তুতঃ নাই) এই জ্ঞানে সর্বদৃশ্যপদার্থ পরিত্যাগপূর্বক আমার চিন্তন দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ও সুখী হইয়া আনন্দপূর্ণ ও সর্বক্লেশ রহিত হইয়া যাও। ॥৬০॥

যে পুরুষ আপন চিত্তে আমার সর্বগুণাতীত নির্গুণস্বরূপ অথবা কখনও কখনও সগুণ স্বরূপ চিন্তন করিয়া থাকে, তাহাকে আমারই রূপ বলিয়া জানিবে। সে আপন চরণধূলি স্পর্শ দ্বারা সূর্যের ন্যায় ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে। ॥৬১॥

এই অদ্বিতীয় জ্ঞান সর্বশ্রুতি সমূহের সারভূত। যাহার লীলা বা আচরণের মর্ম একমাত্র বেদান্ত জ্ঞান দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, সেই আমিই আজ এই তত্ত্ব বর্ণন করিলাম। গুরুভক্তি সম্পন্ন যে পুরুষ এই গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করিবে, আমার বচনে ভক্তি থাকিলে সে আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। ॥৬২॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর
সংবাদে উত্তর কাণ্ডে পঞ্চম সর্গ
রামগীতা সমাপ্ত

ষষ্ঠ সর্গ

লবণ বধ, ভগবান রামচন্দ্রের যজ্ঞে কুশ-লব সহিত মহর্ষি বাল্মীকির আগমন ও কুশকে পরমার্থ উপদেশ প্রদান

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

একদিন যমুনাতীরবাসী সমস্ত মুনিগণ লবণ রাক্ষসের ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন। ॥১॥

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হইতে অভয় লাভ করিবার ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিয়াই সেই অসংখ্য মুনিগণ ভৃগুপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ চ্যবনকে পুরোভাগে লইয়া আসিয়াছিলেন। ॥২॥

রঘুকুল শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই মুনিগণকে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে পূজন করতঃ তাঁহাদের প্রসন্নতা উৎপাদন পূর্বক মধুর বাণী সহকারে বলিলেন— ॥৩॥

"হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের আগমনের কারণ কি? (আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন) আমি সেইরূপই করিব। যদি আপনারা আমার প্রতি প্রীতিবশতঃই এখানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। ॥৪॥

আপনাদের কোন কার্য দুষ্কর হইলেও তাহা আমি অবশ্যই করিব। আমি আপনাদের সেবক, কৃপা করিয়া আমাকে কি করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করুন। ব্রাহ্মণগণকে আমি স্বীয় ইষ্টদেব সদৃশ মনে করি।" ॥৫॥

শ্রীরামচন্দ্রের বচন শুনিয়া মহর্ষি চ্যবন সহসা অতি প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—"প্রভো! পূর্বকালে সত্যযুগে মধু নামক এক অতীব ধর্মাত্মা এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজক মহাদৈত্য

ছিল। তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব তাহাকে একটি অতি উত্তম ত্রিশূল প্রদান করিয়াছিলেন। ॥৬-৭॥

এবং বলিয়াছিলেন যে তুমি এই ত্রিশূল যাহার উপর প্রহার করিবে সে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। শোনা যায়, রাবণের কনিষ্ঠা ভগ্নি কুম্ভীনসী তাহার ভার্যা ছিল। ॥৮॥

সেই কুম্ভীনসীর গর্ভে লবণ নামক এক মহাপরাক্রমী, দুষ্টচিত্ত, দুর্ধর্ষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ-হিংসাকারী রাক্ষস উৎপন্ন হইয়াছে। ॥৯॥

হে রাজেন্দ্র! তাহা কর্তৃক অত্যন্ত দুঃখপীড়িত হইয়া আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ বলিলেন—"হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা কোন ভয় করিবেন না। ॥১০॥

আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করুন। আমি লবণকে অবশ্যই বধ করিব।" মুনীশ্বরগণকে এই প্রকার বলিয়া ভগবান রামচন্দ্র আপন ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের মধ্যে কে লবণ রাক্ষসকে বধ করতঃ ব্রাহ্মণগণকে মহা অভয় প্রদান করিবে?" ইহা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভরত শ্রীরঘুনাথকে বলিলেন— ॥১১-১২॥

"হে দেব! লবণাসুরকে আমিই বধ করিব। হে প্রভো! এই কার্যে আপনি আমাকে আজ্ঞা প্রদান করুন।" অতঃপর শত্রুঘ্ন শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন— ॥১৩॥

"হে রাঘব! লঙ্কাসমরে শ্রীলক্ষ্মণ বহু কঠিন কার্য করিয়াছেন এবং মহা বুদ্ধিমান ভরতও নন্দিগ্রামে বাসকালে বহু কষ্ট সহন করিয়াছেন। ॥১৪॥

অতএব লবণ বধের নিমিত্ত আমিই যাইব। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনার কৃপায় আমি যুদ্ধে ঐ রাক্ষসকে অবশ্যই বধ করিব।" ॥১৫॥

শত্রুঘ্নের এই বচন শুনিয়া শত্রুদমন শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে সস্নেহে আপনার অঙ্কে বসাইয়া বলিলেন—"আমি আজই তোমাকে (লবণের রাজধানী) মথুরা রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।" ॥১৬॥

এইরূপ বলিয়া লক্ষ্মণ দ্বারা অভিষেকের সর্বসামগ্রী আনাইয়া শত্রুঘ্নের ইচ্ছা না থাকিলেও শ্রীরামচন্দ্র অতি প্রীতিপূর্বক মথুরা রাজ্যে তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন। ॥১৭॥

অতঃপর শত্রুঘ্নকে একটি দিব্যবাণ প্রদান করতঃ বলিলেন—"ভাই শত্রুঘ্ন! সর্বলোকের কণ্টক স্বরূপ লবণাসুরকে তুমি এই বাণ দ্বারা বধ করিও। ॥১৮॥

রাক্ষস লবণ আপন গৃহে সেই ত্রিশূলের পূজা সমাপন করতঃ তৎপর নানাপ্রকার জীব বধ ও ভক্ষণ করিবার জন্য বনে গমন করিয়া থাকে। ॥১৯॥

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত সে গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে অর্থাৎ বনেই বিচরণ করে ততক্ষণ তুমি ধনুর্ধারণ করতঃ নগরের প্রবেশ দ্বারে তাহার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করিবে। ॥২০॥

সে গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং তখনই সে তোমা কর্তৃক নিহত হইবে। এই প্রকারে মহাক্রূর লবণাসুরকে বধ করিয়া তাহার সেই মধু নামক বনে নগর স্থাপন করতঃ তুমি আমার আদেশে সেইস্থানেই থাকিবে। তুমি সর্বপ্রথম

যাইয়া রাক্ষস নিধন কর। তদনন্তর সেখানে পঞ্চসহস্র অশ্ব, সার্ধদ্বিসহস্র রথ, ষট্‌শত স্ত্রী ও ত্রিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য গমন করিবে।" ॥২১-২৩॥

এইরূপ বলিয়া শ্রীরঘুনাথ শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করতঃ এবং মুনিগণ সহিত আশীর্বাদ দ্বারা তাহাকে অভিনন্দন সহায়ে বিদায় দিলেন। ॥২৫॥

শত্রুঘ্নও শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন সেইরূপই করিলেন। তিনি মধুপুত্র লবণাসুরকে বধ করতঃ মথুরানগরী স্থাপন করিলেন। ॥২৫॥

দান ও মান প্রদানদ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করতঃ তিনি মথুরাকে এক সমৃদ্ধশালী নগরীরূপে পরিণত করিলেন। এই সময়ের মধ্যেই সীতা বাল্মীকি মুনির আশ্রমে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। ॥২৬॥

মুনি তাহাদের উপনয়ন সংস্কার করাইবার পর তাহারা বেদাধ্যয়নে তৎপর হইল। মুনি পুত্র ধীরে ধীরে বিদ্যাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ॥২৭॥

মুনি তাহাদের উপনয়ন সংস্কার করাইবার পর তাহারা বেদাধ্যায়নে তৎপর হইল। মুনি বালকদ্বয়কে সম্পূর্ণ রামায়ণ উত্তমরূপে অভ্যাস করাইলেন। ॥২৮॥

পূর্বকালে এই রামায়ণ ত্রিপুরান্তক ভগবান শঙ্কর পার্বতীকে শুনাইয়াছিলেন। ধর্মশিক্ষণ-সমর্থ (প্রভু) বাল্মীকি বেদের তাৎপর্য সম্যক ও বিস্তৃতরূপে বোধ করাইবার জন্য বালকদ্বয়কে সেই রামায়ণ-কথা উত্তম রূপে শিক্ষা দিলেন। ॥২৯॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয় তুল্য অতি সুন্দর ঐ কুমারদ্বয় বীণা বাজাইয়া তাল ও স্বর সহিত ঐ রামায়ণ গান করতঃ বনে বিচরণ করিত। ॥৩০॥

এই দেবতুল্য বালকদ্বয়কে সর্বত্র মুনিগণ সমক্ষে ঐ রামায়ণ কথা কীর্তন করিতে দেখিয়া মুনিগণ বিস্মিত চিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিলেন— ॥৩১॥

"দীর্ঘজীবী আমরা বহুদিন হইতে সর্ব দিকসকল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি ; কিন্তু গন্ধর্ব, কিন্নর, ভূর্লোক, জীবলোক, দেবালয়, পাতাল অথবা ব্রহ্মলোকাদি কোন লোকেই সঙ্গীত ও বাদ্যে এরূপ কুশলতা সম্বন্ধে জানিও না, দেখিও নাই, শুনিও নাই।" ॥৩২॥

এই প্রকারে প্রতিদিন মুনিগণ কর্তৃক প্রশংসিত বালকদ্বয় তাঁহাদের সহিত দীর্ঘকাল শ্রীবাল্মীকি মুনির একান্ত আশ্রমে পরম সুখে নিবাস করিতে লাগিল। ॥৩৩॥

অযোধ্যায় (সীতার বনবাসের পর) পরম তেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র সুবর্ণময়ী সীতা নির্মাণ করতঃ অশ্বমেধাদি বহুদক্ষিণা বিশিষ্ট যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ॥৩৪॥

সেই যজ্ঞশালাতে যজ্ঞ-উৎসব দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া সকল ঋষি, রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ আগমন করিয়াছিলেন। ॥৩৫॥

কুশী-লবও (রামায়ণ) গান করিতে করিতে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির সহিত মুনিগণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আগমন করিল। ॥৩৬॥

সেখানে একদিন একান্ত স্থানে শান্তভাবে উপবিষ্ট বাল্মীকি মুনিকে তাঁহার সমাধি ভঙ্গের পর কুশ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জ্ঞানশাস্ত্র বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। ॥৩৭॥

(কুশ জিজ্ঞাসা করিল)— "ভগবন্! আপনার মুখে সংক্ষেপে আমি ইহাই শুনিতে চাই যে জীবের সুদৃঢ় সংসার-বন্ধন কিরূপে হয়? ॥৩৮॥

পুনঃ আপনার মুখ হইতে ইহাও শুনিতে ইচ্ছা করি যে ঐ দৃঢ় সংসার-বন্ধন হইতে জীব কি প্রকারে মুক্ত হইতে পারে? হে মুনে! আপনি সর্বজ্ঞ, আমি আপনার শিষ্য। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এই সম্পূর্ণ রহস্য বর্ণন করুন।" ॥৩৯॥

বাল্মীকি বলিলেন—"শোন! আমি তোমাকে সংক্ষেপে সাধন সহিত বন্ধন ও মোক্ষের সম্পূর্ণ স্বরূপ বলিতেছি। আমি যেরূপ বলিব তাহা সব শুনিয়া তুমি সেই প্রকারে আচরণ করিবে। তাহা হইলে তোমার পরম কল্যাণ হইবে ও তুমি জীবন-মুক্ত হইবে। দেহবিহীন চৈতন্যস্বরূপ আত্মার এই দেহই মহাগৃহ-স্বরূপ। ॥৪০-৪১॥

এই গৃহে তিনি অহঙ্কারকেই আপন মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই অহঙ্কাররূপ মন্ত্রী অর্থাৎ দেহ ও গৃহাদিতে অভিমানরূপ মন্ত্রী নিজেকে চিদাত্মাতে আরোপ করতঃ ইহার সহিত একরূপ (তাদাত্ম্য ভাব) প্রাপ্ত হয় এবং নিজের সর্বচেষ্টা চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে। সেই অহঙ্কার ব্যাপ্ত দেহী জীব সেই অহঙ্কারের সংকল্প দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঐ সংকল্পরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় এবং দিবারাত্রি পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদি বিষয়ক সংকল্প বিকল্পাদি করিতে থাকে। ॥৪২-৪৪॥

নানা সংকল্প করে বলিয়াই জীব স্বয়ং সদা শোকাভিভূত হইয়া থাকে। এই অহঙ্কারে সত্ত্ব, রজ, তম নামক উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন প্রকারের দেহ বিদ্যমান। এই তিনটিই সংসারের স্থিতির কারণ। ইহার মধ্যে তামস সংকল্প বশতঃ নিত্য তামসিক চেষ্টা করিয়া জীব অত্যন্ত তমোগুণী হয় এবং কৃমি কীটাদির দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক সংকল্প বিশিষ্ট পুরুষ ধর্ম ও জ্ঞান পরায়ণ হন বলিয়া মোক্ষরূপ সাম্রাজ্যের সমীপেই সুখে অবস্থান করেন। আর রাজস সংকল্প হইলে জীব লৌকিক ব্যবহারে রত হইয়া সংসারে পুত্র, স্ত্রী আদিতে অনুরক্ত হইয়া থাকে। হে মহাবুদ্ধিমান! যে ব্যক্তি এই তিন প্রকার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তিনি, চিত্ত বিলীন হওয়ার পর, পরমপদ প্রাপ্ত হন। এইজন্য তুমি সর্বপ্রকার সংকল্পাদি পরিত্যাগ ও আপন মন দ্বারাই মনকে সংযত করতঃ বাহ্য ও অন্তর বিষয়ক সর্ব সংকল্প সমূহ ক্ষয় কর। হে অনঘ! যদি তুমি পাতাল, পৃথিবী ও স্বর্গ আদি যে কোন স্থানে থাকিয়া সহস্র বর্ষ পর্যন্ত কঠোর তপস্যাও কর তাহা হইলেও এই সংকল্প নাশ ব্যতীত সংসার হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। ॥৪৫-৫২॥

এই জন্য তুমি দুঃখরহিত, বিকারহীন, পরমপবিত্র, সুখস্বরূপ, সংকল্প বিনাশরূপ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থপূর্বক পূর্ণ প্রযত্ন কর। ॥৫৩॥

হে অনঘ! যাবতীয় জাগতিক পদার্থ সংকল্পরূপ সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, ঐ সূত্র ছিন্ন হইলে সংসারের সেই সকল পরম বৈভব কোথায় বিলীন হইয়া যায় তাহা জানাও যায় না। ॥৫৪॥

অতএব সংকল্প বিকল্প রহিত হইয়া প্রারব্ধবশতঃ যথা-প্রাপ্ত ব্যবহারে তৎপর থাক। সংকল্প-জাল ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। ॥৫৫॥

পরমার্থ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া তুমি দৃঢ় সংকল্প পূর্বক বিকল্প জাল পরিত্যাগ কর এবং পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির জন্য চিত্তবৃত্তি বিলীন করতঃ সেই অদ্বিতীয় পরমপদ প্রাপ্ত হও।" ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে
উত্তর কাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তম সর্গ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞে কুশ ও লবের গান, সীতার পৃথিবী-প্রবেশ এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক মাতা কৌশল্যাকে উপদেশ

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে পার্বতি!

বাল্মীকি মুনি প্রদত্ত এই প্রকার উপদেশ লাভ করতঃ কুশের সর্বভ্রম সদ্য বিগত হইল এবং তখন তিনি অন্তরে মুক্ত হইয়া বাহ্য ক্রিয়াসমূহ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করতঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ॥১॥

তখন বাল্মীকি একদিন সীতার মহাবুদ্ধিমান পুত্রদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা উভয়ে যেখানে সেখানে নগরীর অলি-গলিতে গান করতঃ বিচরণ কর। যদি মহারাজ রামচন্দ্রের ঐ গীত শুনিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখেও গান করিবে, কিন্তু তিনি কিছু প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে না।" ॥২-৩॥

মুনির এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গান করিতে করিতে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবং মুনি যে যে স্থানে গান করিতে বলিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাহারা গান করিলেন। তখন কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্র আপন পূর্বচরিত্র নগরীর যত্রতত্র গীত হইবার সমাচার শ্রবণ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র শুনিলেন যে বালকদ্বয়ের গান করিবার বিধি অপূর্ব ও স্বর-তাল-সম্পন্ন, তখন তাঁহার বড়ই কৌতূহল হইল। অতঃপর সেই নরশার্দুল মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞকর্মের বিশ্রাম সময়ে সকল মুনীশ্বরগণ, রাজাগণ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, পৌরাণিকগণ, ব্যাকরণ শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদবিশারদ পণ্ডিতগণ, বৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ সকলকে একত্রিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। ॥৪-৭॥

এইরূপে সকলকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিবার অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র গীতিকুশল ঐ বালকদ্বয়কে সেইস্থানে আনয়ন করাইলেন। সভামধ্যে সমবেত সর্ব রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলে প্রসন্নচিত্তে মহারাজ রামচন্দ্র এবং ঐ বালকদ্বয়কে অনিমেষ নয়নে দেখিয়া বিস্ময় চকিত হইয়া গেলেন। সমবেত সকলেই বলিতে লাগিলেন— ॥৮-৯॥

"এই উভয় বালক বিম্ব হইতে উৎপন্ন প্রতিবিম্বের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সমান-রূপই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। জটাজুট ও বল্কলধারী না হইলে ইহাদের ও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে কোন ভেদই জানিতে পারিতাম না।" সর্বলোকে আশ্চর্যচকিত হইয়া এইরূপ নানাকথা বলিতেছিল, তখন ঐ মুনিকুমারদ্বয় গীত আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই সেই স্থান তাহাদের অতি মধুর ও অলৌকিক সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিল। ॥১০-১২॥

এই মধুর সঙ্গীত শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র অপরাহ্নকালে ভরতকে বলিলেন—"এই বালকদ্বয়কে দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান কর।" ॥১৩॥

কিন্তু ঐ বালকদ্বয় মহারাজ-প্রদত্ত ঐ সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করিল না। এবং বলিল, "হে রাজন্! আমরা বনে কন্দ, ফল, মূল ভোজন করতঃ জীবন ধারণ করিয়া থাকি, এই সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া আমরা কি করিব?" এইরূপ বলিয়া তাহারা সেই সুবর্ণ মুদ্রা সেই স্থানে পরিত্যাগ করতঃ মুনির নিকট গমন করিল। শ্রীরামচন্দ্রও স্বকীয় চরিত্র-গীতি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। ॥১৪-১৫॥

অতঃপর তাহারা সীতার পুত্র জানিয়া শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্ন, হনুমান, সুষেণ, বিভীষণ ও অঙ্গদাদি সকলকে বলিলেন— ॥১৬॥

"দেবতুল্য মহানুভাব, মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীবাল্মীকি মুনিকে সীতাসহ এইস্থানে আনয়ন কর। ॥১৭॥

সকলের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য এই সভামধ্যে জানকী এইরূপ শপথ করুন যাহাতে তিনি নিষ্কলঙ্কা ইহা সকলে জানিতে পারেন।" ভগবান রামচন্দ্রের এই বচন শুনিয়া তাঁহার দূতগণ অতি বিস্মিত চিত্তে বাল্মীকি মুনির নিকট গমন করিল এবং শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ বলিয়াছেন, সে সকল কথা তাঁহাকে নিবেদন করিল। ॥১৮-১৯॥

ভগবান রামচন্দ্রের মনোগত সর্ব অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাল্মীকি মুনি বলিলেন—"আগামীকল্য জনসাধারণের সম্মুখে সীতা শপথ গ্রহণ করিবেন। ॥২০॥

ইহা নিঃসন্দেহ যে স্ত্রীগণের নিকট পতিই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা।" মুনির এই প্রকার বচন শুনিয়া দূতগণ সকলে অনতিবিলম্বে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আগমন করতঃ তাঁহাকে সর্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন শ্রীরামচন্দ্র মুনির বার্তা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"হে রাজেন্দ্রবৃন্দ ও মুনিগণ! আপনারা সকলে সীতার শপথ শ্রবণ করুন এবং তাহা হইতে সকলে তাহার শুভাশুভ নির্ণয় করুন।" ভগবান রামচন্দ্র এই প্রকার বলিবার পর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মহর্ষি ও বানরাদি সকলে অত্যন্ত কুতূহল পরবশ হইয়া সীতার শপথ দর্শন (শ্রবণ?) করিবার জন্য সমবেত হইলেন। ॥২১-২৪॥

তখন সীতাকে সঙ্গে লইয়া মুনীশ্বর বাল্মীকিও সেই স্থানে আগমন করিলেন। সীতা ঋষিকে পুরোভাগে করিয়া তৎপশ্চাৎ কিঞ্চিৎ অবনত মস্তকে করজোড়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মার পশ্চাতে আগমনকারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় বাল্মীকি মুনির পশ্চাতে সীতাকে আসিতে দেখিয়া সেই জনসমাজ 'ধন্য, ধন্য' এইরূপ শব্দে গুঞ্জায়মান হইয়া উঠিল। তখন সীতা সহিত মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সেই জনসঙ্ঘে প্রবেশ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—"হে দশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র! এই পতিব্রতা, ধর্মপরায়ণা, নিষ্কলঙ্কা সীতাকে তুমি পূর্বে লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া ভয়ঙ্কর বনে আমার আশ্রম সমীপে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। ॥২৫-২৯॥

এখন সীতা আপন নির্দোষিতা প্রমাণ করিবেন, তুমি আজ্ঞা প্রদান কর। সীতার যমজ পুত্রদ্বয় এই কুশ ও লব। তাহারা একই সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে। ॥৩০॥

আমি সত্য সত্য বলিতেছি—এই উভয় দুর্জয় বীর বালক তোমারই সন্তান। হে রঘুকুল শ্রেষ্ঠ! আমি প্রজাপতি প্রচেতার দশম পুত্র। ॥৩১॥

আমি কখনও মিথ্যা ভাষণ করিয়াছি, ইহা আমার কদাচ স্মরণ হয় না। সেই আমি তোমাকে বলিতেছি যে এই বালকদ্বয় তোমারই পুত্র। আমি বহুবর্ষ পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছি। ॥৩২॥

যদি এই মিথিলেশ কুমারীর কোন দোষ থাকে তবে আমার উক্ত তপস্যা বিফল হউক।" বাল্মীকি এই প্রকার ঘোষণার পর শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন— ॥৩৩॥

"হে মহাপ্রাজ্ঞ! হে সুব্রত! আপনি যেরূপ বলিলেন, উহা যথার্থ। আপনার নির্দোষ বাক্য শ্রবণেই আমার বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। ॥৩৪॥

জানকী দেবগণের সম্মুখে লঙ্কাতেও মহান পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্যই আমি তাহাকে আমার গৃহে লইয়া আসিয়াছিলাম। ॥৩৫॥

কিন্তু হে ব্রহ্মন্! সতী সীতা সর্বথা নিষ্পাপা হইলেও আমি লোকনিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আপনি আমার এই অপরাধ মার্জনা করুন। ॥৩৬॥

আমি ইহাও জানি যে এই যুগল পুত্রদ্বয় আমারই ঔরসে জাত। এই জগতিতলে বিশুদ্ধা সীতার প্রতি আমার প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকুক।" ॥৩৭॥

ঐ সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমস্ত দেবগণ অতি উৎসুকচিত্তে ব্রহ্মাজীকে পুরোভাগে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। ॥৩৮॥

সহস্র সহস্র প্রজাগণও প্রসন্নচিত্তে সেই স্থানে সমবেত হইয়াছিল। তখন কৌশেয়বস্ত্রধারিণী সীতা উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ করজোড়ে কহিলেন— ॥৩৯॥

"যদি আমি শ্রীরামচন্দ্রের অতিরিক্ত অন্য পুরুষকে মনেও কখনও চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে পৃথিবী দেবী আমাকে তাহার বিবরে আশ্রয় প্রদান করুন।" ॥৪০॥

সীতা এই প্রকার শপথ করিবামাত্রই ভূমিতল হইতে একটি মহা অদ্ভুত অপূর্ব অতি উত্তম পরম দিব্য সিংহাসন প্রকট হইল। ॥৪১॥

দিব্যশরীরধারী নাগরাজগণ সেই সূর্যসদৃশ তেজস্বী সিংহাসন ধারণ করিতেছিলেন। তখন পৃথিবী দেবী অতি প্রীতির সহিত উভয় হস্তে জানকীকে ধারণ করতঃ তাহাকে স্বাগত করিলেন এবং উক্ত আসনে তাহাকে উপবেশন করাইলেন। যখন সেই দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া জানকী রসাতলে যাইতে লাগিলেন, তখন তাহার উপর নিরন্তর দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন দেবগণের মুখনিঃসৃত অতি অদ্ভুত ও সুমহান সাধুবাদে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। ॥৪২-৪৪॥

আকাশস্থ দেবগণ নানাপ্রকার (স্তুতি) কথা বলিতে লাগিলেন। সীতার শপথবাক্য শুনিয়া আকাশ ও পৃথিবীতলস্থ স্থাবর জঙ্গম সর্ব প্রাণিগণ এবং মহান বিশালকায় বানরগণের মধ্যে কেহ কেহ চিন্তাগ্রস্ত হইল, কেহবা ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল। ॥৪৫-৪৬॥

কেহ বা শ্রীরামের প্রতি এবং কেহ বা সীতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ অচেতন হইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে সেই সম্পূর্ণ জনসমাজ স্তব্ধ এবং চেতনাশূন্য হইয়া গেল। ॥৪৭॥

সীতার পাতাল প্রবেশ দর্শন করিয়া সর্বসংসার সম্মোহিত হইয়া গেল। শ্রীরামচন্দ্র সবকিছু জানিয়াও ভবিষ্যৎ কার্যের গৌরব রক্ষার জন্য অজ্ঞানী পুরুষের ন্যায় অতি দুঃখে সীতার জন্য শোক করিতে লাগিলেন। তখন ঋষিগণ সহিত স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। ॥৪৮-৪৯॥

তদনন্তর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞের অবশিষ্ট কর্ম সমাপন করিলেন এবং ঋত্বিক্‌রূপে সমাগত ঋষিগণকে প্রচুর ধনরত্নাদি প্রদানে সন্তুষ্ট করতঃ বিদায় দিলেন। অতঃপর প্রভু রামচন্দ্র কুমারদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাপুরীতে আগমন করিলেন। ॥৫০-৫১॥

তদবধি শ্রীরামচন্দ্র সর্বভোগ্য পদার্থে বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্বক নিরন্তর আত্মচিন্তন-পরায়ণ হইয়া নির্জন বাস করিতে লাগিলেন। ॥৫২॥

একদিন শ্রীরঘুনাথ যখন কোন নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন, সেই সময় প্রিয়ভাষিণী মাতা কৌশল্যা রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে অতি ভক্তিভাবে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার প্রসন্নতা দেখিয়া অতি আনন্দের সহিত প্রণতি পূর্বক বলিলেন—"হে রাম! তুমি সংসারের আদি কারণ, কিন্তু তুমি স্বয়ং আদি অন্ত মধ্য রহিত। ॥৫৩-৫৪॥

তুমি পরমাত্মা, পরমানন্দ স্বরূপ, সর্বত্র পূর্ণ, পুরুষ অর্থাৎ জীব হইয়া শরীররূপ পুরে শয়নকারী এবং সকলের স্বামী ; আমার প্রবল পুণ্যোদয় বশতঃই তুমি আমার গর্ভে জন্মধারণ করিয়াছ। ॥৫৫॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এখন আমার শেষ বয়সে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সময় হইয়াছে। আজ পর্যন্তও অজ্ঞানজন্য সংসার বন্ধন আমার সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। ॥৫৬॥

হে বিভো! আজ আমাকে সংক্ষেপে এইরূপ কিছু উপদেশ প্রদান কর যাহাতে এইক্ষণেই আমার ভববন্ধন ছেদনকারী জ্ঞান উৎপন্ন হয়।" ॥৫৭॥

তখন আপন জরাগ্রস্তা শুভলক্ষণা মাতার এইরূপ বৈরাগ্যপূর্ণ বচন শুনিয়া মাতৃভক্ত, দয়ালু, ধর্মপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্র মাতাকে বলিলেন— ॥৫৮॥

আমি পূর্বকালে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং সনাতন ভক্তিযোগ, এই তিনটি সাধন মার্গ বলিয়াছি। ॥৫৯॥

হে মাতঃ সাধকের গুণ অর্থাৎ যোগ্যতানুসারে ভক্তির ত্রিবিধ ভেদ হইয়া থাকে। যাহার যেরূপ স্বভাব তাহার ভক্তিও তদ্রূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ॥৬০॥

যে ব্যক্তি হিংসা, দম্ভ, বা মাৎসর্য উদ্দেশ্য করিয়া ভক্তিসাধন করে এবং যে ব্যক্তি ভেদ-দৃষ্টি-সম্পন্ন ও ক্রোধ বা আক্রোশ বশতঃ ভক্তি করিয়া থাকে তাহাকে তামসিক ভক্ত বলে। ॥৬১॥

যে ফলাকাঙ্ক্ষী, ভোগলিপ্সু অথবা যশকামী হইয়া ভেদবুদ্ধি পূর্বক প্রতিমাদিতে আমার পূজা করে তাহাকে রজোগুণী ভক্ত বলে। ॥৬২॥

পুনঃ যে ব্যক্তি পরমাত্মাতে সমর্পণপূর্বক সর্ব কর্ম সম্পাদন করে অথবা কর্তব্যজ্ঞানে ভেদবুদ্ধি পূর্বক কর্ম করিয়া থাকে তাহাকে সাত্ত্বিক ভক্ত বলে। ॥৬৩॥

গঙ্গাপ্রবাহ যেরূপ সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়, সেইপ্রকার যদি কাহারও মনোবৃত্তি আমার গুণকে আশ্রয় করতঃ অনন্ত গুণালয় আমাতে নিরন্তর লগ্ন থাকে, তবে তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। আমার প্রতি অহৈতুকী নিরন্তর ভক্তি যাহার উৎপন্ন হয় সেই সাধককে সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, ও সাযুজ্য এই চারিপ্রকার* মুক্তি প্রদান করিলেও আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করেন না। ॥৬৪-৬৬॥

হে মাতঃ! ভক্তিমার্গে ইহাকেই আত্যন্তিক যোগ বলা হয়। ইহা দ্বারাই ভক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করতঃ মদ্ভাব অর্থাৎ মদ্‌সদৃশই হইয়া যায়। ॥৬৭॥

(অতঃপর নির্গুণ ভক্তির সাধন বর্ণন করিতেছি)—নিষ্কাম হইয়া স্বধর্মানুষ্ঠান, অতি উত্তম হিংসা রহিত কর্মযোগ— ॥৬৮॥

আমার দর্শন, স্তুতি, মহাপূজা, স্মরণ, বন্দন, প্রাণিবর্গে ভগবৎদৃষ্টি, সৎসঙ্গ, অসত্য ত্যাগ— ॥৬৯॥

মহৎপুরুষগণকে সম্মান প্রদর্শন, দুঃখিগণের প্রতি দয়া, স্বসমান পুরুষগণের প্রতি মৈত্রী, যম-নিয়ম আদি সেবন— ॥৭০॥

বেদান্তবাক্য শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্তন, সৎসঙ্গ, কোমলতা, অহঙ্কার রাহিত্য— ॥৭১॥

এবং আমার ভাগবৎ-ধর্ম লাভের ইচ্ছা — এই সকল সাধন সহায়ে যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই ভক্ত অনায়াসেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ॥৭২॥

বায়ু প্রবাহিত গন্ধ যেরূপ আপন আশ্রয় পরিত্যাগ করতঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয় মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, যোগাভ্যাসে রত চিত্তও সেই প্রকার আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। ॥৭৩॥

সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে আমি আত্মারূপে অবস্থিত, সেই আমাকে না জানিয়া মূঢ়গণ কেবল বাহ্যপদার্থে লিপ্ত হইয়া থাকে। ॥৭৪॥

কিন্তু হে মাতঃ! ক্রিয়াসহায়ে উৎপন্ন দ্রব্যেও অর্থাৎ আয়াসসাধ্য বহুদ্রব্য সমর্পণেও আমার সন্তোষ হয় না এবং অন্য জীবগণকে তিরস্কার অর্থাৎ অবমাননা করতঃ যাহারা কেবল প্রতিমাতে আমার পূজন করে তাহা দ্বারাও আমি বস্তুতঃ পূজিত হই না। ॥৭৫॥

যতদিন পর্যন্ত আপনার মধ্যে ও সর্বপ্রাণিগণ মধ্যে আমি (পরমাত্মা) বিদ্যমান—ইহা জীব না জানে, ততদিনই আপন কর্ম দ্বারা প্রতিমাদিতে আমাকে পূজন করা কর্তব্য। ॥৭৬॥

আপন আত্মা ও পরমাত্মাতে যে ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকে সেই ভেদ-দর্শী অবশ্যই মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। ॥৭৭॥

---

* বৈকুণ্ঠাদি সমান লোকে বাস, ভগবানের সমীপে বাস, ভগবানের সমান ঐশ্বর্য লাভ এবং ভগবানে বিলয় বা সাযুজ্য—এই চারি প্রকার মুক্তি।